শ্রীঅরবিন্দ

সমগ্র রচনাবলী

একাদশ খণ্ড



সুভাষচন্দ্র বসু

সমগ্র রচনাবলী

শ্রীঅরবিন্দ

সমগ্র রচনাবলী

একাদশ খণ্ড

বক্তৃতা, প্রবন্ধ, বিবৃতি ও পত্রাবলি

(১৯৪৩-১৯৪৫)

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৬

সম্পাদনা শিশিরকুমার বসু ও সুগত বসু

অনুবাদ মীনাক্ষী ঘোষ

© নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো, কলিকাতা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-93-5040-613-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১
থেকে মুদ্রিত।

SAMAGRA RACHANABALI XI
[Anthology]
of
Subhas Chandra Bose
edited by
Sisir Kumar Bose
and Sugata Bose
Published by Ananda Publishers Private Limited
45 Beniatola Lane, Calcutta 700 009

ডা. শিশিরকুমার বসু এবং নেতাজির কাজ[১]

১৯৪১-এর ১৬ ও ১৭ জানুয়ারির দুই গুরুত্বপূর্ণ রাত্রিতে নেতাজির যিনি সারথি ছিলেন, তিনি ২০০০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে আমাদের ছেড়ে চলে যান। ডিসেম্বর ১৯৪০-এর দ্বিতীয় সপ্তাহে শিশির বসুকে নেতাজি তাঁর পাশে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, "আমার একটা কাজ করতে পারবে?" সেই জাদুকরী মুহূর্তের পর থেকে নেতাজির কাজে শিশির বসুর কোনও বিরাম ছিল না। ২০০০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সারা সকাল নেতাজির শয়নকক্ষের পাশে সভাপতির দপ্তরে তিনি কাজ করেছিলেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নেতাজির জীবনের প্রতিটি থেকে শিক্ষা লাভ করে। নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোতে নেতাজির বন্ধু দিলীপকুমার রায় শেষবার যখন আসেন, তখন বলেছিলেন, "শিশির, জান তো, loyalty কথাটার কোনও বাংলা সঠিক প্রতিশব্দ হয় না, কারণ আমরা বাঙালিরা loyal হতে জানি না। তুমি কিন্তু loyalty কাকে বলে তা দেখিয়ে দিয়েছ।"

"সুভাষচন্দ্র বসুকে সাহায্য করা"র অপরাধে শিশিরকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেলে, দিল্লির লালকেল্লায়, লাহোর দুর্গে এবং ল্যালপুর জেলে ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। নেতাজির রচনাবলী ১১ এবং ১২ খণ্ডে ওই সব বছরের কথা আছে।[১] স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতের অগ্রগণ্য শিশুরোগ চিকিৎসক হিসেবে অক্লান্ত কাজের পাশাপাশি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের স্মৃতি রক্ষার কাজে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

ডা. শিশিরকুমার বসু নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর মাধ্যমে নেতাজির ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ২০০০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তাঁর ৮০ তম জন্মতিথিতে 'উত্তরাধিকার' নামে একটি কবিতা রচনা করে তাঁর প্রয়াস সর্বোত্তমরূপে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

উত্তরাধিকার

আমাদের এই জীবন
পরিপূর্ণতার এক ছবি,
উত্তরাধিকার রক্ষার দায়
ছিল বড়ই কঠিন,
কিন্তু শেষ রক্ষা তো হল
সে এক কাহিনী।
পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছে

---

১. ডা. শিশিরকুমার বসু নেতাজি রচনাবলী ১০ম ও ১১তম খণ্ড পুস্তকের আকারে দেখে যেতে পারেননি, একটি মহৎ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত তাঁর জীবনব্যাপী আত্মনিয়োগের প্রতি এটি একটি সংক্ষিপ্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

এক যাত্রা, হাতে হাত
ধরে, ইতিহাস প্রতিষ্ঠায়,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রচারে
এবং সর্বোপরি দেশসেবার
বাণী সযত্নে রক্ষায়।
ভালবাসায়, নিষ্ঠায়, সেবায়
সমৃদ্ধ আমাদের এই জীবন।

আশি বছরের জন্মদিনে, ২ ফেব্রুয়ারি ২০০০।

আমাদের দার্শনিক-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, "শিখা থেকে শিখা জ্বালতে হয়। তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদের অগ্নিগ্রহণ করতে হবে।"

এই 'মহৎ প্রতিষ্ঠান'-এর জন্মদাতা (শিশিরের স্ত্রীকে লেখা শোকপত্রে রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণনের কথায়) এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আমরা সান্ত্বনা লাভ করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতন'-এর একটি ভাষণে তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয়ে যা বলেছিলেন, তা থেকে, "মৃত্যুর দ্বারাই সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন— তাঁর সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে— এই জীবনকে নিয়ে আমাদের কোনও সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনও লৌকিক ও সাংসারিক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা নেই। তাঁর সঙ্গে কেবল একটি মাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্ছে অমৃতের যোগ। মৃত্যুই এই অমৃতকে প্রকাশ করে।"

রবীন্দ্রনাথের লেখাকে একটু এদিক-ওদিক যদি করতে পারি: "একদিন তিনি একলা অমৃতজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার সংবাদ খুব অল্প লোকেই জেনেছিল... তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি। সেই অধিকারকে আমরা সার্থক করে যাব।"

সেই অঙ্গীকার আমি ড. শিশিরকুমার বসুর নিজের কথায় শেষ করছি:

কাজ চলছে

ব্যাপারটা ঘটেছিল শীতের এক দুপুরে,
আমার ডাক পড়ল, কাছে বসতে বলে
জিজ্ঞাসা করলেন, আমার একটা কাজ আছে,
করতে পারবে?
স্নিগ্ধ শান্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছিলেন
আমার জবাবের আশায়,
আমি কীই বা বলব!
কী কাজ? চিঠি ডাকে দিতে হবে?
টেলিগ্রামের খসড়া করতে হবে?
অথবা কোন অতিথিকে দেখাশোনা?
না, এক গোপন কাজ, এক গোপন যাত্রার
সাথী হতে হবে, কেউ জানবে না!

[ছয়]

জানবে শুধু ইলা।
তাই তো, এ আবার কী কাণ্ড কারখানা?
মনে পড়ল বছর দুয়েক আগে
বাবা বলেছিলেন
ছেলেটা সুভাষের পাল্লায় পড়েছে,
কথাটা ফলে গেল না কি!
সেই তো কাজের শুরু, কাজ চলছে,
কাজ চলবে।

সুগত বসু

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় পরামর্শদানের জন্য আমরা অধ্যাপক কৃষ্ণা বসু এবং অধ্যাপক লিওনার্দ এ. গর্ডনকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শ্রীকার্তিক চক্রবর্তী গ্রন্থের প্রস্তুতিতে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন, স্বর্গগত শ্রীনগসুন্দরম ও শ্রীসুখময় চৌধুরী সংরক্ষণশালা থেকে নথিপত্র সংগ্রহ করে দিয়েছেন, এবং নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর প্রকাশনা বিভাগের পরিচালনার ব্যবহারিক বিষয়গুলিতে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করেছেন মনোহর মণ্ডল ও মুনসী দাস – এঁদের সকলকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ২০০৫ সালের গ্রীষ্মে, শেষ পর্যায়ের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের প্রস্তুতিতে ক্যালিফোর্নিয়া-বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সোনা গাঙ্গুলির গবেষণা আমাদের প্রভূত সাহায্য করেছে। এই খণ্ডে ব্যবহৃত বক্তৃতা ও চিঠিগুলি বহু বছর ধরে সংগ্রহ করা হয়েছে। সেই কাজে সাহায্য করবার জন্য আমরা দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার বহুজনের কাছে কৃতজ্ঞ, যার মধ্যে আছেন: এস. এ. আয়ার, আবিদ হাসান সাফরানি, জন এ. বিডি, মহম্মদ জামান কিয়ানি, প্রেম কুমার সাহগল, গুরবক্স সিং ধিলন, জানকী দাভার আখিনহপান, ব্রহ্মচারী কৈলাসম্, প্রতিমা পাল, সত্যবতী থেভর, আনন্দ মূর্তি (রাম মূর্তির ভাইপো), ইরোচি ইয়োকোবোরি, এবং মিসেস এমোরি।

একাদশ খণ্ডের সম্পাদনার কাজ অন্য খণ্ডগুলির তুলনায় কঠিন ছিল। অন্য খণ্ডগুলির জন্য আমরা সাধারণভাবে মূল পাণ্ডুলপি, নথি এবং চিঠি, যা নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংরক্ষণশালায় আছে তার উপরে নির্ভর করতে পেরেছিলাম। এই একাদশ খণ্ডেও আমরা অবশ্যই প্রাথমিক ভাবে এনআরবি-র সংরক্ষণশালায় সংরক্ষিত চিঠি এবং বক্তৃতা ও বেতার ভাষণের অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিংগুলি ব্যবহার করেছি। কিন্তু ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে, নেতাজি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে অনেক বক্তৃতাই দিয়েছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত হিন্দুস্থানিতে। সৌভাগ্যক্রমে, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ এ আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের প্রচার দপ্তরের দক্ষতায়, স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিশ্চিত, অস্থির পরিস্থিতিতেও এই বক্তৃতার অনেকগুলিই ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ের বিশেষ ভাবে তিনটি প্রকাশনা এনআরবি-তে পাওয়া যায় : নারায়ণ মেনন সম্পাদিত On to Delhi: Speeches and Writings of Subhas Chandra Bose (Bangkok: Indian Independence League, 1944); Subhas Chandra Bose, Blood Bath (Singapore: The Publicity and Propaganda Department, The Indian Independence League Headquarters, 1944; লাহোর থেকে পুনঃপ্রকাশিত Hero Publications, 1947); এবং India Fights On (Bangkok: Provisional Government of Azad Hind, 1945)। India Fights On-এর সম্পাদক নারায়ণ মেনন তাঁর ভূমিকাতে লেখেন, যে তিনি যতদূর সাধ্য চেষ্টা করেছেন যাতে বক্তৃতাগুলি, ঠিক যেমনভাবে নেতাজি বলেছিলেন, অবিকল সেই ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়। কিন্তু তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে নেতাজি নিজেও সেই সময়ে এত

ব্যস্ত ছিলেন যে প্রকাশের আগে তিনি পাণ্ডুলপি পড়ে দেখার সময় পাননি। সুতরাং আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিতভাবে বলতে পরি না, যে হিন্দুস্থানিতে দেওয়া বক্তৃতাগুলি তাঁর প্রচার দপ্তর যে ভাবে অনুবাদ করেছে, নেতাজি নিজেও ঠিক সেই ভাবেই ইংরেজিতে বলতে চাইতেন কিনা। নেতাজি জীবিত থাকার সময়ে যে বক্তৃতাগুলি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তা ছাড়াও আরও অন্ততঃ দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার সংকলন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার ঠিক পরেই প্রকাশিত হয়: অরুণ সম্পাদিত Testament of Subhas Bose: Being a Complete and Authentic Record of Netaji's Broadcast Speeches, Press Statements, etc. during the Years 1942-1945 (Delhi: Rajkamal Publications, 1946) এবং এস. এ. দাস ও কে.বি. সুব্বাইয়া সম্পাদিত (আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিব জন এ. থিভির ভূমিকাসহ) Chalo Delhi ! A Historical Account of the Independence Movement in East Asia (Kuala Lumpur: The Econony Printers, 1946). অরুণ ছদ্মনামে সম্পাদিত Testament-এ আই এন এ-র কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করা হয়েছিল, এবং তা ছাড়াও ব্রিটিশদের করা নেতাজির বেতার ভাষণগুলির প্রতিলিপিও তাঁরা হাতে পেয়েছিলেন বলে অনুমান করা যায়। দাস ও সুব্বাইয়ার সংকলনটিও নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারে কারণ সেখানে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের মন্ত্রী জন এ. থিভি তার ভূমিকা লিখেছিলেন, যিনি আজ়াদ হিন্দ আন্দোলনের একটা চমৎকার কালানুক্রমিক বিবরণও লিখেছিলেন। নেতাজি যে সভাগুলিতে বক্তৃতা করেছিলেন সেই সভার পরিবেশের বিষয়েও কিছু বর্ণনা, দাস ও সুব্বাইয়ার বিবরণে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ সরকারের করা নেতাজির কিছু বেতার ভাষণের প্রতিলিপিও আমরা পড়েছি, যা এখন ভারতবর্ষের জাতীয় সংগ্রহালয়ে আছে। আজ়াদ হিন্দ আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বক্তৃতা এবং এই প্রতিলিপিগুলি মূলতঃ সদৃশ, ছোটখাট অমিল থাকলে আমরা সেই ক্ষেত্রে আজ়াদ হিন্দ আন্দোলনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বক্তৃতার বয়ানই অনুসরণ করেছি। আজ়াদ হিন্দ আন্দালনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বক্তৃতামালায় পাওয়া যায়নি বলে, শাসক সরকারের করা প্রতিলিপিগুলির মধ্যে শুধুমাত্র দু'টি ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসের দু'টি বেতার ভাষণের প্রতিলিপি, আমাদের ব্যবহার করতে হয়েছে।

সব মিলিয়ে, বলা যেতে পারে যে আমরা ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে লেখা নেতাজির রচনা ও বক্তৃতার একটা নির্ভরযোগ্য ও যথাসম্ভব নির্ভুল সংকলন প্রস্তুত করতে পেরেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার অস্থির ঘটনবলীর অবসানের পরে দীর্ঘ ষাট বছর কেটে যাবার পরে, এখনও, আরও নতুন লেখা আমাদের হাতে এসে পৌঁছচ্ছে। যেমন, শ্রীরাম মূর্তির কাছে লেখা চিঠি আমরা পেয়েছি মাত্র ২০০৫ সালে। আমরা জানি যে ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে নেতাজি জাপান থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দিয়েছিলেন, কিন্তু এখনও আমরা সেই ভাষণের প্রতিলিপি খুঁজে বার করতে পারিনি। আবারও একবার আমেরিকা ও জাপানের সংগ্রহশালাগুলিতে এই বিষয়ে গবেষণার কাজ করতে পারলে হয়তো আরও বেশ কিছু বক্তৃতা ও চিঠির সন্ধান পাওয়া যাবে, যা এই রচনাবলীর ভবিষ্যৎ সংস্করণে আমরা যোগ করতে পারব। ১৯৬১ সালে, বিনোদ সি চৌধুরীর সহায়তায় ডক্টর শিশির কুমার বসু নেতাজির রচিত লেখাগুলি প্রকাশ করবার অতি বিশাল এই কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন এবং ১৯৮০ সালে তিনি ১১ খণ্ডের (ইংরেজি সংকলন ১২ খণ্ডে বিভক্ত) এই সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের প্রকল্প হাতে নেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

প্রাপ্তির হীরক জয়ন্তীতে, নেতাজির লেখা জনসাধারণের হাতে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি যে আমরা রাখতে পেরেছি, যদিও আমাদের উদ্যোগ এখনও সম্পূর্ণ করতে পারা যায়নি তবুও আমরা যে সেই কাজের সিংহভাগ শেষ করতে পেরেছি, সেই সাফল্য আমাদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছে।

আমরা আবারও এই সুযোগে নেতাজির স্ত্রী এমিলি শেঙ্কল ও তাঁদের কন্যা অনিতা পাফ-কে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই, নেতাজির লেখাগুলির কপিরাইট নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর হাতে তুলে দেবার জন্য।

ভূমিকা

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ৯০ দিন ব্যাপী এক বিপজ্জনক সাবমেরিন যাত্রার শেষে ১৯৪৩ সালে ৬ মে, সুমাত্রার উপকূলে সাবাংয়ে এসে পৌঁছলেন। যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৪৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি জার্মানির কীল শহরে এবং যাত্রাপথে এক সময়ে, ১৯৪৩ সালের ২৮ এপ্রিল, ভারত মহাসাগরে মাদাগাসকর উপকূলের কাছে জার্মান সাবমেরিন থেকে জাপানি সাবমেরিনে এক দুঃসাহসিক যান বদলের ঘটনাও ঘটেছিল। যাত্রাশেষে সাবমেরিন ছেড়ে যাবার ঠিক আগে নাবিকদের সঙ্গে তোলা এক আলোকচিত্রে সুভাষচন্দ্র বসু স্বাক্ষর করে লিখলেন: 'এই সাবমেরিন ভ্রমণ আমার জীবনে এক চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়ে থাকল... আমাদের মুক্তি ও শান্তির সংগ্রামে এই যাত্রা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস।'[১]

পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক পথ পরিক্রমা করে, নেতাজি দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য এসে পৌঁছলেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষ থেকে তাঁর অন্তর্ধানের পর তিনি ইউরোপে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জার্মান ও ইতালীয় বাহিনীর হাতে যে সব ভারতীয়রা যুদ্ধবন্দি হয়েছিলেন তাঁদের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশীদার করা। কিন্তু ১৯৪১ সালে জুন মাসে জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করায় তাঁর সেই পরিকল্পনায় বাধা পড়ল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু করে ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে জাপানের সেনাবাহিনী যখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে অগ্রসর হল, ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্ত তখন তাঁর স্বপ্নের আজ়াদ হিন্দ ফৌজের জন্য উন্মুক্ত হয়ে গেল। ১৯৪২ সালের ১৫ জুন, ব্যাঙ্ককে প্রবাসী ভারতীয় স্বদেশানুরাগীদের এক সমাবেশে তারা তাঁকে আমন্ত্রণ জানাল দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য। তিনি তখন তাদের কাছে শুধুমাত্র একটা বার্তা পাঠাতে পেরেছিলেন যাতে তিনি 'সারা বিশ্বের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন'[২]–এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। এক বছর পরে যখন তিনি এই প্রবাসী ভারতীয়দের মাঝে এসে পৌঁছলেন, তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতির মাধ্যমে অবশেষে সেই সম্পর্ক গড়ে তোলবার সুযোগ এল। আজ়াদ হিন্দ ফৌজের পক্ষের দাবি অনুসারে ত্রিশ লক্ষ না হলেও, বিশ লক্ষেরও অনেক বেশি স্থানীয় ভারতীয় অসামরিক ব্যক্তির উপস্থিতি এশিয়াতে তাঁর আন্দোলনকে এক বিশাল সামাজিক সমর্থনের আশ্বাস দিল। সাবাং থেকে তিনি প্রথমে টোকিওতে এলেন তাঁর সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য সমর্থন গড়ে তুলতে, এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাপানের স্বীকৃতি আদায় করে নিতে। নেতাজির

---

১. শিশিরকুমার বোস, আলেকজ়ান্ডার ওয়ের্থ এবং এস এ আইয়ার প্রণীত 'এ বিকন অ্যাক্রস এশিয়া: এ বায়োগ্রাফি অব সুভাষচন্দ্র বোস' (বম্বে: ওরিয়েন্ট লঙম্যান, ১৯৭৩), পৃষ্ঠা ১৬৩-১৬৪।

২. 'সারা বিশ্বের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করুন, ১৫ জুন ১৯৪৩ ব্যাঙ্কক আলোচনা সভায় প্রদত্ত বার্তা, *দেখুন* 'আজাদ হিন্দ: রচনা ও বক্তৃতামালা ১৯৪১-১৯৪৩, শিশির কুমার বসু ও সুগত বসু সম্পাদিত 'শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী দশম খণ্ড', আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., পৃ. ৮৩।

রচনাসমগ্রের এই একাদশ ও শেষ খণ্ডের প্রথমাংশে রয়েছে তাঁর বিবৃতিগুলি ও টোকিও থেকে দেওয়া উদ্দীপ্ত বেতার ভাষণসমূহ। 'স্বাধীনতা-প্রেমী ভারতীয়দের রক্তের বিনিময়েই কেবলমাত্র ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা পাবে'[৩], তিনি ঘোষণা করলেন।

২ জুলাই ১৯৪৩ সালে, সুভাষচন্দ্র বসু এলেন সিঙ্গাপুরে— একসময় সিঙ্গাপুরকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'সুরক্ষাপ্রাচীর' বলা হত, এবং পরে যা সেই সাম্রাজ্যের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। *'সুভাষজি, সুভাষজি, উওহ্ জান-এ-হিন্দ আ গয়ে, উওহ্ নাজ় জিসপে হিন্দ কো, উওহ্ শান-এ-হিন্দ আ গয়ে'* গান গেয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হল। নেতাজির প্রতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সস্নেহ ও সগর্ব অনুভূতির সেটাই ছিল প্রথম প্রকাশ। দু'দিন পরে, ক্যাথে থিয়েটারে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উৎসাহী ভারতীয়দের এক প্রতিনিধি সভায় রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে নেতাজি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন। সেই ঐতিহাসিক দিনে হিন্দুস্থানী ভাষায় দেওয়া তাঁর বক্তৃতা এবং প্রত্যুত্তরে সমাগত জনগণ যেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে সাড়া দিয়েছিল, তা আমরা রেকর্ড করা ফিল্মে শুনেছি। কিন্তু তীব্র দেশাত্মবোধের অনুভূতি যা তাঁর বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছিল, নিরুত্তাপ ইংরেজি অনুবাদের ছাপানো অক্ষরগুলিতে সে অনুভূতির কিছুই ধরা পড়েনি। শ্রুতিমধুর কণ্ঠে ও মার্জিত হিন্দিতে নেতাজি তাদের বলেছিলেন, যারা দিল্লির লাল কেল্লার অভিমুখে যাত্রায় তাঁকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত, 'শুধুমাত্র ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বঞ্চনা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিরন্তর এগিয়ে চলা, এমনকী মৃত্যুও'[৪]— এ ছাড়া দেবার মতো তাঁর আর কিছুই নেই। পরের দিন, ৫ জুলাই ১৯৪৩ ছিল নেতাজির জীবনে 'সব থেকে গর্বের দিন।' সেদিন তিনি বললেন, 'আজ, আমার ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন হয়ে আমাকে এক অনন্যসাধারণ অধিকার ও সম্মান দিয়েছে কারণ আমি সমগ্র বিশ্বের সামনে ঘোষণা করতে চলেছি যে ভারতের মুক্তি বাহিনী বা আর্মি অফ লিবারেশন গঠিত হল।[৫] এর পরে মাসের পর মাস সুভাষ অসামরিক জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিশাল জনসমাবেশে হিন্দুস্থানী ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন, তাদের উদ্দীপ্ত করেছেন এবং 'যুদ্ধের জন্য তাঁর সর্বাত্মক উদ্যোগে'-র ডাকে তাদের কাছ থেকে বিপুলভাবে সাড়া পেয়েছেন। তাঁর বক্তৃতাগুলি সঙ্গে সঙ্গেই তামিল ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালের ৯ জুলাই তিনি সিঙ্গাপুরের এক জনসভায় বলেন, 'ভারতবর্ষের বাহিরের ভারতীয়েরা— বিশেষতঃ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা— এমন একটা সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলবে যে বাহিনী ভারতের শাসক ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করবার মতো শক্তিশালী হবে। যেদিন আমরা সেই বাহিনী গড়ে তুলতে পারব সেদিন বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হবে, শুধুমাত্র দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে নয়, ভারতীয় সেনাদলের মধ্যেও, যারা এই মুহূর্তে ব্রিটিশ পতাকার তলায় যুদ্ধ করছে। ব্রিটিশ সরকার যখন এইভাবে দুই দিক থেকে— ভারতের ভিতর থেকে ও বাহির থেকে— আক্রান্ত হবে, তখন তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এবং ভারতীয় জনগণ তখন তাদের স্বাধীনতা ফিরে পাবে।' তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর ৫ জুলাইয়ের ভাষণে সেনাদের কণ্ঠে ভারতে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের স্মৃতিবাহী এই স্লোগান দিয়েছিলেন— 'চলো দিল্লি।' দক্ষিণপূর্ব

---

৩. দ্রষ্টব্য, 'স্বাধীনতা-প্রেমী ভারতীয়দের রক্ত' [টোকিও থেকে বেতার সম্প্রচার, জুন ১৯৪৩]।

৪. দ্রষ্টব্য, 'ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বঞ্চনা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগিয়ে চলা, মৃত্যু' [৪ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে সিঙ্গাপুরে পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধিদের সভায় সভাপতির ভাষণ]।

৫. দ্রষ্টব্য, 'দিল্লি চলো, দিল্লি চলো!' [৫ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে সিঙ্গাপুরে আই এন এ-র সামরিক পর্যবেক্ষণে আই এন এ-র সর্বাধিনায়ক রূপে ভাষণ]।

এশিয়ার ভারতীয় নাগরিকদের তিনি আহ্বান করলেন 'সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে।' মহিলা-পুরুষ, অর্থ ও সামগ্রী সংগ্রহের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতির বিনিময়ে তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন 'আমার অনুরোধ মতো পূর্ব এশিয়ায় আপনারা সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিন এবং আমি আপনাদের দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি— ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রকৃত দ্বিতীয় রণক্ষেত্র।'[৬]

বিপ্লবের এই আহ্বানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে এক বিশাল অংশ বিপুল উৎসাহ ভরে সাড়া দিল। অন্তঃপক্ষে ১৮,০০০ সাধারণ নাগরিক ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আই এন এ)-তে যোগ দিল, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল দক্ষিণ ভারতীয় তামিল, ব্রিটিশ সেনাবাহিনী থেকে তারা বাদ পড়েছিল তথাকথিত যোদ্ধার জাতি নয় বলে। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের পেশাদার সৈন্যদের পাশাপাশি তারা সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করল। ব্রিটেনের ভারতীয় সেনাদলের প্রায় ৪০,০০০ সেনা ব্রিটিশ সম্রাটের আনুগত্য অস্বীকার করল এবং নেতাজির কাছে নতুন আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিল। ১৯৪৫ সালে লাল কেল্লায় বিচারের সময় শাহ নওয়াজ খান বলেছিলেন, 'যখন নেতাজি সিঙ্গাপুরে এসে পৌঁছলেন, আমি তখন তাঁকে খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ করেছি... জনসভায় আমি তাঁকে বহুবার বক্তৃতা করতে দেখেছি, যা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এ কথা বললে ভুল হবে না যে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বক্তৃতা আমাকে যেন সম্মোহিত করেছিল। আমাদের সামনে তিনি ভারতবর্ষের প্রকৃত রূপ তুলে ধরেছিলেন এবং সেই প্রথম যেন আমি একজন ভারতীয়ের চোখ দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখেছিলাম।'[৭] ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের স্থানীয় শাখাগুলিতে হাজার হাজার সাধারণ নাগরিক এসে যোগ দিয়েছিল এবং ভারতীয় মুক্তিবাহিনীকে তারা বহুভাবে সাহায্য করেছিল।[৮] সাবমেরিনে থাকার সময় সুভাষ চন্দ্র বসু আবিদ হাসানের কাছে একটি ভাষণ দেন শ্রুতিলিখনের জন্য, যা তিনি একদিন তাঁর স্বপ্নের সেনাবাহিনী— আই এন এ-র মহিলা বাহিনীর উদ্দেশ্যে দেবার কথা ভাবছিলেন। শ্রুতিলিখনের সময়ে একটা টর্পেডো আক্রমণের ঘটনাও ভাষণ থেকে তাঁর মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করতে পারেনি।[৯] তিনি অবশেষে ভাষণটি দিতে পেরেছিলেন ঝাঁসীর রানি বাহিনীর প্রথম দফায় নাম লেখানো সেনানীর সামনে, মালয় ও বর্মাদেশের সহস্রাধিক ভারতীয় তরুণীদের কাছে, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল তামিলভাষী।[১০] ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে ১৭ বছরের তরুণী জানকী ডাবর (থেভর) কুয়ালা লামপুরের এক জনসভায় গিয়েছিল সুভাষচন্দ্র বসুর ভাষণ শুনবে বলে। সভা শেষে

---

৬. দ্রষ্টব্য, 'কেন আমি ঘর ও দেশ ছেড়েছি' [৯ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে সিঙ্গাপুরে জনসমাবেশে ভাষণ।]

৭. Moti Ram, *Two Historic Red Fort Trials* (New Delhi, Roxy Printing Press, 1946), pp. 109-110.

৮. Leonard A. Gordon, Brothers against the Raj: *A Biography of Indian Nationalists Sarat and Subhas Chandra Bose* (New York: Columbia University Press, 1990), p. 498; Peter Ward Fay, *The Forgotten Army: India's Armed Struggle for Independence, 1942-1945* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993), pp. 214, 525-526.

৯. আবিদ হাসান সাফরানি, 'এ সোলজার রিমেমবারস', নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত টেপ করা সাক্ষাৎকারের প্রতিলিপি, ১৯৭৬, পর্ব ৫, *The Oracle*, 7, 1 (January 1985), পৃঃ ২১-এ প্রকাশিত।

১০. দ্রষ্টব্য, 'এক দিনে যে সাম্রাজ্যের উত্থান হয়েছিল এক রাতেই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে' [১২ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে আইআইএল-এর মহিলা বিভাগের সিঙ্গাপুর শাখায় ভারতীয় মহিলাদের সমাবেশে ভাষণ]।

সমবেত জনগণ ছুটে যায় নেতাজির কাছে, তাদের যার কাছে যা আছে, অর্থ, গহনা সব কিছু তাঁর হাতে দেবার জন্য। জানকীও তার কানের দুল ও গলার সোনার হার খুলে নেতাজির হাতে দেয়। তার মা-বাবা সেই খবর পান তার পরের দিন স্থানীয় খবরের কাগজে প্রথম পাতায় মেয়ের ছবি দেখে। পরে লক্ষ্মী স্বামীনাথন যখন তাঁর বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য মেয়েদের ডাক দিলেন, জানকী তখন তার বাবার কাছ থেকে যোগদানের অনুমতি আদায় করে নিল এবং সে ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে বাহিনীর সঙ্গে বর্মাদেশে গিয়ে পৌঁছেছিল। ১৯৪৫ সালে মে মাসে, শতাধিক মেয়ে যারা সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে পায়ে হেঁটে বর্মা থেকে থাইল্যান্ডে ফিরে এসেছিল, জানকী ছিল তাদের মধ্যে একজন।[১১]

নেতাজি ঝড়ের গতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিতে একের পর এক সফর করতে লাগলেন, তাঁর আন্দোলনের সমর্থনে জনমত গড়ে তোলার জন্য। ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে বর্মাদেশে ভ্রমণের সময় তিনি বললেন, '১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত আমি মান্দালয় কারাগারে বন্দি, তখন আমার বন্দিশালার বারান্দা থেকে বর্মাদেশের শেষ স্বাধীন সম্রাটের প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতাম আবার কবে বর্মাদেশ তার স্বাধীনতা ফিরে পাবে। আজ বর্মা এক স্বাধীন দেশ এবং আমি এক মুক্ত দেশের পরিবেশে আমার শ্বাস নিচ্ছি।'[১২] বাংলাদেশ যখন এক মর্মান্তিক মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কবলে, সেই সময়ে বর্মাদেশ থেকে নেতাজি চাল পাঠাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরা সভয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।[১৩] ১৯৪৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, দিল্লির লাল কেল্লা অভিমুখে আই এন এ-র যাত্রার শপথ নেবার জন্য রেঙ্গুনে ভারতবর্ষের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের সমাধিস্থলে একটা আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে নেতাজি বলেছিলেন, 'বাহাদুর শাহ ধর্মনির্বিশেষে ভারতীয়দের কাছে স্মরণীয় ব্যক্তি, কারণ তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে ডাক দিয়েছিলেন বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য। এবং শুধুমাত্র এই কারণেই নয়। অধিকন্তু তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর পতাকার তলায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রদেশবাসী ভারতীয়রা একত্র হয়েছিল, তাঁর পবিত্র পতাকার তলায় মুসলমান, হিন্দু, শিখ, অথবা বলা যেতে পারে, স্বাধীনতা অভিলাষী মুসলমান, হিন্দু, শিখ সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল, যে যুদ্ধকে ইংরেজ ঐতিহাসিক নাম দিয়েছেন 'সিপাহি বিদ্রোহ।' কিন্তু আমরা ভারতীয়রা তাকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করে থাকি। ভারতের 'স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শেষ যুদ্ধে'[১৪] নেতাজি চেয়েছিলেন আমাদের জাতীয় ঐক্যে সপ্রাণ অনুভূতি গড়ে উঠবে আমাদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের অনুপ্রেরণায়— ধর্মের সঙ্গে সম্পর্করহিত নিষ্প্রাণ, বৈচিত্র্যহীন কোনও সমাজ থেকে নয়।

১৮৪৩ সালের ২১ অক্টোবর, সিঙ্গাপুরে নেতাজি আজ়াদ হিন্দ (স্বাধীন ভারতবর্ষের) আপৎকালীন সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করলেন। এস এ আয়ার লিখেছেন, নেতাজি ১৯-২০ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখে কীভাবে রাত জেগে, ভারতের ইতিহাস এবং আয়ারল্যান্ড ও

---

১১. Puan Sri Datin Janaki Athinahappan, 'The Rani of Jhansi Regiment', in *The Oracle*, 2, 2 (January 1980), pp. 29-32, and editors' conversations with Janaki Athinahappan (nee Davar [Thevor]. আরও দেখুন, Fay, *The Forgotten Army*, p. 219-221.

১২. দ্রষ্টব্য, 'স্বাধীন বর্মাদেশ' [১ আগস্ট ১৯৪৩ তারিখে বর্মাদেশের স্বাধীনতা লাভের উপলক্ষে সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত বিবৃতি]।

১৩. দ্রষ্টব্য, কৃষ্ণা বসু, চরণরেখা তব (কলকাতা: আনন্দ, ১৯৮২), পৃঃ ৬৬-৬৭

১৪. দ্রষ্টব্য, 'বাহাদুর শাহের সমাধিস্থলে' [২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ তারিখে দেওয়া ভাষণ]।

আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের উদাহরণ ব্যবহার করে সেই ঘোষণাপত্র রচনা করেছিলেন। আয়ার লিখেছেন, 'আমি এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে দেখলাম, এক বিশাল ব্যক্তিত্বের পরিচয় আমার চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। তিনি হাতে কিছু সাদা কাগজ আর একটা পেনসিল নিয়ে লিখতে শুরু করলেন।' নেতাজি টানা হাতের লেখায় একটা পৃষ্ঠা শেষ করে আয়ারের হাতে দিতে থাকলেন এবং আয়ার সেটা টাইপ করতে থাকলেন, ছাপাখানায় পাঠাবার জন্য। 'ব্রিটিশদের দেশশাসনের কপট নীতির তাড়নায় ভারতবাসীদের অবস্থা সঙ্গীন, তাদের অবাধ লুণ্ঠন ভারতবাসীদের অনাহার ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে ভারতীয়দের কাছে তাদের সুনাম একেবারেই বিলুপ্ত হয়েছে, ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্য ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাদের এই দেশ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করবার জন্য এখন আমাদের শুধু একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন, এবং আজ়াদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব হল সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গটুকু জ্বালানো।' সেই রাতে নেতাজির বক্তৃতা লেখার ঘটনার বর্ণনা আয়ার দিয়েছেন: 'তিনি তাঁর সামনে রাখা কাগজগুলি থেকে একবারের জন্যও মুখ তুললেন না, প্রথম পৃষ্ঠার লেখা শেষ হয়ে গেলে নিঃশব্দে সেটা আমার হাতে তুলে দিলেন, আর আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে টাইপরাইটারের সামনে বসলাম। নেতাজির লেখা শেষ হয়ে গেলেই, আবিদ (হাসান) আর (এন জি) স্বামী পালা করে তাঁর ঘর থেকে হস্তলিখিত ঘোষণাপত্রের পৃষ্ঠাগুলি, একের পর এক আমার কাছে নিয়ে আসতে লাগল। আমার কাছে যেটা আশ্চর্য লাগল যে তিনি আগে লেখা পৃষ্ঠাগুলির কোনওটা একবারের জন্যও দেখতে চাইলেন না। কীভাবে তিনি মনে রাখতে পারলেন আগের পৃষ্ঠাগুলিতে তিনি কী লিখেছেন, কোন ক্রমানুসারে অনুচ্ছেদগুলি সাজিয়েছেন। হাতে লেখা সম্পূর্ণ ঘোষণাপত্রের কোথাও একটা শব্দও বাতিল করতে হল না, সংশোধন করতে হল না, এমনকী দাঁড়ি, কমা ইত্যাদি বিরাম চিহ্নগুলি পর্যন্ত অপরিবর্তিত রইল।' সব শেষের অনুচ্ছেদে তিনি ভারতীয় জনগণের কাছে তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখলেন:

> 'ঈশ্বরের নামে, ও অতীত প্রজন্মের মানুষ যাঁরা ভারতবাসীদের এক জাতিতে পরিণত করেছেন, এবং সেই গতপ্রাণ বীর যোদ্ধা যাঁরা আমাদের বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগের ঐতিহ্যে দীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের সকলের নামে আজ আমরা ভারতীয় জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি যেন তারা আমাদের পতাকার তলায় সমবেত হন এবং আসুন, আজ আমরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য একযোগে শেষবারের মতো আমাদের শত্রুদের উপরে আঘাত হানি।'

আয়ারল্যান্ডের পূর্বসূরীদের ঘোষণার প্রতিধ্বনি করে তিনি তাঁর ঘোষণায় বললেন, 'এই আপৎকালীন সরকারের প্রতি প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্য থাকা উচিত এবং আজ তারা সেই আনুগত্যের স্বীকৃতি দাবি করছে। এই সরকার তাঁর প্রতিটি নাগরিককে তাদের নিজস্ব ধর্ম আচরণের স্বাধীনতা, সমান অধিকার ও সমান সুযোগ দেবার অঙ্গীকার করছে। এই সরকার আজ তাদের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করছে যে তারা ধূর্ত বিদেশি সরকারের সৃষ্ট ও পরিপোষিক সর্ব ধরনের বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠে সমভাবে সমগ্র জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করবে।'[১৫]

---

১৫. দ্রষ্টব্য, 'আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকার', [২১ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখে সিঙ্গাপুরে দেওয়া বক্তৃতা] এবং S.A. Ayer, *Unto Him A Witness: The Story of Netaji Subhas Chandra Bose in East Asia* (Bombay: Thacker & Co. 1951), পৃঃ ১৬৩-১৬৪।

১৯৪৪ সালের জুন মাসের মধ্যে, শুধুমাত্র মালয়েই ২,৩০,০০০-র অধিক ভারতীয় লিখিতভাবে এই সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্যের শপথ নিল।[১৬] ভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী ও ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির বন্ধন গড়ে তোলার কাজে নেতাজি চমকপ্রদ সাফল্য লাভ করলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দাবি করবার সময় তাদের ধর্মগত, ভাষাগত বিভিন্ন পরিচয়গুলি ভুলে যাবার দাবি না রাখা সত্ত্বেও তিনি তা করতে পারলেন।

শ্রেণিগত বৈষম্যের মধ্যে মেলবন্ধন কিন্তু তত সহজে হল না। প্রথম দিকে দরিদ্রতম ভারতীয়েরা নেতাজির ডাকে অনেক বেশি তৎপরতার সঙ্গে সাড়া দিল। বেশ ক'জন অর্থবান ব্যক্তির কার্পণ্য দেখে নেতাজির পক্ষে তাঁদের প্রতি বিরূপ মনোভাব সংবরণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল, যদিও একই সঙ্গে, অনেক কোটিপতি তাঁদের সর্বস্ব দান করে পথের ফকির হয়ে গেলেন এমন চমকপ্রদ উদাহরণও দেখা গেল। ১৯৪৩ সালের ২৫ অক্টোবর তিনি চেট্টিয়ার ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের বললেন, 'যেখানে আই এন এ-র সেনানীর প্রশিক্ষণের মূলমন্ত্র হল তারা দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করবে যতক্ষণ না জয় করায়ত্ত হয়, সেখানে ধনী ব্যক্তিরা প্রশ্ন তুলছেন রসদ সংগ্রহের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতিতে তাঁদের কতটা দিতে হবে, মূল সম্পত্তির শতকরা ১০ ভাগ না ৫ ভাগ। এই ধনী ব্যক্তিরা, যাঁরা ৫ না ১০ সেই শতকরা হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে আমরা কি আমাদের সেনাদের বলতে পারব যে তোমরা এমনভাবে যুদ্ধ করবে যাতে শুধুমাত্র ১০ শতাংশ রক্তপাত ঘটে, বাকি ৯০ শতাংশ তোমরা তুলে রাখবে।'[১৭] শেষে যাদের কাছে যেমন পাওয়া গেল, আপৎকালীন সরকার কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই দান গ্রহণ করতে লাগল। উৎসাহীরা দিল ১০০% এবং অনিচ্ছুক দাতারা দিল ১০%। দেখা গেল নেতাজি অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সফল হয়েছেন, ১৯৪৩ সাল শেষ হবার আগে তিনি প্রতি মাসে ২০ লক্ষ স্ট্রেটস ডলার সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন।[১৮] আজাদ হিন্দ সরকারের কোষাগারে যারা প্রচুর অর্থ দান করেছিল, তাদের মধ্যে তামিলনাড়ুর চেট্টিয়ার ব্যবসায়ীরা অন্যতম।

সিঙ্গাপুরের প্রধান চেট্টিয়ার মন্দিরের পুরোহিতেরা কোনও একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নেতাজিকে নিমন্ত্রণ করবার জন্য এসেছিলেন, তখন তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কারণ তাঁরা সমাজের সকলকে সমানাধিকার দেবার নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু যখন তাঁরা সমাজের সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত এক জাতীয় সভার আয়োজনে রাজি হলেন, তখন নেতাজি তাঁদের অনুরোধে সাড়া দিলেন। সেই অনুষ্ঠানে নেতাজি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই বক্তৃতা আদ্যোপান্ত আবিদ হাসানের স্মরণে ছিল না। অনেক দিন পরে তিনি লিখেছেন, 'যে স্মৃতিটুকু আমি ধরে রাখতে পেরেছি, তা যেন দেশবাসীর ঐক্যসাধনে, দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এক উদ্দীপ্ত ঐকতান, সকল ভারতীয়রা যাতে তাদের স্বপরিচয় পাবার প্রয়াসে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেন।' ১৯৪৪ সালের শেষের দিকে যখন নেতাজি ইম্ফল থেকে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন, সেই মর্মান্তিক পশ্চাদপসরণের সময় সেই ঐকতানের প্রতিধ্বনিই

---

১৬. ভুলাভাই দেশাই, 'Address of Counsel for Defence, Red Fort Trial, Delhi, 1 December 1945', *in The Oracle* 15, 4 (October 1993), পৃঃ ৩৪।

১৭. দ্রষ্টব্য, 'আপনাদের ব্যাঙ্কের খাতা কোথায়?' [অল মালয় চেট্টিয়ার্স এবং অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সমাবেশে ভাষণ, ২৫ অক্টোবর, ১৯৪৩]।

১৮. Fay, *The Forgotten Army*, পৃঃ ২১৫। মালয়ের স্থানীয় শাখাগুলিতে সংগৃহীত অনুদানের বিস্তারিত প্রতিবেদনের জন্য দেখুন, *Young India* (Sunday, 19 September 1943), নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহালয়), পৃঃ ৬৬-৬৭।

তাঁকে শক্তি জুগিয়েছিল।[১৯] আজাদ হিন্দ সরকার জাতীয় ঐক্যের এই বোধ অতি সূক্ষ্মভাবে জাতির মানসিকতায় খোদাই করে দিতে পেরেছিল। যখন ভারতীয়েরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতেন, তখন 'জয় হিন্দ' ('ভারতের জয় হোক') বলে সম্ভাষণ করবার রীতি একেবারে প্রথম থেকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল। হিন্দি ও উর্দুর সংমিশ্রণে গঠিত হিন্দুস্থানী ভাষা, যা লেখা হত রোমান হরফে, হয়ে উঠেছিল জাতীয় ভাষা। কিন্তু যেহেতু সভায় বিপুল সংখ্যক দক্ষিণ ভারতীয়দেরও উপস্থিতি ছিল, সেই জন্য প্রতিটি জনসভাতে তামিল অনুবাদও দেওয়া হত। এমনকী আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাও পড়া হয়েছিল হিন্দুস্থানী, তামিল ও ইংরেজিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জনগণমন' গানের একটা সহজ হিন্দুস্থানী অনুবাদ সংগীত রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার মধ্যে আঁকা, ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে মহিশূরের টিপু সুলতানের বীরত্বব্যঞ্জক প্রতিরোধের প্রতীক, আক্রমণে উদ্যত বাঘের ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল সেনাবাহিনীর পোশাকের কাঁধে। আই এন এ-এর সেনানী যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা নিয়ে দিল্লি অভিমুখে রওনা হয়েছিল তার কেন্দ্রস্থলে আঁকা ছিল গান্ধীর চরকা। ইতমদ্ (বিশ্বাস), ইত্তেফাক (একতা), এবং কুরবানি (ত্যাগ)— এই তিনটি উর্দু কথায় আজাদ হিন্দ আন্দোলনের মূলমন্ত্র নিহিত ছিল।[২০]

১৯৪৩ সালের শেষ দিকে, এক সভায় তাঁর বক্তৃতায় জনগণের উৎসাহী সমর্থনে আবেগে আপ্লুত হয়ে নেতাজি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বছর শেষ হবার আগে আই এন এ ভারতের মাটিতে পা রাখবে। সৌভাগ্যবশত, ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপান আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের আইনসংগত মালিকানা অর্পণ করে। নেতাজি সেলুলার জেল পরিদর্শনে আসেন ও যে সব বিপ্লবীরা সেই জেলে বন্দি ছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের তিনি নতুন নামকরণ করেন, যথাক্রমে 'শহীদ' ও 'স্বরাজ।'[২১]

১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসে, আপৎকালীন সরকারের হেড কোয়ার্টার্স স্থানান্তরিত করা হল সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে। সেই বছরেরই ফেব্রুয়ারি মাসে আরাকান যুদ্ধক্ষেত্রে আই এন এ-র প্রথম অংশগ্রহণ, এবং তারপর ১৮ মার্চ ১৯৪৪ তারিখে আই এন এ উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষে প্রবেশ করল ইম্ফল ও কোহিমার উদ্দেশ্যে। তাদের কণ্ঠে 'চলো দিল্লি' ধ্বনি উঠতে লাগল, ভারত-বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করে আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম নিয়ে এল ভারতের মাটিতে। সেই ঐতিহাসিক ক্ষণে নেতাজি সুললিত ভাষায় এক বিশেষ বার্তা প্রচার করলেন, যে বার্তার মূলমন্ত্র ছিল দেশপ্রেম ও ত্যাগ:

> 'ওই দূরে, অনেক দূরে— নদী পার হয়ে, অরণ্যের শেষে, পর্বত অতিক্রম করে রয়েছে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত দেশ— ওই মাটিতে আমাদের জন্ম— ওই ভূমিতলে আমরা প্রত্যাবর্তন করব। ওই শোনো! ভারত ডাকছে— ভারতের রাজধানী দিল্লি আমাদের ডাকছে— ৩৮ কোটি স্বদেশবাসী আমাদের ডাকছে। রক্তের টানে তারা আমাদের

---

১৯. আবিদ হাসান সাফরানি, *'The Men from Imphal'* (কলকাতা: নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৭১, ১৯৯৫), পৃঃ ১২-১৩।

২০. দ্রষ্টব্য, 'ভারতীয় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা' [৯ ডিসেম্বর ১৯৪৩ তারিখে আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবগুলি]।

২১. 'Netaji in Andaman', 29-31 December 1943: A Report' in *The Oracle*, 16, 1 (January 1994), pp. 11-13.

টানছে। ওঠো, নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। অস্ত্র তুলে নাও। তোমাদের সামনে রয়েছে পথ যা তোমাদের পথিকৃতরাই গড়েছে। আমরা সেই পথ দিয়ে এগিয়ে যাব। আমরা শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে আমাদের পথ করে নেব— আর ঈশ্বর যদি তাই চান, তা হলে আমরা শহীদের মৃত্যু বরণ করব। আমাদের অন্তিম শয়নে আমরা সেই পথকে চুম্বন করব, যে পথ দিয়ে হেঁটে আমাদের সেনাবাহিনী দিল্লি পৌঁছবে। দিল্লি অভিমুখে আমাদের যাত্রা হল স্বাধীন ভারতের দিকে যাত্রা। চলো দিল্লি।'[২২]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে কর্মপন্থা নেতাজি বেছে নিয়েছিলেন তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বিস্তারিত ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন মহাত্মার উদ্দেশ্যে এক বেতার বার্তায়, ৬ জুলাই ১৯৪৪ তারিখে। গান্ধীজি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করবার সিদ্ধান্ত নেবার পর থেকে এই দুই নেতার লক্ষ্য ও আদর্শ আরও কাছাকাছি এসেছিল। দেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে স্বাধীনতা অর্জনের যে পবিত্র যুদ্ধ তখন চলছিল, সেই যুদ্ধে সাফল্যের জন্য নেতাজি 'জাতির জনক'-এর কাছ থেকে আশীর্বাদ ও শুভকামনা প্রার্থনা করেছিলেন।[২৩]

ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের যে সব অঞ্চল আইএনএ-র ক্ষমতাধীনে আসবে, সেখানকার বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়েছিল।[২৪] রেঙ্গুনের একজন ভারতীয় কোটিপতি আবদুল হাবিব সাহেব তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দান করেছিলেন, যার মূল্য এক কোটি টাকারও অধিক হবে, শ্রীমতী বেতাই-ও প্রায় একই কাজ করেছিলেন এবং তার জন্য তাঁদের 'সেবক-ই-হিন্দ' সম্মান দেওয়া হয়েছিল।[২৫] মূলতঃ নেতাজির মন্ত্রমুগ্ধকর বাগ্মিতার জন্যই, মালয় ও বর্মাদেশ থেকে আজ়াদ হিন্দ ব্যাঙ্ক ২০ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল।[২৬] দিল্লি অভিমুখে আজ়াদ হিন্দের প্রতিশ্রুতি অভিযান কিন্তু ইম্ফলে এসে থেমে যায়। আমেরিকান বিমান বাহিনীর সাহায্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এবং ব্রিটেনের ভারতীয় সেনাবাহিনী সাড়ে তিন মাস ব্যাপী ইম্ফলের অবরোধ ভেদ করতে সক্ষম হয় এবং তারা কোহিমার সীমানাতেও জাপানের এবং আই এন এ-র বাহিনীকে পরাস্ত করে। ১১ জুলাই ১৯৪৪ তারিখে, বাহাদুর শাহের মৃত্যুবার্ষিকীতে, তাঁর সমাধিস্থলে যখন নেতাজি ও তাঁর পার্ষদেরা পুনর্বার মিলিত হয়েছেন, ততদিনে মুষলধারায় বৃষ্টির জন্য ইম্ফল ও কোহিমাতে আই এন এ-র সেনানীর কাছে রসদ পৌঁছানোর কাজে বাধা পড়েছে। সেই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে, তাঁদের একমাত্র সান্ত্বনা দিয়েছিল ১৮৫৭ সালে ব্যর্থ বিদ্রোহের পরে বাহাদুর শাহ রচিত একটি কবিতা যাতে একজন যোদ্ধার বিশ্বাসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা ছাড়াও ইংরাজিতে লেখা একটা প্রসিদ্ধ কবিতার পঙ্‌ক্তি: 'Freedom's battle once begun, bequeathed from bleeding sire to son, tho' baffled off, is e'er won.' —স্বাধীনতার সংগ্রাম একবার শুরু হলে সর্বক্ষেত্রেই তা উত্তরাধিকার সূত্রে রক্তাক্ত পিতার কাছ থেকে পুত্রের হাতে এসে পড়ে, প্রায়শঃ ব্যর্থতা এলেও সব শেষে তারাই জয়ী হয়।[২৭]

---

২২. দ্রষ্টব্য, 'ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধে যোগ দিল' [১৯৪৪ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত আই এন এ-র উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণ এবং বিবৃতিগুলি]।

২৩. দ্রষ্টব্য, 'আমাদের জাতির জনক' [মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যে বার্তা, ৬ জুলাই ১৯৪৪ তারিখে বেতার ভাষণ]।

২৪. Gordon, *Brothers against the Raj*, p. 511.

২৫. Gordon, *Brothers against the Raj*, p. 510.

২৬. ভুলাভাই দেশাই, 'Address of Counsel for Defence', পৃঃ ৪২।

২৭. দ্রষ্টব্য, 'মহান দেশপ্রেমিক ও নেতা' [সম্রাট বাহাদুর শাহের সমাধিস্থলে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে দেওয়া ভাষণ, ১১ জুলাই ১৯৪৪]।

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে সামরিক বিপর্যয়ের পর শুরু হয় মর্মান্তিক ও কষ্টসাধ্য পশ্চাদপসরণ, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৪৪-এর শেষে ১৯৪৫ সালের প্রথম দিকে বর্মাদেশে কয়েকটি বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের ঘটনা, যে লড়াই আই এন এ পিছু হটতে হটতেই লড়েছিল। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে, নেতাজি ইম্ফল অভিযানে পরাজয়ের কথা প্রকাশ্যেই স্বীকার করে নেন এবং তিনি পরবর্তী লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেবার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে তিনি বর্মাদেশের যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন এই 'লড়াই হচ্ছে একদিকে মানুষের মনোবল ও সাহসিকতা এবং অন্যদিকে ইস্পাত ও দেহবর্মের সঙ্গে।' তিনি তাঁর বিশ্বস্ত সমর্থকদের মনে করিয়ে দেন যে 'পৃথিবীর ইতিহাসে কখনওই কোনও বিপ্লবী গোষ্ঠী সংখ্যা ও অস্ত্রসজ্জায় প্রতিপক্ষের থেকে শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বিদেশি শাসনের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তাই ঘটতে চলেছে।'[২৮] যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে, ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে, নেতাজি আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের কাছে শেষবারের মতো নিজের মত প্রকাশের সুযোগ পেলেন, যেখানে তিনি ভারতের মৌলিক সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করলেন। এই সভায় আলোচিত বিষয়, যাকে তাঁর 'টোকিও তত্ত্ব' বলা হয়, তাতে তিনি বললেন, ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে যে সৃষ্টিশীল প্রতিভা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দৃঢ়তা আছে, তাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে দেশ ও জাতি হিসাবে আমাদের এখনও যথেষ্ট প্রাণশক্তি অবশিষ্ট আছে। তিনি দক্ষতার সঙ্গে ভারতবর্ষের আধুনিক মানসিকতার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন, এবং মহাত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে নিপুণভাবে একটি সূক্ষ্ম মূল্যায়ন করলেন। বক্তৃতার মধ্যে কয়েকটি চোখে পড়ার মতো দুর্বলতা ছিল, বিশেষত যেখানে তিনি ভারতবর্ষের জাতিপ্রথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিদেশি শ্রোতাদের কাছে তিনি সুস্পষ্ট বিশ্লেষণে দেখাতে পেরেছিলেন যে, তাঁর বিচারে স্বাধীন ভারতবর্ষের সামনে যে তিনটি সর্বাপেক্ষা জরুরি কাজ রয়েছে, তা হল— জাতীয় প্রতিরক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা।[২৯]

দিল্লি অভিমুখে তাঁর যাত্রা আবার শুরু করবার জন্য নেতাজি নিতান্তই ব্যগ্র ছিলেন। তিনি তখনও আশা করেছিলেন যে হয়তো দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ইম্ফলে ব্রিটেনের ম্যাজিনো লাইন তিনি অতিক্রম করতে পারবেন, কিন্তু জাপানিদের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেন যে সেই প্রচেষ্টায় তাদের কাছ থেকে আর কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসে, টোকিওতে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত জেকব মালিকের মাধ্যমে নেতাজি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তাদের পশ্চিমী বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে যে মতান্তর ঘটতে চলেছে সেটা নেতাজি অনুমান করতে পেরেছিলেন এবং তিনিও তখন এমন এক রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পথ খুঁজতে চেষ্টা করছিলেন যাদের কাছ থেকে, একমাত্র ১৯৪১ সালে মস্কো দিয়ে তাঁর যাতায়াতের সুযোগ করে দেওয়া ছাড়া, অতীতে তিনি আর কখনও কোনও সাহায্য পাননি। এ ছাড়া, টোকিওতে তিনি তরুণ যুবকদের সঙ্গে দেখা করেন, যাদের তিনি সর্বোৎকৃষ্ট প্রশিক্ষণ নেবার

---

২৮. দ্রষ্টব্য, 'ইস্পাত ও দেহবর্মের চেয়ে শক্তিশালী হল মানুষের মনোবল ও সাহসিকতা' ['সেনা দিবস' উপলক্ষে বেতারভাষণ, ১৮ অক্টোবর ১৯৪৪]।

২৯. দ্রষ্টব্য, 'ভারতবর্ষের মৌলিক সমস্যাগুলি' [টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, নভেম্বর ১৯৪৪]।

জন্য টোকিওর মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে শিক্ষার্থী রূপে পাঠিয়েছিলেন। এই সময়ে লেখা নেতাজির চিঠি থেকে দেখা যায় যে টোকিওর এই তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রতি এবং ঝাঁসির রানি বাহিনীর তরুণীদের প্রতি তিনি কতটা স্নেহপরায়ণ ছিলেন ও তাদের মঙ্গলকামনায় তিনি কতটা চিন্তিত ছিলেন। ২৯ নভেম্বর ১৯৪৪ তারিখে (সেদিন তাঁর কন্যা অনিতার দ্বিতীয় জন্মদিন) তিনি লেখেন, 'স্নেহের তরুণবৃন্দ, নিষ্পনের মাটি ছেড়ে চলে যাবার প্রাক্কালে আমি তোমাদের কাছে আমার আশীর্বাদ জানাই ও কাজে তোমাদের সাফল্য কামনা করি। আমার নিজের কোনও পুত্রসন্তান নেই— কিন্তু তোমরা আমার নিজের পুত্রের থেকেও বেশি— কারণ যে কাজে তোমরা তোমাদের জীবন উৎসর্গ করেছ— সেই কাজ হল আমার জীবনের এক ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য— 'ভারত মাতা'র মুক্তি।'[৩০] লড়াই অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে নেতাজি বর্মাতে ফিরে এলেন তাইপেই, সায়গন এবং সিঙ্গাপুর ঘুরে। ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৪ তারিখে সায়গন থেকে টোকিওর এই তরুণ শিক্ষার্থীদের তিনি লিখলেন, 'আজ এখান থেকে একজন ভদ্রলোক টোকিও যাচ্ছেন। আমি এই সুযোগে তাঁর হাতে তোমাদের কাছে কিছু 'পাঁপড়' পাঠাচ্ছি। আমি আরও কিছু জিনিস পাঠাতে পারতাম। কিন্তু তিনি এর বেশি ওজন নিতে পারবেন না।'[৩১] এম সত্যবতী থেভরকে লেখা চিঠিগুলি থেকে বোঝা যায় যে মহিলা বাহিনীর পরিচালনার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়গুলি সম্বন্ধেও তাঁর কতটা আগ্রহ ছিল।

'এ তো মণিপুর অববাহিকাতে জয়ের আশা মনের মধ্যে রেখে লড়াই করা নয়', পিটার ফে লিখেছেন, 'এ হল সাফল্যের কোনও আশা ছাড়াই ইরাবতীর তীর ধরে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু শেষের ফলাফল যেমনই হোক না কেন, এই যুদ্ধের জন্যই স্বাধীনতাকামী সেনাবাহিনী গড়ে তোলা যুক্তিসংগত ছিল এবং এই যুদ্ধই সব শেষে সেনাদের এক অসামান্য মানসিক শক্তির জোগান দিয়েছিল।'[৩২] এখানে আরও একটা কথা যোগ করা যায় যে ১৯৪৫ সালের এপ্রিল ও মে মাসে, আই এন এ সেনা ও ঝাঁসির রানি বাহিনীর মেয়েদের নিয়ে বর্মাদেশ থেকে থাইল্যান্ড পর্যন্ত নেতাজির ঐতিহাসিক পশ্চাদপসরণ— টানা ২৩ দিন ধরে বিপজ্জনক এলাকায় শত্রুপক্ষের আক্রমণ অগ্রাহ্য করে অবিরাম পথ চলা— স্বাধীনতার মূল্য দিতে সেনাদের এই চূড়ান্ত আত্মবিসর্জন জনসাধারণের মনের মধ্যে এমন এক ছাপ ফেলেছিল যা সহজে ভোলবার নয়। বর্মাদেশ ত্যাগ করবার আগে নেতাজি তাঁর সেনাদের বলেছিলেন যে, 'আজকের এই সংকটকালে আমি শুধুমাত্র একটা আদেশই আপনাদের দিতে পারি, এবং তা হল যদি সাময়িকভাবে আপনাদের হার স্বীকার করে নিতে হয় তা হলে আপনারা যেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যেতে পারেন, তেরঙা পতাকা যেন সগর্বে উড্ডীন থাকে, যদি মরতেই হয় তা হলে বীরের মতো লড়াই করে যেন মৃত্যুবরণ করতে পারেন এবং সম্মান ও শৃঙ্খলার সর্বোচ্চ মান যেন সর্বদা রক্ষিত হয়। আপনাদের এই সুমহান ও বিশাল আত্মত্যাগের জন্যই ভারতবর্ষের আগামী প্রজন্ম ভবিষ্যতে জন্ম নেবে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে, বিদেশিদের পদানত দাসরূপে নয়। তারা আপনাদের নামে জয়ধ্বনি দেবে কারণ আপনারা, তাদের পূর্বসূরীরা মণিপুরে, বর্মাতে, আসামে লড়াই করেছেন, কখনও কখনও হার স্বীকার করতে হয়েছে কিন্তু সাময়িক ব্যর্থতা

---

৩০. দ্রষ্টব্য, টোকিওতে আইএনএ-র সেনানীর প্রতি পত্র, ২৯ নভেম্বর ১৯৪৪।

৩১. দ্রষ্টব্য, টোকিওতে আইএনএ-র সেনানীর প্রতি পত্র, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৪।

৩২. Fay, The Forgotten Army, p. 556.

সত্ত্বেও গৌরবময় লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে পথ আপনারা সাফল্যের সঙ্গে নির্মাণ করেছেন তার জন্য।'[৩৩]

সামরিক দিক থেকে বিচার করলে, জেনারেল স্লিম যদি 'পরাজয়কে জয়ে' পরিণত করতে পারার জন্য আত্মপ্রসাদ অনুভব করে থাকেন,[৩৪] তা হলে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তখন নেতাজিও চিন্তা করছিলেন রাজনৈতিক বিচারে কী ভাবে আই এন এ-র পক্ষ থেকে তার পালটা জবাব দেওয়া যায়। ১৯৪৫ সালের ২১ মে থাইল্যান্ডে পৌঁছবার পরে জনগণ সমক্ষে তাঁর প্রথম বক্তৃতায়, তিনি তুরস্ক ও আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে ভারতীয়দের লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। তাঁর 'চলো দিল্লি' স্লোগানে তিনি যাদের অভূতপূর্ব স্বদেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'এমন হতেই পারে যে আমরা ইম্ফলের পথ দিয়ে দিল্লি যাব না।' তিনি এই আশ্বাস দেন, 'কিন্তু দিল্লি পৌঁছবার পথ অনেক, যেমন রোমে যাবারও অনেক পথ ছিল। বহুবিধ এই পথগুলির কোনও একটা ধরে আমরা অগ্রসর হব এবং একদিন আমরা আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থানে, ভারতের রাজধানীতে পৌঁছব।' বর্মাদেশের উপর পুনরায় সামরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার কাজে ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সেনারা আবারও যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, তাতে তিনি স্বভাবতই হতাশা বোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টতই একটা নতুন ইঙ্গিত পেয়েছিলেন যাতে একটা ভিন্নতর ভবিষ্যতের আশ্বাস ছিল:

> 'যে ঘন মেঘ আমাদের আকাশকে আচ্ছন্ন করেছে তাতে একটিই রূপালি রেখা চোখে পড়ছে এবং সেটা হল গত যুদ্ধের সময়কার ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে আজকের ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর পার্থক্য আছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেক সেনাই ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সেনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছিল। অনেক সময়েই আমাদের সেনাদের তারা জানিয়েছে যে যদি আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা আরও অগ্রসর হতে পারে তা হলে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর নেতারা তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি, এবং ভারতের মুক্তির জন্য ফৌজের সংগ্রামের প্রতি ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে অনেকেরই যে সহানুভূতি আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনই তারা বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেবার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। বহুদিন বিদেশি শাসকের অধীনে থাকার ফলে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সেনারা তাদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের ভয় আছে যে শেষ পর্যন্ত যদি ব্রিটিশ শক্তিরই জয় হয় তা হলে তারা বিপদে পড়বে। উপরন্তু তারা আমাদের শত্রুপক্ষের প্রচারে কিছুটা বিশ্বাসও করেছে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ (ভারতীয় জাতীয় বাহিনী) জাপানিদের হাতে খেলার পুতুলবাহিনী। বর্মাতে আসবার পর ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সেনাদের চোখ খুলবে। তারা নিজের চোখে দেখতে পাবে আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ কী করছে এবং কীভাবে তারা ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই করেছে। তারা নিজের কানে শুনবে ''জয়

---

৩৩. দ্রষ্টব্য, 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভারতীয়রা আপনাদের নামে জয়ধ্বনি দেবে' [দিনের বিশেষ বার্তা, ২৪ এপ্রিল ১৯৪৫]।

৩৪. William Slim, *Defeat into Victory* (London: Cassell 1956).

হিন্দ" ধ্বনি— প্রতি স্বাধীন ভারতীয় যে ধ্বনি দিয়ে পরস্পরকে সম্বোধন করে। তারা আরও শুনবে ভারতের উদ্দীপক জাতীয় সংগীত বর্মাদেশের স্বাধীন ভারতীয়দের কণ্ঠে। ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সেনা ও আরও যারা ব্রিটিশদের সঙ্গে বর্মাদেশে এসে পৌঁছচ্ছে, তাদের এই দেশে আসার পরে যে অভিজ্ঞতা হবে আগামী দিনের জন্য তার প্রভাব হবে অচিন্তনীয়।'[৩৫]

ব্রহ্মচারী কৈলাশমকে ১০ জুন ১৯৪৫ সালে লেখা ব্যক্তিগত চিঠিতে তিনি প্রায় একই কথা বলেছেন। 'বর্মাতে সম্প্রতি যা ঘটেছে তা সত্ত্বেও আমাদের লড়াই চলবে। আমরা জয়ী হব এবং ভারত স্বাধীন হবে।'[৩৬]

ভারতে বসবাসকারী ভারতীয়রা যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতিস্বীকার না করে সেই উদ্দেশ্যে, ১৯৪৫ সালের জুন মাসের শেষের দিকে নেতাজি অনেকগুলি বেতারভাষণ দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি ত্রিমুখী কৌশল অবলম্বনের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন: (১) ভারতবর্ষের বাইরে সশস্ত্র সংগ্রাম অব্যাহত রাখা, (২) ভারতের অভ্যন্তরে আপোস মীমাংসার পথ বর্জন করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা, এবং (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক সমর্থন রক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যখন নতজানু হয়ে আমেরিকার কাছে সাহায্য চাইতে পেরেছে, তখন তিনি মনে করেছিলেন যে পরাধীন, অস্ত্রহীন দেশের নেতা হিসাবে জাপানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করায় তিনি কোনও অপরাধ করেননি। বহির্বিশ্বের কাছ থেকে পাওয়া কিছু সাহায্য ছাড়া কোনও দেশই পরাধীনতা থেকে মুক্তি পায়নি। যে কারণে তিনি মনে করেছিলেন যে দেশবাসীকে পরামর্শ দেবার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছেন সেই কারণগুলি তাঁর ওয়াভেল প্রস্তাবের বিশ্লেষণের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল:

'আমি ও আমার সহযোদ্ধারা এখানে এক মরণপণ লড়াই করছি। রণক্ষেত্রে আমার কমরেডরা তাদের জীবন নিয়ে খেলা করছে। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে নেই তাদেরও প্রতি মুহূর্তে বিপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। যখন বর্মাদেশে ছিলাম, বোমাবর্ষণ ও মেশিনগানের গুলি ছিল আমাদের প্রতিদিনের আমোদের খোরাক। শত্রুপক্ষের বোমার নির্মম আঘাতে ও মেশিনগানের গুলিতে আমার অনেক কমরেডকে আমি প্রাণ দিতে দেখেছি, আহত পঙ্গু হতে দেখেছি। হাতপাতালে রোগীদের গুরুতর আহত করে রেঙ্গুনে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের গোটা হাসপাতাল আমি জমির সঙ্গে মিশে যেতে দেখেছি। আমি এবং আমার মতো আরও অনেকে যে আজও বেঁচে আছি, সে শুধু ঈশ্বরের কৃপায়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেহেতু আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, জীবনধারণ করতে ও লড়াই করতে হচ্ছে সেইজন্য আমি মনে করি আমার অধিকার আছে আপনাদের সঙ্গে কথা বলার ও আপনাদের উপদেশ দেবার। আপনাদের মধ্যে অনেকেরই জানা নেই বোমাবর্ষণ কী! আপনাদের মধ্যে অধিকাংশেরই জমির কাছাকাছি উড়ে যাওয়া বিমান থেকে মেশিনগানের গুলির সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা নেই। কানের পাশ দিয়ে, শরীরের ডানদিক দিয়ে, বাঁদিক দিয়ে উড়ে যাওয়া বুলেটের

৩৫. দ্রষ্টব্য, 'আমাদের সংগ্রাম চলবে' [ব্যাঙ্ককে বক্তৃতা, ২১ মে ১৯৪৫]।
৩৬. দ্রষ্টব্য, ব্রহ্মচারী কৈলাসম্‌কে লেখা পত্র, ১০ জুন ১৯৪৫।

শব্দের সঙ্গে আপনাদের মধ্যে অধিকাংশেরই কোনও পরিচয় নেই। যাঁরা এই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন তার পরেও নিজেদের মনোবল অটুট রেখেছেন তাঁরা লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের দিকে ফিরেও তাকাবেন না।'[৩৭]

৪ জুলাই আমেরিকার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন, যেদিন তারা তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। পূর্ব এশিয়াতে, আজ়াদ হিন্দ আন্দোলনের ইতিহাসেও ওই দিনটির গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। ১৯৪৩ সালের সেই দিনটিতে নেতাজি আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে, সিঙ্গাপুরে দু' ঘণ্টা ধরে এক বিশাল জনসভায় হিন্দুস্থানীতে বক্তৃতা দেন। সভায় উপস্থিত জনগণ, হয় মুক্তি নয় মৃত্যু, এই শপথ বাক্য পুনরায় উচ্চারণ করে। ১৯৪৫ সালের ৮ জুলাই, নেতাজি আই এন এ-র সৈনিক যারা স্বাধীনতার যুদ্ধে তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, সেই শহীদদের স্মৃতিসৌধের ভিত্তি স্থাপন করলেন। আই এন এ-র সিরিল জন স্ট্রেসি সিঙ্গাপুরের সমুদ্রের ধারে এই স্মৃতিসৌধ গড়ে দিলেন অবিশ্বাস্য স্বল্প সময়ের মধ্যে; সৌধের উপরে আই এন এ-র মূলমন্ত্র খোদাই করা হল— *ইতমদ্* (বিশ্বাস), *ইত্তেফাক* (একতা), এবং *কুরবানি* (ত্যাগ)।[৩৮] ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের ফলে পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধে এক আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সমাপ্তি ঘটে গেল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক দু' বছর আগে, ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান পরাজয় স্বীকার করে নিল— নেতাজি সেই দিনটিতে শেষবারের মতো দিনের বার্তা ঘোষণা করলেন এবং পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের জন্যও তিনি একটি বিশেষ বার্তা পাঠালেন। তিনি তাঁর সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দিল্লির অভিমুখে যাত্রার পথ অনেক এবং এখনও দিল্লিই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের অমর সহযোদ্ধাদের প্রাণবিসর্জন ও আপনাদের সকলের ত্যাগ আমাদের সংগ্রামকে অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত করবে।'[৩৯] এবং অসামরিক ব্যক্তিরা যারা তাঁর সর্বাত্মক প্রস্তুতির আহ্বানে অভূতপূর্ব উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন:

বোনেরা ও ভাইয়েরা,

ভারবতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল সমাপ্তি ঘটল এবং সেই অধ্যায়ে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় ভাই ও বোনদের জন্য এক চিরন্তন স্থান থাকবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সৈন্য, অর্থ ও সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন জোগান দিয়ে, দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের এক মহান দৃষ্টান্ত আপনারা রেখেছেন। আমি যখন "সর্বাত্মক প্রস্তুতির" জন্য ডাক দিয়েছিলাম যখন যে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের সঙ্গে আপনারা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, আমি সে কথা কোনও দিনও ভুলব না। আজ়াদ হিন্দ ফৌজ ও ঝাঁসির রানি রেজিমেন্টের সৈনিক হিসাবে প্রশিক্ষণ নেবার জন্য আপনারা আপনাদের সন্তানদের পাঠিয়েছেন দলে দলে। আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের রণভাণ্ডারে অকাতরে পাঠিয়েছেন অর্থ ও সামগ্রী। সংক্ষেপে বলতে গেলে

---

৩৭. দ্রষ্টব্য, 'জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা' [সিঙ্গাপুর থেকে বেতার ভাষণ, ২৬ জুন ১৯৪৫]।

৩৮. Cyril John Stracey, 'How I came to join the INA, *in The Oracle,* 4, 1 (January 1982,), pp. 53-56.

৩৯. দ্রষ্টব্য, 'দিল্লির অভিমুখে অনেক পথ আছে' [আজকের বিশেষ ঘোষণা, ১৫ অগাস্ট ১৯৪৫]।

ভারতমাতার সুযোগ্য পুত্রকন্যার দায়িত্ব আপনারা পালন করেছেন যথার্থ ভাবে। আপনাদের এই কঠোর আত্মত্যাগের যে এখনই কোনও পুরস্কার পাওয়া গেল না তার জন্য আমার আক্ষেপ আপনাদের থেকেও বেশি। কিন্তু এই প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি কারণ ভারতবর্ষ যে একদিন স্বাধীনতা পাবে আপনাদের আত্মত্যাগ সেটা নিশ্চিত করেছে। সেই আত্মত্যাগ সারা পৃথিবীর ভারতীয়দের মনে চিরদিন অনুপ্রেরণা জাগাবে। ভবিষ্যতের প্রজন্ম আপনাদের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের বেদীতে আপনাদের অবদানের কথা এবং আপনাদের সাফল্যের কথা তারা সগর্বে উল্লেখ করবে।

স্বাধীনতা প্রাপ্তিতেই যে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নিহিত আছে, সেই বিশ্বাসে যাতে ভারতবাসী অটল থাকে, নেতাজি এই অনুরোধ করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, 'ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবে এবং সেই দিন আসন্ন।'[৪০]

১৯৪৫-এ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ঠিক সেই সময়ে দিল্লির লাল কেল্লায় নেতাজির সৈন্যরা এল যেন ঈশ্বর প্রেরিত হয়ে। আই এন এ-র কিছু উচ্চপদস্থ অফিসারের বিচারের ঘটনা নেতাজি ও তাঁর সেনাবাহিনীর কাহিনিকে ভারতের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিল। গান্ধীজি বললেন, 'সারা দেশ আজ জেগে উঠেছে, এবং সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতার আলোড়ন এসেছে, তাদের চিন্তাতেও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে।'[৪১] এশিয়ার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের যে সুকঠিন আধিপত্য ছিল তার ভিতের মধ্যে ভাঙন ধরাবার জন্য, শাসকদের প্রতি আনুগত্য ভুলিয়ে দিয়ে নেতাজি সুকৌশলে ভারতীয় সেনাদের মনের মধ্যে স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি নতুন আনুগত্যের বীজ বপন করে দিতে সফল হয়েছিলেন। নেতাজি তাঁর একটি বক্তৃতায় ঘোষণা করেছিলেন, 'আমরা বাঁচি কিংবা মরি, দেশকে স্বাধীন দেখার অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের হল কিংবা হল না, আমাদের যে জয় হবেই সেই বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত।'[৪২] জাপানের আত্মসমর্পণের পরে নেতাজি যখন এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার চেষ্টা করছিলেন, তখন দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৪৫ সালের ১৮ অগাস্ট তাইপেইতে তিনি বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন। আত্মপ্রচারের চেষ্টা তিনি সর্বদাই ঘৃণা করেছেন, এবং স্বাধীনতার যুদ্ধের একটা চরম সংকটাবস্থায় তাঁর প্রাণ হারানোর ঘটনার ফলে ব্রিটিশ শাসনের পরবর্তী অধ্যায়ে স্বাধীন ভারতবর্ষে নেতাজির চিন্তাভাবনা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। কিন্তু 'দেশপ্রেমিকদের মধ্যে স্বমহিমায় যিনি যুবরাজ', তাঁর সম্বন্ধে 'জাতির জনক' বলেছিলেন, 'নেতাজির নাম'-এর প্রভাব হয়েছিল 'জাদুর মতো'। ১৯৪৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন'-এ লিখেছেন, 'নেতাজি ও তাঁর সেনাবাহিনীর কাছ থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তা হল, আত্মত্যাগ, শ্রেণি ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে ঐক্য এবং শৃঙ্খলার শিক্ষা।'[৪৩] ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা থেকে তাঁর 'মহানিষ্ক্রমণ'-

---

৪০. দ্রষ্টব্য, 'ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবে' [মালয়, থাইল্যান্ড, ইন্দোচিন, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, ফিলিপাইন, জাপান ও পূর্ব এশিয়ার অন্যত্র বসবাসকারী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা, ১৫ অগাস্ট ১৯৪৫]।

৪১. D.G. Tendulkar, *Mahatma: Life of Mohandas Karamchand Gandhi,* Vol 7, 1945-1947 (New Delhi: Publications Divison, Government of India, Reprinted 1988), p. 113.

৪২. দ্রষ্টব্য, 'বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সম্মেলনে নেতাজি', নভেম্বর ১৯৪৩।

৪৩. Tendulkar, *Mahatma,* p. 68.

এর আগে নেতাজি নিজেই তাঁর শেষ ইচ্ছাপত্র লিখে গিয়েছিলেন। যারা তাঁকে বন্দি করে রেখেছিল সেই ব্রিটিশ শাসকদের উদ্দেশ্য করে, জেলখানাতে অনশন ধর্মঘট শুরু করবার আগে তিনি লিখেছিলেন, 'ব্যক্তিবিশেষকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে, যাতে দেশ ও জাতি বাঁচতে পারে। যাতে ভরতবর্ষ বাঁচতে পারে এবং গৌরবময় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে, তার জন্য আজ আমি অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবার জন্য প্রস্তুত।' তিনি একান্তভাবেই এ কথা বিশ্বাস করতেন যে, 'কষ্টে ও ত্যাগে কখনও কারও কোনও ক্ষতি হয় না।' তিনি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে লিখেছেন, 'যদি কেউ পার্থিব ধন কিছুমাত্র হারিয়ে থাকে তা হলে তার পরিবর্তে সে আরও অনেক ধনে ধনী হবে, কারণ সে অমরত্বের উত্তরাধিকার পাবে।'[৪৪]

ইতিহাসের অধ্যাপক এডওয়ার্ড ফারলে ওটেন, ১৯১৬ সালে নেতাজি যাঁকে আঘাত করেছিলেন বলে শোনা যায়, ভারতের এই অমর বীর সন্তানের জীবনাবসানের পর তিনিই সব থেকে সুন্দর শ্রদ্ধাঞ্জলি লিখেছেন:

Subhas Chandra Bose
Obiit 1945

Did I once suffer, Subhash, at your hand?
Your patriot heart is stilled! I would forget!
Let me recall but this, that while as yet
The Raj that you once challenged in your land
Was Mighty; Icarus-like your courage planned
To mount the skies, and storm in battleset
The ramparts of High Heaven, to claim the debt
Of freedom owed, on plain and rude demand.
High Heaven yielded, but in dignity.
Like Icarus, you sped towards the sea.
Your wings were melted from you by the sun,
The genial patriot fire, that brightly glowed
In India's mighty heart, and flamed and flowed
Forth from her Army's thousand victories won.[45]

সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৪৫

একদিন কি তোমার হাতই আমাকে আঘাত হেনেছিল?
সে কথা আমি আজ ভুলে যাব! হে দেশপ্রেমিক, তোমার হৃদয়
আজ স্পন্দনহীন! আজ যে কথা আমি মনে আনতে চাই—
তোমার দেশের রাজশক্তির বিরুদ্ধে তুমি একদিন বিদ্রোহ করেছিলে,

তা ছিল বিপুল শক্তিশালী; তোমার দুর্জয় সাহস চেয়েছিল
ইরাকাসের মতো আকাশকে ছুঁতে, রক্ষাপ্রাচীর ভেদ করে
ঝঞ্ঝার মতো এসে রাজদ্বারে হানা দিতে। কেড়ে নেওয়া স্বাধীনতা—
যে স্বাধীনতায় তোমার ন্যায্য অধিকার ছিল,
তুমি তা ফেরত চেয়েছিলেন, স্পষ্ট ভাষায় রূঢ় দাবিতে।
রাজশক্তি নতজানু হল, কিন্তু হার স্বীকার করল না।
ইরাকাসের মতো তুমি সমুদ্রের দিকে ডানা মেলে দিলে,
সূর্যের দীপ্তিতে তোমার মোমের ডানা গলে, খসে পড়ে গেল।
কিন্তু তোমার স্বভাবসুন্দর দেশপ্রেমের আগুন
ভারতের মহতী হৃদয়কে আলো করে রইল, তার শিখা
জ্বলতে লাগল উজ্জ্বল হয়ে। একে একে ভারতের সেনাদের
বুকে সেই আগুন হাজারো জয়ের মধ্যে দিয়ে বহমান হল।[৪৫]

অনুবাদকের মন্তব্য: ওটেনের কবিতাটির বাংলা অনুবাদ অনুবাদকের করা, অন্য কেউ করেছেন বলে জানা নেই।

---

৪৪. শিশির কুমার বসু ও সুগত বসু সম্পাদিত 'My Political Testament', letter to the Governor, Chief Minister and Council of Ministers, 26 November, 1940, The Alternative Leadership: *Speeches, Articles, Statements and Letters, June 1939-January 1942: Netaji Subhas Chandra Bose Collected Works Volume 10* (কলকাতা: নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো এবং দিল্লি: Permanent Black, 2003), p. 197.

৪৫. ওটেনের নিজের হাতে লেখার পুনর্মুদ্রিত প্রতিলিপি: কৃষ্ণা বসু, *ইতিহাসের সন্ধানে* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭২)।

সূচি

১.	ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থ কী, ১৯ জুন ১৯৪৩	৩
২.	আমাদের জাতীয় সমর, ২১ জুন ১৯৪৩	৫
৩.	স্বাধীনতা-প্রেমী ভারতীয়দের রক্ত, জুন ১৯৪৩	১০
৪.	বর্তমান যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ কী, ২৪ জুন ১৯৪৩	১৩
৫.	ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কাল্পনিক কাহিনি, ২৮ জুন ১৯৪৩	১৬
৬.	সুভাষচন্দ্র বোস নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন, ২ জুলাই ১৯৪৩	১৯
৭.	ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বঞ্চনা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগিয়ে চলা, মৃত্যু, ৪ জুলাই ১৯৪৩	২১
৮.	দিল্লি চলো, দিল্লি চলো, ৫ জুলাই ১৯৪৩	২৭
৯.	কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই, ৬ জুলাই ১৯৪৩	৩১
১০.	কেন আমি ঘর ও দেশ ছেড়েছি, ৯ জুলাই ১৯৪৩	৩৩
১১.	একদিনে যে সাম্রাজ্যের উত্থান হয়েছিল এক রাতেই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, ১২ জুলাই ১৯৪৩	৩৭
১২.	সুভাষচন্দ্র বসু লীগকে পুনর্গঠিত করলেন, ১৩ জুলাই ১৯৪৩	৪১
১৩.	জিন্না সম্বন্ধে, ১৮ জুলাই ১৯৪৩	৪৯
১৪.	স্বাধীন বর্মাদেশ, ১ আগস্ট ১৯৪৩	৫১
১৫.	স্বদেশে ভারতীয়দের জন্য আধ্যাত্মিক ও সামরিক সাহায্য, ১৮ আগস্ট ১৯৪৩	৫৭
১৬.	বাংলার মন্বন্তর, ২০ আগস্ট ১৯৪৩	৫৮
১৭.	৩৮ কোটি স্বদেশবাসীর সেবক, ২৫ আগস্ট ১৯৪৩	৫৯
১৮.	আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ২৫ আগস্ট ১৯৪৩	৬১
১৯.	এক উভচর জীব, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩	৭০
২০.	বাহাদুর শাহের সমাধিস্থলে, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩	৭৫
২১.	ভারতবর্ষের সংগ্রামে গান্ধীজির ভূমিকা, ২ অক্টোবর ১৯৪৩	৭৭
২২.	একটি স্মরণীয় দিন, ১৪ অক্টোবর ১৯৪৩	৮২
২৩.	আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকার, ২১ অক্টোবর ১৯৪৩	৮৩
২৪.	ইতিহাসের পদরেখা অনুসরণ করে, ২১ অক্টোবর ১৯৪৩	৯৪
২৫.	রানি ঝাঁসি বাহিনী, ২২ অক্টোবর ১৯৪৩	৯৬
২৬.	আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা, ২৩-২৪ অক্টোবর ১৯৪৩	১০০

২৭. আপনাদের ব্যাঙ্কের খাতা কোথায়? ২৫ অক্টোবর ১৯৪৩ ১১০
২৮. বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সম্মেলনে নেতাজি, ৩১ অক্টোবর ১৯৪৩ ১১৬
২৯. ভারতবর্ষ ও আয়ারল্যান্ড, নভেম্বর ১৯৪৩ ১২৫
৩০. আই এন এ-র পরিকল্পনা, ৩ নভেম্বর ১৯৪৩ ১২৭
৩১. চুঙকিঙের কাছে আবেদন, ২১ নভেম্বর ১৯৪৩ ১২৯
৩২. ভাগ্যের আশীর্বাদ, ৮ ডিসেম্বর ১৯৪৩ ১৩১
৩৩. ভারতীয় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৩ ১৩৩
৩৪. দিল্লি অভিমুখে, ডিসেম্বর ১৯৪৩ ১৩৫
৩৫. আই এন এ (ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী) এখন প্রস্তুত, ১ জানুয়ারি ১৯৪৪ ১৩৮
৩৬. ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধে যোগ দিল, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৪৪ ১৩৯
৩৭. ভারতীয় জনগণের জননীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ ১৫৩
৩৮. ভারতের মাটিতে আই এন এ, মার্চ-এপ্রিল ১৯৪৪ ১৫৫
৩৯. ভারত মাতার আদর্শ কন্যারা, ১৪ মে ১৯৪৪ ১৬০
৪০. জাতীয় বাহিনী যখন কলকাতায় প্রবেশ করবে মহাত্মা গান্ধী তখন প্রীত হবেন, ১৮ মে ১৯৪৪ ১৬২
৪১. পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ এখন আমাদেরই যুদ্ধ, ৪ জুলাই ১৯৪৪ ১৬৩
৪২. রক্ত ও স্বাধীনতা, ৪ জুলাই ১৯৪৪ ১৬৫
৪৩. আমাদের জাতির জনক, ৬ জুলাই ১৯৪৪ ১৭১
৪৪. ইউরোপের পরিস্থিতি, ৮ জুলাই ১৯৪৪ ১৮১
৪৫. পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি, ৯ জুলাই ১৯৪৪ ১৮৯
৪৬. ভারতীয় পরিস্থিতি, ১০ জুলাই ১৯৪৪ ১৯৬
৪৭. মহান দেশপ্রেমিক ও নেতা, ১১ জুলাই ১৯৪৪ ২০৪
৪৮. শত্রুপক্ষের প্রচার কৌশল পরিবর্তিত হচ্ছে, ১২ জুলাই ১৯৪৪ ২০৮
৪৯. সম্মুখ-সমরে আমাদের প্রথম পরীক্ষা, ২১ আগস্ট ১৯৪৪ ২১৭
৫০. গান্ধী-জিন্না আলোচনা সভার বিষয়ে, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ ২১৯
৫১. ইস্পাত ও দেহবর্মের চেয়ে শক্তিশালী হল মানুষের মনোবল ও সাহসিকতা, ১৮ অক্টোবর ১৯৪৪ ২২২
৫২. আমাদের প্রথম বার্ষিকী, ২১ অক্টোবর ১৯৪৪ ২২৮
৫৩. ভারতবর্ষের মৌলিক সমস্যাগুলি, নভেম্বর ১৯৪৪ ২৩৫
৫৪. ভারতবর্ষের অদৃষ্ট, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪ ২৫০
৫৫. আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব, ১ জানুয়ারি ১৯৪৫ ২৫৬
৫৬. আমাদের অমর যোদ্ধারা, ২ জানুয়ারি ১৯৪৫ ২৫৯
৫৭. সাহসিকতা ও কাপুরুষতা, ১৩ মার্চ ১৯৪৫ ২৬১
৫৮. একটি স্বপ্নের পরিসমাপ্তি, ২৪ এপ্রিল ১৯৪৫ ২৬৩
৫৯. ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভারতীয়রা আপনাদের নামে জয়ধ্বনি দেবে, ২৪ এপ্রিল ১৯৪৫ ২৬৫
৬০. আমাদের সংগ্রাম চলবে, ২১ মে ১৯৪৫ ২৬৭
৬১. জার্মানির পরাজয়, ২৪ মে ১৯৪৫ ২৭৩

৬২. যুদ্ধবন্দিদের প্রতি দুর্ব্যবহার, ৩০ মে ১৯৪৫ ২৭৬
৬৩. ওয়াভেলের প্রথম প্রস্তাবের বিষয়ে অভিমত, ১৮ জুন ১৯৪৫ ২৭৮
৬৪. স্বাধীনতার বিষয়ে কোনও আপোষ নয়, ১৯ জুন ১৯৪৫ ২৮৩
৬৫. ওয়াভেলের প্রস্তাবের মুখোশ খুলে গেছে, ২০ জুন ১৯৪৫ ২৯২
৬৬. ওয়াভেলের প্রস্তাবকে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করুন, ২১ জুন ১৯৪৫ ২৯৭
৬৭. ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিষয়ে চিন্তাভাবনা, ২২ জুন ১৯৪৫ ৩০৫
৬৮. ওয়াভেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন, ২৩ জুন ১৯৪৫ ৩১০
৬৯. ব্রিটেনের সঙ্গে কোনও আপোষ নয়, ২৪ জুন ১৯৪৫ ৩১৪
৭০. বর্মাদেশ সম্পর্কে ব্রিটেনের নীতি, ২৫ জুন ১৯৪৫ ৩২১
৭১. জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা, ২৬ জুন ১৯৪৫ ৩২৩
৭২. আমি একজন বিপ্লবী, ২৭ জুন ১৯৪৫ ৩২৮
৭৩. কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যান, ২৮ জুন ১৯৪৫ ৩৩৪
৭৪. মেঘের আড়ালে আলোক রেখা, ২৯ জুন ১৯৪৫ ৩৩৭
৭৫. হয় মুক্তি নয় মৃত্যু, জুলাই ১৯৪৫ ৩৪০
৭৬. সাহসী সৈনিকের মতো যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়ান, ১৪ আগস্ট ১৯৪৫ ৩৪৩
৭৭. দিল্লির অভিমুখে অনেক পথ আছে, ১৫ আগস্ট ১৯৪৫ ৩৪৪
৭৮. ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবে, ১৫ আগস্ট ১৯৪৫ ৩৪৫

পত্রাবলী

১. হিকারি কিকানের প্রতি, ২৬ আগস্ট ১৯৪৩ ৩৪৯
২. শিশির কুমার বসুর প্রতি, ২৯ অক্টোপর ১৯৪৩ ৩৫০
৩. প্রতিমা পালের মা ও বাবার, প্রতি ২২ জানুয়ারি ১৯৪৪ ৩৫০
৪. ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি, ১৩ মার্চ ১৯৪৪ ৩৫১
৫. ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি, ১৮ মার্চ ১৯৪৪ ৩৫১
৬. ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি, ১৬ এপ্রিল ১৯৪৪ ৩৫২
৭. লেফটেন্যান্ট এম. সত্যবতী থেভরের প্রতি, ১৪ মে ১৯৪৪ ৩৫৩
৮. ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি, ১৮ জুন ১৯৪৪ ৩৫৫
৯. লেফটেন্যান্ট সত্যবতী থেভরের প্রতি, ১৮ জুন ১৯৪৪ ৩৫৬
১০. আর কে শেখরণের প্রতি, ১৮ জুন ১৯৪৪ ৩৫৭
১১. সিংহল দপ্তরের সেক্রেটারির প্রতি, ২১ জুন ১৯৪৪ ৩৫৯
১২. লেফটেন্যান্ট সত্যবতী থেভরের প্রতি, ২১ জুন ১৯৪৪ ৩৬০
১৩. লেফটেন্যান্ট সত্যবতী থেভরের প্রতি, ৪ আগস্ট ১৯৪৪ ৩৬২
১৪. লেফটেন্যান্ট সত্যবতী থেভরের প্রতি, ১৯ আগস্ট ১৯৪৪ ৩৬৩
১৫. ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি, ২০ আগস্ট ১৯৪৪ ৩৬৫
১৬. ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি, ২২ আগস্ট ১৯৪৪ ৩৬৬
১৭. প্রতিমা পালের মাতাকে, ২২ আগস্ট ১৯৪৪ ৩৬৬

১৮.	ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি, ১৯ অক্টোবর ১৯৪৪	৩৬৭
১৯.	আইএনএ-র শিক্ষারত সেনানীর প্রতি, ২৯ নভেম্বর ১৯৪৪	৩৬৮
২০.	শ্রীরাম মূর্তির প্রতি, ২৯ নভেম্বর ১৯৪৪	৩৬৮
২১.	শ্রীরাম মূর্তির প্রতি, ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৪	৩৭০
২২.	আইএনএ শিক্ষারত সেনানীর প্রতি, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৪	৩৭১
২৩.	শ্রীরাম মূর্তির প্রতি, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৪	৩৭২
২৪.	বেনিতো মুসোলিনি প্রেরিত (টেলিগ্রাম), ২ জানুয়ারি ১৯৪৫	৩৭৩
২৫.	ডক্টর মজুমদারের প্রতি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫	৩৭৪
২৬.	এম সত্যবতী থেভরের প্রতি, ২১ মে ১৯৪৫	৩৭৫
২৭.	এম সত্যবতী থেভর প্রেরিত, ২২ মে ১৯৪৫	৩৭৬
২৮.	ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি, ১০ জুন ১৯৪৫	৩৭৭

বক্তৃতা, প্রবন্ধ, বিবৃতি

(১৯৪৩-১৯৪৫)

১

ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থ কী

[১৯ জুন ১৯৪৩, টোকিওতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বিবৃতি][১]

ভদ্রমহোদয়গণ, প্রথমেই আপনাদের আমার সহৃদয় অভিনন্দন জানাই যা আজ আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় কারণ আমি দীর্ঘদিন ধরে আমার নিজের দেশেও সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িত। আপনারা হয়তো ভাবছেন কোন ঘটনাস্রোত আজ আমাকে এই মুহূর্তে পৃথিবীর এই স্থানে টেনে এনেছে। বহুদিন ধরে ভারতবর্ষ ও বর্মাদেশের বিভিন্ন ব্রিটিশ কারাগারেই আমার বসবাস। কিন্তু ভারতবর্ষের কারাগারে নিষ্ক্রিয় কালক্ষেপ না করে আমি যে আজ নিপ্পনের প্রাণকেন্দ্রে আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি, তা এক বিশেষ এক বার্তা বহন করছে। সেই বার্তা হল আজ আমার দেশে এক নতুন আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে যা দেশকে ভাসিয়ে নিতে চলেছে।

আজ থেকে প্রায় দু'বছর আগে আমার স্বদেশবাসীর ইচ্ছাক্রমেই আমি ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি এবং তার পর থেকে আমি যখন যা করেছি তার সবই তাদের ইচ্ছানুসারে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় কূটকৌশলী ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা আমাদের নেতৃবৃন্দকে প্রতারণা করেছিল। আজ থেকে ২০ বছরের আগে আমরা তাই শপথ নিয়েছি যে আর কখনও আমরা তাদের দ্বারা প্রতারিত হব না। এই ২০ বছর ধরে, আমার প্রজন্মের মানুষ স্বাধীনতা পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং তারা যে শুভক্ষণের অপেক্ষায় ছিল আজ সেই ক্ষণ এসেছে যে শুভক্ষণে ভারতবর্ষের জনগণের জন্য স্বাধীনতার সূর্যোদয় হতে চলেছে। আমরা নিশ্চিত জানি যে আগামী একশো বছরে এই সুযোগ হয়তো দ্বিতীয় বার আসবে না। আজ তাই সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে আমরা কৃতসংকল্প।

ভদ্রমহোদয়গণ! আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে বিশ্বের শক্তিশালী জাতিসমূহ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতালাভের জন্য যুদ্ধ করছে। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই এই শক্তিশালী জাতির সম্বন্ধে আমাদের স্বদেশবাসীদের মনোভাব অনুমান করতে পারেন যখন তারা একদিকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার কথা বলে এবং অন্যদিকে তারাই আবার বিশ্বের মনুষ্যসমাজের এক পঞ্চমাংশকে সেই গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রাখে। স্বাধীনতার দাবি জানালে তার উত্তর তারা দেয় সন্ত্রাস ও নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে এবং নিরস্ত্র নারীপুরুষ ও শিশুদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। ভারতবাসীর কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থ হল নৈতিক অধঃপতন, কৃষ্টির অবক্ষয়, অর্থনৈতিক দারিদ্র্য এবং রাজনৈতিক দাসত্ব।

---

১. নারায়ণ মেনন সম্পাদিত *On to Delhi: Speeches and Writings of Subhas Chandra Bose* (Bangkok Indian Independence League, 1944), পৃষ্ঠা ১৫-১৭ এবং নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংরক্ষণশালা থেকে সংগ্রহ করা সাংবাদিক সম্মেলনের অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিং।

সুতরাং, ভারতীয় জনগণ যে অবশেষে এই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পাবার সংকল্প নিয়েছে তাতে কি বিস্মিত বোধ করার কোনও কারণ আছে? তাদের কাছে বিশ্বের বর্তমান সংকটের অর্থ হল, যে জাতিগুলি এই স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায় এবং যারা সেই জাতিগুলির বিরোধিতা করতে দৃঢ়সংকল্প, এই দুই দলের মধ্যে লড়াই। এই দুই প্রতিপক্ষের সংঘাতে, যে শক্তি পরিবর্তন আনবার শপথ নিয়েছে যারা নতুন পথের দিশারী, তাদের প্রতি যদি আমাদের সহানুভূতি থাকে, তাহলে সেই সহানুভূতি প্রকাশের জন্য আমাদের কি কেউ দোষারোপ করতে পারে? এবং যখন এই শক্তি আমাদের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন করে তখন এটাই কি স্বাভাবিক নয় যে তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি ঐকান্তিক সমর্থনে পরিণত হবে?

আমাদের চিরকালীন শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এই ত্রিপাক্ষিক শক্তিগোষ্ঠী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপুল ভাবে সাহায্য করেছে। এবং শুধুমাত্র সহানুভূতি নয়, সক্রিয় সমর্থন ও সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে তারা আমাদের কাছ থেকে অসীম কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছে। তবু, আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে আমাদেরই রক্তের বিনিময়ে। সেটাই আমাদের কর্তব্য। অতএব আমরা মনে করি আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমরা সক্রিয় ভাবে যোগ দেব।

যে শত্রু প্রথমে তার তরোয়াল কোষমুক্ত করেছে তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে তরোয়াল দিয়েই। আইন অমান্য আন্দোলনকে অবশ্যই সশস্ত্র যুদ্ধে পরিণত করতে হবে। এবং বিপুল সংখ্যায় ভারতবাসী যখন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের দীক্ষা নেবে তখনই তারা তাদের স্বাধীনতা পাবার যোগ্যতা অর্জন করবে।

জাপানের প্রতি ভারতীয়দের মনোভাবের কথা জানবার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই উৎসুক। জাপানই হল প্রথম দেশ যারা এশিয়া মহাদেশের উপর ভিন্ন এক মহাদেশের আক্রমণকে প্রতিরোধ করেছিল। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধজয় ছিল এশিয়ার জনশক্তির নব জাগরণের সূচনা এবং শুধু জাপানের জনসাধারণ নয়, ভারতীয় জনগণও এই যুদ্ধজয়কে মহানন্দে অভিনন্দন জানিয়েছিল। ভারতীয়েরা মনে করেন এশিয়া মহাদেশের পুনর্গঠনের জন্য জাপানের শক্তিশালী উপস্থিতি আবশ্যক।

এটা সত্য যে চিন দেশের ঘটনাবলীর পরে জাপানের প্রতি ভারতীয়েরা কিছুটা ভিন্ন মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু পূর্ব এশিয়ার মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। আজ জাপান যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তারা আমাদেরও শত্রু; চুঙকিঙ আমাদের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতীয়েরা সকলেই সেই দেশের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হবেন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সহযোগী। তা ছাড়া ভারতীয়েরা আজ এই প্রশ্নও করছে যে কেন চিয়াং কাই-শেক জাপানিদের সঙ্গে একটা সম্মানজনক মীমাংসায় পৌঁছাতে পারেননি এবং জাপান ইতিমধ্যে চিন সম্পর্কে তাদের নতুন নীতি ঘোষণা করার পরেও কেন তিনি এখনও ব্রিটিশ-আমেরিকানদের উপর আস্থা রাখছেন এবং তাদের হাতের পুতুল হয়ে কাজ করছেন।

ভারতবর্ষ ও জাপানের মধ্যে সংস্কৃতির বন্ধন প্রায় দু'হাজার বছরের পুরাতন। সাম্প্রতিককালে সেই সম্পর্কের মধ্যে যে ছেদ পড়েছিল তার কারণ হল ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তার। এবং এ কথা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন থেকে আমাদের সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হবে ও আরও গভীর হবে।

২

আমাদের জাতীয় সম্মান

[২১ জুন ১৯৪৩ তারিখে টোকিও থেকে বেতার সম্প্রচার][১]

আমার স্বদেশবাসী ও বন্ধুগণ! গত এপ্রিল মাসে আপনারা বিশ্বের আরেক প্রান্ত থেকে অন্য একটি বেতার মাধ্যমে আমার ভাষণ শুনেছেন। বর্তমানে আমি টোকিওতে এসে পৌঁছেছি এবং এখানকার বেতার সম্প্রচার কেন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেছি যাতে আবার আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। শেষ যখন আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তার পরে সাধারণভাবে যুদ্ধাবস্থার কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়নি। যুদ্ধের পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে, এবং উত্তর আফ্রিকায় যুদ্ধের অবসান হয়েছে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কয়েকটি ছোট অনুর্বর দ্বীপ অধিকার করে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি তাদের অভিযান অব্যাহত রেখেছে। এই সামান্য সামরিক সাফল্য অর্জনের পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিন প্রচারযন্ত্রের কাছ থেকে যেমন আশা করা যায়, ঠিক সেই প্রথা অনুসারেই তারা আকাশ বিদীর্ণ করে দম্ভোক্তি করে চলেছে। এর আগে, উত্তর আফ্রিকায় ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনী এসে পৌঁছানোর পরেও তারা একই ভাবে প্রচার চালিয়ে বলেছিল যে আফ্রিকায় যুদ্ধজয়ের মাধ্যমেই এই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির যুদ্ধজয় সত্ত্বেও চূড়ান্ত বিজয় এখনও তাদের করায়ত্ত হয়নি এবং ১৯৪০ সালের শেষে যুদ্ধাবস্থা যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনই আছে। প্রচারমাধ্যমের এই কলাকৌশল থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে কোনও রকমের সাফল্য তাদের একান্ত আবশ্যক তা সে যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন যাতে তাদের জনসাধারণের ভগ্ন মনোবলকে কিছুটা পুনরুজ্জীবিত করা যায়। তিউনিসিয়ার সমরাভিযানের পরে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে প্রচারিত বেতারবার্তা যদি কেউ শুনে থাকেন, যেটা আমি শুনেছি, তাঁদের নিশ্চিত ধারণা হবে যে চূড়ান্ত জয় ইতিমধ্যেই ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনীর করায়ত্ত হয়েছে। গত বিশ্ব যুদ্ধের সময়ও, যখন বেতার সম্প্রচার প্রায় একেবারেই অজানা ছিল, এই ধরনের প্রচার বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল। সেই জন্যই ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি আবার সেই একই পথ অনুসরণ করছে। দুর্ভাগ্যক্রমে, তারা এই কথা ভুলে গেছে যে ১৯১৪-১৯১৫ সালে পৃথিবী যেমন ছিল এখন তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং বেতার সম্প্রচার এখন পৃথিবীর সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে ও জনসাধারণের কাছে দুই পক্ষের ভাষ্যই পৌঁছচ্ছে। উপরন্তু, বারংবার ধূর্ত ও মিথ্যাচারী ব্রিটিশ সরকারের প্রচারে বিভ্রান্ত হবার পরে ভারতবাসীরা এখন অত্যন্ত সতর্ক হয়েছেন এবং তাঁরা

---

১ Arun (ed) Testament of Subhas Bose : Being a Complete and Authentic Record of Netaji's Broadcast Speeches, Press Statements, etc during the years 1942-1945 (Delhi : Rajkamal Publications, 1946), PP. 54-8

এখন আর শত্রুদের এই একতরফা অপপ্রচারের দ্বারা একেবারেই বিভ্রান্ত হবেন না। তার ফলে আমার নিজের মনের মধ্যে এই বিষয়ে কোনও সংশয় নেই যে লন্ডন, নিউ ইয়র্ক বা বোস্টন থেকে কী বলা হচ্ছে তাতে আমার স্বদেশবাসী আর কখনই প্রতারিত হবেন না।

ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্যানটেলিরিয়া ও ল্যাম্পেডিউসার মতো কয়েকটি ছোট অনুর্বর দ্বীপ অধিকার করার পর শত্রুপক্ষের প্রচার সমগ্র বিশ্বকে এমন একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করছে যেন আর কয়েক দিনের মধ্যেই ইউরোপীয় মহাদেশে তাদের সেনাবতরণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। ফরাসিদের অধিকৃত উত্তর আফ্রিকার দেশগুলিতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির প্রথম সেনাবতরণের ঠিক পরেই যখন আমি প্যারিসে ছিলাম তখন অনেক প্যারিসবাসীর মুখে শুনেছি যে ইঙ্গ-মার্কিন বেতারকেন্দ্রগুলি থেকে যে প্রচার হয়েছিল তাতে তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে দুই সপ্তাহের মধ্যেই ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনী প্যারিসে পৌঁছে যাবে। যে সব ফরাসি নাগরিক এই সংবাদে উল্লসিত হয়েছিলেন তাঁরা পরে স্বভাবতঃ খুবই হতাশ হয়েছেন যখন দেখেছেন দিয়েপে-র লজ্জাজনক পরাজয়ের পরে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী আর ফ্রান্সে এসে পৌঁছাতে পারেনি। আমার আশঙ্কা এই, যে যাঁরা ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর যুদ্ধজয়ের অভূতপূর্ব ঘটনার আশায় অপেক্ষা করে আছেন তাঁদের জন্যও একই প্রকার বেদনাদায়ক হতাশা অপেক্ষা করে আছে। এই আশাবাদীরা অচিরেই উপলব্ধি করবেন যে ইউরোপীয় মহাদেশ অধিকার করারা সম্ভাবনা চাঁদে অধিকার প্রতিষ্ঠার মতোই এখনও সুদূরপরাহত।

বন্ধুগণ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে যখন আফ্রিকা অভিযান চলছিল তখন আমি বারংবার আপনাদের বলেছিলাম যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফলের উপরে সেই অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রভাব পড়বে না, যদিও প্রচারের কাজ চালানোর জন্য ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে। আপনারা এখন বুঝেছেন যে আমি যা বলেছিলাম তাতে কোনও অতিশয়োক্তি ছিল না। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধাভিযান শেষ হয়ে যাবার পরেও আমরা কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার কোনও সম্ভাবনা একেবারেই দেখতে পাচ্ছি না। সাইরেনাইকা বা ট্রিপোলিটানিয়া বা তিউনিসিয়াতে যখন লড়াই চলছিল তখন পরিস্থিতি যা ছিল এখনও ঠিক তেমনই আছে। আসল কথা হল, আমি আগেও যা আপনাদের একাধিকবার বলেছি, যুদ্ধের জয়পরাজয় নির্ভর করবে ইউরোপ, এশিয়ার পরিস্থিতির উপরে এবং জলযুদ্ধে কী ঘটছে তার উপরে। ভারতবাসীদের প্রধান চিন্তা হল ভারতবর্ষের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে কী ঘটছে তা নিয়ে। ইঙ্গ-মার্কিন প্রচারযন্ত্র যত চেষ্টাই করুক না কেন তারা এই কথা কিছুতেই লুকিয়ে রাখতে বা অবজ্ঞা করতে পারবে না যে হঙকঙ, ফিলিপিন, ইস্ট ইন্ডিজ, মালয়, সিঙ্গাপুর ও বর্মাদেশের চমকপ্রদ বিজয়াভিযানের শেষে জাপানের সেনাবাহিনী এখন ভারতবর্ষের সীমান্তে এসে পৌঁছেছে।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকালের সমগ্র সময়সীমার মধ্যে একজন ব্রিটিশ জেনারেলেরও এ কথা মনে হয়নি যে ভবিষ্যতে কোনও একদিন হয়তো ব্রিটেনের কোনও শত্রু ভারতের পূর্বপ্রান্তে এসে হানা দিতে পারে। ব্রিটেনের সামরিক পরিকল্পনার কৌশলীরা তাই কেবলই ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল। আমাদের শাসকদের ধারণা ছিল যে ভারত তাদের হাতে নিরাপদ ও সুরক্ষিত কারণ সিঙ্গাপুরের নৌসেনার ঘাঁটিও ছিল তাদের দখলে। কিন্তু জাপানি সেনাবাহিনীর এই বিস্ময়কর অগ্রগতি ও সাফল্য সারা বিশ্বের চোখ খুলে দেখিয়ে দিয়েছে যে ব্রিটিশ সামরিক কলাকৌশল কতটা নখদন্তহীন। তারপর থেকে

জেনারেল ওয়াভেল ভারতের পূর্বপ্রান্তকে সুরক্ষিত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু ভারতীয় জনগণ আজ যে প্রশ্ন করছে তা হল, 'সিঙ্গাপুর গড়ে তুলতে লেগেছিল ২০ বছর আর এক সপ্তাহের মধ্যেই যদি তা হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে পূর্বপ্রান্তের ঘাঁটিগুলি থেকে পিছু হঠতে ব্রিটিশ সেনাধিপতি, যিনি ক্রমাগতই পশ্চাদপসরণ করছেন, তাঁর অথবা তাঁর উত্তরসূরীর কতদিন লাগবে?'

বর্তমান যুদ্ধ চলাকালীন, আপনারা দেখেছেন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠী যুদ্ধাভিযানের শুরু থেকেই দম্ভপূর্ণ প্রচার ও সাফল্যের বিষয়ে অতিশয়োক্তি করে বারে বারে বিশ্বের কাছে নিজেদের হাস্যাস্পদ করেছে। ইউরোপীয় মহাদেশ অধিকার করবার বিষয়েও তারা এখন এটা করছে। কয়েকমাস আগে জেনারেল ওয়াভেল যখন ভারত-বর্মাদেশের সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বর্মাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন তখনও সেই একই ঘটনা ঘটল। সেই সময় বিশ্বের সর্বত্র প্রচার করা হল যে বর্মাদেশ পুনরধিকারের অভিযান শুরু হয়েছে। কিন্তু শক্তিশালী জাপানি সেনাবাহিনীর পালটা আক্রমণে যখন ব্রিটিশ সেনাদের অস্ত্র সরঞ্জাম সব কিছু ফেলে রেখে ভারতবর্ষে পালিয়ে আসতে হল তখন ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষের মুখ দেখাবার উপায় থাকল কোথায়? পরাজয়ের কারণ হিসাবে জেনারেল ওয়াভেল তারপরে বহুপ্রকার অজুহাত খাড়া করলেন। এমনকী, তাঁর সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীও বর্মাদেশ পুনরধিকারের অভিযানের লজ্জাজনক ব্যর্থতা ঢাকা দেবার কী প্রাণান্তকর চেষ্টাই না করলেন। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠী কেন যে সাফল্যের মুখ দেখার আগেই সেই বিষয়ে দম্ভোক্তি শুরু করে সেই কথাটা কারুরই বোধগম্য হয় না। তার বিপরীত দিকে দেখুন অক্ষ শক্তিগুলিকে, তারা কথা বলে কম এবং কোনও একটা সামরিক অভিযান শুরু করবার আগে থেকেই প্রচার না চালিয়ে তারা আসল কাজটি করে, জয়পরাজয়ের কী ঘটল তা তাদের কাজের থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ১৯৪০ সালে যখন জার্মান বাহিনী ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের উপকূলের মধ্যবর্তী চ্যানেল দ্বীপগুলি অধিকার করে নিল, জার্মান বাহিনী কিন্তু তখন দাবি করেনি যে তারা ইংল্যান্ডে অভিযান চালাতে উদ্যত হয়েছে কেননা তারা এই দ্বীপগুলি অধিকার করে নিতে পেরেছে। এখন যেমন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠী দাবি করার চেষ্টা করছে যে প্যানটেলিরিয়া অধিকার করার ফলে তাদের পক্ষে যুদ্ধাভিযান চালিয়ে সিসিলি অধিকার করা প্রায় নিশ্চিত, কেন তাহলে তারা এর আগে মালটা দ্বীপের দুর্গ থেকে সিসিলি দখলের চেষ্টা করেনি, বিশেষতঃ যখন সিসিলি থেকে প্যানটেলিরিয়ার দূরত্ব যতটা, মালটার দূরত্বও প্রায় তাই এবং মালটা তো এতদিন ধরে তাদেরই করতলগত রয়েছে? না, বন্ধুরা, আসল কথাটা হল ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠীর পরিস্থিতি এখন এতটাই নৈরাশ্যজনক যে, যে কোনও প্রকারে দেশবাসীর মনোবলকে আবার চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা তাদের করতেই হবে, এবং সেটা করবার জন্য তারা মনে করে যে উপর্যুপরি দম্ভপূর্ণ আত্মপ্রচার ছাড়া তাদের আর অন্য কোনও পথ খোলা নেই। এই ধরনের কৌশল হয়তো তাদের নিজেদের প্রচারের জন্য প্রয়োজন হতে পারে; কিন্তু সমগ্র বিশ্বের এখন চোখ কান খোলা, বিশ্ববাসীর এই প্রচারে প্রতারিত হবার কোনও কারণ নেই। তিউনিসিয়া ও টিমবাকটু বা ল্যাম্পেডিউসা ও আলাস্কাতে কী ঘটেছে তা ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল ভারতের অভ্যন্তরে বা তার সীমান্ত জুড়ে কী ঘটছে।

আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল বহুল প্রচারিত বর্মাদেশ বিজয় শেষ হয়েছে লজ্জাজনক পশ্চাদপসরণে, বিজয়দৃপ্ত জাপানি সেনা এখন আমাদের পূর্বসীমান্তে

দাঁড়িয়ে, তাদের যোগ্য প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর মাধ্যমে জাপানের সরকার বারে বারে ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে পরিপূর্ণ সমর্থন এবং ভারতবর্ষ থেকে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও প্রভাব দূর করবার জন্য তাদের দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা জানিয়েছে। এবং সব শেষে, যদি ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা চান তাহলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতালাভের জন্য আমাদের জাতীয় সংগ্রামে জাপানের প্রধানমন্ত্রী, তাঁর দেশের সক্রিয় সাহায্য দেবার প্রস্তাব করেছেন। ভারতের জন্য আরও যে বিষয়টির প্রত্যক্ষ গুরুত্ব রয়েছে তা হল আমাদের দেশের প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নীতি।

আপনারা জানেন এবং আমিও জানি যে যখন এই যুদ্ধের শুরু তখন আমাদের কোনও বন্ধু ভেবেছিলেন যেহেতু ব্রিটিশ সরকার অচিরেই গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হবে, তারা তখন কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সমাধানে আসতে বাধ্য হবে যারা ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ১১টি প্রদেশের মধ্যে আটটি প্রদেশেই ক্ষমতাসীন। এই বন্ধুদের মতানুসারে, কংগ্রেসকে শুধুমাত্র যা করতে হবে তা হল ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করা যতদিন না ব্রিটিশ সরকার তাদের প্রথম পদক্ষেপটি নিতে বাধ্য হয়। একটা বছর গড়িয়ে গেল কিন্তু এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না যা থেকে মনে করা যেতে পারে যে ব্রিটিশদের তরফ থেকে কোনও মত পরিবর্তন ঘটেছে। তখন সেই বন্ধুরা মনে করলেন যে তাহলে ব্রিটিশ সরকারের উপরে এখন সামান্য চাপ দেওয়া প্রয়োজন যাতে একটা সমঝোতায় পৌঁছানো যায়। এই উদ্দেশ্যে বহু ধরনের চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু কোনও ফল পাওয়া যায়নি। এমনকী সিঙ্গাপুরের পতনের পরে, যা মিস্টার উইনস্টন চার্চিলের বর্ণনা অনুসারে, 'ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিপর্যয়' এবং বর্মা দেশের যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বজায় থাকবে আমাদের শাসকরা তাই মনে করে থাকে। আপনারা হয়তো বলবেন এটা রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষতার অভাব বা দেউলিয়া রাজনীতি বা নিছক পাগলামি। কিন্তু এই পাগলামিরও একটা নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়েই উঠেছে ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে। ব্রিটিশ জনসাধারণ, তা তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস যাই হোক না কেন, ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া ধনসামগ্রী থেকেই তাদের পুষ্টি। আজ তাদের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থই হল ভারত। সেই সাম্রাজ্যকে নিজেদের করতলগত রাখার জন্যই আজকের লড়াই তারা লড়ছে। যুদ্ধ জয়ী হতে গেলে যদি তাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকে মেনে নিতে হয় তাহলে, তার অর্থ দাঁড়াবে তারা যুদ্ধে জিতবে কিন্তু সাম্রাজ্য হারাবে। তার ফলে, এই যুদ্ধে ব্রিটেনের ভাগ্য যে দিকেই সেই দেশকে টেনে নিয়ে যাক না কেন, যে কোনও ইংরেজ তার শেষ শক্তিটুকু দিয়ে তাদের এই সাম্রাজ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করবে, অর্থাৎ ভারতকে হাতছাড়া করতে চাইবে না। সুতরাং আজ যদি আমাকে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে দেওয়া হয় তাহলে আমি এইটুকুই বলব যে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদেরা যে তাদের অত্যন্ত দুরবস্থা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকে স্বীকৃতি দিতে চাইছে না, সেটা তাদের নিছক পাগলামি নয়। এটা আমাদেরই পাগলামি যে আমরা মনে করছি ইংরেজরা শুধুমাত্র কিছুটা বিপাকে পড়েছে বলে স্বেচ্ছায় তাদের সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে। এ ছাড়াও আরও একটা কারণে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার তাদের নাছোড়বান্দা নীতি অনুসরণ করে চলেছে। জার্মানির বিদেশমন্ত্রী সেই কথাই বলেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে যে বর্তমান যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা একদিকে শত্রুদের কাছে তাদের ভূখণ্ড হারাচ্ছে, আবার অন্যদিকে বন্ধুদের কাছেও তাদের জমি ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

উপরন্তু সাম্রাজ্য অটুট রাখবার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় জন বুলের এখন প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। এই ক্ষতির আংশিক পূরণ করবার একমাত্র উপায় হল যুদ্ধ শেষ হবার পরে ভারতবর্ষকে আরও নির্মম ভাবে শোষণ করা। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী যুক্তি অনুসারে, যুদ্ধের ফলে ইংল্যান্ডের পরিস্থিতি যতটা খারাপ হবে ভারতবর্ষকে পদানত করে রাখা ঠিক ততটাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল কোনও না কোনও দিন ছিঁড়বে কিন্তু তাদের কোনও দিনও নত করা যাবে না। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদীরা চিরকাল এই আচরণই করে এসেছে। কাজেই, কোনও ভারতীয় যেন এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন যে ইংল্যান্ড একদিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকে স্বীকৃতি দিতে স্বেচ্ছায় সম্মত হবে।

তবে এ কথাও বলছি না যে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদেরা আবারও কখনও ভারতবর্ষের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে চাইবে না। যে কোনও দিন আবার আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব আসতে পারে, সেটা সামরিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি হওয়ার কারণে হতে পারে, অথবা ইংল্যান্ড ও আমেরিকার উদারপন্থীদের কিছুটা আশ্বস্ত করবার জন্যও হতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে এই বছরেই আর একবার এই ধরনের প্রচেষ্টা করা হবে, কিন্তু আমি অত্যন্ত জোরালো গলায় আপনাদের যেটা মনে করিয়ে দিতে চাই তা হল, মীমাংসার মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদেরা কোনও দিনও ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে না, বরং তারা আরও একবার ভারতীয়দের ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবে, এবং অনাবশ্যক দীর্ঘ আলাপ আলোচনা চালাবে যাতে স্বাধীনতার দাবিকে একপাশে ঠেলে দিয়ে ভারতীয়দের জাতীয় মনোভাবকে আবারও দুর্বল করে দেওয়া যায়, ঠিক যেমন ঘটেছিল ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৪২ এর জুলাইয়ের মাঝে। গত বছরে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাতে ব্রিটিশ সরকারের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি, সেটা কেবলমাত্র আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাধার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং এবার আমাদের সংকল্প করতে হবে যে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কোনও আপোষ আলোচনায় একেবারেই বসব না। বন্ধুরা, স্বাধীনতা পাবার জন্য আমরা কোনও আপোষে রাজি হব না। স্বাধীনতা কথাটির একটাই তাৎপর্য আছে, তা হল ব্রিটিশ ও তাদের মিত্রদের চিরকালের মতো ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। এবং যাঁরা সত্যই এই স্বাধীনতা পেতে চান তাঁদের তার জন্য যুদ্ধ করতে হবে ও নিজের রক্ত দিয়ে সেই স্বাধীনতার মূল্য দিতে হবে।

স্বদেশবাসী ও বন্ধুরা, আসুন আমরা সর্বশক্তি দিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করি। অন্তরে দৃঢ় সঙ্কল্প ও অবিচল বিশ্বাস নিয়ে আমরা আমাদের ও মিত্রগোষ্ঠীর এই মিলিত আক্রমণ চালিয়ে যাব, যতদিন না আমরা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরাতে পারি এবং যতদিন না সেই ধ্বংসাবশেষ থেকে আবার নতুন ভারত জন্ম নেয় এক স্বাধীন জাতির রূপে। এই সংগ্রামে আমরা পিছু হঠব না, দ্বিধাগ্রস্ত হব না। আমাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে হবে, সামনের দিকে, আরও সামনে যতদিন না জয় আমাদের করায়ত্ত হয় ও আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজ়াদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

৩

স্বাধীনতা-প্রেমী ভারতীয়দের রক্ত

[টোকিও থেকে বেতার সম্প্রচার, জুন ১৯৪৩][১]

টোকিওতে আমার অবস্থানের সময় আপনাদের কাছে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই, এবং আমার কোনও সন্দেহ নেই যে আপনারা আমার কথা শুনবেন ও সেই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবেন। প্রথমতঃ পূর্ব এশিয়ার জন সমাবেশে আমার উপস্থিতিতে আপনারা যে আন্তরিক উৎসাহের সঙ্গে আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন, এবং আমাদের প্রিয় স্বদেশভূমির স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামকে সর্বাত্মক সমর্থনের যে আশ্বাস আপনারা দিয়েছেন তার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের মহান দেশপ্রেম ও নিঃস্বার্থ ত্যাগস্বীকারের এই প্রকাশ আমাকে অভিভূত করেছে। আপনাদের কাছ থেকে টেলিফোন ও ডাক মারফত অসংখ্য বার্তা সরাসরি আমার কাছে পৌঁছেছে, তা ছাড়া প্রেসের মাধ্যমেও আমি অনেক বার্তা পেয়েছি যা আমাকে অপরিসীম আনন্দ ও পরিতৃপ্তি দিয়েছে।

আপনারা জানেন যে আমি সর্বদাই আশাবাদী। তবুও, আমাকে যে কথা বলতেই হবে তা হল আপনাদের কাছ থেকে যে বিপুল সাড়া আমি পেয়েছি তা আমার দূরতম আশারও অতীত ছিল। তার উত্তরে আমি শুধু এটুকুই আজ বলতে পারি যে আপনাদের সমর্থন পেয়ে আমি গর্ব অনুভব করছি। ইউরোপ ও পূর্ব আফ্রিকায় যুদ্ধারম্ভের পর থেকে, আমি বার বার বলেছি, স্বাধীনতা অর্জনে সহায়ক এমন অনুকূল পরিস্থিতির কথা আমরা ভারতীয়রা আশাই করতে পারিনি, এমন সম্ভাবনার কথা আমাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। বিশ্বের শক্তিগুলি আমাদের সাহায্য করবার জন্য এই ভাবে এগিয়ে আসায় আমাদের দুরূহ কাজ আপনা থেকেই যে সহজতর হয়ে গেছে, সেই বাস্তব সত্য আমাদের আত্মবিশ্বাস ও সাফল্যের আশাকে আরও মজবুত করবে, সামনের লড়াইয়ে যাতে আমরা প্রাণপণে যুঝতে পারি তার প্রেরণা দেবে। স্বাধীনতার যুদ্ধে সামিল হবার দায়িত্ব যে ভারতবাসীদেরই নিতে হবে আপনাদের এই উপলব্ধি আমাকে অশেষ আনন্দ দিয়েছে। এটাই তো স্বাভাবিক যে কর্তব্যের ভারী বোঝা তাঁদের কাঁধের উপরেই থাকবে এবং সেই বোঝা তারা ইতিমধ্যেই নিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে প্রতিটি ভারতীয়—এই মুহূর্তে তারা যেখানেই বাস করুক না কেন— দেশের প্রতি তাদেরও কর্তব্য আছে এবং চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনের জন্য তাদের কাজটুকু তাদেরও করতে হবে।

আমি এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত যে আজকের বিশ্বের এই অপরিসীম সঙ্কটের দিনে

---

১. নেতাজির স্বকণ্ঠে বেতার সম্প্রচারের অডিও রেকর্ডিং (নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংরক্ষণশালা থেকে সংগ্রহ করা)।

প্রবাসী ভারতীয়রা যতদিন না তাদের করণীয় কাজগুলি করবেন ততদিন ভারত স্বাধীনতা অর্জনের আশা করতে পারে না। ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে ত্রিপাক্ষিক শক্তি তাদের সম্পূর্ণ সমর্থন দেওয়ায়, প্রবাসী ভারতীয়দের কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। যে ভারতীয়েরা এখন অক্ষশক্তির দেশগুলিতে, বা অক্ষশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন দেশগুলিতে বাস করছেন, আমি আশা করব তাঁদের প্রত্যেকেই সেখানকার জাতীয় সংগ্রামে যোগ দেবেন ও তাঁদের নিজের নিজের ভূমিকা পালন করবেন এবং ফলতঃ সেটাই হবে তাঁদের নিজের মাতৃভূমির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সেবা। আপনারা নিজেরাই দেখছেন এখানে পূর্ব এশিয়ায়, ভারতীয় স্বাধীনতার বিষয়ে কী গভীর সমর্থন ও ঔৎসুক্য রয়েছে। জাপানের সম্রাট ও সরকার এবং সমগ্র জাপানি জাতি যে আগ্রহ সহকারে আমাদের জাতীয় সংগ্রামে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে তা আমাদের কাজকে অনেকাংশে লাঘব করে দেবে। সুতরাং পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের বর্তমানের সংগ্রামে পুরোপুরি সামিল না হবার পক্ষে এখন আর একেবারেই কোনও কারণ রইল না।

যদিও অক্ষশক্তিগুলি, বিশেষতঃ জাপান আমাদের যে কোনও সময়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত এবং তারা ইতিমধ্যেই সেই সাহায্য দিতে শুরু করেছে কিন্তু ভারতবর্ষকে বিদেশিদের হাত থেকে মুক্তি দেবার দায়িত্ব আমাদের, একান্তভাবেই আমাদের। সেই দায়িত্ব আমরা অন্য কারুর উপরে ন্যস্ত করতে চাই না কারণ তা হবে আমাদের জাতীয় সম্মানের পরিপন্থী। উপরন্তু আমরা তখনই কেবলমাত্র অন্য কারুর কাছ থেকে সাহায্য চাইবার অধিকার অর্জন করতে পারব বা তাদের কাছ থেকে সাহায্যের আশা করব যখন আমরা আমাদের দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি রাখব না। আমার ভারতবাসী ভাই ও বোনেরা তাদের পরিস্থিতিতে যতটা সম্ভব তার সবটুকু শক্তি দিয়ে লড়ছে, কিন্তু আমাদের শত্রু নিষ্ঠুর ও বেপরোয়া এবং সামরিক অস্ত্রশস্ত্রে চূড়ান্ত ভাবে সজ্জিত। এই নির্মম শত্রুর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন, বা অন্তর্ঘাত, বা বিপ্লবী সন্ত্রাস কোনওটাই কার্যকরী হবে না। কাজেই আমরা যদি ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করতে চাই তাহলে আমাদের লড়তে হবে তাদের অস্ত্র দিয়েই। শত্রু তার অসি কোষমুক্ত করেছে সেই অসি হাতে নিয়েই তার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাস্ত করা আমার স্বদেশবাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং সেই দায়িত্ব নিতে হবে প্রবাসী ভারতীয়দেরই, এবং বিশেষভাবে পূর্ব এশিয়াতে বসবাসকারী ভারতীয়দের।

বন্ধুগণ! আপনারা যদি আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংগ্রাম ও তাদের ইতিহাসের তুলনা করে দেখেন তাহলে আপনারা উপলব্ধি করবেন যে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষে আমাদের শুধুমাত্র একটি বিষয়েই ঘাটতি আছে। আমাদের এমন কোনও সংগঠন নেই যেখানে আমরা শক্তি দিয়ে শক্তির মোকাবিলা করতে পারি। আজ তাই আমাদের কাজ হল সেই ঘাটতি পূরণ করা যাতে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের এই অভাবকে আমরা চিরদিনের মতো মুছে ফেলতে পারি। তাই আজ আমার একটাই আকাঙক্ষা আছে যেটা হল পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী সকল সুস্থ ও সবল ভারতীয়রা স্বেচ্ছায় আমাদের স্বদেশভূমির স্বাধীনতার জন্য আমার সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেবেন।

এটাই আমাদের সর্বপ্রধান কাজ ও কর্তব্য এবং এমন কোনও কাজ নেই যা এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে সকল ভারতীয় লড়াই করতে প্রস্তুত, তাঁদের সকলের কাছে আমার অনুরোধ যে কালক্ষেপ না করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন, সরাসরি

অথবা আপনাদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে। আমি নিশ্চিত জানি যে ভারতবর্ষে যাঁরা ইতিমধ্যেই সংগ্রাম শুরু করেছেন, তাঁদের সাথে পূর্ব এশিয়ার বসবাসকারী ভারতীয়দের সাহায্য পেলে এমন একটা বিশাল বাহিনী আমি গড়ে তুলতে পারব যা ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে নির্মূল করতে পারবে। সেই শুভক্ষণ আসন্ন, এবং আজ প্রতিটি স্বদেশপ্রেমী ভারতবাসীকে এগিয়ে আসতে হবে সংগ্রামের পথ ধরে। স্বাধীনতা-প্রেমী ভারতীয়দের রক্তের বিনিময়েই কেবলমাত্র ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা পাবে।

৪

বর্তমান যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ কী

[নেতাজির টোকিও থেকে বাংলায় বক্তৃতা, ২৪ জুন ১৯৪৩]*

স্বদেশবাসী বন্ধুগণ। এ মাসের ২১ তারিখ টোকিও থেকে রেডিও হইতে আমি বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি বিষয়ে আপনাদের কিছু বলিয়াছিলাম। আজ আমার ইচ্ছা যে গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন রেডিও স্টেশন হইতে যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহার পুনরাবৃত্তি করা। সর্বপ্রথমে আমি এই প্রশ্ন তুলিতে চাই যে বর্তমান যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ কি এবং এই বিশ্বসংঘাতের পশ্চাতে কোন কোন শক্তি ক্রিয়া করিতেছে।

বন্ধুগণ, এই যুদ্ধ আমরা দুই বিশ্ব শক্তির সংঘর্ষ দেখিতেছি। একদিকে পুরাতন রাজশক্তিপুঞ্জ যাহারা নিজেদের কায়েমি সত্ব বজায় রাখিতে চায় তাহাদের বিরুদ্ধে কতকগুলি নূতন রাজশক্তি দেখিতেছি যাহারা সত্ব ধ্বংস করিয়া পৃথিবীতে এক নূতন ব্যবস্থা আনিতে চায়। প্রথমদলে আমরা স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্রের মুখোশধারী অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে দেখিতেছি। যদি এই সাম্রাজ্যবাদের বিজয় হয় তাহা হইলে ভারতের পরাধীনতা চিরস্থায়ী হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক দুর্ভাগ্য জাতির দাসত্ব শৃঙ্খল সুদৃঢ় হইবে। কোন কোন ভারতবাসী পূর্বে আশা করিয়াছিলেন যে, বর্তমান যুদ্ধের চাপে ইংরাজের মতো সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের ন্যায় পদানত জাতিদের স্বাধীনতা বিস্তার করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু এই আশা দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। অপরদিকে যে সব ব্যক্তি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন উভয়পক্ষের মধ্যে একটা আপস করাইয়া এই বিশ্বযুদ্ধ নিবারণ করিতে, তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। অতএব এই সংগ্রামে আপসের কোন সম্ভাবনা নাই এবং যতদূর দেখা যাইতেছে গত বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা বর্তমান যুদ্ধ আরও বেশিদিন চলিতে পারে। এই ঐতিহাসিক ঘাত-প্রতিঘাতের সময় আমাদের কর্তব্য কি। আমাদের কর্তব্য নবীন জাতিদের পক্ষ অবলম্বন করা কারণ তাহারা যদি বর্তমানের অচলায়তন ধ্বংস করিতে পারে তাহা হইলে এই ওলট-পালটের মধ্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিবার এক সুবর্ণসুযোগ লাভ করিব। একথা আপনারা সহজেই উপলব্ধি করিবেন যে অ্যাক্সিস শক্তিরা অর্থাৎ জাপান, জার্মান ও ইতালি আমাদের চিরশত্রু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ ও দুর্বল করিয়া পরোক্ষভাবে আমাদেরই সাহায্য করিয়াছে। তাহারা যদি এইভাবে আমাদের শত্রুকে কাবু না করিত তাহা হইলে আমাদের এই কাজ শতগুণে কঠিনতর হইত। এই সাহায্যের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আরও কৃতজ্ঞ হওয়া উচিৎ যে অ্যাক্সিস শক্তিরা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেছে এবং তাহারা সকলপ্রকার সহায়তা দিতেও প্রস্তুত আছে।

---

* মূল বানান অপরিবর্তিত।

আমি জানি যে ইংরাজি শিক্ষা এবং ইংরাজের প্রপোগ্যান্ডার প্রভাবের দরুণ কতিপয় ভারতবাসী অ্যাক্সিস শক্তিতে সততা বিষয়ে অত্যন্ত সন্দিহান। সেই সব দেশাবাসীদের আমি অনুরোধ করিতে চাই যে তাঁহারা যেন আমায় বিশ্বাস করেন। আমিতো আমাদের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করিব না এবং আমাকে কেহ প্রতারিত করিতেও পারিবে না। প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশরাজ সারাজীবন আমাকে নির্যাতন করিয়া এবং এগারবার আমাকে কারারুদ্ধ করিয়াও যখন আমাকে কাবু করিতে পারিল না তখন আর কোন পার্থিব শক্তি তাহা করিতে পারিবে না এবং চালাক-চতুর ও ক্রূর প্রকৃতির ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ যখন আমাকে প্রলুব্ধ বা প্রতারিত করিতে পারিল না তখন পৃথিবীতে আর কেহ তাহা করিতে পারিবে না।

বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে ১৯৪০ সালের শেষদিকে আমি যখন দেখিলাম যে মহাত্মা গান্ধী পরিশেষে সত্যাগ্রহ সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন আমি তখন অনুভব করিলাম যে এখন পৃথিবীর সম্মুখে ভারতের মান-মর্যাদা রক্ষা হইল এবং অতঃপর ভারতের বিপ্লব আন্দোলন এরূপ ব্যাপকভাবে এবং নূতন প্রণালিতে চালাইতে হইবে যাহাতে আমাদের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনটি বস্তু একান্ত প্রয়োজন আমি অনুভব করি। প্রথমতঃ বিশ্ব পরিস্থিতি এবং বিশেষ করিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতির নিরপেক্ষ সঠিক সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়তঃ অ্যাক্সিস শক্তিদের সহিত সংযোগ স্থাপন করা এবং তৃতীয়তঃ প্রবাসী ভারতবাসীদের সহায়তা সংগ্রহ করা। বন্ধুগণ, আজ আমি সানন্দে আপনাদিগকে জানাইতে পারি যে আমার তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বিশ্বপরিস্থিতির সঠিক খবর আমরা পাইয়াছি এবং পাইতেছি। তাই আমাদের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে অন্তিমে আমাদেরই জয় এবং ইংরাজের পরাজয় হইবে দ্বিতীয়তঃ আমরা বুঝিয়াছি যে অ্যাক্সিস শক্তিরা এবং বিশেষ করিয়া জাপান ভারতের বাহিরে ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সহায়ক। তৃতীয়তঃ আমাদের শত্রু কর্তৃক অধিকৃত দেশের ছাড়া যত ভারতবাসী আজ ভারতের বাহিরে প্রবাসে আছেন তাঁহারা সকলে এক বিরাট আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে সুসংবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহারা একদিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীর সহিত সংযোগ রাখিতেছেন এবং অপরদিকে আন্তর্জাতিক ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। যাঁহারা ইংরাজের সকলপ্রকার অত্যাচার, নির্যাতন ও নিশৃংসতা অগ্রাহ্য করিয়া ভারতের ভিতরে মুক্তির সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছেন ঠিক সময়ে তাঁহাদের নিকট প্রয়োজনীয় সাহায্য পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতিষ্ঠান এখন সফল আয়োজন করিতেছে।

বন্ধুগণ, আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ থাকিবে যে, আমি ইতিপূর্বে বহুবার আপনাদিগকে বলিয়াছি এবং প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, যখন আমাদের আকাঙ্ক্ষিত শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হইবে তখন আমি এবং আমার সঙ্গে আরও অনেকে আপনাদিগের পাশে আসিয়া দাঁড়াইব। আমরা সকলে তখন একসঙ্গে লড়িব এবং দুঃখভোগ করিব এবং তারপর আমরা একসঙ্গে সাফল্য ও স্বাধীনতার গৌরব অর্জন করিব। আমরা জানি যে ভারতের সীমান্ত হইতে বেশি দূরে নাই। আপনারা জানেন যে ১৯৪১ সালের জানুয়ারি মাস হইতে আজ পর্যন্ত আমার গতিবিধি কেহ রোধ করিতে পারে নাই অতএব আমি যেদিন ভারতের সীমান্ত পুনরায় অতিক্রম করিয়া দেশে ফিরিব এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে যোগদান করিব, ঘৃণ্য কোন পার্থিব শক্তি আমার পথ রোধ করিতে পারিবে না। স্বদেশবাসী বন্ধুগণ, পরিশেষে যে সব সাথী আজ অন্তরীণে অথবা কারাবাসে লাঞ্ছনা ও নির্যাতন ভোগ করিতেছেন আপনাদের মারফৎ দিয়া আমি তাঁহাদের নিকট আমার সাদর অভিনন্দন ও প্রীতিপূর্ণ শুভ-ইচ্ছা প্রেরণ

করিতে চাই। তাঁহারা যেন মনের উৎসাহ, আনন্দস্ফূর্তি না হারান। তাঁহাদিগকে গিয়া বলুন যে মাতৃভূমির সম্মান ও মর্যাদা তাঁহারাই রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতন পৃথিবীকে জানাইয়া দিয়াছে যে পরাধীন ভারতবাসী আজ ইংরাজের সহিত সংগ্রামে নিরত। আমরা যাহারা আজ ভারতের বাহিরে কাজ করিতেছি আমরা তাহাদের গর্বে গর্বিত। প্রতিদিন তাহাদের কথা আমরা চিন্তা করি এবং তাহাদের উদ্দেশ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করি। আবার তাঁহাদের নিকট গিয়া বলুন যে তাঁহাদের এই বিরাট দুঃখ ও ত্যাগ কখনও ব্যর্থ হইতে পারেনা। ভারত পুনরায় স্বাধীন হইবেই হইবে এবং স্বাধীনতার সূর্য উদয়ের খুব বেশি বিলম্বও নাই। স্বাধীন ভারতে সকল কারাগারের লৌহকপাট উন্মুক্ত হইবে এবং ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা তখন কারা প্রকোষ্ঠের অন্ধকার হইতে মুক্তির আনন্দে নির্মল আলোকে বাহির হইয়া জয়মাল্যে ভূষিত হইবেন।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।
আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ।

৫

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কাল্পনিক কাহিনি

[সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ২৮ জুন ১৯৪৩][১]

গতকাল মিস্টার সুভাষচন্দ্র বোসের সঙ্গে আমাদের যে কথোপকথন হয়েছিল আরউইন উইকার্ট এখন আমাদের জার্মান শ্রোতাদের কাছে তার একটু বিবরণ দেবেন।

'ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যা জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ও দলগত ভিত্তিতে বহুবিভক্ত এবং সেই কারণে তারা স্বশাসনে অক্ষম, এই কাহিনি ব্রিটিশ প্রচার মাধ্যমের কল্পনাপ্রসূত। ১৯৩৯ সালে যখন জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাগ্রাসী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে তখন থেকে ভারতবর্ষে কমিউনিজম প্রভাব বিস্তার করেছে, তার কারণ হল ব্রিটিশরা তাতে আগ্রহী। ভারতীয় জনসাধারণ তাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিতে পেরেছে যে তারা স্বশাসনে সম্পূর্ণ সক্ষম। এই যুদ্ধে ত্রিপাক্ষিক শক্তির সাফল্য যেমন নিশ্চিত, ঠিক তেমনই এটাও নিশ্চিত যে এই যুদ্ধে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা লাভ করবে।'

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা মিস্টার সুভাষচন্দ্র বোস জার্মান রেডিয়োর শ্রোতাদের জন্য যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, তার প্রধান বক্তব্য উপরের কথাগুলোতেই নিহিত আছে। জার্মান ভাষায় তাঁকে যে সব প্রশ্ন করা হল, শান্ত ও সুচিন্তিতভাবে বোস তার প্রত্যেকটির উত্তর দেন। শাণিত ও নিশ্চিত ভঙ্গিতে তাঁর মূল ভাষ্যের উপর জোর দিয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন। স্বাধীন ভারতের জন্য তাঁদের সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বোস রেডিয়োকে প্রচারের মূল অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন এই তথ্যই ছিল আলোচনার ভিত্তি। আমরা পূর্ব এশিয়াবাসীরা স্পষ্টই মনে করতে পারি, কারাগার থেকে বোসের অন্তর্ধানের পর, তিনি জার্মানি এসে পৌঁছানোর আগে ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র যখন বোসের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করছে তার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি কীভাবে ফ্রি ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে কথা বলেন। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে ভারতের কোন অঞ্চল বিশেষভাবে তাঁর আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তিনি তার উত্তরে বলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো, তাঁর আন্দোলনকেও সমগ্র ভারতের জনসাধারণ সাদরে গ্রহণ করেছে। এর পরে প্রশ্নোত্তরগুলি এই ভাবে চলতে থাকে।

প্রশ্ন: মহানুভব, দশদিন আগে টোকিওতে যখন আপনার আগমনবার্তা ঘোষিত হয় তখন স্বাধীন পূর্ব এশিয়াতে এমন একজনও ভারতীয় ছিলেন না যিনি মহানন্দে এই ঘটনাকে স্বাগত জানাননি। চিন, ফিলিপাইন, জাপান, ইন্দোচিন, থাইল্যান্ড ও মালয়ের ভারতীয় সম্প্রদায়ের জনগণ অভিনন্দন জানিয়ে আপনাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জাতি ও ধর্ম ভারতীয় জনসাধারণকে বিভক্ত করে রেখেছে এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুযুধান— ব্রিটিশ

---

১. Testament of Subhas Bose. পৃষ্ঠা ১৪৪-৭।

সরকারের এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আপনার জন্য এই অকুণ্ঠ অভিনন্দন, আপনি কীভাবে এর ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর: ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র সাধারণত যে ভাবে তাদের মিথ্যাচার চালিয়ে থাকে এটা হল তারই একটা আদর্শ নমুনা। আমার জাতীয় আন্দোলনে ধর্মীয় প্রশ্নের কোনও অস্তিত্ব নেই। আমার অনুগামীরা সব ভারতীয়দের মধ্যেই রয়েছেন, বিশেষ করে মুসলমানদের ভিতরে, ব্রিটিশ প্রচার মাধ্যমের ভাষ্য অনুসারে যাঁরা স্বতন্ত্র দেশের দাবিতে কাজ করে চলেছেন।

প্রশ্ন: ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্রের দিকে তাকালে আপনি লক্ষ করবেন দেশের অংশগুলি প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসনাধীন, তাদের পাশাপাশি রয়েছে রাজ পরিবারদের দ্বারা শাসিত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রদেশগুলি। মহানুভব, আপনার কর্মসূচিতে এই ভারতীয় রাজাদের ভূমিকা কী?

উত্তর: আমাদের আন্দোলন ও তার সাফল্যজনক সমাপ্তিকে রাজারা থামাতে পারবে না। তারা হয় স্বেচ্ছায় ব্রিটিশদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে অথবা তাদের উপরে ব্রিটিশরা যথেষ্ট চাপ দিচ্ছে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের যে রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল বর্তমান যুদ্ধে তাদের সেই ভূমিকা নেই। গত বিশ বছর ধরে এই রাজাদের চোখের সামনেই প্রতিটি ভারতীয় রাজ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। আজকের দিনে জনসাধারণ কী ভাবছেন সেটাই প্রধানত বিচার্য। এই রাজ্যগুলির সর্বত্রই আমার আন্দোলনের অনুগামীরা রয়েছেন।

প্রশ্ন: ভারতবর্ষে এমন কোনও গোষ্ঠী আছে কি যারা ভারতীয় ঐক্যের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি ঘটাতে পারে? যেমন উদাহরণস্বরূপ, কমিউনিস্টদের বিষয়ে আপনি কী মনে করেন? গত কয়েক বছরে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের কাছ থেকে তারা অনেক বেশি স্বাধীনতা পেয়েছে, হয়তো মস্কোর কাছ থেকে চাপে পড়েই বাধ্য হয়ে ব্রিটিশদের সেটা দিতে হয়েছে।

উত্তর: ১৯৩৯ সালের যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকেই থার্ড ইন্টারন্যাশনাল ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের হয়ে লড়ছে এবং সেই মুহূর্ত থেকেই ভারতীয় জনসাধারণের কাছে তাদের সাফল্যের সমস্ত সম্ভাবনা লুপ্ত হয়ে গেছে। তার ফলে তাদের কোনও রাজনৈতিক গুরুত্ব আর নেই। ব্রিটেনের সঙ্গে তাদের যোগসাজস থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমরা ভয় পাই না। আমাদের আন্দোলনের সামনে সব থেকে বড় যে বিপদ, তা হল গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষে মীমাংসা করবার আকাঙ্ক্ষা এবং এখনও ভারতবর্ষের কিছু কিছু মানুষ, যাদের এখনও চৈতন্য হয়নি, তাঁরা সেই ইচ্ছা পোষণ করে থাকেন।

প্রশ্ন: ব্রিটেনের প্রচারের ভিত্তি হল ভারতবর্ষ স্বশাসনে অক্ষম, সেই কারণেই ব্রিটেন এই দেশের উপর আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছে।

উত্তর: বোস শুধু মৃদু হাসলেন এবং বললেন যে ব্রিটিশদের এই পুরনো যুক্তি মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন। তিনি আরও যোগ করলেন: ব্রিটিশ যখন ভারতবর্ষে আসে তার আগে থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের দেশে আমাদের নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে চালু ছিল। আমাদের দেশের ইতিহাস বহু প্রাচীন, ব্রিটিশদের থেকে আরও অনেক বেশি প্রাচীন সেটা। এ ছাড়া অল্প কিছুদিন আগেই ভারতীয় কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা আটটা ভারতীয় প্রদেশে কাজ করেছে। যদিও আমরা তখনও আমাদের স্বাধীনতা পাইনি কিন্তু তবুও সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের স্বদেশবাসীর জন্য যে কাজ করতে পেরেছিলাম তা ব্রিটিশরা তাদের সমগ্র শাসনকালে যা করেছে তার থেকে বেশি। ভারতবর্ষের সামাজিক

সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সেই সময় প্রথম কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরু করা হয়। এই ঘটনা ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। আমরা জানি যে আমাদের দেশের শাসনকার্য পরিচালনায় ব্রিটিশ শাসকদের তুলনায় আমরা অনেক বেশি সক্ষম। ১৯৩৯ সালে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের শুরুতে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির হাত থেকে স্বশাসনের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল, কারণ তখন তারা মনে করেছিল যে আমাদের হাতে শাসনকার্যের ভার থাকলে তা বড় বেশি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সুভাষচন্দ্র বোস এর পরে জার্মানি ও ভারতবর্ষের ভাগ্যের সাদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে সপ্তদশ শতাব্দীতে *'divide et impera'* এই মূলমন্ত্রের ভিত্তিতে ব্রিটেন বারংবার জার্মানি ও ইউরোপের মধ্যে মতবিরোধের সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছিল তাদের তথাকথিত 'শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করা'-র নীতি প্রয়োগ করে। বিগত এক শতাব্দী ধরে ব্রিটেন ভারতবর্ষে ঠিক একই কাজ করে চলেছে, এবং আগে ইউরোপে যেমন করেছে তেমনই এখানে তারা একটা ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে অন্য দলকে উসকানি দিয়েছে। এই দলগুলির মধ্যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ নেই, কিন্তু ব্রিটেন সেই বৈসাদৃশ্যগুলিকেই অতিরঞ্জিত করছে এবং গোটা দুনিয়াকে বলে বেড়াচ্ছে যে ভারতবর্ষ স্বশাসনে অক্ষম। এই ভ্রান্ত ধারণা গড়ে তোলার জন্য ব্রিটেন একাই দায়ী এবং এখনও অনেক উদার মনোভাবসম্পন্ন মানুষ,ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই ধারণাই পোষণ করে থাকেন। 'আমি জানি', বোস বলেন, 'ব্রিটেনের নীতির সম্বন্ধে জার্মানদের মধ্যে অনেকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকায় তারাই ভারতকে ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশ্বের যে কোনও অন্য দেশের থেকে বেশি ভালভাবে বুঝতে পারবে। সেই কারণেই আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের সংগ্রাম এবং জার্মানি ও অন্য ত্রিপাক্ষিক শক্তিগুলির সঙ্গে ব্রিটেনের যে সংগ্রাম চলছে তার একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আমরা যদি ব্রিটেনের সঙ্গে একা এই লড়াই লড়তাম তা হলে সেটা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াত।'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যুদ্ধে ত্রিপাক্ষিক শক্তিগুলির জয় অবধারিত এবং ঠিক ততটাই দৃঢ়তার সঙ্গে আমি বিশ্বাস করি যে এই যুদ্ধ ভারতকে স্বাধীনতা দেবে।' এই বলে বোস তাঁর সাক্ষাৎকার শেষ করেন।

বার্লিন রেডিয়ো, ২৮ জুন ১৯৪৩।

৬

সুভাষচন্দ্র বোস নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন

[২ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে সিঙ্গাপুরে আইএনএ-র জনসভায় বক্তৃতা,
এবং ৪ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের
প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সভার বিবরণ][১]

২ জুলাই শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস যখন বিমানে টোকিও থেকে উড়ে এসে সায়োনান বিমানবন্দরে নামলেন, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির প্রতিনিধিরা ও আন্দোলনের নেতৃবর্গ তাঁকে রাজকীয় সমারোহে স্বাগত জানালেন। আইএনএ-র প্রাঙ্গণে সদস্যেরা তাঁকে জানালেন গার্ড অফ অনার। নিজের চোখে ভারতের আজাদ হিন্দ বাহিনীকে দেখে সুভাষ অভিভূত হয়ে পড়লেন। "ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে একমাত্র যে অভাব আমাদের ছিল তা হল ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করবার উপযুক্ত একটি সশস্ত্র বাহিনী। আপনারা দেশপ্রেমী যোদ্ধারা আজ এগিয়ে এসেছেন আর সেই সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছেন।" গার্ড অফ অনার-কে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "আসুন আমরা সকলে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যাই, আজ আমরা প্রাণ দিতে এবং তার বিনিময়ে আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা জয় করে নিতে প্রস্তুত।" আইএনএ-র সদস্যেরা তার উত্তরে তাঁকে তিন বার উচ্চস্বরে উৎফুল্ল অভিনন্দন জানালেন।

৪ জুলাই, সায়োনানে পূর্ব এশিয়ার ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের প্রতিনিধিদের কমিটির সভায় দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত প্রকাশের এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল যখন শ্রীসুভাষ চন্দ্র বোস পূর্ব এশিয়ায় লীগের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। সেদিন ভোরবেলা থেকে সমানেই বৃষ্টি পড়ছে। কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে ক্যাথি সিনেমার চতুর্দিকে সব রাস্তায় বিপুল জনতার ভিড়। তারা একবারের জন্য নেতাজি সুভাষ বোসের দর্শন চায়। তিনি রাসবিহারী বোসের সঙ্গে সিনেমায় এসে পৌঁছলে জনতা তাঁকে বজ্রগম্ভীর গর্জনে অভিনন্দন জানাল। হিনোমারু (উদিত সূর্যের পতাকা) ও ভারতীয় ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা দিয়ে মঞ্চ সজ্জিত ছিল। সুভাষ বোসের সভাকক্ষে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা উঠে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে তাঁকে অভিনন্দন জানাল। সভাকক্ষের সব দিক থেকে আওয়াজ উঠল 'সুভাষ বোস কি জয়', 'রাসবিহারী বোস কি জয়', 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়', 'মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কি জয়' এবং 'পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কি জয়।'

রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রীদের দ্বারা দুই নেতাকে মাল্যভূষিত করার পরে সভার কাজ শুরু

---

১. এস এ দাস এবং কে বি সুব্বাইয়া সম্পাদিত (জন এ. থিভি, স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লিখিত ভূমিকাসহ) 'চলো দিল্লি! অ্যান হিস্টোরিকাল অ্যাকাউন্ট অব ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট অন ইস্ট এশিয়া (কুয়ালা লামপুর: দি ইকোনোমি প্রিন্টারস, এন ডি) পৃঃ ১২৩-১২৫, ১৩০।

হল। মিস এস এন সরস্বতী ভারতীয় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে সমবেত জনগণকে আনন্দ দিলেন।

রাসবিহারী বোস যখন 'দেশসেবক' সুভাষচন্দ্র বোসকে পূর্ব এশিয়ার ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সভাপতি রূপে ঘোষণা করলেন তখন উপস্থিত জনগণ বিপুল উদ্দীপনায় সভাগৃহে তাঁকে অভিনন্দন জানাল। শ্রীরাসবিহারী বোসের ভাষণ তামিল ভাষায় অনুবাদ করলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এ আলাগাপ্পন।

তাঁর বক্তৃতা শুরু করবার আগে শ্রীসুভাষচন্দ্র বোস বিদায়ী সভাপতিকে বিশুদ্ধ হিন্দিতে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানালেন, যা তামিলে অনুবাদ করে দেওয়া হল। একটা যথার্থই মর্মস্পর্শী দৃশ্যের সৃষ্টি হল যখন সুভাষ বোস বললেন:

"গত মহাযুদ্ধের সময় ও তার আগে, ভারতবর্ষের জনগণ তাঁকে (বিদায়ী সভাপতিকে) খুব ভালভাবে জানতেন, কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের মানুষ হয়তো তাঁকে ভুলে যেতে বসেছে। গত যুদ্ধের সময় তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তিনি যে দেশসেবা করেছেন, তা শুধু আমাদের স্মৃতিতেই চিরদিন উজ্জ্বল থাকবে তাই নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রেকর্ডেও তার সাক্ষ্য থাকবে।"

সুভাষ বোস বিদায়ী সভাপতিকে অনুরোধ করলেন যেন সভাপতির সর্বপ্রধান উপদেষ্টা রূপে লীগের সেবায় তিনি তাঁর অবদান অব্যাহত রাখেন এবং এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে বোসকে তিনি পথপ্রদর্শন করেন।

৭

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বঞ্চনা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে এগিয়ে চলা, মৃত্যু

[৪ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে সিঙ্গাপুরে পূর্ব এশিয়ার
প্রতিনিধিদের সভায় সভাপতির ভাষণ][১]

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বোস এবং পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিনিধিরা! বোনেরা ও ভাইয়েরা!

পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সভাপতির সম্মান আমাকে দেবার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করছি— কিন্তু আমি তা করছি অত্যন্ত বিনম্র চিত্তে এবং আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে এই দায়িত্ব পালনের শক্তি দেন, আমার কাজে আমি যেন আমার স্বদেশবাসীদের, যাঁরা ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারতের বাইরে বাস করেন, সকলকে যেন আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে পারি।

বর্তমান যুদ্ধের শুরুর সময় থেকে ভারতে এবং ভারতের বাইরে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই বিষয়ে যদি আপনারা জানতেন— তা হলে আমার মতো আপনারাও অনুভব করতেন যে ভাগ্যবিধাতা যেন দুই হাত দিয়ে আমাদের বিপদে আগলে রেখেছেন, জয় ও স্বাধীনতার পথে আমাদের প্রয়াসকে যেন তিনি সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন। এই অনুভূতি আমাকে আরও আশাবাদী করেছে, আমার আত্মবিশ্বাসকে শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বন্ধুরা, আজ সেই শুভক্ষণ এসেছে যখন স্বাধীনতাপ্রেমী ভারতীয়দের কাজ শুরু করতে হবে। যুদ্ধের সংকটাপন্ন পরিস্থিতি আজ আমাদের কাছে সব থেকে আগে যা দাবি করে তা হল সামরিক শৃঙ্খলা এবং সেই সঙ্গে লক্ষ্যের প্রতি আমাদের অচঞ্চল আনুগত্য। পূর্ব এশিয়ার স্বদেশবাসীরা, আমি তাই আজ আপনাদের এক নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং এক কঠোরতম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই আহ্বানে আপনারা সাড়া দেবেন।

আমি আপনাদের অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই যে এই আজকের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ আমাদের সকলকে একটা অঙ্গীকারের বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে, শুধু পূর্ব এশিয়ার স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়দের নয়, বিশ্বের সর্বত্র যেখানেই স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়রা আছেন, তাঁদের সকলের জন্যই এই অঙ্গীকার। সকল প্রবাসী স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়, যাঁরা আমাদের মাতৃভূমির মুক্তির জন্য সক্রিয়ভাবে কাজে নেমেছেন, আজ আমি তাঁদের সকলের বিশ্বাস ও সহযোগিতা পেয়েছি। এমনকী যে সব ভারতীয়েরা এখন শত্রুদের অধিকৃত দেশগুলিতে

---

১. *On To Delhi* পৃ: ২২-৩০, মূল হিন্দুস্থানি থেকে অনূদিত। নেতাজির মূল হিন্দুস্থানি বক্তৃতার অডিও ও ভিডিও কলকাতার নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংরক্ষণশালা থেকে পাওয়া যাবে।

বসবাস করছেন তাঁরা যদিও ভারতের স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে অক্ষম কিন্তু সকলেই আদর্শগত ভাবে আমাদের কাজের সমর্থন করছেন। আমার জ্ঞান অনুসারে সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই প্রথম সকল প্রবাসী ভারতীয় একই লক্ষ্যের অভিমুখে একটি প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত হয়েছেন।

তার থেকেও হয়তো বা আরও উল্লেখযোগ্য তা হল স্বদেশপ্রেমী প্রবাসী ভারতীয়েরা আজ স্বদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের সাথে একযোগে কাজ করছেন। আমি বহুবার সর্বজনসমক্ষে ঘোষণা করেছি যে ১৯৪১ সালে আমি যখন এই মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে পথে নেমেছিলাম, তখন স্বদেশের অসংখ্য মানুষের শুভ কামনাই ছিল আমার পাথেয়। তখন থেকে সি আই ডি অর্থাৎ সিক্রেট সার্ভিসের বিপুল বিধিনিষেধ সত্ত্বেও আমি সর্বদাই ভারতবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম হয়েছি। এমনকী আজ আমি আপনাদের এমন কথাও জানাতে পারি যে গত ১২ মাসে বিশ্বের চতুর্দিক থেকে আমাদের বহু প্রতিনিধিদের ভারতবর্ষে পাঠানো হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ধরাও পড়েছেন ও প্রাণ দিয়েছেন, এবং একদিন আমরা তার প্রতিশোধ নেব কড়ায় গন্ডায়। কিন্তু আরও বহুজন গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছেন, আর আমার কাছে সর্বাধুনিক যে খবর আছে সেই খবর অনুসারে তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। কাজেই আমরা বলতে পারি যে প্রবাসের স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়েরা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকদের যথার্থ সহযোদ্ধা! আমি আজ আরও একবার সকলকে এই আশ্বাস দিতে চাই যে, আমরা আজ পর্যন্ত যা করেছি এবং ভবিষ্যতেও যা করব তার সব কিছুই ভারতের স্বাধীনতার জন্য করা হয়েছে বা হবে, এবং এমন কোনও কাজ আমরা কখনওই করব না যা ভারতবর্ষের স্বার্থের পরিপন্থী বা যা ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরোধী।

এর পরের প্রশ্ন হল কী ভাবে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করব, এবার আমি আপনাদের সেই প্রশ্নের উত্তর দেব। দেশে কোনও এক সময়ে আমার কোনও কোনও বন্ধু ভেবেছিলেন যে, এমন একটা আন্তর্জাতিক সংকটকালে ব্রিটিশ সরকার হয়তো তাদের নিজেদের স্বার্থেই ভারতের স্বাধীনতা দাবি মেনে নেবে। এতদিনে নিশ্চয়ই সেই বন্ধুদের ভুল ভেঙেছে— কারণ এটা এখন একেবারে কাচের মতো স্বচ্ছ যে ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রায় হল ভারতবর্ষ থেকে যুদ্ধের সময় ও তার পরে যৎপরোনাস্তি শোষণ অব্যাহত রাখা। সেই কারণেই ফিল্ড মার্শাল লর্ড ওয়াভেলকে ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল করে পাঠানো হচ্ছে। আমি লক্ষ করেছি যে দেশে কোনও কোনও মহলে এই ঘটনায় অত্যন্ত অসন্তোষের কারণ ঘটেছে, এবং তাঁরা হয়তো চাইছিলেন যে ভাইসরয়ের পদে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের মতো কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হোক। কিন্তু আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমার মতে ভাইসরয়ের পদে ফিল্ড মার্শাল লর্ড ওয়াভেলের নিয়োগ একটা ভবিষ্যদ্বাণীর মতো ঘটনা— দেওয়াল লিখন বলতে পারেন। এই চির-পশ্চাদপসারী সেনানায়কের ভবিতব্যই হল যে ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয় হওয়া। উপরন্তু ভারতের যে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ চলেছে যা এই নতুন ভাইসরয়ের শাসনকালে আরও তীব্র হতে বাধ্য, সেই ঘটনা ভারতের জনগণের মনোভাবকে আরও তিক্ত এবং বিপ্লবের শক্তিকে আরও দৃঢ় করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

যদিও নতুন ভাইসরয়ের অধীনে ভারতবর্ষে কিছুদিনের জন্য সামরিক একনায়কত্ব বলবৎ হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার অনুমান, ভবিষ্যতে আরও একবার ভারতের সঙ্গে একটা

সমঝোতায় আসার চেষ্টা করা হবে। সেই প্রচেষ্টা একটা ভাঁওতা— চোখে ধুলি নিক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছুই নয়— এবং দেশে আমাদের স্বদেশবাসীদের আগে থেকেই সেই প্রতারণা ধরবার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে— ঠিক যেমন এর আগে তাঁরা করেছিলেন ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ভারতবর্ষের কাছে একটা ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিতে এসেছিলেন। ব্রিটিশ জনগণের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি, মিস্টার উইনস্টন চার্চিল সম্প্রতি তাঁর মনোভাবের একটা আভাস দিয়েছেন যখন তিনি লন্ডন শহরের মেয়রকে বলেছেন যে তিনি (চার্চিল) 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ'-এর পক্ষপাতী নন, তার বদলে তিনি পছন্দ করেন 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্য'। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ইংল্যান্ডের শেষ সাম্রাজ্যবাদী প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে অটুট রাখার জন্য তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন এবং তিনি ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে যে প্রস্তাবই রাখুন না কেন, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে জনগণকে প্রতারণা করা। কিন্তু যে সাম্রাজ্য অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে, তার সঙ্গে কোনও সমঝোতায় আসার কথা চিন্তার মধ্যেই স্থান দেওয়া উচিত হবে না।

আমার মতে, আপনারা যাঁরা অন্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দু'টি শর্ত অবশ্য প্রয়োজন— প্রথমত, একটা সুবিধাজনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত আরও যেটা প্রয়োজন তা হল স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ ও অদম্য প্রচেষ্টা। প্রথম শর্তটি ইতিমধ্যেই পূর্ণ হয়েছে। যদি ভারতবর্ষকে একক শক্তিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে হত তা হলে আমাদের কাজ অনেক বেশি দুরূহ হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরাস্ত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য ত্রিপাক্ষিক শক্তি বদ্ধপরিকর।

বন্ধুরা! গত দুই বছর ধরে আমি অনবরত এক স্থান থেকে অন্যত্র ভ্রমণ করছি যাতে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে এই যুদ্ধের একটি মাত্র পরিণতিই সম্ভব, তা সে যুদ্ধ যতদিন ধরেই চলুক না কেন, এবং তা হল ত্রিপাক্ষিক শক্তিগোষ্ঠী ও তাদের সহযোগীদের চূড়ান্ত জয়। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করবার আগে যে বহু বাধা অতিক্রম করতে হবে সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন এবং আমার আরও জানা আছে যে দীর্ঘদিনব্যাপী যুদ্ধে অস্থায়ী উত্থান ও পতন অনিবার্য যেমন এই মুহূর্তে সমরাঙ্গনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে, যার গুরুত্ব অকিঞ্চিৎকর, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি স্বল্পকালীন সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে আছে। কিন্তু সাধারণভাবে যুদ্ধের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে বিশেষ আমরা যদি কৌশলগত পরিস্থিতির কথা ভাবি তা হলে দেখা যাবে যে ত্রিপাক্ষিক শক্তি অধিকতর সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে আছে, এবং আপনারা দেখবেন যে একদিন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে ত্রিপাক্ষিক শক্তির কাছে একের পর এক যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হবে।

বন্ধুরা! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এত শক্তি ও পরাক্রম সত্ত্বেও, তারা প্রত্যেক সম্ভাব্য দেশ থেকে সাহায্য চাইছে ও গ্রহণ করছে। তার ফলে এটাই স্বাভাবিক যে আমাদেরও দেখতে হবে যে আমরা কোথা থেকে সহানুভূতি ও সাহায্য পেতে পারি। অধিকন্তু, ইতিহাসের সব স্বাধীনতা আন্দোলনকেই বিদেশের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে হয়েছে, এবং তার পরেই তারা তাদের সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। বর্তমান পরিস্থিতির ঘটনাপ্রবাহ ত্রিপাক্ষিক শক্তিগোষ্ঠীকেই আমাদের স্বাভাবিক মিত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং আমরা যদি তাদের সমর্থন এবং প্রয়োজন হলে, তাদের সাহায্য গ্রহণ করি তা হলে তাতে কোনও দোষ নেই।

আমি জানি আমার কোনও কোনও স্বদেশবাসী ব্রিটিশ প্রচারে বিভ্রান্ত এবং তাঁরা ভারতবর্ষের প্রতি ত্রিপাক্ষিক শক্তির মনোভাব সম্পর্কে সন্দিহান। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগ করলে তাঁরা বুঝবেন যে ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন করাটাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। অধিকন্তু স্বাধীন ভারতের অস্তিত্ব ইংল্যান্ড ছাড়া বিশ্বের যে কোনও দেশের পক্ষেই বিশেষ সুবিধাজনক, এবং এর মধ্যে ত্রিপাক্ষিক শক্তিগোষ্ঠীও অন্তর্ভুক্ত।

অতীতে ত্রিপাক্ষিক শক্তিগোষ্ঠী অনেক সময়েই ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের মনোভাব স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছে। এ ছাড়াও জাপানের সরকার তাদের যোগ্য প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর মাধ্যমে ফিলিপাইন, বর্মাদেশ ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে বারে বারেই তাদের নীতি ঘোষণা করেছে। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও প্রচারবিদেরা, যাঁরা নিজেরাই কপটতা দোষে দুষ্ট, জাপানের মনোভাবকে কপট ও দু'মুখো নীতি বলে বর্ণনা করেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তোজো সমগ্র বিশ্বের সামনে সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন যে বর্মাদেশ ও ফিলিপাইন তাদের স্বাধীনতা অর্জন করবে এই বছরের শেষে— যুদ্ধশেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে হবে না। এই ঘোষণা ইঙ্গ-মার্কিন প্রচারযন্ত্রের উপর বিপুল আঘাত হেনেছে।

বর্মাদেশ ও ফিলিপাইনের সম্বন্ধে জাপানের মনোভাব সেই দেশের আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের সর্বোত্তম প্রমাণ। কিন্তু এ ছাড়াও, একজন সাধারণ মানুষ হিসাবেও আমি জাপানের উদ্দেশ্যকে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করবার মতো কোনও কারণ খুঁজে পাই না। জাপান হল প্রথম এশীয় শক্তি যারা সাফল্যের সঙ্গে বিদেশি শক্তির আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে পেরেছে— এবং অন্য যে কোনও এশীয় দেশের থেকে জাপানের আরও ভাল করে জানা আছে যে যতদিন না এশিয়ার পরাধীন দেশগুলি তাদের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে, ততদিন তারা বিদেশি আক্রমণের আতঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাবে না। সর্বোপরি আজ জাপানে একটা মনোভাব জাগ্রত হয়েছে যাকে হয়তো এশীয় সচেতনতা বলা যেতে পারে, এবং সেই সচেতনতারই প্রকাশ ঘটছে অন্য এশীয় দেশগুলির স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে তাদের সাহায্যের ইচ্ছার মাধ্যমে। এটা ঘটনাচক্রের একটা অনন্যসাধারণ পরিণতি, যা এশিয়ার সকল পরাধীন জাতিগুলির কাছে স্বাধীনতা লাভের একটা সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে, এবং যা স্বাধীনতা, সুবিচার ও ন্যায়নীতির উপরে ভিত্তি করা ভবিষ্যতে এক নতুন দিনের সূচনা করতে চলেছে।

যদি কারুর মনে এখনও কোনও সংশয় থাকে, আমি তাঁদের শুধু এই অনুরোধ করব যে তাঁরা যেন আমার উপরে আস্থা রাখেন। ভারতবর্ষ এবং শুধু ভারতবর্ষের প্রতিই আমার একান্ত আনুগত্য, এবং আমার শত্রুদেরও এই কথা বলার স্পর্ধা হবে না যে আমি আমার দেশ ও দেশবাসীর সঙ্গে কোনও প্রতারণা করতে পারি। আমি কয়েকদিন আগেও টোকিওতে যে কথা বলেছি, যে ব্রিটিশ সরকার যদি আজীবন আমার বিরুদ্ধে তাদের যাবতীয় অত্যাচার ও লাঞ্ছনা চালাবার পরেও যদি আমাকে আমার সংকল্পচ্যুত করতে না পেরে থাকে তা হলে আর কারও সাধ্য নেই তা করার। এবং ধূর্ত ব্রিটিশ রাজনীতিবিদেরা যখন আমাকে তাদের মধুর বাক্য দিয়ে কিনতে পারেনি বা আমার চোখে ধুলো দিতে পারেনি তখন অন্য কেউ সেই কাজে সফল হবে এমন আশা যেন তারা না করে। প্রতিটি ভারতবাসীর যেন আজ এই কথা উপলব্ধি করা উচিত যে যদি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি জয়যুক্ত হয় তা হলে তার একটাই সম্ভাব্য ফলাফল হবে যে ভারতবাসীরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে না ও ব্রিটিশ রাজের শোষণ আরও

তীব্র হবে। অতএব যুদ্ধে ত্রিপাক্ষিক শক্তির জয়ের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আশা নিহিত আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের নিজেদের লড়াই আমাদেরই লড়তে হবে যাতে অক্ষশক্তির জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আমাদের স্বাধীনতা পেতে পারি।

বন্ধুরা! আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিস্থিতি আমাদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল এবং ঘটনাচক্রের সম্মিলনও সৌভাগ্য সূচক। সুতরাং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের একমাত্র যা প্রয়োজন তা হল আমাদের দিক থেকে যথেষ্ট প্রয়াস ও স্বার্থত্যাগ। সেইদিকে আমাদের রেকর্ড খুবই সন্তোষজনক বলে আমি দাবি করতে পারি। আপনাদের হয়তো মনে আছে, যে গত বছরে মে মাসে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ভারতবর্ষ ত্যাগের সময় এবং আমাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের আরম্ভের ঠিক ৮৫ বছর পরে আমি ঘোষণা করেছিলাম যে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের এখন একটা বিশেষ যুগান্তকারী পর্যায় শুরু হতে চলেছে। তারপর আমাদের যাত্রাপথে আমরা অনেকগুলি লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে এসেছি, যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল অসহযোগ আন্দোলনকে তীব্রতর করা ও গত আগস্টে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর থেকে অন্তর্ঘাত ক্রিয়াকলাপ শুরু করা। সেইজন্য ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস একটা অবিস্মরণীয় সময় রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, কেন না তখন থেকেই ভারতবাসীরা মানসিকভাবে তাদের সংগ্রামকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের বদলে প্রত্যক্ষ সংঘাতের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেছে। কেবলমাত্র আইন অমান্য আন্দোলনে সন্তুষ্ট না থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতীয় জনগণ এখন নীতিগত ভাবে অন্য পথের সন্ধানে প্রস্তুতি নিতে ইচ্ছুক।

সুতরাং আজ সময় এসেছে আমাদের আন্দোলনকে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাবার। ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাইরে সকল প্রতিষ্ঠানকে এখন এক নেতৃত্বের অধীনে শৃঙ্খলাবদ্ধ এক সামরিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে হবে। এবং যখন সময় আসবে ও যখন ডাক পড়বে তখন সেই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা। আমাদের সব নেতাদলকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করার জন্য আমি আর্জি হুকুমত-এ-আজ়াদ হিন্দ (স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার) গড়ে তোলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই আপৎকালীন সরকারের কাজ হবে ভারতীয় বিপ্লবকে সার্থক সমাপ্তির লক্ষ্যে নেতৃত্ব দেওয়া এবং সেই কাজে সফল হতে গেলে ভারতীয় জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে— ভারতের অভ্যন্তরে ও ভারতের বাইরে— যা হবে ১৮৮৩ সাল থেকে শুরু করা আমাদের সকল জাতীয় প্রচেষ্টার সার্থক পরিণতি। বিপ্লব যখন সফল হবে ও ভারতবর্ষ থেকে যখন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি উন্মূলিত হবে তখন আপৎকালীন সরকারেরও কাজ শেষ হবে। তখন তারা ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয় জনগণের ইচ্ছানুসারে গঠিত স্থায়ী সরকারের হাতে দেশ শাসনের দায়িত্বভার অর্পণ করবে।

শেষ সংগ্রামের জন্য আমাদের সকল প্রস্তুতি যখন সম্পূর্ণ হবে, কেবলমাত্র তখনই ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব হবে ত্রিপাক্ষিক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের সাধারণ শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে এক তালে একই সংগ্রামে সামিল হওয়া। এই সম্মিলিত সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের স্বদেশের মুক্তি অর্জনের যোগ্য হতে পারব। এই মহান ব্রতে আমাদের রক্তদানের মাধ্যমেই আমরা আমাদের স্বাধীনতার মূল্য দিতে পারব এবং একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় ঐক্যের সুদৃঢ় ভিত্তিস্থাপন সম্ভব হবে। এবং সর্বশেষে, আমাদের নিজস্ব প্রয়াস ও স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জন করা স্বাধীনতা আমাদের যে শক্তি

যোগাবে তার দ্বারাই আমরা চিরকালের জন্য আমাদের দেশকে স্বাধীন রাখতে পারব।

বন্ধুরা! সব শেষে আমি আবার আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার উপরে বিশ্বাস করে আপনারা যে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন, এবং যে অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার জন্য। যদিও আমরা জানি যে আমাদের চূড়ান্ত জয় অনিবার্য তবু আমি আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই যে আমরা কখনওই আমাদের শত্রুদের শক্তিকে অবহেলা করতে পারি না এবং এমনকী মাঝে মাঝে আমাদের হয়তো সাময়িক ভাবে পিছু হঠবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। অত্যন্ত কঠোর সংগ্রাম আমাদের সামনে— কারণ আমাদের শত্রু একাধারে শক্তিশালী, নীতিজ্ঞানশূন্য ও নির্মম। স্বাধীনতার দাবিতে এই শেষ লড়াইয়ে আপনাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বঞ্চনা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিরন্তর এগিয়ে চলা, এমনকী মৃত্যুরও সম্মুখীন হতে হবে। যখন আপনারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তখনই স্বাধীনতা আপনাদের করতলগত হবে। আমার একান্ত বিশ্বাস যে আপনারা তা পারবেন এবং তার ফলে আপনাদের এই দারিদ্র, দাসত্বের বন্ধনে বন্দি দেশে আপনারা প্রাচুর্য ও স্বাধীনতা আনতে সক্ষম হবেন। আমরা যখন দিল্লির লাল কেল্লার সামনে আমাদের যুদ্ধ জয়ের কুচকাওয়াজ করব, কেউ বলতে পারে না আমাদের মধ্যে কারা সেদিন সেখানে থাকবে, আমাদের মধ্যে কারা স্বাধীন ভারত দেখবার সৌভাগ্য নিয়ে বেঁচে থাকব। আমরা বাঁচি কিংবা মরি সেটা আজকের বিচার্য বিষয় নয়। একমাত্র যা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ এবং একমাত্র সত্য যা, তা হল ভারত একদিন স্বাধীন হবে।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! (বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!) আজ়াদ হিন্দ জিন্দাবাদ! (স্বাধীন ভারত দীর্ঘজীবী হোক!)

৮

দিল্লি চলো, দিল্লি চলো

[৫ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে সিঙ্গাপুরে আইএনএ-র সামরিক পর্যবেক্ষণে আইএনএ-র সর্বাধিনায়ক রূপে ভাষণ][১]

৫ জুলাই তারিখে সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল অফিস ভবনের বিপরীত দিকের ময়দানে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ব এশিয়ান ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের প্রেসিডেন্ট রূপে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অভিবাদন গ্রহণ করলেন। কুচকাওয়াজ শুরু হবার এক ঘণ্টা আগে থেকে সেনাবাহিনীর বিশেষ প্রতিনিধিরা তাঁদের যথানির্দিষ্ট স্থানগুলিতে আসনগ্রহণ করেছিলেন। আইএনএ-র একজন দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে, খাকি সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বোস যখন ঠিক সকাল ১০.৩০টায় প্যারেডে এসে পৌঁছলেন, তখন সেনাবাহিনী তাদের সমরাস্ত্র প্রদর্শন করল ও বিউগ্‌ল বেজে উঠল। প্রেসিডেন্ট তারপরে মঞ্চে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে সমবেত সেনাবাহিনীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন, এই সেনারা যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াইয়ের শপথ নিয়েছে।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির প্রধানদের অনুসরণ করে, তাঁর সর্বপ্রধান উপদেষ্টা শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বোসের সঙ্গে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বোস সেনাবাহিনীকে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। প্রেসিডেন্ট তারপরে মঞ্চে ফিরে গেলেন এবং সেনাদলের অফিসার ও সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে একটা উদ্দীপ্ত ভাষণ দিলেন। তাঁর বক্তৃতার মাঝে মাঝে বজ্রগর্জনের মতো শোনা গেল 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' এবং 'সুভাষচন্দ্র বোস কি জয়'।

প্রেসিডেন্ট বললেন:

ভারতীয় মুক্তি বাহিনীর সৈনিকেরা,

আজ আমার জীবনের সব থেকে গর্বের দিন। আজ, আমার ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন হয়ে আমাকে এক অনন্যসাধারণ অধিকার ও সম্মান দিয়েছে কারণ আমি সমগ্র বিশ্বের সামনে ঘোষণা করতে চলেছি যে ভারতের মুক্তি বাহিনী বা আর্মি অফ লিবারেশন গঠিত হল। এই সেনাবাহিনী এখন সামরিক সজ্জায় সজ্জিত হয়ে সিঙ্গাপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, একদিন যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা প্রাকার ছিল। এই সেনাবাহিনী শুধু যে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেবে তাই নয়; এরাই একদিন স্বাধীন ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনীও গড়ে তুলবে। প্রতিটি ভারতীয় অবশ্যই আজ এই সেনাবাহিনীর জন্য গর্ব অনুভব করবে— কারণ এই বাহিনী তাদের নিজস্ব— একান্তভাবেই ভারতীয় নেতৃত্বের

---

১. *Chalo Delhi*, pp. 135-138.

অধীনে এই বাহিনী গঠিত হয়েছে এবং যখন সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত আসবে, তখন ভারতীয় নেতৃত্বের অধীনে তারা হাতে অস্ত্র তুলে নেবে।

এমন অনেকেই আছেন যাঁরা একদিন ভেবেছিলেন যে ব্রটিশ সাম্রাজ্য, যেখানে সূর্য কোনও দিন অস্তগামী হয় না, সেই সাম্রাজ্যও চিরকালীন। আমি সেই ধরনের ভাবনাকে কখনও প্রশ্রয় দিইনি। ইতিহাস আমাকে শিখিয়েছে যে প্রত্যেক সাম্রাজ্যেরই একদিন পতন ও বিলোপ হবে, এটা অবশ্যম্ভাবী। উপরন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি, নগর ও দুর্গ যা একদিন দুর্ভেদ্য ছিল, কালক্রমে তা বিলুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এই সমাধিস্থলে দাঁড়িয়ে, এমনকী শিশুরাও উপলব্ধি করবে যে পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইতিমধ্যেই অতীতের ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে।

১৯৩৯ সালে ফ্রান্স যখন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাদের সমরাভিযান শুরু করল, তখন শুধুমাত্র একটা আওয়াজ কানে এসেছিল এবং তা এসেছিল জার্মান সেনাদের কণ্ঠ থেকে 'প্যারিস চলো, প্যারিস চলো'। যখন ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানের সাহসী সেনাদল তাদের অভিযান শুরু করল তখনও তাদের মুখ থেকে শুধুমাত্র একটা আওয়াজই শোনা গিয়েছিল, 'সিঙ্গাপুর চলো, সিঙ্গাপুর চলো'। কমরেডরা! আমার সৈনিকেরা! আসুন, আজ আমাদের রণহুঙ্কার হোক, 'দিল্লি চলো, দিল্লি চলো'। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মধ্যে কতজন এই মুক্তিযুদ্ধের শেষ দেখতে পাব তা আমার জানা নেই। কিন্তু আমার নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে তা হল— সব শেষে জয় আমাদের অবধারিত এবং আমাদের কাজ শেষ হবে সেইদিন যে দিন আমাদের বিজয়ী সেনাদল, যারা তখনও জীবিত থাকবে, তারা যখন পুরনো দিল্লির লাল কেল্লার সামনে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আরেকটা সমাধিস্থলে তাদের বিজয় কুচকাওয়াজ করতে পারবে।

আমার জনসেবায় নিয়োজিত জীবনে আমি সব সময় অনুভব করেছি যে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একেবারে প্রস্তুত, কিন্তু তার একটা অভাব আছে, তা হল স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবার উপযুক্ত সেনাদল। আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন যুদ্ধ করে স্বাধীনতা জিতে নিতে পেরেছিলেন কারণ তাঁর সেনাবাহিনী ছিল। গ্যারিবল্ডি ইতালিকে স্বাধীনতা দিতে পেরেছিলেন কারণ তাঁর পিছনে সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবীদের সমর্থন ছিল। আপনারা আজ বিশেষ সম্মানের অধিকারী কারণ আপনারাই প্রথম এগিয়ে এসে ভারতের জাতীয় সেনাদল গড়ে তুলেছেন। আপনাদের সেই কাজ আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের শেষ বাধাটুকুকে অপসারিত করে দিয়েছে। আজ আপনাদের আনন্দ ও গর্বের দিন কারণ আপনারাই হলেন— এই মহান কাজে অগ্রণী পথপ্রদর্শক।

আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে আপনাদের কাজ দুই পর্যায়ে বিভক্ত। অস্ত্রের ব্যবহারে ও রক্তের বিনিময়ে আপনাদের স্বাধীনতা জিতে নিতে হবে। এবং তার পরে ভারত যখন স্বাধীন হবে তখন আপনাদের দায়িত্ব হবে স্বাধীন ভারতের স্থায়ী সৈন্যদল গঠন করা, যে সৈন্যদল সর্বসময়ের জন্য ভারতের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখবে। ভারতবর্ষের জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে আমাদের এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে গড়ে তুলতে হবে যাতে আমাদের ইতিহাসে কোনওদিন আর সেই স্বাধীনতা হারাতে না হয়।

একজন সৈনিক হিসাবে— আনুগত্য, কর্তব্য ও ত্যাগ এই তিনটি আদর্শকে আপনারা সর্বসময় মনে রাখবেন। যে সেনানীদের দেশের প্রতি সর্বদা অবিচল আনুগত্য আছে, যারা সর্ব পরিস্থিতিতে তাদের কর্তব্যসাধন করে থাকে এবং যারা তাদের প্রাণ বিসর্জনে সদাপ্রস্তুত,

আপনারা জানবেন সেই সেনাদল অপরাজেয়। আপনারাও যদি অপরাজেয় হতে চান তা হলে এই তিনটি আদর্শ আপনাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে চিরদিনের মতো খোদাই করে নিন। একজন প্রকৃত সৈনিকের যুদ্ধকৌশল শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার শিক্ষাও নিতে হয়। আপনারা প্রত্যেকে অবশ্যই নিজেদের ও সহসৈনিকদের এই প্রশিক্ষণ দেবেন যে প্রতিটি সৈনিকের যেন অপরিসীম আত্মবিশ্বাস থাকে, শত্রুপক্ষের থেকে আপনারা যে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট সেই বিষয়ে আপনারা সচেতন থাকবেন, মৃত্যুভয় যেন আপনাদের অবদমিত না করতে পারে এবং যদি প্রয়োজন হয় তা হলে যে কোনও সংকটজনক পরিস্থিতিতে নিজের বল ও বুদ্ধিতে কাজ করবার মতো উদ্যম যেন আপনাদের থাকে। বর্তমান যুদ্ধ চলাকালীন, আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন যে নির্ভীক সাহস ও অক্লান্ত কর্মশক্তি, বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণের সঙ্গে মিলে কী আশ্চর্য ফলাফল করায়ত্ত করতে পারে। এই উদাহরণ থেকে যথাসম্ভব শিক্ষালাভের চেষ্টা করুন এবং আমাদের মাতৃভূমির জন্য এক অতি উচ্চ শ্রেণীর সেনাবাহিনী গড়ে তুলুন।

আপনাদের মধ্যে অফিসার যাঁরা, তাঁদের দায়িত্ব যে আরও গুরুভার সে কথা আমি তাঁদের মনে করিয়ে দেব। পৃথিবীর যে কোনও সেনাবাহিনীতেই অফিসারদের দায়িত্ব বেশি, আপনাদের ক্ষেত্রে সেই দায়িত্ব আরও অনেক বেশি। আমাদের দাসত্বের ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে মুকডেন, পোর্ট আর্থার বা সেদানের মতো কোনও অভিজ্ঞতা আমাদের নেই যা থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হতে পারি। ব্রিটিশরা আমাদের যা শিখিয়েছে তার কিছু কিছু আমাদের ভুলে যেতে হবে আর যা তারা আমাদের শেখায়নি তা আমাদের শিখতে হবে। তবে আমি জানি যে আপনারা পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন এবং স্বদেশবাসী আপনাদের সাহসী কাঁধে যে গুরুভার চাপিয়ে দিয়েছে, আপনারা তা বহন করবেন ও আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন। মনে রাখবেন অফিসারেরাই সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন ও তাঁদের হাতেই থাকে বাহিনীর ভালমন্দের ভার। আরও মনে রাখবেন, যে ব্রিটিশ বাহিনীকে যে এতগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কারণ অপদার্থ অফিসারেরা। এবং আরও মনে রাখবেন যে একদিন আপনাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হবেন স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীর ভবিষ্যৎ সর্বাধিনায়ক।

আপনাদের সকলকে আমি আরও বলব যে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে ও আপনাদের সাফল্যের ভিত্তিতেই ভবিষ্যতে আমাদের সেনাবাহিনীর একটা জাতীয় পরম্পরা গড়ে উঠবে। যে সেনাবাহিনীর সাহস, নির্ভীকতা ও অপরাজেয় মনোভাবের ঐতিহ্য নেই সেই সেনাবাহিনী কখনও কোনও শক্তিশালী শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে না।

কমরেডরা! আপনারা স্বেচ্ছায় যে গুরুভার কাজ বেছে নিয়েছেন তার থেকে মহান কোনও কাজ মানুষ চিন্তাতেও আনতে পারে না। সেই কাজ সার্থকভাবে করবার জন্য কোনও ত্যাগই যথেষ্ট নয়— এমনকী নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়াও নয়। আপনাদের হাতেই আজ ভারতবর্ষের জাতীয় সম্মান রক্ষার ভার তুলে দেওয়া হল এবং আপনাদের মধ্য দিয়েই ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হবে। সুতরাং আপনারা এমনভাবে আচরণ করবেন যাতে দেশবাসীর আশীর্বাদ আপনাদের উপর থাকে এবং ভবিষ্যতের মানুষ যাতে আপনাদের কথা ভেবে গর্ব অনুভব করতে পারে।

আমি আগেই বলেছি যে আজ আমার জীবনের সব থেকে গৌরবের দিন। যারা দাসত্বের

বন্ধনে বন্দি, তাদের জীবনে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য গঠিত সেনাদলের প্রথম সৈনিক হবার থেকে বড় আর কোনও গৌরব নেই, উচ্চতর আর কোনও সম্মান নেই। কিন্তু এই সম্মানের সঙ্গে এসেছে সমান মাপের দায়িত্ব, এবং আমি গভীরভাবে সেই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে আমি আপনাদের পাশে থাকব রাতের অন্ধকারে, দিনের আলোয়, দুঃখে ও আনন্দে, যন্ত্রণায় ও জয়ের দিনে। বর্তমানে আপনাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বঞ্চনার, ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে এগিয়ে চলা ও মৃত্যু ছাড়া আর কিছু দেবার সাধ্য নেই। কিন্তু আপনারা যদি আমাকে অনুসরণ করেন জীবনে ও মরণে— আমার বিশ্বাস যা আপনারা পারবেন— তা হলে আমি আপনাদের জয় ও স্বাধীনতার পথে এগিয়ে দিতে পারব। আমাদের মধ্যে কে বেঁচে থাকবেন ভারতের স্বাধীনতার দিনে, তা নিয়ে আজ আমরা চিন্তা করব না। ভারত যে একদিন স্বাধীন হবে এটাই যথেষ্ট এবং আমাদের যা আছে তার সর্বস্ব দিয়ে আমরা দেশকে স্বাধীন করব। ঈশ্বর আমাদের সেনাবাহিনীকে আশীর্বাদ করবেন ও আগামী যুদ্ধে আমাদের জয়যুক্ত করবেন এই আমাদের প্রার্থনা!

৯

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই

[৬ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজে
প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজোকে স্বাগত সম্ভাষণ][১]

পরের দিন, মঙ্গলবার, ৬ জুলাই ১৯৪৩ সাল, প্রখর সূর্যালোকে এবং সিঙ্গাপুরের পুরনো যুদ্ধক্ষেত্রে, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতিতে নিপ্পনের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় মুক্তি বাহিনী বা আর্মি অফ লিবারেশনের কুচকাওয়াজ দেখলেন।

প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল অফিসের ছাদে দাঁড়িয়ে ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্ঘবদ্ধ কুচকাওয়াজ পর্যবেক্ষণ করলেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অফিসাররা, নিপ্পন প্রধানমন্ত্রী যাঁদের জরিপ করছিলেন, তাঁরা সকলেই জেনারেল তোজোর মাধ্যমে নিপ্পন তাঁদের প্রতি এই বিশেষ ও বিরল সম্মান প্রদর্শন করায় বেশ সচেতন ছিলেন। অবশ্যই নিপ্পনের আন্তরিকতা, এবং মাতৃভূমির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতীয়দের সাহায্য করবার জন্য তাদের অবিচল সংকল্পের আরও প্রমাণ পাওয়াতে সেই অনুভূতি গভীরতর হয়েছিল।

ময়দানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির ঘন সন্নিবদ্ধ সেনাদের কাছে, নিপ্পনের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো ও স্বাধীন ভারতবর্ষের অনভিষিক্ত সম্রাট শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বোস পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন, এটা ছিল একটা বিরল অভিজ্ঞতা এবং সেটা চমৎকার একটা উত্তেজক পানীয়ের মতো ইতিমধ্যেই তুঙ্গে ওঠা মনোবলকে যেন আরও একটু তুলে দিচ্ছিল।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সেনাদলের পক্ষ থেকে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বোস নিপ্পনের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন নীচের কথাগুলি বলে:

"মহানুভব, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির পক্ষ থেকে আজ আপনাকে আন্তরিক স্বাগত জানাতে পেরে আমি বিশেষ আনন্দিত। আমাদের সেনাবাহিনী পর্যবেক্ষণের জন্য আপনার মূল্যবান সময়ের অনেকটা আজ এখানে আপনি ব্যয় করলেন, এর জন্য আপনাকে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকের এই দিনটি স্বাধীন ভারতে নবগঠিত সেনাবাহিনীর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। গতকাল ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ সম্মেলনকে প্রেরণাদায়ক বার্তা পাঠাবার ঠিক পরে আজই আবার সেনাদের মাঝখানে আপনার উপস্থিতি আমাদের বিপ্লবী সংগ্রামীদের মধ্যে এক বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে।

আপনার সম্মুখে উপস্থিত সেনাবাহিনীর জানা আছে যে ভারতের মুক্তির জন্য তাদের

---

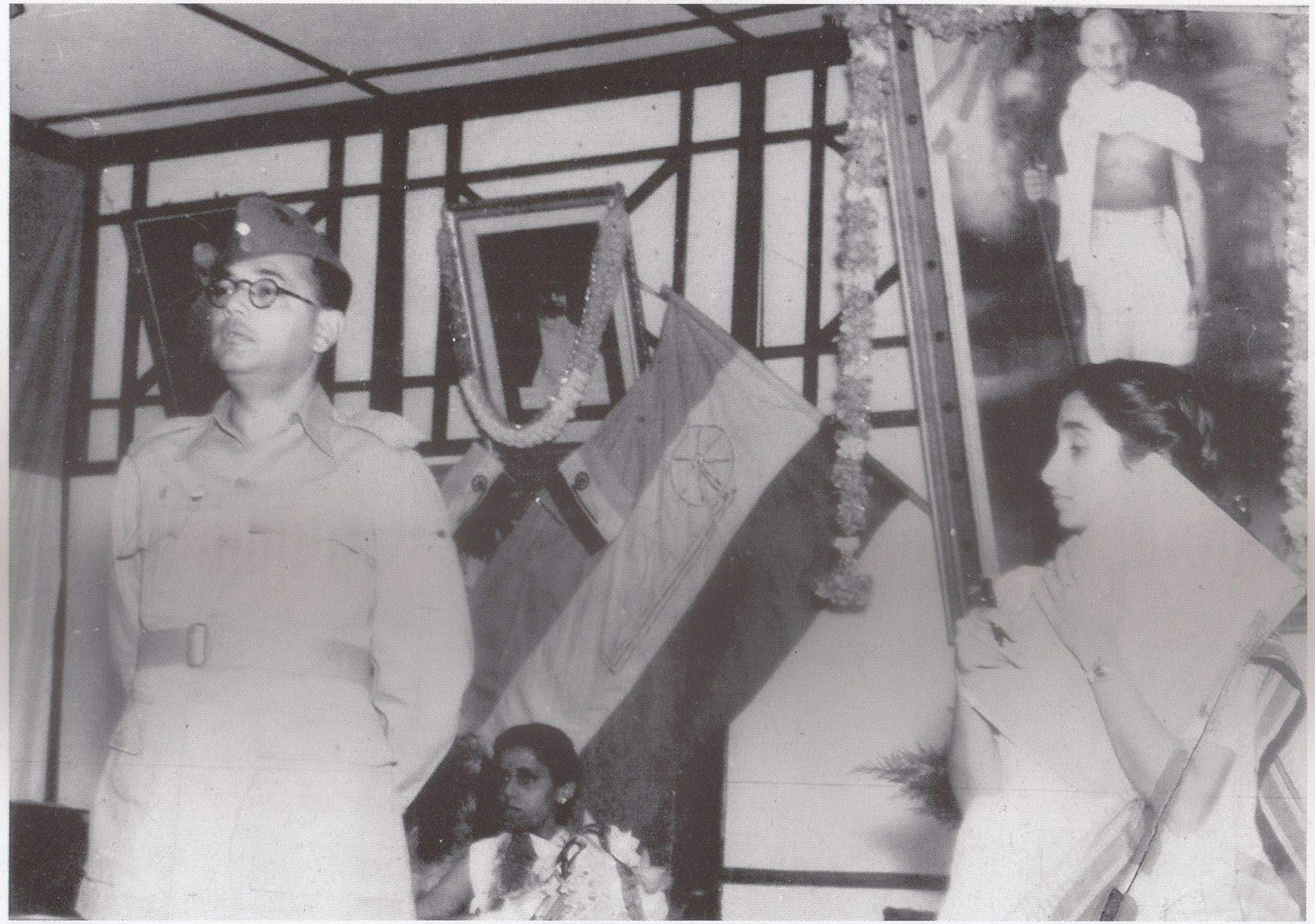
১. *Chalo Delhi*, pp. 138-139.

লড়তে হবে। যুদ্ধে জয়ী স্বাধীনতা অর্জন করার আগে যে তাদের অনেক বাধা অতিক্রম করতে হবে সেই বিষয়েও তারা সচেতন। কিন্তু ভারতের মুক্তির জন্য যে কোনও ত্যাগস্বীকারে এই সেনাবাহিনী সংকল্পবদ্ধ। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা সকলেই বিপুল উৎসাহের সঙ্গে এই সেনাবাহিনীকে তাঁদের সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছেন।

মহানুভব, সব শেষে আপনাকে আমি আমাদের অবিচল সংকল্পের আশ্বাস দিতে চাই, আপনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা লড়াই করব, সুখে ও দুঃখে, দিনের আলোয় ও রাতের অন্ধকারে, যতদিন না সম্পূর্ণ জয় আমাদের করায়ত্ত হয় এবং যতদিন না ভারতবর্ষ তার হারানো স্বাধীনতা আবার ফিরে পায়।"



১৯৪৩-এ সিঙ্গাপুর থেকে ভারতের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন।



১৯৪৩-এ সিঙ্গাপুরে মহিলাদের একটি সভায় বক্তৃতারত।



"সিঙ্গি সভা"।



সাময়িক আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণা, ২১ অক্টোবর ১৯৪৩।



সিঙ্গাপুরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি পরিদর্শন, ১৯৪৩।



এ সি চ্যাটার্জি, মহাম্মদ জামন কিয়ানি এবং হবিবুর রহমানের সঙ্গে।



একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠানে হালকা মেজাজে।



গ্রেটার ইস্ট-এশিয়া কনফারেন্সে ভাষণদানরত, টোকিয়ো নভেম্বর ১৯৪৩।



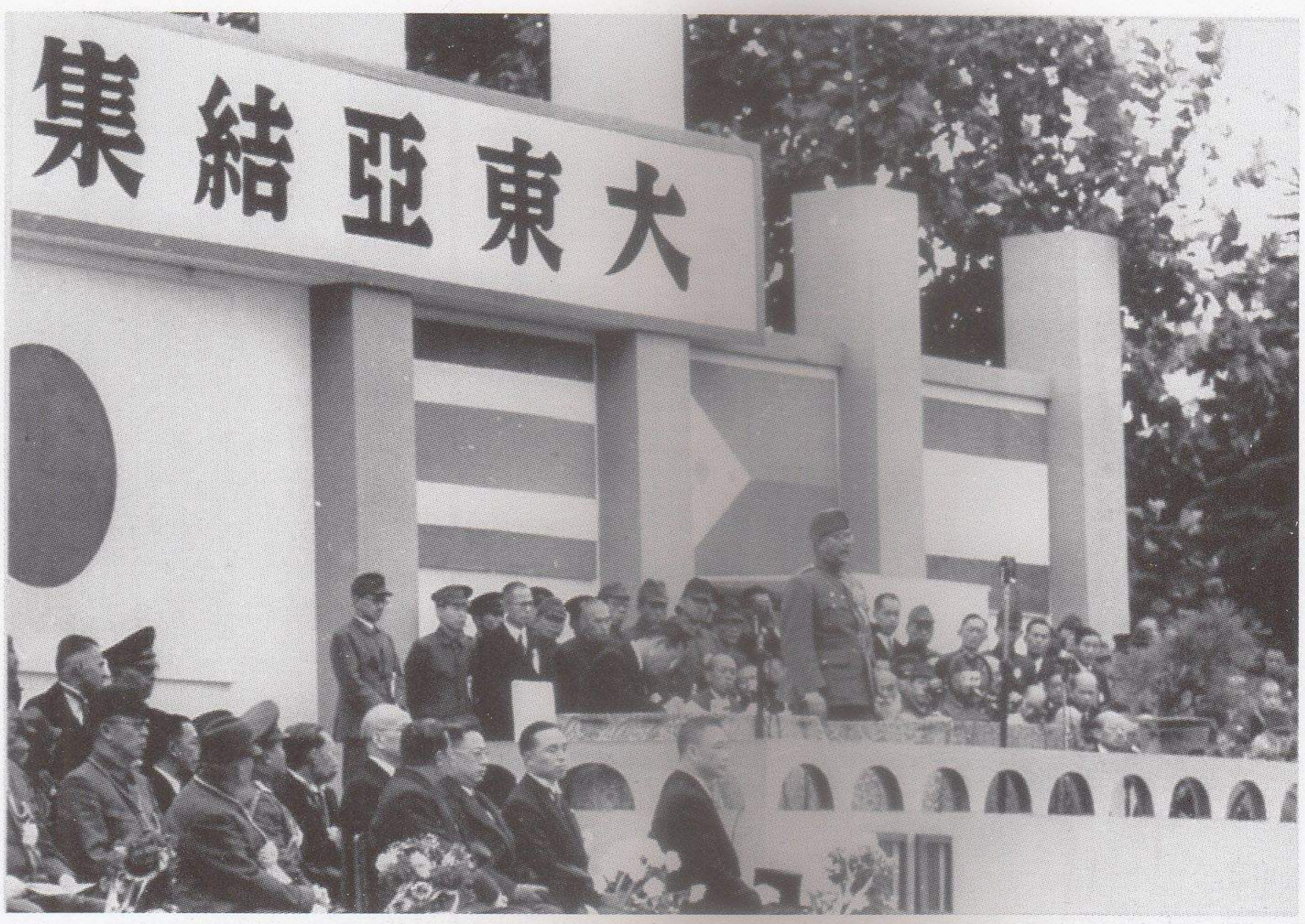
একটি প্রতিকৃতি, টোকিয়ো নভেম্বর ১৯৪৩।



‘নিপ্পন টাইমস’ পাঠরত, টোকিয়ো ১৯৪৩।



টোকিয়োতে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলছেন, নভেম্বর ১৯৪৩।



হিবিয়া পার্ক, টোকিয়োতে এক বিশাল জনতার উদ্দেশে ভাষণরত, নভেম্বর ১৯৪৩।



টোকিয়োর হিবিয়া পার্ক-এর জনতা, নভেম্বর ১৯৪৩।



জাপান-সম্রাটের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন, টোকিয়ো নভেম্বর ১৯৪৩।



নেতাজি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির উদ্দেশে বক্তৃতারত।



আন্দামানের সেলুলার জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন, ডিসেম্বর ১৯৪৩।



রেঙ্গুনে আইএনএ বাহিনীর ইন্দো-বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করার ঘোষণা, মার্চ ১৯৪৪।



যুদ্ধক্ষেত্রে।



ব্যাংককে স্বাক্ষরিত শেষ ফোটো, ১৭ আগস্ট ১৯৪৫।



শেষ অভিবাদন, সাইগন ১৭ আগস্ট ১৯৪৫।

১০

কেন আমি ঘর ও দেশ ছেড়েছি

[৯ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে সিঙ্গাপুরে জনসমাবেশে ভাষণ][১]

বোনেরা ও ভাইয়েরা! আপনারা আজ যে অত্যন্ত উষ্ণ ও উদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন সেইজন্য প্রথমেই আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি বিশেষভাবে আমার বোনেদের ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ তাঁরা যে বিপুল সংখ্যায় সাহস ভরে এগিয়ে এসেছেন তার মধ্য দিয়ে তাঁদের স্বাদেশিকতার এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। আজ আমি আমার চোখের সামনে যা দেখছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আগামী সংগ্রামে সায়োনান ও মালয়ের ভারতবাসীদের একটা অগ্রণী ভূমিকা থাকবে। যা একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিরাপত্তার প্রাচীর ছিল এখন তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সুরক্ষা দেবে।

আজ আপনাদের কাছে আমি অকপটে জানাতে চাই যে কী কারণে আমি আমার ঘর ছেড়ে, আমার দেশ ছেড়ে এই যাত্রা শুরু করেছিলাম, যে যাত্রায় পদে পদে আমাকে বহুবিধ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আপনারা জানেন ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পর থেকে আমি সক্রিয়ভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। গত দুই দশকের সব আইন অমান্য আন্দোলনে আমি যোগ দিয়েছি। উপরন্তু গোপন বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত— অহিংসাত্মক বা হিংসাত্মক সে যাই হোক না কেন— এই সন্দেহে আমাকে বিনা বিচারে কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছে বারংবার। আমি এতটুকু অতিশয়োক্তি না করেই বলতে পারি যে আমি যে বহু ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি, ভারতের অন্য কোনও জাতীয়তাবাদী নেতা, তাঁর সেই অভিজ্ঞতা আছে বলে দাবি করতে পারবেন না। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রাণপণ চেষ্টা করলেও আমরা ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করতে পারব না। যদি ভারতের ভিতর থেকে সংগ্রামই আমাদের জনগণের মুক্তি অর্জন করবার জন্য যথেষ্ট হত তাহলে আমি এই বিপদের অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেবার মতো নির্বোধ আচরণ করতাম না।

সুতরাং সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার স্বদেশত্যাগের কারণই হল যাতে দেশের ভিতরকার সংগ্রামে দেশের বাহির থেকেও রসদ যোগানো যায়। দেশের বাহির থেকে সাহায্য না পেলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। অপরপক্ষে, দেশের ভিতরে জাতীয় সংগ্রামের জন্য বাহিরের যে সাহায্য একান্ত জরুরি তার পরিমাণ কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে খুবই সামান্য। তার কারণ হল অক্ষশক্তির হাতে পরাজয়ের ফলে ব্রিটিশদের শক্তি ও গৌরব যে ভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তা আমাদের কাজকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে দিয়েছে।

দেশে আমাদের জনগণের যে সাহায্য প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে, তা দ্বিবিধ—

---

১. *On To Delhi*, pp. 31-60, মূল হিন্দি থেকে অনূদিত।

অনুপ্রেরণা ও সামরিক অস্ত্রসম্ভার। প্রথমত, অনুপ্রেরণার দ্বারা তাদের চিন্তার জগতে এই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে একদিন জয় তাদের করায়ত্ত হবে। দ্বিতীয়ত, দেশের বাহির থেকে তাদের সামরিক সাহায্য দিতে হবে। প্রথম কাজের জন্য, আমাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে যুদ্ধের সম্ভাব্য ফলাফল কী হতে পারে। দ্বিতীয় কাজের জন্য আমাদের দেখতে হবে যে প্রবাসী ভারতীয়েরা দেশের ভারতবাসীদের কী ভাবে সাহায্য করতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রু যারা তাদের কাছ থেকেও কোনও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে কিনা। বন্ধুরা! আমি এখন আপনাদের জানাতে পারি যে আমরা সেই অবস্থায় পৌঁছাতে পেরেছি যখন এই দুই ধরনের সাহায্যই পাওয়া সম্ভব। বিদেশে থাকাকালীন আমি নিজের চোখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছি এবং যুদ্ধরত সব দেশগুলির পারস্পরিক শক্তি ও অবস্থানও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং তার পরে আমি যখন এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তখন সেই সিদ্ধান্তের কথা আমি ভারতের জনগণকে জানিয়েছি। আমি আনন্দের সঙ্গে তখন উপলব্ধি করেছি যে ভারতবাসীরা পৃথিবীর যে যেখানে আছেন, তাঁরাও অতন্দ্র ও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন যে কখন তাঁরা তাঁদের জাতীয় সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। আমি অক্ষশক্তি— বিশেষ করে জাপানের— কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে তারাও ভারতের স্বাধীনতার জন্য একই ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছে এবং তাদের ক্ষমতায় যতটা সম্ভব সর্বপ্রকারে সাহায্য করতে তারা প্রস্তুত, যদি ভারতবাসীরা সেই সাহায্য চান।

মনোভাবের কথা আলোচনা করতে হলে— যদি কারুর মনে সামান্যতম সংশয় বা সন্দেহ থাকে, তা হলে আমি তাঁদের প্রভূত প্রমাণ সহযোগে এখনই এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আমার স্বদেশবাসীকে হিসাবের মধ্যে না ধরলে, এই মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বে তারাই আমাদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। উপরন্তু আমি আপনাদের আমার উপরে আস্থা রাখতে অনুরোধ করব। স্বদেশের স্বার্থবিরোধী কোনও কাজ আমি করতে পারি, আমার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনবার স্পর্ধা আমার শত্রুদেরও হবে না। এবং ব্রিটিশ সরকার যদি আমার মনোবল ভেঙে দিতে না পেরে থাকে, তারা যদি আমাকে প্রতারণা বা প্রলুব্ধ করতে না পেরে থাকে তা হলে পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যারা সেটা পারবে। সুতরাং আমি যখন বলছি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রামে আপনারা যদি বহির্বিশ্বের থেকে কোনও সাহায্য চান তা হলে অক্ষশক্তি আপনাদের সেই সাহায্য দেবে তখন আপনারা আমার উপরে বিশ্বাস রাখুন। তবে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন আপনাদের হবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত আপনারাই নেবেন— এবং এই কথা অনস্বীকার্য যে কোনও সাহায্য না নিয়েই যদি আপনারা কার্যোদ্ধার করতে পারেন তা হলে সেটাই ভারতবর্ষের পক্ষে সর্বোত্তম পন্থা। কিন্তু একই সঙ্গে আমি এও বলব, যদি পরম পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সরকার বিশ্বের সর্বত্র সাহায্যের ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরতে পারে— এমনকী তাদের পদানত ও নিতান্ত দরিদ্র ভারতীয় জনগণের কাছ থেকেও— তখন বাহির থেকে সাহায্য নেওয়া আমাদের পক্ষেও কোনও অন্যায় অপরাধ হবে না, যদি আমাদের বাধ্য হয়েই সেই সাহায্য নিতে হয়।

আজ সেই সময় এসেছে যখন আমি প্রাণ খুলে আমাদের শত্রুপক্ষসহ সকল বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করতে পারি যে আমরা কীভাবে আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করবার প্রস্তাবনা করছি। ভারতবর্ষের বাহিরের ভারতীয়েরা— বিশেষত পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা— এমন

একটা সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলবে যে বাহিনী ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করবার মতো শক্তিশালী হবে। যেদিন আমরা সেই বাহিনী গড়ে তুলতে পারব সেদিন বিপ্লবের বীজ অঙ্কুরিত হবে, শুধুমাত্র দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে নয়, ভারতীয় সেনাদলের মধ্যেও, যারা এই মুহূর্তে ব্রিটিশ পতাকার তলায় যুদ্ধ করছে। ব্রিটিশ সরকার যখন এইভাবে দুই দিক থেকে— ভারতের ভিতর থেকে ও বাহির থেকে— আক্রান্ত হবে, তখন তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী এবং ভারতীয় জনগণ তখন তাদের স্বাধীনতা ফিরে পাবে।

অতএব আমার পরিকল্পনা হল, ভারতবর্ষের প্রতি অক্ষশক্তির যথার্থ মনোভাব কী তা নিয়ে আমাদের অহেতুক চিন্তার একেবারেই কোনও প্রয়োজন নেই। ভারতের ভিতরে ও ভারতের বাহিরে ভারতবাসীদের যা কর্তব্য শুধুমাত্র সেইটুকু করতে যদি তারা সক্ষম হয় তা হলে জনসাধারণই ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিতাড়িত করতে পারবে এবং ৩৮.৮ কোটি স্বদেশবাসীকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারবে। কিছু সন্দিহান ব্যক্তি হয়তো বলবেন ৩৮.৮ কোটি ভারতবাসী যদি দেশে থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে নির্মূল করতে না পারে তা হলে ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়েরা কীভাবে আশা করে যে সেই দুরূহ কাজ তাদের পক্ষে করা সম্ভব হবে? কিন্তু বন্ধুরা, আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস দেখুন। ৩০ লক্ষ আইরিশ যারা ব্রিটিশ ডমিনেশনের অধীনে ছিল, যা এক ধরনের মার্শাল আইন বলতে পারেন, তারা যদি ১৯২১ সালে পাঁচ হাজার সশস্ত্র শিন ফেইন স্বেচ্ছাসেবীর সহায়তায় ব্রিটিশ সরকারকে পর্যুদস্ত করতে পেরে থাকে তা হলে কেন ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়, যাদের পিছনে স্বদেশের শক্তিশালী আন্দোলনের সমর্থন রয়েছে এবং প্রয়োজন হলে শক্তিশালী জাপানও যাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে, তারা কেন ভারত থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করতে পারবে না?

আমাকে যে কথা অবশ্যই বলতে হবে তা হল এই কাজ সম্পন্ন করতে হলে ভারতীয়দের এবং বিশেষভাবে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের আত্মনিয়োগ করতে হবে পূর্ণতম প্রচেষ্টাসহ। তা কার্যকরী করতে হলে আমার প্রস্তাব হল স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার (আর্জি হুকুমত-এ আজ়াদ হিন্দ) গঠন করা। সেই সরকারের কাজ হবে ভারতীয় জনসাধারণের কাছ থেকে যুদ্ধের জন্য যাবতীয় রসদ সংগ্রহ করা ও ভারতে ব্রিটিশ সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া। এই অভিযান সফল হলে তখন আপৎকালীন সরকার ভারতীয় জনগণের ইচ্ছানুসারে গঠিত স্থায়ী সরকারের হাতে দেশ শাসনের দায়িত্বভার অর্পণ করবে।

বন্ধুরা! আপনারা এখন তা হলে উপলব্ধি করতে পারছেন যে এখন সেই সময় এসেছে যখন পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ৩০ লক্ষ ভারতীয়কে তাঁদের যাবতীয় রসদ— ধনবল ও জনবলসহ— সংগ্রহের কাজে নামতে হবে। আমি চাই সর্বাত্মক প্রস্তুতি এবং তার থেকে এক চুল কম হলেও চলবে না— কারণ আমাদের বারে বারেই বলা হয়েছে যে এ হল সর্বাত্মক সংগ্রাম, এমনকী আমাদের শত্রুরা সেই একই কথা বলেছে। আপনারা আজ আপনাদের চোখের সামনে যা দেখছেন তা হল ভারতীয় মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ, আজ়াদ হিন্দ ফৌজ বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। সেদিন তারা টাউন হলের সামনে তাদের আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ করেছে যার পরে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যতদিন না তারা প্রাচীন দিল্লি নগরীর লালকেল্লার সামনে তাদের যুদ্ধজয়ের কুচকাওয়াজ করতে না পারছে ততদিন তাদের বিশ্রাম নেই। তাদের স্লোগান হল "দিল্লি চলো- দিল্লি চলো!" বন্ধুরা! আসুন, পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের স্লোগান হোক— "সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতি!" এই সর্বাত্মক প্রস্তুতিতে আমি আশা করব অন্ততপক্ষে ৩ লক্ষ সৈন্যের এক বাহিনী গঠিত হবে ও ৩ কোটি ডলার সংগৃহীত হবে।

আমি আরও যা চাই তা হল ভারতীয় মহিলাদের "মৃত্যুঞ্জয়ী বাহিনী", সাহসী ঝাঁসির রানির অনুসরণে যিনি ১৫৫৭ সালে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে খোলা তলোয়ার হাতে যুদ্ধে নেমেছিলেন।

বন্ধুরা! আমরা ইউরোপীয় যুদ্ধে একটা দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের কথা বহুবার বহুভাবে শুনে আসছি। কিন্তু আমার দেশে আমার দেশবাসীর এখন বড় দুঃসময়, এবং তারা এখন একটা দ্বিতীয় রণক্ষেত্র দাবি করছে। আমার অনুরোধ মতো পূর্ব এশিয়ায় আপনারা সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিন এবং আমি আপনাদের দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি— ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রকৃত দ্বিতীয় রণক্ষেত্র।

১১

একদিনে যে সাম্রাজ্যের উত্থান হয়েছিল এক রাতেই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে

[১২ জুলাই ১৯৪৩ তারিখে আইআইএল-এর মহিলা বিভাগের
সিঙ্গাপুর শাখায় ভারতীয় মহিলাদের সমাবেশে ভাষণ][১]

আমার বোনেরা! আজ আপনারা আমাকে যে বিপুল অভ্যর্থনা জানিয়েছেন সেইজন্য প্রথমেই আমি আপনাদের আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। আমি বিশেষভাবে বিপুল অভ্যর্থনা কথাটা ব্যবহার করছি কারণ আপনারা আজ আমাকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছেন তার থেকে উষ্ণ ও আন্তরিক অভ্যর্থনা আমার কল্পনার অতীত। সেই সঙ্গে এর আগের দিন পেড্যাঙয়ে মিউনিসিপ্যাল অফিসের সামনে আমাদের জমায়েতে আপনারা যে আন্তরিক উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সেই জন্যও আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আপনারা সেদিন যে সাহসিকতার সঙ্গে বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়া অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাতে শুধু আমি একাই নই, আমার সঙ্গে অন্য বন্ধু ও অতিথি যাঁরা সেদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সকলেই অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন। আমি জানি আপনাদের অনেকেই সেদিন আপনাদের শিশু সন্তানকে সঙ্গে এনেছিলেন। আপনাদের সাহসী মানসিকতা ও প্রবল উৎসাহ আমাদের সকলের উপরে গভীর ছাপ ফেলেছিল। আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে এমন উদ্দীপনাময় সূচনার পরে প্রতিদিনই আপনাদের কাজ এগোতে থাকবে দ্রুত গতিতে।

আমার মতো আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে আমাদের ঘরের মহিলারা কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বিশেষত গত বাইশ বছরের ইতিহাস তাই বলে। ভারতবর্ষের নবজাগরণের সময়, একেবারে প্রথম থেকেই আমাদের ঘরের মেয়েরা জনজীবনের প্রতিটি স্তরে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ১৯২১ সাল থেকে তাদের অংশগ্রহণের আরও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পুনর্জন্ম ঘটল। শুধুমাত্র কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ বা আইনঅমান্য আন্দোলনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নয়, সেই সঙ্গে গোপন বিপ্লবী আন্দোলনেও আমাদের বোনেরা মহান ভূমিকা নিলেন।

বাস্তবিক, আমি যদি বলি যে জনজীবনের বিভিন্ন স্তরে এমন কোনও কাজ ছিল না যা ভারতীয় মহিলারা করেননি, বা আমাদের জাতীয় আন্দোলনের এমন কোনও ক্ষেত্র ছিল না যেখানে তাঁরা লক্ষণীয় ভূমিকা নেননি, তাহলে সেটা অতিশয়োক্তি হবে না। তার থেকেই যা আরও বেশি উল্লেখযোগ্য, তা হল কয়েক দশকে আমাদের জাতীয় সংগ্রামে

---

১. *On To Delhi*, pp. 44-50.

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা সমান ভাবে আনন্দ ও সাহসের সঙ্গে যে কোনও কষ্ট স্বীকার করেছেন। কখনও তাঁরা কাজের সূত্রে যথেষ্ট খাদ্য ও পানীয় ছাড়াই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেছেন, এক সভা থেকে আরেক সভায় বক্তৃতা করেছেন, এক দরজা থেকে অন্য দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছেন স্বাধীনতা দাবির মন্ত্র নিয়ে, আবার কখনও বা তাঁরা পথে নেমেছেন ব্রিটিশ পুলিশের অমানুষিক লাঠির আঘাত উপেক্ষা করে, সরকারি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে মিছিলের নেতৃত্ব দেবার জন্য বা নির্বাচনী প্রচারের জন্য, আবার কখনও বা সাহসিকতার সঙ্গে কারাবরণ করেছেন, সব রকমের অপমান সহ্য করেছেন, কোনও ক্ষেত্রেই আমাদের মহিলারা পিছিয়ে থাকেননি। এবং সর্বশেষে ও সর্বতোভাবেই যা উল্লেখযোগ্য তা হল আমাদের বোনেরা, আমাদের সাহসী বোনেরা গোপন বিপ্লবী কার্যকলাপেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন ও তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে প্রয়োজন হলে তাঁরা তাঁদের ভাইদের মতো নির্ভুল লক্ষ্যে গুলিও করতে জানেন।

আজ যদি আমি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপনাদের যে কোনও কষ্ট স্বীকার করবার ও সংগ্রামে অংশগ্রহণের ক্ষমতার প্রতি আমার পরিপূর্ণ আস্থার কথা বলি, তা হলে জানবেন যে সেটা শুধুমাত্র আপনাদের উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন প্রশংসা নয়। সেটা হল আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। আমি জানি আমাদের মহিলারা কি ধরনের ক্ষমতা রাখেন, এবং সেই কারণেই আমি বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি না করেই বলতে পারি যে এমন কোনও কাজ নেই, যা তাঁরা করতে পিছিয়ে যাবেন, এমন কোনও ত্যাগ নেই যা স্বীকার করতে তাঁরা অপারগ, এবং এমন কোনও কষ্ট নেই যা আমার বোনেরা সহ্য করতে পারবেন না। আজ সেইদিন এসেছে যখন মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের শেষ লড়াই লড়তে হবে। যে কোনও জাতির জীবনে এই রকম সুযোগ কদাচিৎ আসে। আমাদের জীবদ্দশায় এই সুযোগ যে আবার আসবে না তা আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, এবং হয়তো পরবর্তী একশো বছরেও আবার সেই সুযোগ আমরা পাব না। আমাকে যে কথা বলতেই হবে তা হল ভাগ্যের অযাচিত আনুকূল্যে এই সুযোগ আজ আমাদের সামনে এসেছে এবং, আমরা যদি দুই হাতে এই সুযোগকে আঁকড়ে ধরি ও যদি আমরা সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকি তা হলেই আমাদের জাতীয় মুক্তিসাধন সম্ভব।

আমি জানি আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা একদিন ভেবেছিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চিরকালীন, এমন অনেকে আছেন যাঁরা একদিন ভেবেছিলেন যে এটা অবিশ্বাস্য যে এমন একদিন আসতে পারে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব থাকবে না, কিন্তু ইতিহাস অন্য কথা বলে। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে প্রত্যেক সাম্রাজ্যেরই যেমন একদিন উত্থান হয় তেমনই একদিন তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। আজ সেই দিন এসেছে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। আমার বোনেরা! আপনাদের মনে থাকতে পারে যে সেদিন সন্ধ্যাবেলা পেড্যাঙে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে আমরা যারা সিঙ্গাপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের অন্তত নিশ্চিতভাবে বলতে পারা উচিত, যে পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইতিমধ্যেই অতীতের ইতিহাসে পর্যবসিত হয়েছে এবং সেই নিশ্চিত বিশ্বাস আমাদের আছে। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি কীভাবে পৃথিবীর এই এলাকা থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে, এবং আমরা এও দেখব কীভাবে পৃথিবীর অন্য এলাকা থেকে— ভারতবর্ষ থেকেও এই সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমার মনে আছে বহুদিন আগে মেরিডিথ কনরেড্ নামে এক ইংরেজের লেখা একটি বই আমি

পড়েছিলাম। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে একবার যদি ভারতবাসীরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে তখন ইংরেজদের পক্ষে ভারতবর্ষকে পদানত করে রাখা অসম্ভব হবে। এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছিলেন যে এই সাম্রাজ্য, একদিনে যার উত্থান হয়েছিল, এক রাতেই তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অল্প কিছুদিন আগে আমার বেতার ভাষণে আমি বলেছিলাম যে সিঙ্গাপুরকে গড়ে তুলতে দীর্ঘ বিশ বছর লেগেছিল এবং মাত্র সাত দিনেই সিঙ্গাপুর থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করা সম্ভব হয়েছে। অবশ্যই আমরা আশা করছি না যে সাত দিনে আমরা ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে পারব কিন্তু এখন যেহেতু শেষ লড়াই শুরু হয়েছে আমরা যদি অঙ্ক কষি তা হলে নিশ্চয়ই আমরা বলতে পারব কতদিনে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করা সম্ভব হবে।

আমার বোনেরা! আমি আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন যে আমাদের মুক্তির জন্য চূড়ান্ত লড়াইয়ের সময় এখন হয়েছে। আমি আশা করি আপনারা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন যে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়ই হবে এই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল, এবং কেবলমাত্র ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে পারলে তবেই ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা লাভের আশা করতে পারবে। সেই জন্য আমি সব সময়েই বলেছি যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধে অক্ষশক্তির জয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আজ ভারত ও অক্ষশক্তিগোষ্ঠী, এই দুই পক্ষ একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে, সুতরাং আমাদের লক্ষ্য এক। এই এক শত্রুর বিরুদ্ধেই আমাদের যুগ্ম সংগ্রামে রত হতে হবে, সে সংগ্রামে আমাদের যত ত্যাগ, যত কষ্টই স্বীকার করতে হোক না কেন, এবং সেই সম্মিলিত ত্যাগ ও কষ্টের মাধ্যমেই আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করে নিতে পারব।

যদি কোনও কষ্ট, ত্যাগ এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়াই স্বাধীনতা অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হত, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে সেই স্বাধীনতার যথার্থ মূল্য আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম না কারণ স্বাধীনতা পেলেও ত্যাগ ও যন্ত্রণা স্বীকার না করে পাওয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা আমাদের পক্ষে দুরূহ হত। অতএব আপনারা যদি ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চান এবং মুক্ত হবার পরে যদি সেই স্বাধীন সত্তা আপনারা রক্ষা করতে চান যাতে ভবিষ্যতে কখনও আবার স্বাধীনতা না হারাতে হয় তা হলে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই শক্তি সঞ্চয় করতে হবে, যে শক্তির বিনিময়ে আমরা জয়কে করায়ত্ত করব চিরদিনের জন্য এবং কষ্টের বিনিময়ে জিতে নেওয়া আমাদের সেই স্বাধীনতাকে আমরা আর কখনও হাতছাড়া হতে দেব না। সুতরাং স্বাধীনতা পাবার জন্য আমাদের মূল্য দিতে হবে, এবং সেই মূল্য হল কষ্ট, ত্যাগ, এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই। আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে আমরা হাসিমুখে সেই প্রয়োজনীয় কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে পারব, এবং তার ফলে আমরা যে শুধুমাত্র ব্রিটিশ শাসনের থেকে মুক্তি পাব, তাই নয়; আমরা চিরদিনের মতো আমাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে পারব।

বোনেরা, আজ শেষ লড়াইয়ের জন্য শেষ প্রস্তুতি নেবার সময় এসেছে, এবং সেই উদ্দেশ্যে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। আমাদের হাতে নষ্ট করবার মতো সময় নেই। কেউ জানে না কখন আমাদের ডাক পড়বে, কখন দৃপ্ত পায়ে আমাদের সমুখে এগিয়ে যেতে হবে। অতএব আমাদের এমনভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে যে, যে-মুহূর্তে ডাক পড়বে তখনই যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আগের দিন যেমন আমি বলেছিলাম, সেই কথা

আবারও বলি যেন আমাদের মনের মধ্যে একই ভাবনা অনুরণিত হতে থাকে, আমাদের কণ্ঠে যেন একই ধ্বনি জাগে— 'দিল্লি চলো, দিল্লি চলো!'

সায়োনান, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, সেই সায়োনান আজ যে সমরাভিযানের শুরু, সেই অভিযান শেষ হবে যখন আমরা ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করতে পারব এবং আমাদের রাজধানীকে পুনর্বার অধিকার করতে পারব। এবং সেদিন আমরা দিল্লির বিখ্যাত লাল কেল্লার সামনে শেষবারের মতো কুচকাওয়াজে যোগ দিয়ে আমাদের বিজয় উৎসব উদ্‌যাপন করব।

বোনেরা। আমাদের মধ্যে কিছু রক্ষণশীল ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা একদিন ভেবেছিলেন যে আমাদের জাতীয় সংগ্রামে মহিলাদের কোনও ভূমিকা নেই, এটা শুধুমাত্র পুরুষদেরই দায়িত্ব। আমি আশা করব আজ এমন কোনও পুরুষ আমাদের মাঝে নেই যিনি সেই ধারণা পোষণ করেন। বিপরীতক্রমে, আমার বদ্ধমূল ধারণা যে জাতীয় সংগ্রামে যতদিন না ভারতীয় মহিলারা উপযুক্তভাবে অংশগ্রহণ করবেন, ততদিন ভারতের স্বাধীনতা লাভের কোনও আশা নেই। এবং আজ যদি আমি আশু মুক্তিলাভের বিষয়ে আশাবাদী হয়ে থাকি, তার কারণই হল যে আমাদের সংগ্রামে ভারতীয় মহিলাদের অংশগ্রহণের বিষয়ে আমি ঠিক সেই একই ভাবে আশাবাদী।

যখন আমি আগামী সংগ্রামে আপনাদের অংশগ্রহণের বিষয়ে কথা বলছি তখন বোনেরা আপনারা প্রতিটি ঘরে ঘরে ইতিমধ্যেই যে সংগ্রামে জড়িত রয়েছেন সে কথা আমি একেবারেই ভুলে যাইনি। আমি ভুলে যাইনি যে শত শত, এমনকী হয়তো সহস্র বোনেরা আজ ব্রিটিশ কারাগারে বন্দি হয়ে আছেন, এবং তাঁদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও ত্যাগ স্বীকারই সমগ্র ভারতের নবীন যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। আমার কোনও সন্দেহ নেই যে প্রতি ঘরে ঘরে আমাদের বন্ধুরা, নারী ও পুরুষ, যুবক ও যুবতীরা তাদের প্রত্যেকের যা যা কাজ সেই কাজ তারা সানন্দে করবে কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সেই কাজটুকুই যথেষ্ট হবে না। তাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা ব্রিটিশদের ভার থেকে বিতাড়িত করতে পারব না; অতএব আমাদের কর্তব্যসাধনের জন্য আমাদের বহির্বিশ্বের কাছ থেকে সাহায্য নিতে হবে।

এখানে পূর্ব এশিয়াতে প্রায় ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় বাস করেন, এবং আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে আমরা যদি এখানকার সব জনসম্পদ ও অর্থসম্পদ এবং অন্যান্য রসদকে কাজে লাগাতে পারি, তা হলে আমরা ভারতের জনগণকে সেই সাহায্য দিতে পারব যা ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হবে।

১২

সুভাষচন্দ্র বসু লীগকে পুনর্গঠিত করলেন

[১৩ জুলাই ১৯৪৩, সায়োনানে
আইআইএল-এর হেডকোয়ার্টার্স থেকে প্রচারিত বিবৃতি][১]

প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার নেবার পরেই শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু লীগের পুনর্গঠনের জন্য নিম্নলিখিত বিবৃতিটি প্রচার করেন:

ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ হেডকোয়ার্টার্স

৭, চ্যান্সেরি লেন,
সায়োনান, ১৩ই জুলাই ২৬০৩ (১৯৪৩)

অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর যে নতুন দায়িত্বভার পড়তে যাচ্ছে, এবং পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে এখন যে প্রবল উৎসাহের জোয়ার লক্ষ করা গেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই কাজের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হবে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের হেডকোয়ার্টার্স পুনর্গঠন করা এবং তার জন্য বর্তমান দপ্তরগুলির মধ্যে কোনও কোনও দপ্তরের পরিসর বাড়াতে হবে এবং কিছু কিছু নতুন দপ্তরও সৃষ্টি করতে হবে। কীভাবে এই পুনর্গঠন করা হবে তার একটা ছক আমি নীচে দিচ্ছি। পুনর্গঠনের ফলাফলের উপর আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখব এবং এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, যদি প্রয়োজন হয় এবং যখন প্রয়োজন হবে আমি আরও পরিবর্তনের কথা চিন্তা করব।

দপ্তরগুলি হল: ১. সামরিক বিভাগ ২. নতুন সৈন্য নিয়োগকরণ ৩. প্রশিক্ষণ ৪. সরবরাহ ৫. অর্থ ৬. সংবাদ মাধ্যমে প্রচার ৭. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ ৮. বিদেশ ৯. মহিলা ১০. পুনর্গঠন ১১. শিক্ষা ও সংস্কৃতি ১২. সাধারণ সম্পাদক

নতুন সৈন্য নিয়োগকরণ দপ্তর: একটা নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করে এই দপ্তর সমগ্র পূর্ব এশিয়া থেকে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ (ভারতীয় জাতীয় সেনাদল)-এর জন্য নতুন সৈন্য নিয়োগের ব্যবস্থা করবে। এটা একটা নতুন দপ্তর।

---

১. On To Delhi pp. 149-156.

প্রশিক্ষণ দপ্তর: এখনকার যুব দপ্তরটি এই নতুন দপ্তরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হবে। এই দপ্তরের কাজ হবে পূর্ব এশিয়ার সব নতুন সেনানীর জন্য প্রাথমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যতদিন না সেনাবাহিনী এই নতুন সেনাদের দায়িত্ব নিতে পারে ও তাদের মিলিটারি ব্যারাকে থাকার ব্যবস্থা করতে পারে।

এখনকার প্রশিক্ষণ বিভাগগুলির পরিচালনার ভার থাকবে এই দপ্তরের উপরে এবং প্রয়োজন হলে আরও নতুন বিভাগ খোলা হবে। এখনকার যুব দপ্তরের কর্মীরা এই দপ্তরের অধীনে কাজ করবে এবং দপ্তরের কাজের ভার বাড়লে প্রয়োজন মতো আরও নতুন কর্মী নিয়োগ করা হবে। যুব দপ্তরের প্রধান প্রশিক্ষণ দপ্তরের প্রধানের পদে আসীন হবেন।

সরবরাহ দপ্তর: এই নতুন দপ্তরটির কাজ হবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য, এবং বিশেষভাবে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের (ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য সমগ্র পূর্ব এশিয়া থেকে রসদ সংগ্রহ করা। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের হেড কোয়ার্টার্সের বর্তমান সংগ্রহশালাগুলি এখন থেকে সরবরাহ দপ্তর দ্বারাই পরিচালিত হবে।

স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ দপ্তর: বর্তমানের কল্যাণ দপ্তরটিকে এই নতুন দপ্তরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে। নতুন স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ দপ্তরটিতে দুটি বিভাগ থাকবে— যথা: (ক) চিকিৎসা এবং (খ) সমাজকল্যাণ।

বর্তমানের কল্যাণ দপ্তরটিকে তার কর্মীবৃন্দসহ সমাজকল্যাণ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হবে এবং কল্যাণ দপ্তরের প্রধান নতুন সমাজকল্যাণ বিভাগটির প্রধান হবেন। চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভাগটি থাকবে একজন জুনিয়র মেডিক্যাল অফিসারের অধীনে। সমগ্র স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ দপ্তরটি থাকবে একজন সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসারের অধীনে।

বিদেশ দপ্তর: এই নতুন দপ্তরটির কাজ হবে—

(ক) শাখা দপ্তরগুলির কাজের পরিচালনা ও নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করা

(খ) যেখানে প্রয়োজন সেখানে নতুন শাখা গড়ে তোলা

(গ) হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে শাখাগুলির নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা

মহিলা দপ্তর: এটা হবে একটা নতুন দপ্তর। সমগ্র পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় মহিলাদের সংগঠিত করে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে তাদের কর্মোদ্যোগকে উৎসাহ দিতে ও পরিচালিত করতে হবে। এই দপ্তর সেনাবাহিনীতেও মহিলাদের নিয়োগ করবে এবং ভারতীয় মহিলা ও বালিকাদের মধ্য থেকে রেডক্রস বিভাগ গড়ে তুলবে।

পুনর্গঠন দপ্তর: এই নতুন দপ্তরটির কাজ হবে—

(ক) ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা— বিশেষভাবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে।

(খ) ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পুরুষদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি: এটাও হবে একটা নতুন দপ্তর। এই দপ্তরের কাজ হবে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক কাজকর্ম পরিচালনা করা এবং লীগের পক্ষে যতটা করা সম্ভব, আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিতে আরও ব্যবস্থার সুযোগ করে দেওয়া।

সাধারণ সম্পাদকের দপ্তর: এই দপ্তরটির কাজ হবে—

(ক) *হিকারি কিকানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা

(খ) বিভিন্ন দপ্তরগুলির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা

(গ) মাঝে মাঝে আমি যদি বিশেষ কোনও কাজের ভার দিয়ে থাকি তা হলে সেই কাজ সম্পন্ন করা।

এই দপ্তরের অধীনে কার্যালয়ের উপবিভাগ নামে একটি বিভাগ থাকবে। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ হেড কোয়ার্টার্সের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে কোনও সমস্যার উদ্ভব হলে তার সমাধানের ভার থাকবে এই বিভাগের উপরে, যেমন— (ক) যানবাহন ও পেট্রল, (খ) বাড়িগুলি ও বাড়ির সরঞ্জাম, (গ) হেড কোয়ার্টার্সের আলো, টেলিফোন ইত্যাদি, (ঘ) স্বাস্থ্যকর্মীরা এবং (ঙ) বহিরাগত অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা করা। কার্যালয় উপবিভাগের কাজের দায়িত্ব বাড়তে থাকলে তখন হয়তো এই বিভাগটিকে একটা সম্পূর্ণ দপ্তরে পরিণত করা প্রয়োজন হতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক: প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলির (বিশেষভাতা, রদবদল ইত্যাদি) ভার থাকবে আমার উপরে। তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলি প্রয়োজনমতো তাদের সুপারিশ করতে পারবে।

বর্তমানের কর্মীবৃন্দ: বর্তমানের কর্মীরা সকলেই লীগের কাজে বহাল থাকবেন, যদিও পুনর্গঠনের প্রয়োজনে হয়তো এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে বদলি করা হতে পারে।

বিস্তারিত নির্দেশ: এর পরে প্রত্যেক দপ্তরের কাজের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

সুভাষচন্দ্র বসু,
প্রেসিডেন্ট,
ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ,
পূর্ব এশিয়া।

এর পরবর্তী বিজ্ঞপ্তিগুলি নতুন সৈন্য নিয়োগকরণ ও প্রশিক্ষণ দপ্তর থেকে প্রচার করা হয়, যেখানে প্রতিটি দপ্তরের কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

---

* অন্য একটি কাজের দায়িত্ব নেবার জন্য মেজর জেনারেল ইওয়াকুরো মালয় ছেড়ে চলে আসার পর কিকানের দায়িত্ব নেন তাঁর উত্তরসূরী কর্নেল ইয়ামামোতো এবং সেই সময় থেকে কিকানের নাম হয় 'হিকারি কিকান'। 'হিকারি' কথার অর্থ হল দীপ্তি ও গৌরব।

ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ
হেড কোয়ার্টার্স
(নতুন সৈন্য নিয়োগকরণ দপ্তর)

৭, চ্যান্সেরি লেন, সায়োনান
২৩ জুলাই ২৬০৩ (১৯৪৩)

বিষয়: নতুন সৈন্য নিয়োগকরণ

হয়তো ইতিমধ্যেই অবহিত আছেন যে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের হেড কোয়ার্টার্সের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে এবং আমাদের জনবল ও সরঞ্জামের সর্বাত্মক প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটা নতুন দপ্তরও সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই পরিকল্পনা অনুসারে, এই দপ্তরটিও সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের প্রেসিডেন্টের একান্ত অভিলাষ যে ভারতের আগামী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অন্ততপক্ষে ৩০০,০০০ ব্যক্তি (যার মধ্যে মহিলা স্বেচ্ছাসেবীরাও অন্তর্ভুক্ত)-কে নিয়োগ করা সম্ভব হবে।

এই নবনিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে নতুন প্রশিক্ষণ দপ্তর আপনাদের স্বতন্ত্রভাবে জানাবেন। আমি শুধু আপনাদের এই কথা বলতে চাই যে আমি এখনই একসঙ্গে এইসব ব্যক্তিদের যোগদানের জন্য আহবান করতে চাইছি না। প্রকৃতপক্ষে প্রশিক্ষণ ঘটবে তিন ধাপে। প্রথম ধাপে নতুন সেনারা তাদের বাড়িতেই থাকবে ও পেশাগত যা যা কাজ তারা করে থাকে, সেই কাজই করতে থাকবে— কেবলমাত্র সকালে বা সন্ধ্যাবেলায় তারা ড্রিল করবে। দ্বিতীয় ধাপে তাদের সারা দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের জন্য ক্যাম্পে আনা হবে, যখন পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে আমরা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারব। তৃতীয় ধাপে তাদের সেনা ছাউনিতে আনা হবে ও তারা আজ়াদ হিন্দ ফৌজের (ভারতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীর) পূর্ণ সদস্য হতে পারবে।

সারা দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের জন্য ডাকবার আগে যদি কোনও নবনিযুক্ত সেনা হঠাৎ তার পেশাগত কাজ ছেড়ে দেয়, বা গৃহত্যাগ করে, তা হলে সেটাকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনা বলে মনে করা হবে।

একটা নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুসারে, ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করবার কাজ অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত দায়িত্ব অর্পণ করা হবে:

১) প্রতিটি আঞ্চলিক কমিটির অধীনে, প্রত্যেক ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ (আইআইএল) শাখার প্রধান হবেন তাঁর নিজের এলাকার নবপ্রবিষ্ট সেনা আধিকারিক।
২) প্রতিটি শাখার অধীনে, প্রত্যেক আইআইএল উপ-শাখার প্রধান হবেন নবপ্রবিষ্ট সেনা সহ-আধিকারিক এবং তাঁর এলাকার সেনা নিয়োগের দায়িত্ব থাকবে তাঁর উপরে।
৩) নবপ্রবিষ্ট সেনাধিকারিক (শাখার প্রধান) সহকারী আধিকারিকগণের কাজের তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধন করবেন। কোনও সহকারী আধিকারিক যথাযোগ্যভাবে

তাঁর দায়িত্ব পালন না করতে পারলে, সেই আধিকারিককে অপসারণ করে সেই পদে নতুন নিয়োগ করবার ক্ষমতা নবপ্রবিষ্ট সেবাধিকারিকের থাকবে, যদি আঞ্চলিক কমিটির চেয়ারম্যানের অনুমোদন থাকে।

৪) প্রতিটি আঞ্চলিক কমিটির প্রধানের হবেন তাঁর এলাকার প্রধান নবপ্রবিষ্ট সেনাধিকারিক এবং তিনি তাঁর এলাকার নবপ্রবিষ্ট সেনাধিকারিকদের কাজের তত্ত্বাবধান এবং সমন্বয় সাধন করবেন। কোনও কর্মীকে যথাযোগ্যভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন না করতে পারলে, সেই কর্মীকে অপসারণ করে সেই পদে নতুন কর্মী নিয়োগ করবার ক্ষমতা প্রধানের কর্মী থাকবে, যদি আইআইএল-এর হেড কোয়ার্টার্সের নতুন সেনা নিয়োগ করণ দপ্তরের সেক্রেটারির অনুমোদন থাকে।

নতুন সেনা নিয়োগের ক্ষেত্রে কাজের দায়িত্বগুলি

১) প্রত্যেক নবনিযুক্ত সেনা একটা এনরোলমেন্ট ফর্ম ভর্তি করবেন ও সেটা অ্যাসিস্টেন্ট রিক্রুটিং অফিসারের হাতে দেবেন।

২) ফর্মগুলি সংগ্রহ করবার পর রিক্রুটিং অফিসার ও চিফ রিক্রুটিং অফিসারের মাধ্যমে তা হেডকোয়ার্টার্সে পাঠানো হবে।

৩) যেহেতু এটা একটা গুরুতর জরুরি অবস্থা, সেই কারণে ফর্মগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে, যতদিন না নতুন পরিবর্তিত ফর্মগুলি এই দপ্তর থেকে ছাপা হয়।

৪) ছাপানো ফর্ম না থাকলে, নবপ্রবিষ্ট সেনাধিকারিক ও তাঁর সহকারীগণ টাইপ করা এনরোলমেন্ট ফর্ম ব্যবহার করতে পারবেন।

৫) প্রত্যেক রিক্রুটিং বা অ্যাসিস্টেন্ট রিক্রুটিং অফিসার, যাঁর উপরে নিয়োগকরণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রয়েছে, তিনি একটা রেজিস্টার রাখবেন। সেই রেজিস্টারে, তাঁর এলাকায় যারা যোগ দেবার জন্য দরখাস্ত দিয়েছে তাদের নাম ও বিশদ বিবরণ লেখা থাকবে।

৬) প্রত্যেক চিফ রিক্রুটিং, রিক্রুটিং বা অ্যাসিস্টেন্ট রিক্রুটিং অফিসার, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে যারা বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য দরখাস্ত দিচ্ছে তাদের বয়সের কোনও বাধা রাখা হচ্ছে না। যোগ দেবার জন্য ছাপানো এনলিস্টমেন্ট ফর্ম, যেখানে বয়সের সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে, সেই ফর্ম প্রয়োজন হলে উপযুক্ত ভাবে পরিবর্তন করে নিতে হবে।

৭) প্রত্যেক অ্যাসিস্টেন্ট রিক্রুটিং অফিসারকে তাঁর এলাকার যোগদানকারীদের প্রত্যেকের ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন হলে তিনি এই বিষয়ে নবনিযুক্ত সেনাধিকারিকের সাহায্য নিতে পারেন এবং প্রয়োজন হলে এই বিষয়ে প্রধান রিক্রুটিং অফিসারের সাহায্য নিতে পারবেন।

৮) ফর্ম ভর্তি করা হয়ে গেলে মেডিক্যাল অফিসারের রিপোর্ট সহ তা হেড কোয়ার্টার্সে পাঠাতে হবে।

৯) সেনা হবার মতো বিশেষ শারীরিক ক্ষমতা নেই এই কারণে কোনও আবেদনকারীকেই মেডিক্যাল অফিসার প্রত্যাখ্যান করবেন না, যদি তারা সাধারণভাবে সুস্থ ও সক্ষম হয়।

১০) নতুন সেনাদের নিয়োগ করবার ব্যাপারে খরচ প্রত্যেক শাখা বা উপ-শাখাকে (প্রযোজ্য হলে) বহন করতে হবে।

১১) মেডিক্যাল অফিসারের রিপোর্ট সহ এনলিস্টমেন্ট ফর্ম নিয়মিতভাবে প্রতি ১৫ দিন অন্তর হেড কোয়ার্টার্সে পাঠাতে হবে এবং এনলিস্টমেন্ট ফর্মের প্রথম দফা পাঠাতে হবে যত শীঘ্র সম্ভব।

১২) নতুন সেনা নিয়োগকরণের কাজের ব্যবস্থা করা এবং দ্রুত সেই কাজ সম্পন্ন করবার জন্য হেড কোয়ার্টার্স প্রত্যেক আঞ্চলিক কমিটির কাছে এক বা একাধিক সামরিক উপদেষ্টাদের পাঠাবে। চিফ রিক্রুটিং, রিক্রুটিং বা অ্যাসিস্টেন্ট রিক্রুটিং অফিসারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা এই উপদেষ্টাদের দেওয়া সাহায্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

সেক্রেটারি,
নতুন সেনা নিয়োগকরণ দপ্তর।

ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ
হেড কোয়ার্টার্স
(প্রশিক্ষণ দপ্তর)
বিষয়-প্রশিক্ষণ

১) নেতাজির শুধু যে যুবশক্তির আবশ্যক তা নয়, সর্বাত্মক প্রস্তুতির জন্য তিনি চান যে কোনও বয়সি সুস্থ ও সক্ষম ব্যক্তিই সেনাদলে যোগদান করুক। সেই কারণে বর্তমানের যুব দপ্তরটি প্রশিক্ষণ দপ্তরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে।

২) যুব দপ্তরের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইএসআই এবং মালয়ের স্থানীয় কেন্দ্রগুলির আজাদ হিন্দ স্কুলের স্নাতকদের উপরে এবং প্রতিটি শাখা ও উপ-শাখার 'দায়িত্ব-প্রাপ্ত সদস্য প্রশিক্ষণ'-এর তত্ত্বাবধানে এই প্রশিক্ষণ চলতে থাকবে।

মালয়ের চেয়ারম্যান যদি চান তা হলে মালয়ের শাখাগুলিতে স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য আরও প্রশিক্ষক পাঠানো হবে।

৩) পূর্ব এশিয়ার জনশক্তির প্রস্তুতিতে প্রশিক্ষণ কাজ করবে তিনটি ক্রমানুসারিক পর্যায়ে।

প্রথম পর্যায়: স্থানীয় এলাকায় সকালে বা সন্ধ্যায় দুই ঘণ্টার প্রশিক্ষণ, সম্ভব হলে প্রতিদিন।

এটা স্থানীয় শাখা ও উপশাখাগুলির দায়িত্ব। নতুন সেনারা তাদের বাড়ি ও পেশাগত যা যা কাজ তারা করে থাকে, কোনওটাই ছাড়বে না।

সারা দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের জন্য ডাকবার আগে যদি কোনও নবনিযুক্ত সেনা হঠাৎ তার পেশাগত কাজ ছেড়ে দেয়, বা তার বাড়ি ছেড়ে চলে আসে, তা হলে সেটাকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনা বলে মনে করা হবে।

এর জন্য আই এন-এ থেকে এবং সেন্ট্রাল ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ইনস্ট্রাক্টর বেছে নেওয়া হবে।

আজ়াদ হিন্দ ফৌজ (আইএনএ)-র অফিসার, যাঁরা নতুন সেনা নিয়োগের জন্য বা অন্য কাজে আছেন, যখনই সম্ভব হবে তাঁদের প্রশিক্ষণের কাজ তত্ত্বাবধান করবার জন্য বা সামরিক প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহার করা হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়: হেড কোয়ার্টার্সের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় কেন্দ্রীয় শিবিরগুলিতে প্রশিক্ষণ।
(ক) সাধারণ শিবির; (খ) বিশেষ শিবির।

(ক) সাধারণ শিবির: আঞ্চলিক শাখাগুলিতে জানিয়ে দেওয়া হবে সাধারণ শিবিরের জন্য তাদের কতজনের আসন বরাদ্দ আছে এবং কখন শিবিরগুলি প্রস্তুত হবে। যদিও বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন নেই, কিন্তু স্থানীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের সব থেকে ভাল ছেলেদের দিয়ে এই আসন পূর্ণ করা হবে।
মালয়ে প্রথম সাধারণ কেন্দ্রীয় শিবিরের উদ্বোধন হবে ১৫ আগস্ট বা তার কাছাকাছি কোনও তারিখে। মালয়ের জন্য সর্বমোট ১০০০ আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। পরে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হবে।
(খ) বিশেষ শিবির: বিশেষ শিবিরের প্রার্থী হবার জন্য প্রয়োজন সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা।
ইতিমধ্যেই এই ধরনের তিনটি বিশেষ শিবির ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে: আজ়াদ স্কুল, সায়োনান; বি ওয়াই টি সি, কুয়ালালামপুর; এবং স্বরাজ ইউথ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, রেঙ্গুন।
১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে, পেনাংয়ের ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবীর জন্য আজ়াদ স্কুল নামে আরেকটা শিবির খোলা হবে। অন্যান্য অঞ্চল সময় মতো যেহেতু প্রার্থী পাঠাতে পারবে না, মালয়ের কাছ থেকেও ১০০ জনের কোটার প্রয়োজন হবে।
অন্যান্য অঞ্চল ভাল প্রার্থীদের বাছাই করতে থাকবে এবং আবেদনপত্রগুলি তাদের যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়: আজ়াদ হিন্দ ফৌজে প্রশিক্ষণ

সেনাবাহিনীতে যেই এই সেনাদের স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে তখনই প্রশিক্ষণ শুরু হবে। যখন প্রশিক্ষণের কাজ পুরো দমে চলতে থাকবে তখন প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রার্থীদের মধ্যে অনেক সেনা প্রস্তুত থাকবে আইএনএ-তে যোগদানের জন্য।

৪) শর্তাবলী ও হাতখরচ: বিনা খরচে জামা কাপড়, থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও কেন্দ্রীয় শিবিরের সব পুরুষদের একটা সাধারণ হাতখরচ দেওয়া হবে।
৫) প্রশিক্ষণের কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা: প্রথম পর্যায়ের জন্য, ১৩. ৪. ২৬০৩ তারিখে দেওয়া "অন্তর্বর্তী কালীন পরিকল্পনা" বহাল থাকবে। শুধুমাত্র যে ক্ষেত্রে পরিবর্তন

ঘটবে তা হল শারীরিক সক্ষমতা, রুট মার্চ ও সামরিক প্রশিক্ষণের উপর এখন বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

আগামী আগস্ট মাসের কার্যক্রমের একটা সহজ নমুনা নীচে দেওয়া হল:

সপ্তাহে একবার: রুট মার্চের দূরত্ব বাড়ানো হবে ৫ মাইল থেকে ১৫ মাইল।
প্রতিদিন: পিটি (ব্যায়াম) ৪৫ মিনিট, আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ২০ মিনিট, ড্রিল ৪৫ মিনিট, পরের দিনের জন্য নির্দেশ ও বিশ্রাম ১০ মিনিট। মোট ২ ঘণ্টা।
রবিবার ও ছুটির দিন: আধ্যাত্মিক ও সামরিক প্রশিক্ষণের উপর বক্তৃতা।

৬) আর্থিক সংস্থান: প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণের জন্য খরচের দায়িত্ব বহন করবে অঞ্চলগুলি।

সেক্রেটারি
প্রশিক্ষণ দপ্তর

১৩

জিন্না সম্বন্ধে

[১৮ জুলাই ১৯৪৩, সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত বিবৃতি][১]

'১৯৪০ সালে আমি মিস্টার জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করবার চেষ্টা করি যাতে আমরা একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ায় পৌঁছতে পারি কিন্তু আমি হতাশ হয়ে ফিরে আসি। মুসলিম লীগ হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার আনুগত্য ব্রিটিশদের প্রতি এবং প্রধানত বিশ্বাসঘাতক ও চাটুকার "যারা সকল বিষয়েই সায় দেবে" এমন ব্যক্তিদের সমর্থনে গঠিত। এই কারণেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্য ভাইসরয় প্রায়শঃই মিস্টার জিন্নাকে ডেকে পাঠান। কোটিপতি ও জমিদারদের দাক্ষিণ্যে পরিপুষ্ট মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছে ব্রিটিশদেরই হাতে। ১৯৪০ সালে যখন ফ্রান্সের পতন হয়েছে ও ব্রিটিশদের মনোবল যখন একেবারেই ভেঙে পড়েছে, সেই সময় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যদি একটা সমঝোতায় পৌঁছতে পারত তা হলে এতদিনে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতা পেয়ে যেত। কিন্তু মিস্টার জিন্না তখন পাকিস্তান গঠনের দাবি করতে লাগলেন, যা ভারতবর্ষের স্বার্থের পরিপন্থী এবং তাঁর এই দাবি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমাদের দাবিতে বাধা সৃষ্টি করল। ব্রিটিশরা বহুদিন ধরে ভারতবর্ষে তাদের 'বিভেদ সৃষ্টি করো ও শাসন করো' নীতি প্রয়োগ করে চলেছে। এবং আমাদের সংহতিতে আরও ভাঙন ধরানোর জন্য তারা মুসলিম লীগের মাধ্যমে পাকিস্তানের দাবি সৃষ্টি করল যার উদ্দেশ্যই হল অখণ্ড ভারতের অঙ্গহানি ঘটানো। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নটি সম্পূর্ণ ব্রিটিশদের সৃষ্টি। এর অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাবে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী থেকে যা মূলতঃ মুসলমান সেনা দ্বারা গঠিত কিন্তু হিন্দু সহসৈনিকদের সঙ্গে তাদের সম্পূর্ণ হৃদ্যতা আছে।' এর পরে মিস্টার বোস আরও বলেন যে স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার শীঘ্রই গঠিত হবে এবং যতদিন না তারা ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শক্তি বিতাড়নের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে ততদিন তারা তাদের কাজ অব্যাহত রাখবে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হবে তখন এই সরকার ভারতীয় জনগণের দ্বারা গঠিত নতুন সরকারের হাতে দেশ শাসনের দায়িত্ব তুলে দেবে। 'আমার বিশ্বাস', মিস্টার বোস বলেন, 'মিস্টার জিন্না পাকিস্তানের দাবি তুলে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের এক বিরাট ক্ষতি করছেন। তিনি সরল-মতি মুসলমানদের পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ও ধর্মের প্রতি অন্ধ আনুগত্যকে উসকানি দিচ্ছেন। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে পাকিস্তান গঠনের এই পরিকল্পনা যদি ফলপ্রসূ হয় তা হলে ভারতবর্ষ এক চরম বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত হবে। মুসলমানেরা বুঝতে পারছেন না যে ব্রিটিশরা মুসলমান ও ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, ব্রিটিশদের নীতিগুলি সর্বদাই তাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। ব্রিটিশরাই মুঘলদের পতন ঘটিয়ে ভারতবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। ব্রিটিশরা কি কোনও দিনই ভারতকে স্বাধীনতা

১. *On Testament of Subhas Bose*. pp. 189-190.

দেবে? আমরা মনে করি না যে আমাদের তারা কোনও দিনই দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে। আমার ধারণা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিতে জিন্নার কোনও উৎসাহ নেই। মুসলমানদের প্রতি তাঁর মনোভাব যদি আন্তরিক ও সততাপূর্ণ হত তা হলে অন্যান্য মুসলমান নেতাদের মতো তিনিও কারাবরণ করতেন। ভারতবর্ষের এই দুঃসময়ে মিস্টার জিন্না কিছুই করছেন না, কেবল মাত্র আলঙ্করিক ভাষায় বক্তৃতা করে নিজের অহমিকাকে পরিতৃপ্ত করে চলেছেন। মিস্টার জিন্না সর্বদাই ব্রিটিশদের অনুগত মুসলমান জমিদার ও পুঁজিবাদীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকেন। কিন্তু আমরা তাদের কর্মপদ্ধতিকে অশ্রদ্ধা করি ও ব্রিটিশদের প্রতি তাদের আনুগত্যকে ধিক্কার দিই। আমরা আমাদের স্বাধীনতা পাবার জন্য ব্যগ্র ও উৎকন্ঠিত। একটা স্বাধীন ভারতীয় সেনাদল গঠন করা হয়েছে যা ভারতবর্ষকে বিদেশিদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে এবং ভারতীয় সৈনিকেরা তাদের দেশকে ব্রিটিশ প্রভাব মুক্ত করবে যা ইসলাম ধর্মের জন্য একটা বিরাট সেবা হিসাবে পরিগণিত হবে।'

—ব্যাঙ্কক রেডিয়ো, ১৮ জুলাই ১৯৪৩।

১৪

স্বাধীন বর্মাদেশ

[i. ১ আগস্ট ১৯৪৩, বর্মাদেশের স্বাধীনতা লাভ উপলক্ষে
সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত বিবৃতি][১]

১৯২৫ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত যখন আমি মান্দালয় কারাগারে বন্দি তখন আমার বন্দিশালার বারান্দা থেকে বর্মাদেশের শেষ স্বাধীন সম্রাটের প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবতাম আবার কবে বর্মাদেশ তার স্বাধীনতা ফিরে পাবে। আজ বর্মা এক স্বাধীন দেশ এবং আমি এক মুক্ত দেশের পরিবেশে আমার নিশ্বাস নিচ্ছি।

বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিতাভস্ম থেকে, পলায়মান ব্রিটিশ বাহিনীর পিছনে ফেলে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ থেকে, এশিয়াতে এখন এক স্বাধীন দেশ জন্ম নিয়েছে। ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে বর্মার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনকর্তাদের কাছে সামান্যতম স্বশাসনের আর্জি নিয়ে, কিন্তু তাঁর সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল চরম অবজ্ঞা ও অবহেলার সঙ্গে। বর্মাদেশের জনসাধারণ তখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ও নিপ্পনের সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতায় তারা বর্মাদেশ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নে সক্ষম হয়। এখন তারা তাদের কষ্ট ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জন করা স্বাধীনতার ফলভোগ করছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরাধীন ভারতবর্ষকে যুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ব্রিটেনের সশস্ত্র বাহিনী বর্মাদেশকে আক্রমণ করেছিল তাদের স্বাধীনতা হরণের উদ্দেশ্যে। আর এখন ব্রিটিশদের বিতাড়িত করবার পরে বর্মাদেশ আমাদের সুযোগ দিয়েছে তাদের দেশের মুক্ত অঞ্চলকে ব্যবহার করবার জন্য, যাতে সেখান থেকে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ ভারতে অবস্থানকারী ব্রিটিশ সেনাদের আক্রমণ করতে পারে। জাপানের সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি তিনি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আশ্বাস দিয়েছিলেন যে যুদ্ধের পরে ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে ও পাকিস্তান গঠন করা হবে— এবং স্যার ডোরমান স্মিথের দাবি ছিল যে তিনি তাঁর টাইপরাইটারের সাহায্যেই দিল্লি থেকে বর্মাদেশ শাসন করবেন। কার্যত দেখা গেল বর্মাদেশ তাদের বন্ধু নিপ্পনের সাহায্যে ব্রিটিশদের পরাস্ত করে তাদের স্বাধীনতা জিতে নিতে সক্ষম হল। ভারতের, এশিয়ার তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য এই ঘটনা পরম্পরার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে।

ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী বর্মাদেশ যে এখন একটি স্বাধীন দেশ, সেই খবর দিল্লিতে আমাদের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। তাদের ভয় হল বর্মাদেশের উদাহরণ

---

১. *On To Delhi*. pp. 51-61. iii-র অংশ নেতাজির নিজের হাতে বাংলায় লেখা ও নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর গ্রন্থশালা থেকে সংগ্রহ করা।

অনুসরণ করে এখন ভারতীয় জনগণও তাদের বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে অনুপ্রাণিত হবে, এবং সেই কারণে ভারতে যে কোনও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সমূলে বিনাশ করবার জন্য তারা উত্তরোত্তর নির্মম পদ্ধতি আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পৃথিবীর কোনও শক্তিই আজ আর ভারতকে দাসত্বের বন্ধনে আটকে রাখতে পারবে না, এবং আজ যেমন রেঙ্গুনের সরকারি ভবনে ময়ূরের প্রতিকৃতি আঁকা পতাকা উড়ছে— তেমনি অদূর ভবিষ্যতে দিল্লির লালকেল্লায় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়তে দেখা যাবে।

[ii. ১ আগস্ট ১৯৪৩ তারিখে রেডিয়ো ভাষণ]

আমার স্বদেশবাসী বন্ধুরা! আজ ১৯৪৩ সালের ১ আগস্ট। আজ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছে। বিশ্বযুদ্ধের মধ্যখানে আজ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে। বর্মাদেশ— আমাদের প্রতিবেশী দেশ আজ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং তারা তাদের নিজস্ব স্বাধীন সরকার গঠন করেছে। স্বাধীন বর্মাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

আপনারা সকলেই জানেন যে যখন ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়, তখন বর্মার জনসাধারণ তাদের হারানো স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য সেই যুদ্ধাবস্থার সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করে, বর্মাদেশের অধিকাংশ জনগণ তাদের দেশ থেকে ব্রিটিশদের বহিষ্কার করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করে। আজ তার ফলশ্রুতি আপনারা দেখছেন। বর্মাদেশ যে শুধু ব্রিটিশদের কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে তাই নয়, তারা তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের এই সংকট মুহূর্তে বর্মাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঘটনা আমাদের কাছে দুই কারণে বিশেষ অর্থবহ। প্রথমত, এই ঘটনা আমাদের দেখিয়েছে যে ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় সৃষ্ট সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে যে কোনও দেশের পক্ষে কী বিপুল সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত অধিকারের পরে ঠিক যে ভাবে ব্রিটেনের সশস্ত্র বাহিনী বর্মাদেশকে আক্রমণ করবার জন্য পরাধীন ভারতকে যুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছিল— ঠিক তেমনই আজ বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা লাভ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুযোগ দিয়েছে বর্মাদেশকে যুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ভারতে ব্রিটিশ সেনাদের আক্রমণ করবার।

ব্রিটিশদের হাতে ভারতের স্বাধীনতা হারাবার বহুদিন পরে বর্মাদেশ তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছিল। কিন্তু এখন তারা আমাদের পিছনে ফেলে রেখে তাদের স্বাধীনতা জয় করে নিতে পেরেছে, অথচ আমরা এখনও বিপ্লবের মাধ্যমে চেষ্টা করে চলেছি সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে। ভারতীয় জনগণ ও আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি বর্মার জনগণকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই তাদের সাফল্যের জন্য— এবং আগামী দিনগুলিতে তাদের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি হোক এই শুভকামনা করি। আমি নতুন ও স্বাধীন বর্মাদেশের প্রধান মহানুভব ডক্টর বা ম-কেও আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, এবং কামনা করি এখন যে বিবিধ কাজের দায়িত্বভার তাঁর উপরে এসেছে সেই দায়িত্ব বহনে তিনি সফলকাম হোন। সম্প্রতি জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সায়োনানে ডক্টর বা ম-র দেখা হবার পরে, এখন

আবার এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমি তাঁকে নতুন ও স্বাধীন বর্মাদেশের প্রধান রূপে আমার অভিনন্দন জানাতে পারছি, এটা আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা।

বন্ধুরা, আপনারা জানেন ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসনকাল শুরু হবার পর থেকে ভারতবর্ষের জনগণকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল— যে প্রতিশ্রুতির মূল্য কিছু বাজে কাগজের থেকে যে বেশি নয় তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আপনাদের আরও জানা আছে যে এই যুদ্ধ হবার পর থেকে বারে বারে সেই প্রতিশ্রুতিগুলির পুনরুক্তি করা হয়েছে এবং অনেক অর্থহীন অজুহাত খাড়া করা হয়েছে এটা দেখাবার জন্য যে যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশদের থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব নয়। সেই উদাহরণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন দেখছি জাপানের প্রধানমন্ত্রী মহানুভব জেনারেল তোজো, তাঁর দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে বর্মাদেশকে স্বাধীনতার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি তিনি সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করলেন এবং সেটাও ঘটল যুদ্ধ চলাকালীন। যদি সদিচ্ছা থাকে তা হলে প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজও করা যায় এবং জাপানের পক্ষ থেকে এই উদারতা ও শাসকের ভূমিকায় তাদের যোগ্যতার যে পরিচয় পাওয়া গেল তাতে ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতাদের কপটতার মুখোশ আরও স্পষ্ট ভাবে খুলে গেছে— এবং একই সঙ্গে জাপান সরকারের রাজ্য শাসনের নীতিরও প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে বর্মাদেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করেছে, ফিলিপাইনে স্বাধীনতা পেতেও আর দেরি নেই। এশিয়ার ইতিহাস এখন এক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছে। এশিয়া মহাদেশের সব ক'টি পরাধীন দেশের সম্মুখে এখন একটা অনন্যসাধারণ সুযোগ এসেছে রুখে দাঁড়াবার ও মুক্তিলাভের জন্য সচেষ্ট হওয়ার। সর্বোপরি, বর্তমানের এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা ও তাদের বহুদিনের স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করাই হল ভারতীয় জনগণের পবিত্রতম কর্তব্য।

এশিয়ার স্বাধীনতা লাভ সম্পূর্ণ হতে পারবে না যতদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন না হবে। সুতরাং ভারতীয় জনগণকে অবশ্যই স্বাধীনতা পেতে হবে এবং সেই স্বাধীনতা পেলে তারা অন্যান্য এশীয় দেশগুলিকেও স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করবে। জাপান ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য পরাধীন দেশগুলির দিকে বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতিসহ সাহায্যের যে হাত বাড়িয়েছে ভারতবর্ষকে অবশ্যই সেই সাহায্য নিতে হবে। আমাদের সকলের সামনে একই বৈরী, ভারতের জনগণকে তাই সাহসী জাপানিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে হবে, যতদিন না আমরা সেই শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে পারি এবং ভারতবর্ষ তার হারানো স্বাধীনতা ফিরে পায়।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

আজ়াদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

[iii. বাংলায় বার্তা, ১ আগস্ট ১৯৪৩]*

বন্ধুগণ,

মুক্ত বার্মার প্রান্তর হইতে আজ আমি আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাতে চাই। আজ বার্মা স্বাধীন— আমরাও কি স্বাধীন হইব না? ভারতের বাহিরে, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের

---

* মূল বানান অপরিবর্তিত।

সৈনিক অথবা আজ়াদ হিন্দ ফৌজ এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এমনকী আমাদের ভগিনীগণ তাঁহাদের হাতে রাইফেল লইয়া নিজেদের প্রশিক্ষণ লইতেছেন। আপনারা এখন থেকেই প্রস্তুত হন যাহাতে আমরা যত শীঘ্র সম্ভব পৌঁছাইতে পারি, বিপ্লবের অগ্নিশিখা ভারতের সর্বত্র দ্রুত ছড়াইতে পারে। দয়া করিয়া তাঁহাদের বলুন যাঁহারা আজ কারাগারে আছেন যে তাঁহাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা আজ আমাদের অনুকূলে, স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ এখন আরম্ভের পথে। আমাদের জয় এখন সুনিশ্চিত। এই শেষ যুদ্ধে পুরুষ এবং স্ত্রী, যুবক এবং বৃদ্ধ সকলেই অবশ্যই অংশ গ্রহণ করুক। আমরা বিশেষভাবে চাই যাঁহারা বৃটিশের পতাকাতলে কাজ করিতেছেন তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে যোগদান করুন। আর বিশেষ সময় নাই— আমরা অবশ্যই দ্রুত সকল প্রকার প্রস্তুতি লইব এবং শেষ লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিব। যুদ্ধ শুরু হইলে বাংলার মাটিতে রক্তের স্রোত বহিবে। কিন্তু ভয়ের কিছু নাই— আমাদের রক্তের বদলে আমাদের পাপের প্রতিদান দেব। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে আমাদের ভারত সোনার চেয়েও মূল্যবান— এই সময়ে ইহা মুক্ত হইবে। দেখুন, সূর্যোদয়ের উজ্জ্বল শিখা পূর্বাকাশে ইতিমধ্যেই কিরণ দিতেছে।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজ়াদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

সুভাষচন্দ্র বসু

[iv. সিঙ্গাপুরের ফারার পার্কে ভাষণ, ১৫ আগস্ট ১৯৪৩]

সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে আজ ভারতীয়রা অভাবনীয় সংখ্যায় মিলিত হচ্ছে দু'টি কারণে। প্রথমত তারা বর্মাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঘটনাকে উদ্‌যাপন করছে ও দ্বিতীয়ত ব্রিটিশদের এখনই ভারতবর্ষ ছেড়ে দেবার দাবিতে তারা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। যতদিন না ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পারছে ততদিন তারা অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে শপথ নিচ্ছে তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখবার জন্য।

আপনাদের হয়তো জানা আছে যে ১ আগস্ট যখন বর্মাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং নতুন ও স্বাধীন বর্মাদেশের প্রথম মন্ত্রীসভা গঠন করা হয় তখন সৌভাগ্যক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও হৃদয়স্পর্শী এবং এই শুভক্ষণে যখন ভারতবর্ষের সীমানায় এক নতুন ও স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নিচ্ছে তখন সেই ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী থাকতে পারার জন্য আমার ভাগ্যকে আমি ধন্যবাদ জানাই। ইতিহাসের এমনই চক্রান্ত যে বর্মার স্বাধীন রাষ্ট্র ঠিক সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হল যেখানে ব্রিটিশ বর্মাদেশকে শাসন করত।

আমি যখন এই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি তখন আমার মানস চক্ষে যে ছবি অত্যন্ত জীবন্ত ভাবে ফুটে উঠছিল তা হল নতুন দিল্লিতে ভাইসরয় ভবনের সামনে আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছি এবং আজ়াদ হিন্দ ফৌজ (ভারতীয় জাতীয় সেনাদল) তাদের বিজয় কুচকাওয়াজ করছে দিল্লির সুপ্রাচীন লালকেল্লার সামনে— যখন ব্রিটিশরা শেষবারের মতো ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

বন্ধুরা! আপনাদের হয়তো জানা আছে যে বর্মাদেশ আমার কাছে নতুন দেশ নয়। বর্মা যখন ব্রিটিশ শাসকদের অধীনস্থ ছিল তখন আমি সেই দেশের কারাগারে দীর্ঘ আড়াই বছর কাটিয়েছি। কিন্তু এবারে আমার সফর হল যেন এক নতুন দেশে, নতুন ও স্বাধীন

বর্মাদেশে। সেই স্বাধীন বর্মায় জাপানের সামরিক শাসন সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে; ডক্টর বা ম এই নতুন রাষ্ট্রের প্রধান হয়েছেন, এবং তিনি একাধারে প্রধানমন্ত্রী ও সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং তিনি তাঁর মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন যে মন্ত্রীসভাকে পরামর্শ দেবে প্রিভি কাউন্সিল; স্বাধীন বর্মাদেশ ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, যারা এখনও বর্মাদেশকে পুনর্দখল করে আবার তাদের দাসত্বের বন্ধনে রাখবার স্বপ্ন দেখছে।

বর্মাদেশ জাপানের সঙ্গে একটা সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। বর্মায় ইতিমধ্যেই একজন জাপানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছেন। অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূতেরাও কিছুদিনের মধ্যে রেঙ্গুনে পৌঁছে যাবেন। অন্য দেশগুলিতে বর্মার রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করা হচ্ছে। বর্মার যাবতীয় ইঙ্গ-মার্কিন শত্রু সম্পত্তি জাপান নতুন বর্মী সরকারের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে কলকারখানা, বন্দর, রেল, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন। অতএব বর্মাদেশের সরকার এখন বর্মার জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে দেশ শাসন করবে। এবং তাদের সেনাবাহিনীতে সেনা ও অফিসারদের পদে কেবলমাত্র বর্মীরাই থাকবেন। সর্বশেষে এবং যা সমভাবেই ইঙ্গিতবাহী তা হল তাদের ময়ূর চিহ্নিত জাতীয় পতাকা আজ দেশের প্রধান— অধিপতি ডক্টর বা ম'র ভবনে শোভা পাচ্ছে— ইউনিয়ন জ্যাক নয়।

বর্মাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আজ আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং সেখানে আমি যা দেখেছি আর যা শুনেছি সেসব যদি আমি বর্ণনা করতে চাই তা হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাবে। সুতরাং কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করার পরে আমি প্রসঙ্গান্তরে যাব। প্রথমত রেঙ্গুনে জেলের বিষয়ে বলি। ১৯২৭ সালে আমি বেশ কয়েক মাস রেঙ্গুন জেলে কাটিয়েছি, সেইজন্য সেখানে আরও একবার যাবার আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমাকে সেখানে যাবার অনুমতি দেওয়া হল না কারণ সেই জেলে আর এখন ভারতীয় বন্দিদের রাখা হয় না, শুধুমাত্র ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দিদের জন্য সেই স্থানটি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে।

বন্ধুরা! সেই দিনের কথা চিন্তা করে দেখুন যখন ভারতের সব কারাগার ব্রিটিশ যুদ্ধবন্দিদের ক্যাম্পে পরিণত করে আমরা শত সহস্র ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের কারারুদ্ধ করে রাখার প্রতিশোধ নিতে পারব। এখন থেকে আপনারা সেই গৌরবময় দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকুন।

ডক্টর বা ম ও তাঁর মন্ত্রীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এবং আমি আপনাদের আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই যে সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধানের বিষয়ে আমাদের দুই পক্ষের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ একমত হতে পেরেছি। বর্মাদেশ ও ভারতবর্ষ এখন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে, এবং যখন সেই শত্রুকে আমরা চিরতরে বিনাশ করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব তখন আমরা দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারব।

বন্ধুরা! ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষ থেকে আমি অধিপতি ডক্টর বা ম'কে, তাঁর নতুন মন্ত্রীসভার সদস্যদের ও স্বাধীন বর্মাদেশের জনগণকে তাদের স্বাধীনতা অর্জনের উপলক্ষে আমার উষ্ণতম অভিনন্দন জানাই এবং এ ছাড়াও আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি যে বর্মাদেশের স্বাধীনতা যেন চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে ও ভবিষ্যতে যেন তাদের প্রগতি অব্যাহত থাকে। সৌভাগ্যক্রমে আজ আমাদের মাঝে রয়েছেন বর্মী প্রতিনিধিদলের সদস্যেরা। যাঁরা সম্প্রতি টোকিও সফর করেছেন। তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় উ বা লুইন। আপনাদের সকলের ও আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি উ বা লুইন ও তাঁর সহকর্মীদের উষ্ণতম স্বাগত জানাচ্ছি ও তাঁদের আমি অনুরোধ করছি যেন তাঁরা রেঙ্গুনে পৌঁছবার পরে আমাদের

শুভেচ্ছাবার্তা ব্যক্তিগতভাবে বর্মার জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেন।

বন্ধুরা! বর্মাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি আমাদের কাঁধে নতুন দায়িত্বভার অর্পণ করেছে। বর্মাদেশ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নের পর ভারতে পৌঁছানোর পথ উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং সেই পথ দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। যতদিন না আমরা ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করতে পারছি, বর্মাদেশের স্বাধীনতা নিরাপদ নয়। সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যে শুধু ভারতীয়দের জন্য প্রয়োজন তা নয়, বর্মার জনসাধারণের জন্যও তার প্রয়োজন আছে।

ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগের দাবি করার অপরাধে মহাত্মা গান্ধীকে কারারুদ্ধ করার পর এক বছর কেটে গেছে। তারপর থেকে আইনঅমান্য আন্দোলন ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ অপ্রতিরোধ্য গতিতে চলছে কিন্তু তবু আমরা আমাদের স্বাধীনতা পাইনি। এবং আমার বিশ্বাস যে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব না যতদিন আমরা ভারত-বর্মা সীমান্তে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারব এবং ভারতীয় জনগণকে ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সেনাদের ব্রিটিশ ও তাদের মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে উদ্বুদ্ধ করতে পারব।

পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের উপরে ভাগ্যের যে নির্দেশ এসেছে তা হল দ্বিতীয় একটা রণক্ষেত্র সৃষ্টি করা, যা ভারতীয় জনগণ বেশ কিছুদিন ধরেই দাবি করছিলেন। এর জন্য আমাদের পূর্ব এশিয়ার জনসম্পদ ও অর্থসম্পদকে সম্পূর্ণ রূপে কাজে লাগাতে হবে। আমি চাই রানি ঝাঁসির রেজিমেন্টসহ আজাদ হিন্দ ফৌজে (ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীতে) সর্বমোট ৩০০,০০০ নারী ও পুরুষ যোগ দিক। বিপুল সংখ্যায় ফৌজে নাম লেখানোর জন্য সায়োনান ও মালয়ের যুবশক্তির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সায়োনান থেকে যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা গেছে তা আমাদের প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের জন্য আমি সায়োনান থেকে অন্তত পক্ষে ৫ কোটি ডলার চাই, এবং আমি জানি এই অর্থ সংগ্রহ করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব।

আমি আশা করছি সেইদিন শীঘ্রই আসবে যখন আমরা স্বাধীন ভারতের জন্য এক আপৎকালীন সরকার গঠন করতে পারব। সেই কাজ সম্পন্ন করতে পারলে আমরা আমাদের নিজস্ব সরকারের নেতৃত্বে ভারতে প্রবেশ করতে পারব। সেনাবাহিনীতে ও সাধারণ জনগণের মধ্যে আমাদের সহসেনাদের আমি জানাতে চাই ভারতীয় জাতীয় বাহিনী এখন এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত। সায়োনান থেকে দিল্লি— অনেক দূর পথ— সুতরাং আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে যত শীঘ্র সম্ভব। আপনাদের মধ্যে যারা সুস্থ, সক্ষম ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, সকলকে আমি ডাক দিই এই যাত্রায় যোগ দেবার জন্য।

এর পরের দুই মাস, সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশ ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা শুরু করবে এবং তাদের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের হেড কোয়ার্টার্সও ভারতবর্ষের দিকে এগোতে থাকবে। আমি সেই দিনের আশায় আছি যখন আমাদের হেড কোয়ার্টার ভারত-বর্মা সীমান্তে পৌঁছবে।

আজকের এই সমাবেশে আমাদের মুসলমান বন্ধুদের বিপুল সংখ্যায় উপস্থিতি আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছে। তাঁরা আমাকে যেভাবে স্বাগত জানিয়েছেন এবং ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য তাঁরা দরাজ হাতে যে অর্থ সাহায্য করেছেন তার জন্য আমি তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এবং সমগ্র বিশ্ব আজ জানুক, আমাদের শত্রুরাও জানুক যে, পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আজ সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা জিতে নেবার জন্য তাঁরা যে কোনও সংগ্রামে দৃঢ়সংকল্প।

১৫

স্বদেশে ভারতীয়দের জন্য আধ্যাত্মিক ও সামরিক সাহায্য

[১৮ আগস্ট ১৯৪৩, সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত বিবৃতি][১]

'কো-প্রসপ্যারিটি স্ফিয়ার'-এর সব অঞ্চলগুলিতে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে এক দফা পরিদর্শনের পর, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের প্রেসিডেন্ট ও আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক মিস্টার এস সি বোস সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'বর্তমানে ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ক্রমশই অনিশ্চিত ও আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করবার পর থেকে গত এক বছরে ব্রিটিশ সরকারের সুপরিচালিত সন্ত্রাস সেই আন্দোলনকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। এখন বিপ্লবের আগুন স্তিমিত এবং তাদের কার্যকলাপ নিতান্তই নগণ্য। আজ আমাদের সামনে দু'টি পথ খোলা আছে। প্রথমত, দেশপ্রেমিক যারা স্বদেশবাসীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা বাড়াবার জন্য সব ধরনের পন্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত, তাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক রসদ যোগানো। স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার বা আর্জি হুকুমত-এ-আজ়াদ হিন্দ (সংক্ষেপে আজ়াদ হিন্দ সরকার) গঠন করতে পারলে স্বদেশে ভারতীয়দের মনোবল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত, তাদের কার্যকরী সামরিক সাহায্য যোগানো। প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি স্বদেশের ভারতীয় সেনাদলের অধিকতর সহযোগী মনোভাবে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এখন স্বদেশের আন্দোলনের প্রয়োজন অনুসারে আমাদের ভবিষ্যতে কার্যকলাপের কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ প্রধানত সামরিক বিষয়গুলির উপরেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আমার সাম্প্রতিক সফরের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে আমি বলতে পারি যে সর্বত্র প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকার গঠনের ঐকান্তিক আগ্রহ আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী পিবুল সনগ্রাম ও বর্মাদেশের রাষ্ট্রপতি ডক্টর বা ম'র সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তাঁরা দু'জনেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য ও সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আগামী যুদ্ধে যা প্রয়োজন তার জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আমাদের সকল সহসেনার নামে আমরা এই শপথ নিয়েছি যে স্বাধীনতা অর্জনের মহান লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যা কিছু বাধা আমাদের পথে পড়বে সব কিছু অতিক্রম করবার জন্য আমরা আজ কৃতসংকল্প।'

—সিঙ্গাপুর রেডিয়ো, ১৮ আগস্ট, ১৯৪৩।

---

১. *Testament of Subhas Bose*, pp. 148-149.

১৬

বাংলার মন্বন্তর

[২০ আগস্ট ১৯৪৩ তারিখে সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত বিবৃতি][১]

বেতার বিবৃতির সময় প্রসঙ্গক্রমে নেতাজি বলেন, 'ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে ও কলকাতায় এখন এক ভয়াবহ মন্বন্তর চলছে। ভারতবর্ষ থেকে এই রিপোর্ট পাওয়ায় পূর্ব এশিয়ার ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ভারতীয়দের পরিস্থিতি সম্পর্কে অত্যন্ত বিচলিত, এবং তাদের পক্ষে সম্ভাব্য সর্বতো প্রকারে তারা ভারতীয়দের সাহায্য করবার জন্য চেষ্টা করছে। আজ আমি আপনাদের কাছে এই কথা জানাতে পেরে স্বস্তিবোধ করছি যে বর্মাদেশ থেকে ভারতবর্ষের ক্ষুধার্ত জনগণের জন্য ১০০,০০০ টন চাল পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে যার জন্য কোনও শর্ত আরোপ করা হয়নি। বর্তমানে এই ১০০,০০০ টন চাল ভারতের কাছাকাছি কোনও বন্দরে অপেক্ষা করছে। যে মুহূর্তে ব্রিটিশ সরকার এই খাদ্য সম্ভার গ্রহণ করার সম্মতি দেবে তখনই বন্দরের, ও যে কর্তৃপক্ষ এই চাল ব্রিটিশ সরকারের হাতে দেবে তাদের নাম ঘোষণা করা হবে। একই সঙ্গে জাপান সরকারের কাছ থেকেই চালবাহী জাহাজগুলির নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি চাওয়া হবে।' মিস্টার বোস আরও ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ সরকার এই প্রথম দফার সাহায্য গ্রহণে সম্মতি দেয় তা হলে দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতীয় জনগণের জন্য আরও সাহায্য পাঠানো হবে। মিস্টার বোস বলেন যে তাঁর একান্ত আশা যে ব্রিটিশ সরকার সাহায্য গ্রহণে সম্মতি দেবে কারণ তা হলে লক্ষ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ ও ছোট ছেলেমেয়েরা অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবে।

—রেঙ্গুন রেডিয়ো, ২০ আগস্ট ১৯৪৩

---

১. *Testament of Subhas Bose*, pp. 203.

১৭

৩৮ কোটি স্বদেশবাসীর সেবক

[২৫ আগস্ট ১৯৪৩ তারিখে আইএনএ-র সর্বাধিনায়কের প্রত্যক্ষ দায়িত্বভার গ্রহণ উপলক্ষে প্রচারিত দিনের বিশেষ বার্তাদেশক্রমে][১]

শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনী ও আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং এই দিনের বিশেষ বার্তাদেশ সম্প্রচার করলেন যা নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও আজ়াদ হিন্দ ফৌজের স্বার্থে আমি আজ থেকে আমাদের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের প্রত্যক্ষ দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি।

আজ আমার পরম আনন্দ ও গৌরবের দিন— কারণ একজন ভারতীয়ের পক্ষে ভারতীয় মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদগ্রহণ করার থেকে বেশি সম্মানজনক আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু যে দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি তার গুরুত্ব সম্বন্ধেও আমি সচেতন, এবং দায়িত্বের এই গুরুভার আমি সর্বাংশে অনুভব করছি। ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে ভারতের প্রতি কর্তব্য সাধনে সর্বপ্রকার পরিস্থিতিতে তিনি যেন আমাকে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান, সেই পরিস্থিতি যত কঠিন ও যত দুঃসাধ্য হোক না কেন।

আমি নিজেকে আমার ৩৮ কোটি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী স্বদেশবাসীর সেবক বলে মনে করে থাকি। আমি এমনভাবে আমার কর্তব্যসাধনে বদ্ধপরিকর যাতে এই ৩৮ কোটি দেশবাসীর স্বার্থ যেন আমার হাতে নিরাপদ থাকে এবং যাতে ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ যথার্থ কারণে আমার উপরে তাদের পরিপূর্ণ আস্থা রাখতে পারে। কেবলমাত্র নিখাদ স্বদেশপ্রেম এবং নিখুঁত ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার ভিত্তিতেই ভারতীয় মুক্তিবাহিনী গঠন করা সম্ভব।

আমাদের মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আগামী দিনের সংগ্রামে, ৩৮ কোটি ভারতীয় জনগণের আশীর্বাদধন্য স্বাধীন ভারতের সরকার স্থাপনে, এবং ভারতবর্ষের জন্য স্থায়ী সেনাবাহিনী গঠনে, যা সর্বসময়ের জন্য স্বাধীন ভারতের সুরক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকবে, এই সব কাজগুলির জন্য আজ়াদ হিন্দ ফৌজের এক অপরিহার্য ভূমিকা আছে। এই ভূমিকা পালনে আমরা অবশ্যই এমন এক সেনাবাহিনীর সঙ্গে নিজেদের অঙ্গীভূত করব যার একটি মাত্র লক্ষ্য থাকবে— যা হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, এবং একটি মাত্র অভীপ্সা— যা হল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম। আমরা যখন রুখে দাঁড়াব তখন আজ়াদ হিন্দ ফৌজের প্রতিরক্ষা হবে গ্র্যানাইটের দেওয়ালের মতো অভেদ্য; যখন আমরা এগিয়ে

---

১. *On To Delhi*, pp. 62-63.

যাব তখন আজ়াদ হিন্দ ফৌজের গতি হবে স্টিমরোলারের মতো, যা শত্রুদের পায়ের তলায় নিষ্পেষণ করে এগোবে।

আমাদের কাজ সহজ হবে না, এই যুদ্ধ হতে চলেছে সুদীর্ঘ ও সুকঠিন; কিন্তু ন্যায়বিচারের উপর, এবং আমরা যে এই সংগ্রামে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে পারব সেই বিশ্বাসে আমার অবিচল আস্থা আছে। পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজের এক পঞ্চমাংশ এই ৩৮ কোটি মানুষের অধিকার আছে স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করবার এবং আজ তারা সেই স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত। সুতরাং পৃথিবীতে আজ এমন কোনও শক্তি নেই যা এর পরেও স্বাধীনতার জন্য জন্মগত এই অধিকার থেকে আমাদের বঞ্চিত রাখতে পারে।

কমরেডগণ! অফিসার ও জনগণ! আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও অপরিসীম আনুগত্য আজ়াদ হিন্দ ফৌজকে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার করে তুলবে। চূড়ান্ত লড়াইয়ের শেষে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী, আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি।

আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে। "দিল্লি চলো" এই আহ্বান আমাদের কণ্ঠে নিয়ে আসুন আমরা আমাদের কর্মব্রতে নিযুক্ত থাকি এবং আমরা আমাদের সংগ্রামে অবিচল থাকব যতদিন না আমাদের জাতীয় পতাকা নতুন দিল্লির ভাইসরয়ের ভবনে উত্তোলিত করতে পারি এবং ভারতের রাজধানী প্রাচীন লালকেল্লার অভ্যন্তরে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ তাদের বিজয় কুচকাওয়াজ করতে পারে।'

সুভাষ চন্দ্র বসু
সিপাহ্-সালার
(সর্বাধিনায়ক)

হেডকোয়ার্টার্স, সিপাহ্-সালার
আজ়াদ ফৌজ,
২৫ আগস্ট ১৯৪৫

১৮

আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

[২৫ আগস্ট ১৯৪৩, আইএনএ-র অফিসারদের কাছে দেওয়া ভাষণ][১]

অফিসার ভ্রাতৃবৃন্দ! আমার ইচ্ছা যে আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হই যাতে আমাদের সকলের যেন জানা থাকে আমাদের কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে, আমাদের কোন কোন কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং কী করলে সেই কর্তব্য ও দায়িত্ব আমরা সন্তোষজনকভাবে পালন করতে পারব।

প্রথমত, আমার সম্বন্ধে আমি আপনাদের কিছু বলব কারণ একজন ব্যক্তি হিসাবে আমার যে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে সেই বিষয়ে, এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়ে আমি আপনাদের জানাতে চাই কেননা ভবিষ্যতে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে, একই পথে আমাদের চলতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করবার পরে রাজনীতির জগতে আমার প্রবেশ। সেই সময় আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল: গত যুদ্ধের সময় ভারতীয়রা কী করেছিল: তার ফলাফল কী হয়েছিল এবং তা থেকে আমরা ভবিষ্যতের জন্য কোন কোন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করেছিলাম? ভারতবর্ষে ও ইংল্যান্ডে আমাদের অভিজ্ঞতা যা হয়েছিল তা থেকে বলা যেতে পারে যে আমাদের নেতৃবৃন্দের নীতি নির্ভুল ছিল না। এটা ঠিক যে আমাদের করণীয় কী সেই বিষয়ে নির্দেশের জন্য আমরা আমাদের নেতাদের উপরে নির্ভর করেছিলাম। কিন্তু আমরা, তরুণ যুবক ও ছাত্রছাত্রীরা নিতান্তই আশাহত হয়েছিলাম। আমাদের মনের মধ্যে একটাই ভাবনা বাসা বেঁধেছিল, সেটা হল গত যুদ্ধের সময় যে ভুল আমাদের নেতারা করেছেন কোনও মতেই যেন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না হয়। আমরা ভেবেছিলাম যে ভবিষ্যতে যদি আমরা কখনও সুযোগ পাই তা হলে আমরা সেই একই ভুল আর করব না।

আরও একটা বড় প্রশ্ন ছিল। ইউরোপে যুদ্ধের পর, ১৯১৮ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল: নতুন সরকার গঠিত হচ্ছিল, যুদ্ধের আগে যে সরকারের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য থেকে চেক নাগরিকেরা বেরিয়ে এসেছিল। অন্যদিকে আরেকটা জাতি, পোলিশরা তাদের নিজস্ব সরকার গঠন করেছিল। আমি যখন ইউরোপে যাই, সেখানে দুই-তিনজন ভারতীয় নেতার সঙ্গে আমার আলাপের সুযোগ ঘটেছিল। তাঁরা সকলেই আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে যদি আমরা আমাদের মাতৃভূমির জন্য কিছু করতে চাই, তা হলে আমাদের অবশ্যই যুদ্ধের ইতিহাস ভাল করে

১.On To Delhi, pp. 64-67, মূল হিন্দি ভাষায় লেখা ভাষণের ইংরেজি অনুবাদ থেকে অনূদিত।

জানতে হবে এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সেই ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। আমরা তখন পড়তে শুরু করলাম, ও বুঝতেও শুরু করলাম। আমরা জানলাম কীভাবে কিছু কিছু চেক নেতা তাঁদের দেশ ছেড়ে গিয়েছিলেন প্রচারের কাজ করবার জন্য এবং অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির শত্রুদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। তাঁরা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন এবং এই দুই দেশের সরকারই চেক নেতাদের সাহায্য করেছিল, এমনকী যুদ্ধের পরে তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন সরকার গঠনের অধিকারকেও তারা স্বীকৃতি দিয়েছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিল। চেক নেতারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের কাজ শুরু করেছিলেন ও চেকোস্লোভাকিয়ার বাইরে বসবাসকারী সব চেক জনগণকে তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সেনাদলের কর্মরত যেসব চেক সৈন্য শত্রুর হাতে ধরা পড়েছিল তারাও চেক জাতীয় সেনাদলে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে যোগ দেয় যার ফলে চেক সেনাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২০,০০০। এই সেনাদল ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পাশাপাশি অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করে। পোল্যান্ডের জনগণও ৩০,০০০ সেনা সমৃদ্ধ এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল ও তারাও এই যুদ্ধে যোগ দেয়। ভাগ্য তাদের সহায় ছিল, তাই যুদ্ধে জার্মানি ও তার সহযোগী দেশগুলি পরাভূত হওয়ায় চেক ও পোলিশরা তাদের নিজস্ব সরকার গঠনে সক্ষম হয়। আমাদের সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে আমরাও সেই একই পথ অনুসরণ করতে পারি এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমরা ব্রিটেনের শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করতে পারি।

আয়ারল্যান্ডের জনগণও যুদ্ধাবস্থার সুযোগ নিয়েছিল। তারা শিন ফেইন পার্টির অধীনে খোলাখুলিভাবেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ডাবলিন শহরে, শিন ফেইন পার্টির সেনাদলের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,০০০। দেশের অন্যত্র তাদের সেনাবাহিনী ছিল ১০,০০০ সংখ্যা বিশিষ্ট। তাদের পরিকল্পনায় কিছু ত্রুটি ছিল, যার ফলে ডাবলিনে যে বিদ্রোহ শুরু হল তা দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ল না। তবু তারা দীর্ঘ ৮ দিন ডাবলিন শহর তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ইস্টারের সময় এই বিদ্রোহ ঘটেছিল বলে এর নাম ইস্টার বিপ্লব। ১৯১৬ সালে বিদ্রোহ সাফল্য লাভ না করলেও, ১৯১৯ সালে ঠিক যুদ্ধের পরেই, আবার বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং তখন তাদের স্বেচ্ছা সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫,০০০। এইবার ফলাফল কিন্তু ভিন্ন হল। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার ফলে ইংল্যান্ড থেকে সৈন্য এনে বিদ্রোহীদের দমন করার চেষ্টা করা হল। তা সত্ত্বেও ৫,০০০ স্বেচ্ছা সৈনিকের এই বাহিনী তাদের লড়াই অব্যাহত রাখল ও শেষে এদের কাছে ব্রিটিশদের নতি স্বীকার করতে হল।

গত যুদ্ধের ইতিহাস পর্যালোচনা করে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা ভারতবর্ষে কাজ শুরু করি ১৯২১ সালে। সেই সময় আপনারা জানেন মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। খিলাফত কমিটিও তখন কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছিল। আমরাও সোৎসাহে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম এবং আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে যখনই সুযোগ আসবে তখনই আমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব। আমাদের জানা ছিল যে জার্মানি আবার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে এবং সেই সঙ্গে আমাদের হাতেও সুযোগ আসবে।

আমরা ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসে যোগ দিই, কারণ তখন আমাদের

লড়াই অব্যাহত রাখার জন্য ও ব্রিটিশদের নির্মম অত্যাচারে নির্যাতিত জাতির সম্মান বজায় রাখার জন্য অন্য কোনও পথ আমাদের সামনে খোলা ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান তখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু আমাদের নিশ্চিত ভাবে জানা ছিল যে আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষ কখনও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে না। অবশ্যই এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করছিল এবং তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করছিল। ১৯২১ সালের পর থেকেই আমরা হাতে অস্ত্র তুলে নেবার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, এবং সেই সুযোগ এল ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হওয়াতে।

এটা আমার একার দৃষ্টিভঙ্গি নয়, ১৯২১ সালে আমার মতো অনেক যুবক যারা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল তাদের অনেকেরই এই মতামত ছিল। নিশ্চয়ই কিছু যুবক ছিল যারা অহিংসায় বিশ্বাস করত, কিন্তু অধিকাংশেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সশস্ত্র বিপ্লবে এবং তারা শুধুমাত্র সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

আমি ১৯৩৩ সালে ইউরোপে যাই ও সেখানে আমি ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ছিলাম। আমার ইউরোপে যাবার উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং এর পরে কী ঘটতে যাচ্ছে সেই বিষয়ে জানবার চেষ্টা করা। ইউরোপ ভ্রমণের সময় আমি বার্লিনেও গিয়েছিলাম এবং সেখানে আমি কয়েকজন সরকারি আমলার সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমি তাদের সোজাসুজি প্রশ্ন করি যে কবে তারা আবার ব্রিটেন আক্রমণ করার কথা ভাবছে যাতে আমরা ভারতীয়েরাও সেই সময় একই সঙ্গে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারি। উত্তরে তারা জানায় যে তারা একেবারেই ব্রিটেনের সঙ্গে কোনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার কথা ভাবছে না এবং তারা আশা করে যে ব্রিটেন তাদের সব দাবিগুলো মেনে নেবে। তারা ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ মীমাংসায় পৌঁছতে পারবে বলে আশা করছে। তবে তারা ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়ে তাদের সমর্থন ও সহানুভূতি প্রকাশ করে। আমি তাদের সঙ্গে তর্ক করি, ভারতীয় হিসাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ব্রিটিশদের ভণ্ড দু'মুখো দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনীতির কূটকৌশলের কথা যেমনভাবে আমার জানা আছে সেই বিষয়ে উল্লেখ করে আমি তাদের সাবধান করে দিয়ে বলি যে যখন ব্রিটেন দেখবে যে জার্মানি ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে তখন তারা নিজেরাই প্রত্যক্ষ যুদ্ধে সামিল হবে। এবং সব শেষে আমি বলি 'ব্রিটেনের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকালীন শত্রুতা। আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়ব, তোমরা আমাদের সমর্থন করো বা না করো।' কিন্তু আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না যে অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপে আবার যুদ্ধ শুরু হবে। জার্মানিতে এই সময় যুদ্ধের জন্য যে বিপুল প্রস্তুতি চলছিল সেটা দেখার পরে কারুর মনেই এই বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। এবার যখন আমি আবার ইউরোপে গেলাম তখন আমি ১৯৩৬ সালে তাদের যে কথা বলেছিলাম সেই বিষয়ে তাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম।

আমার এই কথাগুলো বলবার উদ্দেশ্য হল যে ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে সেই বিষয়ে আমার একটা দৃঢ় ধারণা নিয়ে আমি ইউরোপ থেকে ফিরে এলাম। জার্মানিতে যে নতুন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসেছে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আমি স্পষ্টতই বুঝেছিলাম যে জার্মানদের দাবি ব্রিটিশ মেনে নেবে না, এবং যখন তারা বুঝবে যে জার্মানি ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠছে তখনই তারা নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। ১৯৩৮ সালে আমি যখন ইউরোপে যাই তখন কিছু কিছু পরিবর্তন আমার চোখে পড়ে। জার্মানদের তখন

ধীরে ধীরে এই উপলব্ধি হচ্ছে যে ব্রিটিশরা কখনই তাদের প্রস্তাব পুরোপুরি মেনে নেবে না। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন জার্মানি সুদেটান জার্মানদের বিষয়টা তুলে ধরে তখন মিস্টার চেম্বারলেইন মিউনিখে ছুটে গেলেন হের হিটলারের সঙ্গে একটা ঐকমত্যে পৌঁছবার জন্য। এমন একটা সময় ছিল যখন সাধারণভাবে আন্তর্জাতিক স্তরের সব আলোচনাগুলো হত লন্ডনে। কিন্তু যখন আমি দেখলাম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার চেম্বারলেইন তাঁর নিজের দেশ ছেড়ে জার্মানিতে যাচ্ছেন ও তিনি জার্মানদের দাবিগুলো মেনে নিচ্ছেন তখন আমি এর সহস্যটা বুঝতে পারলাম— ব্রিটেনের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে ও জার্মানির শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্রিটিশ ইতিহাসে এই প্রথম ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী, তাঁদের সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে অন্য কোনও দেশে গেলেন তাদেরই দাবি মেনে নিতে।

তখন, আমি ভারতে এই মর্মে প্রচার শুরু করি যে ইউরোপে আবার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং ভারতীয়দের কর্তব্য হল সেই বিষয়ে সচেতন থাকা ও আমাদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য ব্রিটিশদের বাধ্য করতে চেষ্টা করা। এবং তারা যদি সেটা না মেনে নেয় তা হলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। জনগণের উপরে আমার প্রচারের প্রতিক্রিয়া আমি লক্ষ করছিলাম এবং আমি এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত ছিলাম যে আমার কথার উপরে জনসাধারণের সম্পূর্ণ আস্থা ও সমর্থন ছিল। কিন্তু আমাদের নেতারা অন্যভাবে চিন্তা করছিলেন, বিশেষত মহাত্মা গান্ধীর নীতি ছিল "অপেক্ষা করো আর দেখো কী হয়"। কিন্তু আমরা অল্পবয়সিরা সেই অপেক্ষা করার নীতি অনুসরণ করতে চাইনি। আমরা আমাদের প্রচারের কাজ দ্বিগুণ উৎসাহে শুরু করি। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সামনে যে সুবর্ণ সুযোগ আসছে তার সদ্ব্যবহার করবার জন্য আমরা ভারতের জনগণকে আহ্বান জানাই।

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে, ত্রিপুরীতে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে, আমি এই মর্মে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করি যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে ভারত ছেড়ে চলে যাবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটা চূড়ান্ত দাবি পাঠানো হোক। এবং যদি এই সময়ের মধ্যে যদি তারা সেই দাবি মেনে না নেয় তা হলে আমাদের যতটুকু সাধ্য তার সবটুকু নিয়োগ করে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। অবশ্যই উত্তেজনাপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা মনে রেখেই চূড়ান্ত দাবির এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছিল কারণ আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা ছিল যে আগামী ছয় মাসের মধ্যে ইউরোপে বিধ্বংসী যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন যুদ্ধ প্রকৃতই শুরু হল, তখন আমি মার্চ মাসে যা বলেছিলাম তার যাথার্থ্য জনসাধারণ উপলব্ধি করতে থাকলেন। সেই সময় আমাদের কর্তব্য ছিল জাতীয়তাবাদী সকল শক্তিগুলোকে সঙ্ঘবদ্ধ করে ব্রিটিশ সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করা যাতে তারা আমাদের দাবি মেনে নেয়, এবং সেই কাজে ব্যর্থ হলে আমাদের দাবির জন্য লড়াই করা। কিন্তু আমাদের নেতাদের চিন্তাধারা ও কার্যপদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তাঁদের ধারণা ছিল যে যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশরা উত্তরোত্তর দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তখন ভারতীয়দের সাহায্য পাবার জন্য তারা কংগ্রেসের সঙ্গে একটা সম্মানজনক মীমাংসায় আসবে। আমি এই ধারণার অযৌক্তিকতা তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি এবং বলেছি যে যুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ শক্তি যতই দুর্বল হয়ে পড়ুক না কেন তারা কখনই ভারতবর্ষে তাদের ক্ষমতা আমাদের হাতে তুলে দেবে না। যতই তাদের শক্তিক্ষয় হতে থাকবে ভারতের উপরে তাদের শাসনের বাঁধন ততই চেপে বসবে। ভারতবর্ষ তাদের হাতছাড়া হয়ে গেলে তারা কখনওই সাফল্যের সঙ্গে

যুদ্ধ জিততে পারবে না। যতই তারা দুর্বল হতে থাকবে ততই তারা আমাদের দেশের সম্পদ লুঠ করতে থাকবে।

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে, যখন কংগ্রেসের অধিবেশন চলছে, আমরা আশা করেছিলাম যে আমাদের কাজে আমরা আরও একটু অগ্রসর হতে পারব। কিন্তু গান্ধীজি তাঁর নিজের মতে চললেন। তিনি তাঁর "অপেক্ষা করো আর দেখো কী হয়" নীতিতে অটল রইলেন। আমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হল এবং আমরা ফলাফলের তোয়াক্কা না করে আমাদের পথে এগিয়ে যাবার জন্য উদগ্রীব হলাম। সারাদেশ জুড়ে যুদ্ধ বিরোধী একটা আন্দোলন শুরু হল এবং সেটা বেশ গুরুতর আকার ধারণ করল; বহু দেশবাসী কারাবরণ করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আমি খবর পেলাম যে ব্রিটিশ সরকার কিছুই না করায় গান্ধীজি নিজেই নভেম্বর মাসে একটা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে চলেছেন। আমি এই খবরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম কারণ গান্ধীজি যদি কোনও আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেন তা হলে সারা বিশ্বে তার একটা প্রতিক্রিয়া হবে। সারা পৃথিবীর লোক জানবে যে ভারতবাসীরা তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। পৃথিবীর সব জাতি তখন উপলব্ধি করবে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাবার ন্যায্য অধিকার আছে। আমরা আমাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব ও সারা বিশ্বের সমর্থনও পাব।

কিন্তু আমার মনে হয়েছিল যে শুধুমাত্র আইন অমান্য আন্দোলনের হাতিয়ার নিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা পাব না। এই আন্দোলনে সরকারের উপরে নিশ্চয়ই চাপ সৃষ্টি করা যাবে ও যুদ্ধ চলাকালীন সেই চাপ তাদের জন্য অনুকূল হবে না, কিন্তু সরকার আমাদের দাবি কখনওই মেনে নেবে না। এটাই আমার নিজের ধারণা ছিল। আমরা ভাবছিলাম যে কী করা যায়? অন্য আর কোন পন্থা উদ্ভাবন করা উচিত? অল্পবয়সিরা বোমা ও রিভলবার দিয়ে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। আমি এই তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমার ধারণা ছিল। যদিও তারা ছিল অত্যন্ত তেজস্বী ও বিপ্লবের মন্ত্রে প্রকৃতই বিশ্বাসী, কিন্তু তাদের শক্তি ও ত্যাগ আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যথেষ্ট ছিল না।

তখন আমরা ইতিহাসের পাতায় আমাদের দৃষ্টি ফেরালাম, এবং সেখানে আমরা বহু উদাহরণ দেখলাম ও বহু বিষয়ে শিক্ষালাভও করলাম। আমেরিকার উদাহরণ আমাদের সামনে ছিল। আমি উপলব্ধি করতে শুরু করলাম এবং এমনকী এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হলাম যে বহির্বিশ্ব থেকে সাহায্য না পেলে ভারতীয় বিপ্লব সফল হবে না। যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের কাছ থেকে বহু সাহায্য পেয়েছিল, এমনকী ফ্রান্স থেকে জেনারেলদেরও পাঠানো হয়েছিল। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন নয়।

ভারতে আমাদের কাছে যে সংবাদ পৌঁছত, তা বিকৃত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রচারমূলক ছিল। ব্রিটিশদের পক্ষে সেটা করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু বিশ্বের সর্বত্র প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে, ভারতের অভ্যন্তরে থেকে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। যুদ্ধের ফলাফল কী হবে, কী ভাবে যুদ্ধের শেষ হবে ও শেষে কে জয়ী হবে? ভারতের বাইরে যে ভারতীয়েরা আছেন তাদের চিন্তা ভাবনা কেমন, ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সম্বন্ধে তাঁরা কী ভাবছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাঁদের কাছ থেকে কী সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এবং ব্রিটেনের শত্রুপক্ষের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে কি? এই সব প্রশ্ন আমাদের চিন্তা করতে

বাধ্য করল যে ভারতবর্ষের বাইরে কাউকে পাঠানো দরকার। আমি কয়েকজনকে বিদেশে পাঠানোর কথা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের চলাফেরা এতটাই কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ ছিল যে বিদেশে কাউকে পাঠানো অবশ্যই একটা সহজ কাজ ছিল না। এবং আমি আরও ভাবলাম যে যিনি ভারতবর্ষের বাইরে যাবেন তাঁকে এমন একজন হতে হবে যাঁকে ব্রিটিশরা প্রকৃত 'বোঝে' এবং ভারতীয় জনগণের চোখে তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শেষে আমি নিজেই ভারতের বাইরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি সেই সময় জেলে বন্দি। জেল থেকে বার হওয়া একটা কঠিন সমস্যা। জেল থেকে পালালে ব্রিটিশ সিআইডি-র চোখ এড়িয়ে দেশের বাইরে যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে। শেষে আমি অনশন ধর্মঘট করব স্থির করলাম। এই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আমি আমার মনকে শক্ত করলাম যে হয় আমি জেলের বাইরে যাব অথবা মৃত্যুবরণ করব। সরকার যখন আমার সিদ্ধান্ত জানতে পারল তখন সরকারি মহলে কিছুটা আলোড়নের সৃষ্টি হল, কারণ জেলে আমার মৃত্যু হোক সেটা তারা কখনওই চাইবে না। জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট এসে আমাকে অনশন না করবার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। তিনি এই যুক্তি দেখালেন যে সব বন্দিরা যদি অনশন করতে শুরু করে তা হলে সরকারি কাজকর্ম অচল হয়ে যাবে এবং আমাকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে জেলে যদি আমার মৃত্যু হয় তা হলে আমিই তার জন্য দায়ী হব। আমার অনশন চলল ছ'দিন ধরে। তারা আমাকে জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করতে থাকল কিন্তু আমি সংকল্প করেছিলাম যে আমি যতীন্দ্রনাথ দাসের মতো মৃত্যুবরণ করব। সাতদিন পরে রাজভবনে একটা গোপন বৈঠক বসল। আমার মেডিকেল রিপোর্টগুলো বেশ গুরুতর চেহারা নিচ্ছিল, সেইজন্য তারা কিছু একটা করতে বাধ্য হল। আমাকে তারা মুক্তি দিল এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে আবার এক মাসের মধ্যে আমাকে তারা গ্রেফতার করবে। সময় হাতে থাকতে এই খবরটা পাওয়ায় আমার পক্ষে ভারত ত্যাগের বিষয়ে কিছুটা প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়েছিল এবং আমি ভারত ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

মাতৃভূমি ছাড়বার পরে আমার অনেকেই অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি দুই পক্ষের রেডিয়ো শুনেছি। জার্মান কর্তৃপক্ষের দাক্ষিণ্যে আমার শত্রুপক্ষের রেডিয়ো ও তাদের অপপ্রচার শুনেছি। ইউরোপের সবর্ত্র যুদ্ধের যে প্রস্তুতি চলেছে ও যেভাবে তারা তাদের সামরিক নিরাপত্তা গড়ে তুলেছে সেগুলো আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে। এই সব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, যুদ্ধের ফলাফল যে কী হবে সেই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আপনাদের কুচকাওয়াজের সময় সেদিন আপনাদের আমি যা বলেছিলাম সেই কথাই আবার বলব, এই যুদ্ধ চলবে দীর্ঘকাল। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যুদ্ধের ফলাফল হবে একটাই, তা হল ব্রিটিশদের পরাজয় ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন।

এখন প্রশ্ন হল, সেই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের অবস্থা কী দাঁড়াবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য এবং তার ফলে গোটা দুনিয়ার মানচিত্র বদলে দেবে। সেই নতুন মানচিত্রে ভারতের স্থান কোথায় থাকবে? ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হবে, কিন্তু আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে? আমাদের সেই বিষয়ে চিন্তা করতে হবে। তিনটে বিকল্প পথ আছে।

এক হচ্ছে, যুদ্ধ থেকে দূরে থাকা, একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়া। দ্বিতীয় পথ হল, নতুন যে দেশ ভারত অধিকার করবে তাদের কাছে গিয়ে স্বাধীনতা ভিক্ষা করা এবং তৃতীয়ত, ব্রিটেনের শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেওয়া এবং আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের অধিকার জিতে নেওয়া। আমি জানি এর মধ্যে কোন পথটি আপনাদের কাম্য। আমাদের সামনে একই

পথ খোলা আছে, তা হল ব্রিটেনের শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়াই করা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিলোপ করবার জন্য আমাদের যা করণীয় সে কাজটুকু করা।

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুবই শোচনীয়। আমাদের কর্তব্য হল ভারতের মধ্যের শক্তিগুলি যাতে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতে পারে সেই কাজে তাদের উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা। আজ ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কেমন? সমগ্র জাতি আজ ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে। কোনও অস্ত্র ছাড়া মানুষ আজ লড়াইয়ে নেমেছে। কোটি কোটি নিরস্ত্র মানুষকে পদানত করে রাখার জন্য আধুনিক অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত মাত্র কয়েক হাজার সৈন্যের সেনাবাহিনীই যথেষ্ট। যখন হের হিটলারের সঙ্গে আমার দেখা করার সুযোগ হয়েছিল তখন আমি তাঁকে ভারতবর্ষের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম ও কোন পথটি আমাদের নেওয়া উচিত সেই বিষয়ে তাঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। জার্মানির চ্যান্সেলর, যিনি নিজেও একজন অভিজ্ঞ বিপ্লবী, তাঁর নিজের মত জানিয়ে আমাকে বলেছিলেন যে সামরিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কয়েক সহস্র সৈন্যের পক্ষে সহজেই কোটি কোটি নিরস্ত্র বিপ্লবীকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তিনি আরও যোগ করেছিলেন যে যতক্ষণ না বাইরের কোনও শক্তি এসে সমুখ সমরে সাহায্য না করছে ততক্ষণ আভ্যন্তরীণ অবস্থার কোনও পরিবর্তনের আশা নেই। সেই বাইরের শক্তি গড়ে তোলার কাজ অংশত আমাদেরই করতে হবে। আমরা এখন প্রায়ই দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের কথা শুনতে পাই। আমাদের সেই দ্বিতীয় রণক্ষেত্র সৃষ্টি করতে হবে। অক্ষশক্তি তাদের পঙ্গু করে না দিলে হয়তো দু'টি রণক্ষেত্রেই আমাদের তাদের মুখোমুখি হতে হত। অক্ষশক্তি গোষ্ঠী আমাদের কাজ সহজ করে দিয়েছে। সেইজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই, কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্বদেশের প্রতি আমাদের কর্তব্যসাধনের দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। এই কাজের জন্য ৫০,০০০ সৈন্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনীই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের এমন ভাবে প্রস্তুত হতে যাবে আমরা ৩০০,০০০ সৈন্য বিশিষ্ট সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারি।

তা হলে প্রশ্ন হল: এই সেনাবাহিনীর কর্তব্য কী? দু'টি কর্তব্য আছে যা এই সেনাবাহিনীকে করতে হবে। অবশ্যই প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে স্বদেশকে স্বাধীন করা; কিন্তু দ্বিতীয় কর্তব্যের গুরুত্বও কিছু কম নয়। শত্রুকে পরাভূত করার পর, ভারতবর্ষে আমাদের যে কাজ করতে হবে তার পরিমাণও বিশাল। দেশকে স্বাধীন করলেই আমাদের কর্তব্যের শেষ হবে না। আমাদের বাহিনী হবে এক বিপ্লবী বাহিনী, এবং বিপ্লবীর ভূমিকায় আমাদের কর্তব্য দ্বিবিধ। প্রথম কর্তব্য, যা আমি আগেই বলেছি, ভারত থেকে শত্রু বিতাড়ন, এবং আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হল ভারতে এমন শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা, যে বাহিনী যে কোনও এক বা একাধিক দেশের সেনাদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হবার ক্ষমতা রাখবে ও বিদেশি আক্রমণের হাত থেকে ভারতকে সর্বসময়ের জন্য নিরাপত্তা দিতে পারবে।

বন্ধুরা! আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে যে আমরা আর কখনও দাসত্ব স্বীকার করব না। দাসত্বের স্বাদ আমরা ইতিমধ্যেই বেশ ভালভাবে পেয়েছি। বিদেশি আক্রমণের হাত থেকে মাতৃভূমিকে সুরক্ষা দিতে হলে আপনাদের সকলের কর্তব্য হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার দিক থেকে বিচার করলে আমি জানি আপনারা কারুর থেকে খাটো নন। আমরা যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সুযোগ পাই না, কিন্তু যখনই ভারতীয়েরা সেটা পেয়েছেন তখনই তাঁরা তাঁদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। কেবলমাত্র সামরিক ক্ষেত্রেই নয়, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও ক্রীড়াক্ষেত্রে, আমরা

ভারতীয়েরা কোনওখানেই পিছিয়ে নেই। ভারতীয়েরা দক্ষ ও কর্মতৎপর। ঈশ্বর তাদের সেই ভাবেই সৃষ্টি করেছেন। তবে এটাও সত্য যে পৃথিবীর অন্য দেশ থেকেও আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে, এবং আমরাও শিখতে প্রস্তুত। এবং এই প্রশিক্ষণের সঙ্গে আমাদের সহজাত দক্ষতা, কর্মতৎপরতা ও আত্মবিশ্বাসের সমন্বয়ে আমরা আমাদের সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে চলেছি।

কোনও সেনাবাহিনীর সাফল্যের জন্য কেবলমাত্র সামরিক প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়। আপনারা যদি ফ্রান্সের উদাহরণ দেখেন, ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের সেনাবাহিনী বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাবাহিনী রূপে গণ্য হত। এবং বাস্তবেও তারা সর্বশ্রেষ্ঠই ছিল। তাদের সরঞ্জামের অভাব ছিল না, প্রচুর সংখ্যায় এরোপ্লেন, ভারী কামান ইত্যাদি ছিল। অধিকন্তু তাদের সুরক্ষিত রাখবার জন্য ছিল 'দুর্ভেদ্য' ম্যাজিনো লাইন। কেন তা হলে এত অল্প সময়ের মধ্যে ফ্রান্সের পতন ঘটল? তার একটাই কারণ ছিল, সেটা হল তাদের লড়াই করবার কোনও উৎসাহ ছিল না। গত বিশ্বযুদ্ধের পরে ফ্রান্সে এমন একটা মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল যে শত্রুদের চিরতরে বিনাশ করা গেছে ও এখন আমরা একটু বিশ্রাম নিতে পারি। কিন্তু জার্মানিতে তা হয়নি। তাদের মনের মধ্যে গর্জন করছিল 'প্রতিশোধ'। সমগ্র দেশ একাগ্র হয়ে প্রতিশোধ ও ত্যাগের কথাই চিন্তা করছিল। সেই কারণেই ফ্রান্সের জনগণ যুদ্ধে এমন ভাবে বিপর্যস্ত হল। ফরাসিদের লড়াইয়ে কোনও উদ্দীপনা ছিল না, অন্যদিকে জার্মানরা উত্তেজনা, উদ্দীপনায় ফুঁসছিল।

আজাদ হিন্দ-এর কুচকাওয়াজের পরে আমি প্রধানমন্ত্রী তোজো-র সঙ্গে আলোচনা করি, যখন তিনি আমাকে আপনাদের চমৎকার কুচকাওয়াজের প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন যে কোনও সেনাবাহিনীর সাফল্যের প্রধান উপাদান হল মনোবল বাড়ানোর জন্য দেওয়া প্রশিক্ষণ। আমি তাঁকে আশ্বাস দিই যে আমরা এই বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগ দেব। জাপানিরা তাদের সেনাবাহিনীর 'মনোবল'-এর উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আট্টু দ্বীপের সুরক্ষা বাহিনীর মনোবলের কথা চিন্তা করে দেখুন। তারা জানত যে তাদের বিরুদ্ধ পক্ষের সেনাবাহিনী সংখ্যায় তাদের তুলনায় এতটাই বেশি যে কোনও মতেই তারা যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে না। শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করাই তাদের পক্ষে সহজ কাজ ছিল। কিন্তু তারা এটা করেনি। কারণ তাতে তাদের মাতৃভূমির সম্মানহানি হত। ২,০০০ সৈন্যের পুরো বাহিনী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেদের প্রাণবিসর্জন দিল।

আমি এখানে স্টালিনগ্রাডের সুরক্ষাবাহিনীর কথাও উল্লেখ করতে চাই। এক সময় শত্রুপক্ষ তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলেছিল এবং এমনকী জার্মানরা তাদের আত্মসমর্পণ করবার জন্য চূড়ান্ত হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু তারা পরাজয় স্বীকার করেনি, লড়াই থামায়নি যদিও তাদের ঘিরে থাকা শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল ২০০,০০০। স্টালিনগ্রাডের সুরক্ষাবাহিনীর মনোবল এতটাই সুদৃঢ় ছিল।

আমাদের সৈন্যদের মধ্যেও সেই মনোবলের সৃষ্টি করতে হবে। কাজেই অফিসারদের দায়িত্ব অপরিসীম। একজন সিপাই যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু একজন অফিসার তা পারে না। কারণ একজন অফিসার হল একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং দায়িত্বশীল অফিসারদের নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনীই জয়ী হতে পারবে। সুতরাং আপনাদের কাজ অসাধারণ। আপনারা যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছেন তার থেকে বেশি সম্মানের কাজ আর

কিছু হতে পারে না। ভারতবর্ষে আমাদের ভাই ও বোনেরা আরও দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন বিপুল উৎসাহে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ও ভারতবাসীদের মঙ্গলের জন্য এর থেকে বড় কাজ আর কিছু নেই।

ইউরোপে থাকার সময় আমি একটি ছোট জাতীয় সৈন্যদল গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম ও সেই কাজে আমি সফলও হয়েছিলাম। সেই সৈন্যদলের ফোটো আমি এনেছি। বার্লিন ও রোমে, ভারতীয়েরা চিন্তা করছে ও কাজেও নেমেছে ঠিক যেমন এখানে আপনারা চিন্তাভাবনা করছেন ও কাজে হাত দিয়েছেন। বিশ্বের সর্বত্র, যেখানেই ভারতীয়রা আছেন, সকলের মধ্যে একটা নতুন মনোবল জাগ্রত হয়েছে।

১৯

এক উভচর জীব

[৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩, কুয়ালা লামপুরে দেওয়া ভাষণ][১]

বন্ধুরা! আজ সন্ধ্যায় আমার কাছে আপনারা যে অর্থদান করেছেন তার জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই অর্থসাহায্যের পরিমাণ বিশাল, তবে আমি এটাকে তখনই বিশাল বলব যদি এই দান আপনাদের প্রথম কিস্তিতে দেওয়া অর্থসাহায্য হয়; এ কথা আমি বলছি অন্য শহর থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণের কথা মনে রেখে, এবং এ ছাড়াও "ইপো" থেকে প্রথম কিস্তি হিসাবে আমরা যা পেয়েছি সেই টাকার অঙ্ক মাথায় রেখে। আমি এটা নিশ্চিত রূপে জানি যে কুয়ালা লামপুরের ভারতীয়েরা তাদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে আরও পাঁচগুণ বাড়াবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন, এবং সেটা যদি আপনারা করতে না পারেন তা হলে আমি বলব যে আপনারা আপনাদের স্বদেশের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান দেখাচ্ছেন না। আপনাদের শহরের জন্য আপনারা খুবই গর্ব অনুভব করে থাকেন এবং তার যথেষ্ট কারণও আছে। পৃথিবীর এই অঞ্চলে এটা হল দ্বিতীয় প্রধান শহর এবং সেই শহরে বসবাস করবার জন্য যখন আপনারা একটা বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন, তখন সেই বিশিষ্টতা ও মর্যাদাবোধের দায়িত্বও আপনাদের অবশ্যই পালন করতে হবে।

আমি আপনাদের কাছ থেকে নগদ টাকার অঙ্কে যা চাইছি, তা আমাদের মোট প্রয়োজনের একটা অংশমাত্র। এখন এমন একটা সময় এসেছে যখন আমাদের মাতৃভূমির সেবায় আমাদের সর্বস্ব দিতে হবে। এখন আর সেইদিন নেই যখন ন্যূনতম স্বার্থত্যাগই যথেষ্ট ছিল। এখন সেই সময় এসেছে যখন প্রতিটি মানুষকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা আমাদের দেশের জন্য সর্বাধিক কতটা ত্যাগস্বীকার করতে পারি, এবং আমাদের জীবন, আমাদের অর্থ এবং একটা আধুনিক সামরিক বাহিনীকে সুসজ্জিত রাখবার ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার জন্য আরও যা যা রসদ লাগে সেইসব কিছু দেবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে কুয়ালা লামপুর ও সেলাঙ্গোর প্রদেশের অধিবাসীরা, আপনারা সর্বপ্রকারে আপনাদের কর্তব্য সাধনে উদগ্রীব। আপনাদের কাছে আমার একটি মাত্র বক্তব্য ও অনুরোধ যে আপনারা যত শীঘ্র সম্ভব অর্থসংগ্রহ করুন, যাতে আমাদের সেনাবাহিনীকে আমরা দ্রুত প্রস্তুত করতে পারি, অন্যেরা যা আশা করছে তার আগেই যাতে এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

আমার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যতদিন ভারতীয়রা নিরস্ত্র থাকবে, যতদিন ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণে একটা আধুনিক সেনাবাহিনী থাকবে, এবং যতদিন আমরা আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য অস্ত্র ধারণ না করব, আমরা ভারতবর্ষকে

---

১. On To Delhi, pp. 78-85, মূল হিন্দি ভাষায় লেখা ভাষণের ইংরেজি অনুবাদ থেকে অনূদিত।

পরাধীনতা থেকে মুক্তি দিতে পারব না। মানবসভ্যতার ইতিহাসে কোনও উদাহরণ আমার জানা নেই— একটা একক উদাহরণও আমার জানা নেই যেখানে একটা জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে সশস্ত্র আন্দোলনের পথকে বর্জন করে। এবং ইতিহাসের কথা যদি আমরা চিন্তা নাও করি, গত কয়েক দশকে অর্জন করা সাধারণ অভিজ্ঞতার ফলে আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে আমরা যদি পূর্ণ স্বরাজ চাই তা হলে সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতেই হবে, অন্য কোনও সহজসাধ্য বিকল্প পথে সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারব না। সমগ্র বিশ্বে যতদিন শান্তি বিরাজ করছিল, তখন ভারতীয়দের পক্ষে অস্ত্র সংগ্রহ করা ও সশস্ত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কার্যত অসম্ভব ছিল। ভারতে বসবাসকারী ভারতীয়দের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। ভারতের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয়দের পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমাদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিই কারণ যা আজ থেকে পাঁচ বছর আগে অসম্ভব ছিল, যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে এখন তা সম্ভব হয়েছে। আপনার যদি অস্ত্রের প্রয়োজন থাকে তা হলে আপনি তা সংগ্রহ করতে পারবেন। কিন্তু ভারতের ভিতরে নয়, ভারতের বাইরে। আপনি যদি একটা আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে চান এবং তাদের যদি আপনি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করতে চান তা হলে আজ তা করা সম্ভব। পাঁচ বছর আগে এই কাজ আপনি চাইলেও করতে পারতেন না। সেই কারণেই আমি বলছি যে এই যুদ্ধাবস্থা আমাদের জন্য ঈশ্বরপ্রেরিত এক পরিস্থিতি। এর ফলে আমরা একটা অনন্যসাধারণ সুযোগ পেয়েছি পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের— ডোমিনিয়ন নয়, শাসকের কর্তৃত্বাধীন কলোনি হিসাবে স্বশাসনের অধিকার নয়, পূর্ণ স্বাধীনতা।

আপনাদের কাছে আমার আজ একটাই প্রশ্ন আছে যে ভারতীয় হিসাবে আপনারা প্রকৃতই পূর্ণ স্বাধীনতা চান কিনা। যদি আপনারা তা চান তা হলে তার মূল্য আপনাদের দিতেই হবে। আপনাদের অবশ্যই একটা আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে ও সেই বাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করতে হবে।

আজ ব্রিটিশদের একটা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে হচ্ছে। ভারতীয় জাতীয় ফ্রন্ট বলে তাকে আপনারা অভিহিত করতে পারেন। এবং সেটা হল ভারতবর্ষের ভিতরে। ব্রিটিশরা তাদের সেনাবাহিনীর সাহায্যে ভারতীয় জাতীয় ফ্রন্টকে সামলাতে পারছে। আপনারা যদি আজ আরেকটা যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারেন— তা হলে আমাদের দেশে ব্রিটিশদের কর্তৃত্ব বজায় রাখা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যখন ভারতীয় জাতীয় সেনাদল ভারতবর্ষের সীমান্তে এসে দাঁড়াবে, তখন শুধুমাত্র তাদের উপস্থিতিই সমগ্র দেশবাসীর কাছে রণদামামার মতো বাজবে, এবং সেই সঙ্গে তারা ভারতীয় সেনাদলকেও ডাক পাঠাবে যাতে তারা ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে। এ আমার দিবাস্বপ্ন নয়। আমি জানি আজ আমার দেশের জনসাধারণ পূর্ব এশিয়ায় আমাদের কার্যকলাপের বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল, এবং তাদের সঙ্গে ব্রিটিশরাও, কিন্তু আমি তাই নিয়ে চিন্তিত নই। আজ সেই সময় এসেছে যখন আমরা সারা পৃথিবীর কাছে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে জানাতে পারি যে এখন আমরা কী করছি এবং ভবিষ্যতে আমরা কী করব ভাবছি। ভারতীয় সেনাদলে আমার ভাইয়েরা যারা এখন ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাকের তলায় সামিল আছে, তারা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে কবে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষে এসে পৌঁছবে। কাজেই আজ আমাদের কর্তব্য হল যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের কাজ শুরু করা, যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের জাতীয় সেনাদল নিয়ে ভারতের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া।

যবে থেকে বিশ্বের কাছে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের কথা এবং দিল্লি অভিমুখে সেই ফৌজের যাত্রার অভিপ্রায় ঘোষণা করা হয়েছে, তবে থেকে আপনারা আশ্চর্য হবেন জেনে যে, ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্রের কৌশল সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে। অল্প কিছুদিন আগেও ব্রিটিশ প্রচারমাধ্যমের কাছ থেকে আমরা শুনেছি যে জাপান এখন ভারতের শত্রু এবং তাদের সেনাদল ভারত অধিকারের জন্য ভারতে প্রবেশ করতে চলেছে। কিন্তু যখন থেকে তারা উপলব্ধি করেছে যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ গঠন করা হয়েছে এবং সেই ফৌজ ভারতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন থেকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্রও এখন অন্য সুর গাইছে। এবং এখন তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে ভারতীয় জনগণকে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে। আমাদের মতো ব্রিটিশ সরকারেরও জানা আছে, যখন আমাদের আজ়াদ হিন্দ ফৌজ ভারতের সীমান্তে এসে পৌঁছবে তখন ভারতীয় জনগণ ও ভারতীয় সেনাদলের মনোভাব কী হবে এবং সেইজন্যই তারা চেষ্টা করছে ভারতীয় জনগণের বিশ্বাস ও আনুগত্য জয় করে নেবার যাতে ভারতীয়েরা আজ়াদ হিন্দ ফৌজের বিরোধিতা করে।

তবে আমি সব থেকে আশ্চর্য হয়েছি যখন আমাকে বলা হয়েছে যে কোনও হিন্দু উৎসবের সময় ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র হিন্দুদের কাছে এই মর্মে আবেদন করেছে যে তারা যেন ভাইদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার জন্য প্রস্তুত থাকে, যে ভাইরা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশে উদ্যত। এই ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্রীরা এমনকী এই কথাও বলেছে যে পুরনো সেই সুদিন আবার ফিরে এসেছে!

বন্ধুরা! ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি এখন একজন নতুন নেপোলিয়নকে খুঁজে পেয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিনদের মতে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন হলেন উভচর। তিনি জলে ও স্থলে, উভয় স্থানের যুদ্ধ পরিচালনায় সমান পারদর্শী। খুব ভাল, তা হলে দেখা যাক কীভাবে এই উভচর জীবের পেশাদারি জীবনের বিকাশ হয়েছে? তিনি হলেন ডিয়েপ যুদ্ধের খ্যাতনামা বীর। ব্রিটিশ সেনা ফ্রান্সে অবতরণের চেষ্টা করে ডিয়েপ নামে একটি স্থানে, সেখান থেকে জার্মান বাহিনীকে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে। ফলাফল হল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয় এবং সেখানেই লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের বীরত্বের ইতিহাসের সমাপ্তি। ডিয়েপে তাঁর অভিযানের সাফল্যের পুরস্কার রূপে তাঁকে এখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফের পদে অভিষিক্ত করা হয়েছে। আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ করছি, আমাকে দুনিয়ার আর একটা দেশের উদাহরণ দেখান যেখানে একজন সেনানায়কের পদোন্নতি হয়েছে যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের জন্য নয়, জয়কে করায়ত্ত করবার জন্য নয়, যুদ্ধে পরাজিত হবার ফলস্বরূপ। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ও ব্রিটিশ সরকারের এ এক অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব। আমি লর্ড লুই মাউন্টব্যাটনকে আশ্বাস দিতে পারি যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে তাঁর জন্য ডিয়েপের থেকেও আরও বড় ও আরও গৌরবময় সাফল্য অপেক্ষা করে আছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে, এমনকী মালয়ে বসবাসকারী এমন কিছু মানুষ এখনও আছে যারা আশা করছে, স্বপ্ন দেখছে যে ব্রিটিশরা আবার ফিরে আসবে। আমরা তাদের কথা জানি। সায়োনানেও তেমন কিছু মানুষ আছে। আমি তাদের কেবল মাত্র করুণাই করতে পারি। আপনারা জানেন সায়োনান কী ছিল ও আজ কী হয়েছে। ব্রিটিশরা বিশ বছর ব্যয় করেছে সিঙ্গাপুরকে গড়তে এবং সেখান থেকে তাদের বিতাড়ন করতে কত দিন ব্যয় করতে হল? সাত দিন। এটা এত বড় একটা সাফল্য কিন্তু তবু কিছু মানুষ এখনও ভাবছে যে ব্রিটিশরা

আবার ফিরে আসবে! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব থেকে বড় সুরক্ষা প্রাচীর আজ তাদের বৃহত্তম সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং সেটা সেই সমাধিক্ষেত্রই থাকবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিন শেষ হয়ে গেছে। আপনাদের যদি কোনও সন্দেহ থাকে, ইতিহাসের পাতা খুলে দেখবেন। প্রতিটি সাম্রাজ্যের যেমন উত্থান হয়েছে, তেমনি তাদের পতনও হয়েছে। গত যুদ্ধ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবের দিন, তারপর থেকে তাদের পতন ঘটছে দ্রুত গতিতে এবং আমরা আমাদের নিজের চোখে সেই পতনের শেষ পর্যায়ের সাক্ষী হতে চলেছি।

আমি সব সময়েই বলেছি যে গত যুদ্ধে দু'টি সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তুর্কীদের অটোমান সাম্রাজ্য ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য। এই যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং সাম্রাজ্যের চিতাভস্ম থেকে জেগে উঠবে স্বাধীন ভারত। আপনারা যদি ভারতকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি দিতে চান তা হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বিনাশ করবার জন্য আপনাদের কাজ করতে হবে, লড়াই করতে হবে।

সম্প্রতি ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র একটা নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে, সেটা হল আফ্রিকা ও সিসিলিতে তারা যে নগণ্য সাফল্য অর্জন করেছে সেই সাফল্যকে চূড়ান্ত রূপে প্রচারের কাজে লাগানো। আপনারা যদি সারা পৃথিবী ব্যাপী ব্রিটিশ এজেন্টদের প্রচার শোনেন তা হলে আপনাদের মনে হবে যে সিসিলির জয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশরা যেন ইতিমধ্যেই যুদ্ধে জিতে গেছে। আমার ইউরোপের বিষয়ে কিছু জানা আছে, শুধুমাত্র শান্তির সময়কার ইউরোপ নয়, যুদ্ধরত ইউরোপের সম্বন্ধেও, এবং যে সব স্থানে এখন লড়াই চলেছে সেইগুলি সবই আমার জানা। ইউরোপে অক্ষশক্তির দুর্বলতা কোথায় ও তাদের সামর্থ্য কতটা, তাও আমি জানি এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে ইউরোপে যাই ঘটুক না কেন তার সঙ্গে ভারতবর্ষ বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিন্দু মাত্র সম্বন্ধ নেই। ইউরোপে যাই ঘটুক না কেন আমরা যদি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে পারি, যদি প্রাণপাত চেষ্টা করি তা হলে ভারতীয়রা প্রস্তুত হয়ে থাকবে। সুতরাং শত্রুপক্ষের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে মুহূর্তমাত্র কালক্ষেপ করবেন না, ভারতীয় জনগণের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব, এই বিশ্বাসে আপনারা অটল থাকুন।

প্রথমত, আমরা যে ২০০,০০০ থেকে ৩০০,০০০ সৈন্যবিশিষ্ট সেনাবাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছবার চেষ্টা করছি সেটা কি বিশাল একটা প্রচেষ্টা? তাকিয়ে দেখুন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কোটি কোটি মানুষ সব ধরনের যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করছে। ৩৮ কোটি মানুষের উদ্ধারের জন্য ৩০০,০০০ এমনকী ৪০০,০০০ জন সৈন্যবিশিষ্ট বাহিনী গঠন এমন কিছুই বড় প্রচেষ্টা নয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণের পক্ষে এই বাহিনীর জন্য সৈন্য সরবরাহ করা সম্ভব। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনগণের পক্ষে আরও যা সম্ভব তা হল অর্থ সাহায্য এবং সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সব রসদ জোগানো। অতএব, আসুন আমরা এই বাহিনী গঠনের কাজে আমাদের সর্বসত্তা নিয়োগ করি এবং যত শীঘ্র সম্ভব আমরা একটা নিখুঁত সেনাবাহিনী গড়ে তুলি।

বন্ধুরা! আজ আমাদের কাজ হল বর্তমানে যে বাহিনী আমাদের রয়েছে তাকে সর্বপ্রকারে নিখুঁতভাবে গড়ে তোলা এবং সেইসঙ্গে তাকে আরও বিস্তীর্ণ করা কারণ এই যুদ্ধ হতে চলেছে সুদীর্ঘ ও কঠিন। আমরা চাই তরুণ যুবকেরা দলে দলে এসে যোগ দিক ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুক। কুয়ালা লামপুরের কেন্দ্রস্থলে আপনার যে সৈন্যশিবির গড়েছেন যেখানে ভারতীয় যুবকেরা এসে আগামী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, আপনাদের

সে জন্য অভিনন্দন জানাই। তারা যে আজ শুধু সায়োনান ও কুয়ালা লামপুরের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, তা নয়। মালয়ের সর্বত্র শিবির গঠন করা হয়েছে, এর মধ্যে অনেকগুলিই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত শিবির। এই শিবিরগুলি এখন আমাদের দখলে এসেছে আমাদের ব্যবহারের জন্য। যখন আমরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করব তখনও নিশ্চয় আমরা আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীর জন্য কিছু ব্যবহারযোগ্য শিবির পেয়ে যাব। আমাদের সেনাদের জন্য নতুন শিবির গড়তে হবে না। কলকাতা থেকে বোম্বাই, এবং রাওয়ালপিন্ডি থেকে মাদ্রাজ, এমন প্রচুর শিবির আছে যা অতি চমৎকার কিন্তু তা ভারতীয় সেনাদের ব্যবহারের জন্য নয়, সেগুলি ব্যবহার করে ব্রিটিশ সেনারা। কিন্তু এক সময়ে এই চমৎকার শিবিরগুলি আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীর দখলে আসবে এবং আমি ব্রিটিশদের কথা দিচ্ছি যে তার পরিবর্তে সব জেলখানাগুলি আমরা ব্রিটিশদের জন্য রাখব।

বন্ধুরা! ব্রিটিশদের পরাস্ত করতে হলে আমাদের বহির্বিশ্ব থেকে সাহায্য প্রয়োজন। আমাদের শত্রু সমগ্র পৃথিবীর কাছ থেকে সাহায্য চাইছে। পরমশক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, যেখানে কোনও দিন সূর্যাস্ত হয় না, তারা তাদের ভিক্ষার পাত্র নিয়ে সারা পৃথিবী পর্যটন করছে। তারা যে শুধু ওয়াশিংটনের কাছে সাহায্য চাইছে তা নয়, সারা পৃথিবীর কাছে তারা সাহায্য চাইছে, এমনকী দরিদ্র ভারতীয়রা, যাদের ব্রিটিশরা ক্রীতদাসে পরিণত করে রেখেছে সেই ভারতীয়রাও বাদ পড়েনি। ভারতীয় জনগণকে সৈন্য, অর্থ, অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম সবকিছু দিয়ে সাহায্য করতে হয়েছে। তারপরেও তাদের প্রয়োজনের সময় ব্রিটিশরা ভারতীয়দের কাছে হাত পাতছে। অপরপক্ষে আমাদের লড়াই শুধু ব্রিটিশদের সঙ্গে নয়, তার থেকে আরও পরাক্রমশালী ব্রিটিশ ও তার মিত্রগোষ্ঠীর মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে। আমাদের যদি লড়াই করতে হয় ও সেই লড়াইয়ে আমাদের যদি জয়ী হতে হয় তা হলে আমাদের সাহায্য নিতে হবে এবং যখন সময় আসবে তখন আমরা সাহায্য নেব, কিন্তু যদি আমরা প্রথমে আমাদের করণীয় কর্তব্যগুলি করি তা হলে সাহায্য চাইতে বা সাহায্য নিতে আমাদের কারও কাছে মাথা নিচু করতে হবে না।

আজকের এই সন্ধিক্ষণে, পূর্ব এশিয়ার জনগণের কর্তব্য হল যথাসাধ্য চেষ্টা করা। মনে রাখবেন যে আজ আপনাদের কাছে স্বদেশের জন্য কিছু করবার একটা সুযোগ এসেছে, পৃথিবীর অন্যত্র বসবাসকারী ভারতীয়রা অনেকেই সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যে ভারতীয়রা ইউরোপে, আফ্রিকায়, আমেরিকায় এমনকী ইংল্যান্ডেও বাস করছেন, তাঁরা কী করতে পারছেন? তাঁরা অসহায়। আমি জানি তাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে ও জীবন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁদের পক্ষে তেমন কিছু করা অসম্ভব। তাঁরা জাতীয় সেনাদল গঠন করতে বা তাতে যোগ দিতে অক্ষম; কিন্তু সে সবই আপনাদের নাগালের মধ্যে, যদি সেটাই আপনারা আপনাদের কর্তব্য বলে স্থির করেন। আপনারা জাতীয় সেনাদলে যোগ দিতে পারেন ও তার সাফল্যের জন্য আপনারা কাজ করতে পারেন। সুতরাং যখন আপনাদের কানে দেশের জন্য স্বার্থত্যাগের ডাক এসে পৌঁছবে, তখন আপনারা পিছপাও হবেন না। আপনাদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিন যে আজ পৃথিবীর যেখানে যত ভারতীয় আছেন তার মধ্যে শুধু আপনারাই এই অনন্যসাধারণ সুযোগ পেয়েছেন, স্বদেশের সেবা করবার, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবার।

২০

বাহাদুর শাহের সমাধিস্থলে

[২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ][১]

রবিবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩ সাল, স্বাধীন ভারতবর্ষের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের সমাধিসৌধে ভাবগম্ভীর ও হৃদয়গ্রাহী এক অনুষ্ঠানে নেতাজি বাহাদুর শাহের মরদেহের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য বাহাদুর শাহ লড়াই করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীতে ছিলেন মহানুভব ডক্টর বা ম ও তাঁর সহকর্মীরা।

মহানুভব ডক্টর বা ম এবং বন্ধুরা! আজ আমরা স্বাধীন ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের সমাধিস্থলে সমবেত হয়েছি। ইতিহাসের আশ্চর্য ঘটনাচক্রে এবং হয়তো সৌভাগ্যক্রমেই একদিকে যেমন ভারতবর্ষের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের মরদেহ বর্মাদেশের মাটিতে সমাধিস্থ হয়েছে, তেমনই বর্মার শেষ স্বাধীন নৃপতির দেহ ভারতের মাটিতে স্থান পেয়েছে।

আমরা, ভারত ও বর্মার জনগণ চিরকালই অনুভব করেছি যে ইতিহাস আমাদের দুই দেশের নাগরিকদের এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছে এবং আমাদের শেষ দুই স্বাধীন শাসকের মৃত্যুকে ঘিরে ভাগ্যের এই বিচিত্র আলেখ্য, মহানুভব, আপনার ও আমাদের দেশের সেই সুদৃঢ় বন্ধনের সর্বোত্তম প্রমাণ।

আমাদের এই দুই দেশের সম্মুখে এখন একই শত্রু এবং সেই শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা একই যুদ্ধে সামিল। সুতরাং সঙ্গত কারণেই আমাদের শেষ সম্রাটের সমাধিস্থলে আজ আমরা একটা ক্ষুদ্র উৎসবের আয়োজন করেছি যা একদিকে যেমন আমাদের ভিতরের আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করবে, অন্যদিকে তেমনই ভারত ও বর্মার মধ্যে বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে। বহুদিন থেকেই এই বন্ধুত্বের বন্ধন আমাদের দুই দেশকে কাছাকাছি রেখেছে এবং তা আমাদের চিরকালের জন্য বেঁধে রাখবে।

আজকের এই অনুষ্ঠানে ভবিষ্যতের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সূচনা হতে চলেছে— সেখানে উপস্থিত থেকে আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানকে যে মর্যাদা দিয়েছেন সেইজন্য মহানুভব আপনার ও আপনার সরকারের মাননীয় সদস্যদের কাছে আমরা বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

আমি আগের মতো আবারও একবার আমাদের বর্মী বন্ধুদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়বার অটল সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করতে চাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত বিনাশের

---

১. On To Delhi, pp. 88-90

উদ্দেশ্যে এখন আমরা জাপানের কাছ থেকে উদার সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছি তাতে একদিকে ভারতবর্ষ যেমন তাদের হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাবে, তেমনই অন্যদিকে বর্মাদেশের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা চিরকালের মতো সুরক্ষিত থাকবে।

এই পবিত্র স্মৃতিসৌধে যেখানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ যোদ্ধার মরদেহ সমাধিস্থ আছে, যিনি অনেক মানুষের মাঝে একজন সম্রাট ছিলেন, আবার একই সঙ্গে অনেক সম্রাটদের মধ্যে একজন বরণীয় মানুষ ছিলেন, তাঁরই স্মৃতিসৌধের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের অনমনীয় সঙ্কল্পের কথা আবারও প্রকাশ করছি। বাহাদুর শাহ ধর্মনির্বিশেষে ভারতীয়দের কাছে স্মরণীয় ব্যক্তি কারণ তিনি তাঁর স্বদেশবাসীকে ডাক দিয়েছিলেন বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য। এবং শুধুমাত্র এই কারণেই নয়। অধিকন্তু তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর পতাকার তলায় জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল প্রদেশবাসী ভারতীয়রা একত্র হয়েছিল, তাঁর পবিত্র পতাকার তলায় মুসলমান, হিন্দু, শিখ অথবা বলা যেতে পারে, স্বাধীনতার অভিলাষী মুসলমান, হিন্দু, শিখ সকলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিল, যে যুদ্ধকে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা নাম দিয়েছেন 'সিপাহী বিদ্রোহ'। কিন্তু আমরা ভারতীয়রা তাকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করে থাকি। এবং আজ আমরা যখন ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শেষ যুদ্ধে ব্রতী হয়েছি তখন আবারও নতুন করে সেই অবিচল সঙ্কল্পের শপথ আমাদের গ্রহণ করা প্রয়োজন যে, এই স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাব, যতদিন না আমাদের দুই দেশের— ভারত ও বর্মাদেশের একই শত্রুকে আমরা পরাস্ত করতে পারি, তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারি, আমাদের যাত্রাপথ যতই বন্ধুর হোক না কেন, যুদ্ধ যতই দীর্ঘ হোক না কেন এবং এর জন্য আমাদের যত দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হোক না কেন। তার ফলে আমরা শুধু যে আমাদের দেশের মধ্যেই স্বাধীনভাবে থাকতে পারব তা নয়, আমরা মানবজীবনের পবিত্র লক্ষ্য অভিমুখে একযোগে সহ সৈনিকের মতো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারব স্বাধীনভাবে।

মহামান্য, এই ধরনের পবিত্র তীর্থস্থানে এলে আমাদের প্রথা হল কিছু দক্ষিণা দেওয়া। আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রতীক হিসাবে আজ আমাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ বীর যোদ্ধা সম্রাট বাহাদুর শাহের নামে কিছু 'নজরানা' বা দক্ষিণা দিতে চাই। বর্মাদেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রতীক হিসাবে আমি ৫০,০০০ টাকার এক ক্ষুদ্র দক্ষিণা, মহানুভব, আপনার হাতে দিতে চাই। আপনার বিচারে সর্বোত্তম যে ভাবে সম্ভব সেই ভাবে আপনি এই দক্ষিণা কাজে লাগাবেন, এই আমার অনুরোধ।

এবং এখন আমি আজকের ভাষণ শেষ করব সম্রাট বাহাদুর শাহের স্বরচিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তির অনুবাদ আবৃত্তি করে:

'ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্তরে যতদিন বিশ্বাসের শেষ কণাটুকু অবশিষ্ট থাকবে, ভারতের তরবারি ততদিন লন্ডনের বুকের মধ্যে বিদ্ধ হতে থাকবে।'

২১

ভারতবর্ষের সংগ্রামে গান্ধীজির ভূমিকা

[২ অক্টোবর ১৯৪৩, ব্যাঙ্ককে বেতারভাষণ][১]

বিশ্বের যেখানে যত ভারতীয় আছেন সকলে আজ ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মহাত্মা গান্ধীর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছেন। এমন শুভদিনে আমাদের প্রথা হল, যে মাননীয় ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অর্ঘ্য নিবেদন করছি, তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও তাঁর কর্মধারা সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণ এতটাই অবহিত যে আজ আমি যদি তাঁর জীবনালেখ্য বর্ণনা করতে যাই তা হলে সেটা আমার স্বদেশবাসীর বুদ্ধিমত্তার অবমাননা হবে। তার পরিবর্তে আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর অবদানের মূল্যায়নের কাজে আত্মনিয়োগ করবার চেষ্টা করব। ভারতবর্ষের সেবায় ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা এতটাই অনন্যসাধারণ ও অতুলনীয় যে তাঁর নাম আমাদের জাতীয় ইতিহাসে চিরকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকার যথাযোগ্য মূল্যায়ন করতে হলে ব্রিটিশ কীভাবে ভারতকে শাসনাধীনে আনল তার সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত আমাদের জানা প্রয়োজন। আপনারা সকলে জানেন যে ব্রিটিশ যখন প্রথম ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছিল, তখন ভারত ছিল একটি অত্যন্ত সম্পদশালী দেশ, এবং ভারতের সেই সম্পদই সমুদ্রপারের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ইংরেজদের এই দেশের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। আজ রাজনৈতিক দাসত্ব ও অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ক্ষুধা ও অনাহারে ভারতীয় জনগণের মৃত্যু হচ্ছে ও অন্যদিকে ব্রিটিশ জনগণ যারা একদিন দীনদরিদ্র ছিল তারা ভারতবর্ষের অর্থ সম্পদ হরণ করে ধনী ও পুষ্ট হচ্ছে। অনেক দুঃখ ও কষ্ট, অপমান ও অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় জনগণ অবশেষে এই শিক্ষা অর্জন করেছে যে আমাদের বহুমুখী সমস্যার কেবলমাত্র একটাই সমাধান আছে, তা হল আমাদের হৃত স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার।

ভারতবর্ষকে শাসনাধীনে আনবার জন্য ব্রিটিশরা যে সব পন্থা অবলম্বন করেছিল তার পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তারা কখনওই দেশের কোনও অঞ্চলে সমগ্র ভারতীয় জনসমষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করেনি, এবং সমগ্র ভারতবর্ষকেও তারা এই অভিযানে জয় ও অধিকার করবার চেষ্টা করেনি। বরং তারা বিপরীত পন্থাই অনুসরণ করেছে। তারা সব সময়েই, সামরিক অভিযানের আগে হয় উৎকোচ, নয় দুর্নীতির মাধ্যমে জনসাধারণের একাংশের মন জয় করে নিয়েছে। বাংলায় ঠিক যা হয়েছিল, সেখানে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মীর জাফরকে তারা বাংলার সিংহাসনের লোভ দেখিয়ে নিজেদের দলে টেনে

---

১. On To Delhi, pp. 1-8.

নিয়েছিল। সেই সময় ভারতবর্ষে ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লা ছিলেন মুসলমান, আবার তাঁর সেনাধিনায়ক ও মন্ত্রী মীর জাফরও ছিলেন মুসলমান, কিন্তু তিনিই নবাবের সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন। আর নবাবের সেনাপতি মোহনলাল ছিলেন হিন্দু, যিনি যুদ্ধের শেষদিন পর্যন্ত সিরাজ-উদ্-দৌল্লার সঙ্গে ছিলেন। ভারতের ইতিহাসের এই অধ্যায় থেকে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তা হল, আমরা যদি যথাযথ সময়ে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না পারি, এই মনোবৃত্তিগুলিকে যদি অঙ্কুরেই বিনাশ না করতে পারি তা হলে ভারতবর্ষ কোনও দিনও তার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার আশা করতে পারবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে, বাংলার এই ঘটনাবলী ভারতীয় জনগণকে সেই বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করতে পারেনি। সিরাজ-উদ্-দৌল্লার পরাজয়ের পরেও যদি ভারতীয় জনগণ একযোগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারত তা হলে তারা সহজেই ভারতের মাটি থেকে অবাঞ্ছিত বিদেশিদের বিতাড়িত করতে পারত। এমন কথা কেউ বলতে পারবে না যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতীয় জনগণ প্রাণপণে লড়াই করেনি— কিন্তু সে লড়াই সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না। যখন ব্রিটিশ বাংলাকে আক্রমণ করেছে তখন পিছন থেকে অন্য কোনও বাহিনী তাদের পালটা আক্রমণ করেনি। পরে যখন দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তখনও মধ্য ভারতের মারাঠা বা উত্তর ভারতের শিখ, কেউ টিপু সুলতানের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। বাংলার পতন হবার পরে, একে একে ভারতের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ করা ব্রিটিশের পক্ষে সম্ভব হয়েছে, এবং এই ভাবেই তারা ক্রমশ দেশের সর্বত্র তাদের অধিকার বিস্তার করতে পেরেছে, ভারতীয় ইতিহাসের এই বেদনাদায়ক পরিচ্ছেদ থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি যে শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতবাসী যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে না দাঁড়াতে পারে তা হলে তারা কোনও দিনই স্বাধীনতা পাবে না, এবং স্বাধীনতা পেলেও সেই স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না।

সেই উপলব্ধি হতে ভারতীয় জনগণের দীর্ঘদিন লেগেছে। অবশেষে ১৮৫৭ সালে, যখন তাদের চেতনা হয়েছে তখন তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একযোগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে। সেই যুদ্ধ যখন শুরু হল— যে যুদ্ধকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা বলেন 'সিপাহী বিদ্রোহ' এবং আমরা যাকে বলি 'স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ'— সেই যুদ্ধের প্রথমদিকে ব্রিটিশরা সহজেই পরাস্ত হয়েছিল। কিন্তু দুটি কারণ ছিল যার জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারিনি। প্রথমত যুদ্ধে ভারতের সব অঞ্চল অংশগ্রহণ করেনি এবং তার থেকেও আরও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ হল প্রযুক্তিগত দক্ষতায় আমাদের সেনাবাহিনীর অফিসারেরা শত্রুপক্ষের তুলনায় পিছিয়ে ছিল। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী যুগের সঙ্গে পা ফেলে এগোতে পারেনি। তার ফলে, ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে আমাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের লড়াইয়ে আমাদের সেনাবাহিনীর যুদ্ধকৌশলের ও রসদের ঘাটতি ধরা পড়ল।

১৮৫৭ সালের পরাজয় আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছে তা হল ভবিষ্যতে ভারতীয়দের দুনিয়ার অন্য জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হবে যাতে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অন্যেরা যে উন্নতি করছে সেই বিষয়ে আমরা অবহিত থাকতে পারি।

১৮৫৭ সালের পরাজয়ের পর, ব্রিটিশ শক্তি ভারতীয় জনগণের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিল। আমাদের পক্ষে সব থেকে বড় নির্বুদ্ধিতা ও ভ্রমাত্মক কাজ হয়েছিল সেই সময় শত্রুপক্ষের হাতে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করা। নিরস্ত্র করে নিজেদের অসহায় প্রতিপক্ষে

পরিণত হতে না দিলে ভারতীয় জনগণ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আবার ব্রিটিশদের আক্রমণ করতে পারত। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণের ফলে, হৃত মনোবল ফিরে পেতে ও রাজনৈতিক অবসন্নতা কাটিয়ে উঠতে ভারতীয় জনগণের আরও ত্রিশ বছর কেটে গেল। অবশেষে, ১৮৮৫ সালে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের মাধ্যমে ভারতবর্ষ আবার যেন তার রাজনৈতিক চেতনা ফিরে পেল। প্রথম দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ছিল একটা নরমপন্থী প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের নেতারা প্রথমে ভয় পেয়েছিলেন ভারতের পূর্ণ স্বরাজ ও ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের দাবি তুলতে। কিন্তু পরবর্তী বিশ বছরের মধ্যেই কংগ্রেসের নতুন উদ্দীপনার জোয়ার এল।

১৯০৫ সাল নাগাদ আমরা অরবিন্দ ঘোষের মতো নেতাদের পেলাম যাঁরা ভারতের পূর্ণ স্বরাজের দাবি করতে লাগলেন। স্বাধীনতার দাবির পাশাপাশি, বিদেশি শাসকদের হাত থেকে মুক্তির অন্বেষণে আরও চরম পন্থা অবলম্বনের চেষ্টাও শুরু হল। বাংলাকে দু'টুকরো করার প্রতিবাদে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন করার সঙ্কল্প নেওয়া হল এবং ধীরে ধীরে এই আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। অর্থনৈতিক বয়কটে সন্তুষ্ট না থেকে এরপরে ভারতীয় তরুণেরা বোমা ও রিভলবারের ব্যবহার শুরু করল। বেশ কয়েকজনকে বিদেশেও পাঠানো হল, প্যারিস ও অন্যান্য ইউরোপীয় সেন্টার থেকে বৈপ্লবিক অন্তর্ঘাতের প্রশিক্ষণ নেবার জন্য, অন্যদিকে ভারতীয় তরুণেরা পৃথিবীর অন্যত্র, বিশেষ করে রাশিয়া ও আয়ারল্যান্ডে কীভাবে বিপ্লবী পন্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সেই বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে শুরু করল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বার্থান্বেষী ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের মিথ্যা আশ্বাসে ভারতীয় নেতারা প্রবঞ্চিত হয়েছিলেন এবং তার ফলে ভারতীয়দের রক্ত ও ভারতবর্ষের অর্থ ব্যবহৃত হয়েছিল ব্রিটিশদের সেবায়, যা ভারতের দাসত্ব শৃঙ্খলকে আরও সুদৃঢ় করেছিল। তবে ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি অপরিমিত সম্মান জানিয়ে আমাদের এ কথা বলতেই হবে যে তাঁরা নিজেদের ব্রিটিশ প্রবঞ্চনার শিকার হতে দেননি এবং তাঁরা স্বদেশের মুক্তিকল্পে বিপ্লবের সূচনা করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে যখন ভারতীয় নেতারা প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা দাবি করতে লাগলেন তখনই তাঁরা প্রথম উপলব্ধি করলেন যে তাঁরা বিশ্বাসঘাতক শ্বেতাঙ্গ শাসক, অর্থাৎ ব্রিটিশ জনসাধারণ ও তাদের রাজনীতিবিদদের দ্বারা কতটা প্রবঞ্চিত হয়েছেন। তাঁদের মুক্তির দাবির উত্তরে ১৯১৯ সালে এল— রাউলাট আইন বা ব্ল্যাক অ্যাক্ট, ভারতীয়দের যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, সেটুকুও এই আইনবলে কেড়ে নেওয়া হল। এবং ভারতীয়েরা এই ব্ল্যাক অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গেলে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনা ঘটল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়দের যাবতীয় আত্মত্যাগের জন্য পুরস্কার স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাদের দিল রাউলাট আইন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।

১৯১৯ সালের এই মর্মান্তিক ঘটনা কিছুদিনের জন্য ভারতীয় জনগণকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। মুক্তি অর্জনের যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সরকার ও তাদের সেনাবাহিনীর দ্বারা এত দিন নির্মম ভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে। শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ব্রিটিশ সামগ্রী বর্জন, সশস্ত্র বিপ্লব— কোনও কিছুই স্বাধীনতা আনতে সফল হয়নি। কোথাও এতটুকু আশার আলো দেখা যায়নি এবং যদিও ভারতীয় জনসাধারণের মনের মধ্যে হতাশা ও অপমানের আগুন জ্বলছিল কিন্তু তারা যেন অন্ধকারের মধ্যে সংগ্রামের নতুন পথ, এক নতুন অস্ত্র খুঁজছিল। এই মনোভাব যখন মানুষের মনের মধ্যে কাজ করছে ঠিক তখনই নতুন পথের দিশারী গান্ধীজি

এলেন তাঁর অসহযোগ আন্দোলন বা সত্যাগ্রহ বা আইনঅমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তির পথ দেখাতে। মনে হল তিনি যেন ঈশ্বরপ্রেরিত। সমগ্র ভারতীয় জাতি তখনই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। ভারত যেন রক্ষা পেল। প্রতিটি ভারতীয়ের মুখে আশা ও আত্মবিশ্বাসের আলো জ্বলে উঠল। আবার যেন তারা শেষ লড়াইয়ে জয়যুক্ত হবার আশ্বাস পেল।

কুড়ি বছর ধরে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য কাজ করেছেন, এবং তাঁর সঙ্গে ভারতীয় জনগণও কাজ করেছে। ১৯২০ সালে তিনি যদি তাঁর সংগ্রামের এই নতুন হাতিয়ার নিয়ে এগিয়ে না আসতেন, তা হলে ভারতবর্ষ এখনও পরাজিতের মানসিকতা নিয়েই বেঁচে থাকত, এ কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদান অনন্যসাধারণ ও অতুলনীয়। আর অন্য কোনও ব্যক্তির পক্ষে অনুরূপ পরিস্থিতিতে এবং এক জীবনকালে এর থেকে বেশি সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হত না। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মা গান্ধীর সাফল্যের কাছাকাছি হয়তো একজনই আসতে পারেন। তিনি হলেন মুস্তাফা কামাল, যিনি গত বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পরে দেশকে রক্ষা করেছিলেন, যাঁকে তুর্কিরা 'গাজি'-র সম্মান দিয়েছে।

১৯২০ সাল থেকে ভারতীয়েরা মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে দুটি শিক্ষা পেয়েছে যা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অত্যাবশ্যক পূর্ব শর্ত। প্রথমত, তারা জাতি হিসাবে আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের শিক্ষা পেয়েছে— তার ফলশ্রুতিতে তাদের প্রাণের মধ্যে এখন বিপ্লবের ঐকান্তিক অনুভূতি জন্ম নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, এখন সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে তারা প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে, ভারতের দূরতম গ্রামে গ্রামান্তরে যা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিটি ভারতীয়র প্রাণে এখন স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে এবং সারা দেশ জুড়ে সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তারা গঠন করেছে— স্বাধীনতার জন্য আমাদের চূড়ান্ত সংগ্রামের— চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত।

কেবল ভারতবর্ষেই যে আত্মিক সচেতনতা থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্রতী হবার জন্য আহ্বান এসেছে তা নয়। ইতালিতে রিসোরজিমেন্টো আন্দোলনের মাধ্যমে ইতালির জনসাধারণকে মাৎসিনিই প্রথম অনুরূপ ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। তাঁকে তারপরে অনুসরণ করেছেন বীর যোদ্ধা— গ্যারিবল্ডি, যিনি রোম অভিমুখে তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন এক সহস্র সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেনার পুরোভাগে। আধুনিক আয়ারল্যান্ডেও শিন ফেইন পার্টি, ১৯০৬ সালে যার প্রতিষ্ঠা, তারা আইরিশ জনসাধারণকে একটা কর্মপন্থার নির্দেশ দিতে পেরেছিল, ১৯২০ সালের মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যার প্রভূত সাদৃশ্য পাওয়া যায়। শিন ফেইন পার্টির গঠনের ১০ বছর পরে অর্থাৎ ১৯১৬ সালে আয়ারল্যান্ডে প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা হয়।

মহাত্মা গান্ধী দৃপ্তপদে স্বাধীনতার পথে আমাদের যাত্রা শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি ও অন্য নেতৃবৃন্দ এখন কারাগারে বন্দি। মহাত্মা গান্ধী যে কাজের সূচনা করেছিলেন সেই কাজ এখন তাঁর স্বদেশবাসীদের, যাঁরা দেশের অভ্যন্তরে এবং যাঁরা দেশের বাইরে আছেন, তাঁদের সেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

স্বদেশে যে ভারতীয়রা বাস করছেন চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য যা প্রয়োজন তার সব কিছুই তাঁদের আছে। কিন্তু তাঁদের যা নেই তা হল মুক্তিযুদ্ধের জন্য সেনাদল। সেই সেনাদল গড়তে

হবে দেশের বাইরে এবং কেবলমাত্র দেশের বাইরেই সেই বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব।

আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরের কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী যখন ভারতের জনগণকে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য ডাক দিয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, 'যদি ভারতের হাতে তরবারি থাকত তা হলে ভারতীয়েরা আজ সেই তরবারি উন্মুক্ত করত।' এবং তার পরে মহাত্মাজি আরও যোগ করে বলেন যে যেহেতু সশস্ত্র বিপ্লবের প্রশ্নই ওঠে না, ভারতের সম্মুখে একমাত্র বিকল্প যা আছে তা হল, অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ। সেদিনের থেকে আজ দিন ও কালের পরিবর্তন হয়েছে, এবং এখন ভারতীয়দের পক্ষে তরবারি উন্মুক্ত করা সম্ভব। আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে, এবং আমাদের সৈন্যসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমাদের একদিকে যেমন এই সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণের কাজ শেষ করতে হবে এবং তাদের যত শীঘ্র সম্ভব তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের আরেকটি নতুন সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে যা যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত থাকবে। মুক্তির জন্য এই শেষ যুদ্ধ হতে চলেছে দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন এবং যতদিন না ভারতবর্ষের শেষ ব্রিটিশকে আমরা হয় কারাগারে বন্দি করতে পারি অথবা আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে পারি— আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আমি আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই যে আমাদের মুক্তিবাহিনী— আজ়াদ হিন্দ ফৌজ বা ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনী— ভারতের মাটিতে পদার্পণ করার পরে সমগ্র ভারতকে ব্রিটিশদের কবল থেকে মুক্তি দিতে আমাদের বারো মাস বা তারও বেশি সময় লাগবে। কাজেই আসুন আমরা কোমর বেঁধে এই দীর্ঘ ও কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুতি নিই।

২২

একটি স্মরণীয় দিন

[১৪ অক্টোবর ১৯৪৩, ফিলিপাইন প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন উপলক্ষে সিঙ্গাপুরে সাংবাদিকদের কাছে প্রদত্ত বিবৃতি][১]

ফিলিপাইনের জাতীয় ইতিহাসে আজকের দিনটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ ১.৮ কোটি ফিলিপাইনের অধিবাসীর দেশ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে, যে স্বাধীনতা বিয়াল্লিশ বছর আগে আমেরিকা অপহরণ করেছিল। স্বাধীন বর্মাদেশের নবজন্মের মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে প্রজাতান্ত্রিক ফিলিপাইনের নবজন্ম হতে চলেছে, এই ঘটনা এশিয়ার সব ক'টি দেশের কাছে এক পরম উৎসবের দিন এবং বিশেষত যাদের স্বাধীনতার লড়াই এখনও অব্যাহত রয়েছে। প্রজাতান্ত্রিক ফিলিপাইনের স্বাধীনতা লাভের ঘোষণা আজ ভারতবর্ষের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণও বটে, কারণ আমার ৩৮.৮ কোটি স্বদেশবাসী যারা তাদের স্বাধীনতার জন্য ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়ছে তাদের কাছে আজকের এই ঘটনা আশা ও উৎসাহেব বার্তা বহন করে আনবে। পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি কোনা থেকে জাপানি শক্তি দ্বারা বিতাড়িত হবার পর ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠী এখন ভারতবর্ষকে পূর্ব এশিয়াতে তাদের শেষ শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। কিন্তু সেই দিন খুব বেশি দূরে নয় যখন ভারতবর্ষও ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠীকে বিতাড়িত করে তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবে। তার আগে, চল্লিশ বছরের অধিক সময় মার্কিন শাসকদের কাছে পদানত হয়ে থাকার পরে স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আমি ফিলিপিনো ভ্রাতৃগণকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমি প্রবীণ বিপ্লবী নেতা জেনারেল এমিলিও এগুইন্যালডোকেও আমার অভিনন্দন জানাই; তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর আগে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন আজ ফিলিপাইন সেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছে এবং তিনি যে সেই জয়ের মুহূর্তটি নিজের জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারলেন সেই জন্য। ফিলিপাইন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট রূপে নির্বাচিত ডক্টর হোজে লরেলকে, এবং বৃহত্তর পূর্ব-এশীয় যুদ্ধ শুরু হবার দিন থেকে দিবারাত্র যে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য মিস্টার হোরগে ভ্যারগাস অক্লান্ত সংগ্রাম করেছেন, সেই সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য তাঁকেও আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

---

১. On To Delhi, pp. 86-87.

২৩

আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকার

[২১ অক্টোবর ১৯৪৩, সিঙ্গাপুরে প্রদত্ত বক্তৃতা][১]

পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা অপরিসীম উৎসাহ ও অখণ্ড বিশ্বাস নিয়ে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুকে অনুসরণ করছিল ও তাঁকে তারা 'নেতাজি' নামে ডাকতে শুরু করল। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের পুনর্গঠনের পর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রথমে গেলেন মালয়ে এবং তার পরে তিনি থাইল্যান্ড ও বর্মাদেশ ভ্রমণে গেলেন। ১ আগস্ট, ১৯৪৩, বর্মার স্বাধীনতা ঘোষণার ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের দিনে তিনি রেঙ্গুনে উপস্থিত ছিলেন এবং দুই পক্ষের সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী ডক্টর বা ম ও স্বাধীন বর্মার অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

যখন তিনি বর্মা থেকে ফিরলেন তখন স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকার (আর্জি হুকুমত-এ-আজ়াদ হিন্দ) গঠন করবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত। ২১ অক্টোবর, ১৯৪৩ তারিখে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের একটা সমাবেশ ডাকা হল সিঙ্গাপুরে যেখানে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা এবং মালয় থেকে বহু সহস্র ভারতীয়েরা এসে যোগ দিলেন। সভার কাজ শুরু হল মিস্টার এম কে রামচন্দ্রনের স্বাগত ভাষণ দিয়ে এবং তার পরে সাধারণ সম্পাদক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি লীগের কর্মসূচির এক বিস্তারিত বিবরণ পেশ করলেন। সব শেষে মঞ্চে এসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই সাড়া জাগানো বক্তৃতা দিলেন:

'বন্ধুরা— খুব স্বল্প সময়ের নোটিসে আমাদের এই সভা আহ্বান করা হয়েছে, আমি প্রথমেই আপনাদের এই সমাবেশে স্বাগত জানাই। গত জুলাই মাসে যখন আমরা মিলিত হয়েছিলাম তারপর থেকে আমরা কতটা অগ্রসর হতে পেরেছি ও কতটা সাফল্য লাভ করতে পেরেছি তার পর্যালোচনা করা এবং আমাদের জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের করণীয় কাজগুলি স্থির করাই হল আজকের এই সভার উদ্দেশ্য।

পূর্ব এশিয়ার ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বগ্রহণ করার পরে আমার প্রথম কাজ ছিল লীগের হেড কোয়ার্টার্সের পুনর্বিন্যাস করা যাতে আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারি। সেই কাজ শুরু হয়েছিল জুলাই মাসের প্রথম দিকে যখন হেড কোয়ার্টার্সে কয়েকটি নতুন বিভাগ খোলা হয়। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কাছ থেকে সর্ব প্রকার রসদ— জনসম্পদ, অর্থসম্পদ ও সরঞ্জাম— সংগ্রহ করে যুদ্ধের জন্য নতুন 'সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি'-র কার্যক্রম অনুসরণ করবার জন্যই হেড কোয়ার্টার্সের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছিল, এবং তার পরে সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে সর্বত্র লীগের যাবতীয় শাখাগুলিতেও এই একই ভিত্তিতে ও একই উদ্দেশ্যে পুনর্বিন্যাস করা হয়।

---

১. Chalo Delhi, pp. 156-169.

পরের যে কাজে আমি হাত দিই তা হল আজ়াদ হিন্দ ফৌজের (ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর) পুনর্বিন্যাস যে জন্য আমি আমাদের সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বভার গ্রহণ করি। তারপরে আমাদের সেনাবাহিনীর বিন্যাসে ইতিমধ্যেই কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে আরও কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে। সাংগঠনিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর সামগ্রিক মনোবলও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যখনই কোনও ইউনিটকে সায়োনান থেকে উত্তরাঞ্চলে পাঠানো হয়, তখন তাদের প্রত্যেকের উদ্ভাসিত মুখের আনন্দ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক মনোবলের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমি আপনাদের অতি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আজ আজ়াদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সেনার মুখে একই ধ্বনি উঠেছে "চলো দিল্লি"। প্রকৃতপক্ষে এ কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে পুরো সেনাবাহিনী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে কবে তাদের ভারতের সীমান্তে পাঠানো হবে।

বর্তমান সেনাবাহিনীকে মানসিক ও কৌশলগত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা আগামী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে পারে। সেইসঙ্গে আমাদের সেনাবাহিনীকে আরও প্রসারিত করার কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। আমি আজ আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে নতুন যারা সেনাবাহিনীতে যোগদান করছে তাদের সকলের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস আমাদের আশাকে চরিতার্থ করেছে। এবং যদি তাদের সংখ্যার কথা বলতে হয় তা হলে আমি আপনাদের জানাতে পারি যে যদিও গোটা মালয়দেশের সর্বত্র আমাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে ছেয়ে গেছে, তবু আমাদের কাছে বহু সংখ্যক নতুন সেনানী রয়েছে যাদের প্রশিক্ষণের কোনও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা এখনও করে উঠতে পারিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা আশা করছি যে ভবিষ্যতে যখনই কোনও স্বেচ্ছাসেনা আমাদের ফৌজে যোগ দেবে আমরা তখনই তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারব। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য পূর্ব এশিয়ার অন্য অঞ্চলগুলিতেও যেমন থাইল্যান্ড, বর্মাদেশ ইত্যাদি স্থানে প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবীরূপে আমাদের যুবকরাই যে সর্বত্র বিপুল সংখ্যায় যোগ দিচ্ছে তাই নয়। অল্পবয়সি মেয়েরাও স্বেচ্ছাসেবীরূপে বিভিন্ন ধরনের জাতীয় সেবার কাজে যোগ দেবার জন্য এগিয়ে আসছে উৎসাহভরে। সেইজন্য আমাদের রানি ঝাঁসি বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যেখানে আমাদের বোনেদের সামরিক ও রেড ক্রসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আগামী ২২ অক্টোবর সায়োনানে রানি ঝাঁসি বাহিনীর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন হবে।

'সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি'-র পরিকল্পনা অনুসারে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহের জন্য এবং আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করবার ও কেনবার জন্য সর্বত্র আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। আমরা যে সাড়া পাচ্ছি তা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির জনগণের মধ্যে স্বার্থত্যাগের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এখনও পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা সত্যিই চমকপ্রদ এবং তা প্রতিটি স্বাধীনতাকামী ভারতীয়ের মনে সন্তোষ ও গর্বের সঞ্চার করবে। উচ্চবিত্ত পরিবারগুলিও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এবং আমি আশা করব তারাও জাতির সেবায় ও ত্যাগের দৃষ্টান্তে সমাজের বাকি অংশের থেকে পিছিয়ে থাকবে না।

সমগ্র ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের কাজ অব্যাহত রাখা ছাড়াও গত জুলাই মাসের পর থেকে আমরা সমাজের সেই অংশগুলিতে বিশেষ ভাবে মনোযোগ দিচ্ছি যারা

অতীতে নিরুৎসাহী বা স্বল্প উৎসাহী ছিল। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাতে পারি আমরা এই বিষয়ে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পেরেছি। এশিয়ার ভারতীয় জনসম্প্রদায়ের সর্বস্তরেই আজ এক বিশেষ আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য সবকিছু করতে তারা আজ প্রস্তুত ও অতি আগ্রহের সঙ্গে তারা পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

গত কয়েক মাস ধরে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পরিস্থিতির যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তাতে যদিও সাধারণ মানুষের কষ্ট ক্রমশ আরওই বেড়েছে, কিন্তু এর ফলে আমাদের আন্দোলনের জন্য সেই পরিস্থিতি বিশেষ উপযোগী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক আগের মতোই প্রতিক্রিয়াশীল আছে, যদিও মাঝে মাঝে উচ্চপদস্থ অফিসারদের মুখে আপোষ মীমাংসার মেকি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সব নামী ও পরিচিত নেতারা এখন কারাগারে বন্দি। তার সঙ্গে আরও যাঁরা বন্দি হয়ে আছেন, তাঁরা হলেন বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী ও যোদ্ধারা। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনাই নেই, যদিও এই সম্ভাবনা একেবারে বাতিল করা যায় না যে ভারতীয় জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্য ব্রিটেনের সঙ্গে আবারও একবার হয়তো একটা অপমানজনক মীমাংসার ব্যর্থ চেষ্টা করা হবে।

ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে— বিশেষ করে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে গত প্রায় চার বছর ধরে যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য রসদ লুণ্ঠনের যে নির্মম নীতি ব্রিটেন গ্রহণ করেছে, সেই নীতিই এই দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ। আপনাদের জানা আছে যে আমাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্বদেশবাসীর জন্য লীগের পক্ষ থেকে প্রথম কিস্তি হিসাবে আমি এক লক্ষ টন চাল দেবার নিঃশর্ত অঙ্গীকার করেছিলাম। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শুধু যে এই দান গ্রহণ করতে অসম্মত হয়েছে তা নয়, উপরন্তু এর জন্য আমাদের অপমানিতও হতে হয়েছে। অথচ অপরপক্ষে যখন ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যালিটি প্রমুখ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ উপবাসী মানুষের খাদ্যাভাব দূর করবার জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের কাছে আবেদন করেছে তখন তাতে তারা একেবারেই কোনও সাড়া পায়নি। এই দুর্ভাগ্যজনক ও হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি থেকে একমাত্র সুফল যা আমরা আশা করতে পারি, তা হল এই চিন্তাটুকু— ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যেই বিপ্লবের সূচনা হয়ে থাকে।

আপনাদের হয়তো জানা আছে যে গত জুলাই মাস থেকে আমি একাধিকবার মালয়, থাইল্যান্ড, বর্মা ও ইন্দোচিন সফর করেছি। এই সফরের সর্বত্র আমাদের স্বদেশবাসীর মধ্যে আমি যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখেছি তা যে শুধু আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তা নয়, সেইসঙ্গে আমার আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যাশাকেও অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে।

গত আগস্ট মাসে বর্মাদেশের ও এই মাসে (অর্থাৎ অক্টোবরে) ফিলিপাইনের স্বাধীনতা অর্জনের ঘটনা দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত ভারতবাসীদের বিশাল অনুপ্রেরণা দিয়েছে। সমগ্র পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসীরা এই দুই ঐতিহাসিক ঘটনার সাফল্যে স্বাধীন বর্মাদেশ ও ফিলিপাইনের সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাতে মিটিং ও পথসভা ডেকেছে। একই সঙ্গে তারা আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে যে ভারতবর্ষকেও ব্রিটিশ রাজ ও তার মিত্রশক্তির কবল থেকে মুক্তি দেবার জন্য এক অতিরিক্ত দায়িত্ব এখন যেন তাদের উপরে এসে পড়েছে।

থাইল্যান্ড ও বর্মাদেশে আমার সফরের সময় সৌভাগ্যক্রমে আমি মহানুভব রাষ্ট্রপ্রধান ডক্টর বা ম ও বর্মাদেশের অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলাম। দুই সরকারের কাছ থেকেই আমাদের সংগ্রামের জন্য আমি শুধু যে সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা পেয়েছি তা নয়, উপরন্তু সর্ব প্রকার সাহায্যের আশ্বাসও পেয়েছি।

আমি আপনাদের জানাতে চাই যে শুধু আমাদের সংগ্রামের জন্য নয়, যুদ্ধাবসানের পরে দেশের পুনর্গঠনের জন্যও আমরা পরিকল্পনা করছি ও প্রস্তুত হচ্ছি। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত হবার পরে আমরা আমাদের দেশকে কোন অবস্থায় পাব তা আমরা কল্পনা করতে পারি। সেই উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের হেড-কোয়ার্টার্সে একটা পুনর্গঠন দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সামরিক অভিযানের পাশাপাশি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে দ্রুতগতিতে পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সামরিক অভিযানের পাশাপাশি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে দ্রুতগতিতে পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য জনগণকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সংক্ষেপে বলতে হলে, আগামী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য, ও তার পরেও আমাদের যে দায়িত্ব নিতে হবে তার প্রস্তুতিতে আমরা কোনও ফাঁক রাখতে চাই না। প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকেই সংগ্রামের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত। সামরিক ও রাজনৈতিক দুই ধরনের লক্ষ্যসাধনের জন্যই আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

সামরিক লক্ষ্যসাধনের বিষয়ে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা, এবং বিশেষভাবে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের (ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনীর) সদস্যেরা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে কবে তারা ভারতবর্ষের সীমান্ত অতিক্রম করতে পারবে ও আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ যুদ্ধে যোগ দিতে পারবে। কিন্তু তার আগে রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনের কাজেও আমাদের রত হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকার গঠন করতে হবে যে সরকারের নেতৃত্বাধীনে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হবে। আজকের এই সন্ধিক্ষণে এই সরকার গঠন সমগ্র বিশ্বের ভারতীয়দের গভীরভাবে প্রভাবিত করে আগামীদিনের সংগ্রামকে দেবে এক বিশেষ গতিময়তা। বস্তুত পূর্ব এশিয়ায় আমাদের স্বদেশবাসীরা এই আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকার গঠনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন ও তাঁরা আশা করছেন যে আমরা অনতিবিলম্বে এই সরকারের উদ্বোধন করতে পারব।

দি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগই এই সরকার গঠনের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান কারণ তারাই হল পূর্ব এশিয়ার একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা এখানকার ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠানের উপর সমগ্র প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়েরই অগাধ আস্থা। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সংবিধানের দেওয়া ক্ষমতানুসারে সেই আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকার গঠনের দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত হয়েছে।

স্বভাবতই এই সরকার যদি আমরা ভারতের অভ্যন্তরে গঠন করতে পারতাম এবং সেই সরকারের অধীনে যদি আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ যুদ্ধে সামিল হতে পারতাম, তা হলে সেটাই আমাদের সর্বাধিক কাম্য ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা এখন যেমন, এবং যেহেতু প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় নেতারা এখন কারাগারে বন্দি, সেই কারণে ভারতের সীমানার ভিতরে একটা আপৎকালীন সরকার গঠনের চিন্তা একেবারেই অর্থহীন। ঠিক সেই একই কারণে এটাও আশা করা অর্থহীন যে দেশের অভ্যন্তর থেকে আমাদের স্বাধীনতার চূড়ান্ত

লড়াইয়ের সূচনা করা বা পরিচালনা করা সম্ভব হবে। কার্যত পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দেরই এই গুরু দায়িত্বের ভার নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে দেশের সীমানার বাইরে আপৎকালীন সরকার গঠন করার একাধিক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত আছে। দেশের বাইরে থেকে স্বাধীনতার লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল এমন ঐতিহাসিক ঘটনাও ঘটেছে।

কিন্তু যদিও ভারতবর্ষের সীমানার বাহির থেকে আজ রাজনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে লড়াইয়ের প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, এ কথা এখন আর গোপন নয় যে দেশের ভিতরে ও বাইরে স্বাধীনতার আন্দোলনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগ রয়েছে। দেশের বাইরে আমাদের কার্যকলাপের জন্য শুধু দেশের সাধারণ জনসমাজের নয়, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ভারতীয় সেনাদের বিরাট অংশেরও পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আরও যে কথা গোপন নয় তা হল দেশপ্রেমিক যারা দেশের বাইরে কার্যরত তাদের সঙ্গে দেশের ভিতরের দেশপ্রেমিকদের নিয়মিত ও অখণ্ড যোগাযোগ আছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে আমাদের যোগাযোগ রক্ষাকারী এজেন্টদের গ্রেপ্তার করে তাদের উপরে অত্যাচার করছে, হত্যা করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা আমাদের মধ্যের যোগাযোগকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। এই কথাগুলি স্মরণে রাখলে আমাদের মনের মধ্যে আর কোনও সন্দেহই নেই যে যখন আমাদের সেনাবাহিনী ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে দেশে প্রবেশ করবে ও ভারতের মাটিতে যখন আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করব তখন সারা দেশে প্রকৃত বিপ্লব দেখা দেবে— যে বিপ্লব আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবে।

বন্ধুরা, আমরা আজ এখানে যা করছি তা হল শেষ সংগ্রামের প্রস্তুতি। সেই সংগ্রাম শুরু হবে যেদিন আমরা ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করব। সেইদিনই শুরু হবে দিল্লির অভিমুখে আমাদের ঐতিহাসিক অভিযান— এবং সেই অভিযান শেষ হবে যেদিন ভারতবর্ষের শেষ ইংরেজ হয় বিতাড়িত হবে অথবা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে। যখন ভারতের জাতীয় পতাকা উড়বে ভাইসরয়ের প্রাসাদের উপরে এবং যখন আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের রাজধানীর সুপ্রাচীন লালকেল্লার সামনে তাদের বিজয় ঘোষণা করবে।

বন্ধুরা, নিপ্পনের সরকার ও জনগণকে, নিপ্পনের জাতীয় সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীকে তাদের অজস্র ও অকুণ্ঠ সহানুভূতি, সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে আমি আজকের এই ভাষণ শেষ করতে পারি না। এমন একদিন নিশ্চয় আসবে এবং তা আসবে অনতিবিলম্বে যখন অতীতে আমাদের ইতিহাসের তমসাচ্ছন্ন পর্যায়ে যে সাহায্য আমরা পেয়েছি, ও ভবিষ্যতেও যা পেতে থাকব সেই সাহায্যের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধের প্রমাণ তাদের আমরা দিতে পারব। সেইদিন আসার আগে আমাদের প্রতি তাদের মহানুভবতা ও সহানুভূতির জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা ও স্বীকৃতির নিদর্শন হিসাবে একটা ক্ষুদ্র উপহার আমরা দিতে চাই। জাপানের জাতীয় সেনাবাহিনীর জন্য পাঁচটা এবং জাপানের জাতীয় নৌবাহিনীর জন্য পাঁচটা বিমান নির্মাণ, ও সেইগুলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে যে অর্থের প্রয়োজন হবে, সেই পরিমাণ অর্থ আমি আজ আমাদের কৃতজ্ঞতার ক্ষুদ্র নিদর্শন হিসাবে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের তরফ থেকে তাদের হাতে দিতে চাই। অধিকন্তু, আমি নিপ্পনের সরকার ও জনগণকে এই আশ্বাস দিতে চাই যে আমাদের সংগ্রাম যতই দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য হোক না কেন আমরা ভারতীয়েরা তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর যতদিন না আমাদের দুই দেশের একই যে শত্রু তার বিনাশ আমরা করতে পারি। আমাদের জাতীয় মুক্তির বিষয়ে আমাদের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস আছে

তেমনই শেষ পর্যন্ত একদিন যুদ্ধে যে নিপ্পন ও তাদের মিত্রগোষ্ঠীর জয় হবেই সেই বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

এবার বন্ধুরা, আমি ঘোষণা করতে চাই যে আজ দ্বিপ্রহরে আমি আমাদের আপৎকালীন আজাদ হিন্দ সরকার (আর্জি হুকুমত-এ-আজ়াদ হিন্দ)-এর কাঠামো সম্বন্ধে আপনাদের জানাব।'

[ii আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকার (আর্জি হুকুমত-এ-আজ়াদ হিন্দ)-এর তাৎপর্য]

বিকাল ৪টায় জনগণ আবার সভাগৃহে সমবেত হলেন। সকালের অধিবেশনের মতো বিকালেও সভাগৃহ একেবারে লোকে পরিপূর্ণ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এলেন ঠিক ৪টায়, সঙ্গে কর্নেল ইয়ামামোতো, হিকারি কিকানের প্রধান। আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকারের উদ্বোধন ঘোষণা করার আগে নেতাজি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য জাপান সরকারের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জানিয়ে একটা বক্তব্য রাখলেন। সেইসঙ্গে তিনি বর্মাদেশ ও ফিলিপাইনের স্বাধীনতা অর্জনের উপলক্ষে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে আরও দুটি বক্তব্য রাখলেন। সভায় এই বক্তব্যগুলি পরম সমাদরে গৃহীত হল।

নেতাজি তারপরে আপৎকালীন সরকার গঠনের তাৎপর্য সম্বন্ধে হিন্দিতে একটা বিবৃতি দিলেন, যে বিবৃতি মিস্টার এম কে চিদাম্বরম তামিলে অনুবাদ করলেন। বিবৃতিটি নীচে দেওয়া হল:

'ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে, এবং বিশেষ ভাবে গত ২২ বছরের জনগণের সেবায় নিযুক্ত থাকাকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব বিপ্লবের ঘটনা ঘটেছে তা পর্যবেক্ষণের পরে আমি সর্বদাই অনুভব করেছি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধে দু'টি জিনিসের অভাব থেকে গেছে। একটি হল জাতীয় সেনাবাহিনী ও সেই বাহিনীকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবার জন্য একটি জাতীয় সরকার। বর্তমান যুদ্ধাবস্থায় নিপ্পনের সেনাবাহিনীর চমকপ্রদ সাফল্যকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ সেইজন্যই পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের পক্ষে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ এবং ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে।

এই জাতীয় সেনাবাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে পূর্ব এশিয়াতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বাস্তব অস্তিত্ব ও গুরুত্ব অনুভব করা গেছে। এবং এই বাহিনী গড়ে তুলতে না পারলে পূর্ব এশিয়ায় ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ শুধুমাত্র একটা প্রচারযন্ত্রে পরিণত হত। সেনাবাহিনী গঠনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারতবর্ষের একটা আপৎকালীন সরকারও গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে এবং তার প্রয়োজনও ছিল। ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের থেকেই এই সরকারের উদ্ভব হয়েছে যার উদ্দেশ্য হল ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চূড়ান্ত লড়াইয়ের সূচনা ও পরিচালনা করা।

এই আপৎকালীন সরকার গড়ে তোলার ফলে আমরা একাধারে যেমন ভারতবর্ষের জরুরি ও সঙ্কটময় পরিস্থিতিগুলির সমাধানের চেষ্টা করছি এবং সেইসঙ্গে অন্যদিকে ইতিহাসে আগে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে আমরা তার পদক্ষেপ অনুসরণ করবার চেষ্টা করছি। সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে দেখা যায় আয়ারল্যান্ডের জনগণ তাদের আপৎকালীন সরকার গঠন করেছিল ১৯১৬ সালে। চেকোস্লোভাকিয়ার জনগণও সেই একই কাজ করেছিল প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের সময়। তুর্কিরাও মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে আনাতোলিয়াতে তাদের আপৎকালীন সরকার গঠন করেছিল।

আমাদের ক্ষেত্রে এই আপৎকালীন সরকার সাধারণ শান্তির সময়ে গঠিত সরকারের মতো হবে না। এর কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি হবে বিশেষ ও অনন্য, কারণ এই সরকার হবে একটা যুদ্ধরত প্রতিষ্ঠান, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ও তার মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের সূচনা ও পরিচালনাই হবে তার প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা ও পরিচালনার জন্য যে সব দপ্তরের প্রয়োজন, শুধুমাত্র সেই দপ্তরগুলিই সরকার গঠন করবে।

ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীসভায় কিছু সদস্য থাকবেন যাঁরা অসামরিক দপ্তরগুলির প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং অন্য সদস্যেরা সরকারের সামরিক শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে থাকবেন। সরকারের উদ্দেশ্য যেহেতু স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচালনা, সামরিক শক্তির প্রতিনিধিরাই ক্যাবিনেটের বৃহত্তর অংশ গঠন করবেন।

ক্যাবিনেটের সাধারণ মন্ত্রীরা ছাড়াও, বেশ কয়েকজনকে উপদেষ্টা হিসাবে ক্যাবিনেটে স্থান দেওয়া হয়েছে। এইভাবে এই আপৎকালীন সরকার সমগ্র পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এক স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখবে ও আগামী যুদ্ধের সময় তাদের কাছ থেকে যথাসম্ভব রসদ সংগ্রহ করতে থাকবে।

এই আপৎকালীন সরকার যখন ভারতবর্ষের মাটিতে ফিরে যেতে পারবে তখন একটা সাধারণ সরকার যেমন তার নিজস্ব এলাকায় শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে তেমনভাবেই তার কাজ শুরু হবে এবং তখন অনেক নতুন দপ্তরও সৃষ্টি করা হবে।

আজাদ হিন্দ-এর আপৎকালীন সরকার গঠনের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন তাদের সাফল্যলাভের সব কয়টি পূর্বশর্ত পূরণ করতে পেরেছে। এখন শুধু স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম শুরু করার অপেক্ষা। ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনী যখন ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে দিল্লি অভিমুখে তাদের ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করবে তখনই সেই সংগ্রামের সূচনা হবে। এই যাত্রা শেষ হবে কেবলমাত্র তখন, যখন ভারতবর্ষ থেকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি বিতাড়িত হবে ও নতুন দিল্লির ভাইসরয়ের প্রাসাদে যখন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে।'

নেতাজি আপৎকালীন সরকারের সদস্যদের নাম ঘোষণা করতে থাকলেন এবং সভাগৃহ করতালি ও দীর্ঘ উল্লাসধ্বনিতে ভরে উঠতে থাকল:

সুভাষচন্দ্র বসু (রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং যুদ্ধ ও বিদেশ দপ্তরের মন্ত্রী)

ক্যাপ্টেন মিসেস লক্ষ্মী (মহিলাদের দপ্তর)
এস এ আয়ার (প্রচার দপ্তর)
লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি (অর্থ দপ্তর)

সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিবৃন্দ
লেফটেন্যান্ট কর্নেল আজিজ আহমেদ্,
লেফটেন্যান্ট কর্নেল এন এস ভগত,
লেফটেন্যান্ট কর্নেল জে কে ভোঁসলে,

লেফটেন্যান্ট কর্নেল গুলজারা সিং,
লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম জেড কিয়ানি,
লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ জি লোগানাদান,
লেফটেন্যান্ট কর্নেল এশান কাদির,
লেফটেন্যান্ট কর্নেল শাহ নওয়াজ়,
এ এম সহায়, সেক্রেটারি (মন্ত্রীর ক্ষমতাসম্পন্ন),
রাসবিহারী বসু (সর্বোচ্চ উপদেষ্টা)

উপদেষ্টাবৃন্দ

করিম গনি, দেবনাথ দাস, ডি এম খান, এ ইয়েলাপ্পা, জে থিভি ও সর্দার ইশার সিং, এ এন সরকার (আইন উপদেষ্টা)। এর পরে মন্ত্রী ও উপদেষ্টারা মঞ্চে উঠে এসে নেতাজির পিছনে আসন গ্রহণ করলেন।

সব থেকে মর্মস্পর্শী ঘটনা ঘটল যখন নেতাজি ঈশ্বরের নামে ভারতবর্ষের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে উঠলেন। তিনি যখন হিন্দিতে শপথবাণী পাঠ করতে শুরু করলেন তখন তাঁকে বিশেষ অভিভূত দেখাল। কী বিশাল দায়িত্বের বোঝা তিনি কাঁধে নিলেন সেই উপলব্ধিই মনে হল তাঁকে যেন গভীরভাবে নাড়া দিল। কয়েকটি শব্দ পড়বার পরে তিনি এতটাই অভিভূত হয়ে পড়লেন যে তাঁকে থামতে হল। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে তিনি তাঁর চোখের জল মুছলেন। সভাগৃহে সমবেত জনগণের মধ্যে একটা আবেগের ঢেউ উঠল যখন রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত শপথবাণী পড়লেন:

'ঈশ্বরের নামে এই পুণ্য শপথ গ্রহণ করে বলছি যে আমি, সুভাষচন্দ্র বসু, ভারতবর্ষ ও তার আটত্রিশ কোটি জনগণের জীবনে স্বাধীনতা আনব এবং যতদিন আমার দেহে প্রাণ থাকবে আমি স্বাধীনতা অর্জনের এই পুণ্য সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

আমি সর্বদাই ভারতবর্ষের সেবা করব এবং আটত্রিশ কোটি ভারতীয় ভাই ও বোনেদের মঙ্গলের জন্য কাজ করাই আমার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে গণ্য করব।

স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়ী হবার পরেও, যদি প্রয়োজন হয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমি আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকব।'

নেতাজির পরে সরকারের অন্য সদস্যেরা রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি তাঁদের আনুগত্য স্বীকার করে, ভারতমাতার সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্য ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করলেন। প্রতিটি সদস্য নেতাজির সম্মুখে সামরিক কায়দায় ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত শপথবাণী উচ্চারণ করলেন:

'আমি,... ভারতবর্ষ ও তার আটত্রিশ কোটি জনগণের জীবনে স্বাধীনতা আনার জন্য ঈশ্বরের নামে এই পুণ্য শপথ গ্রহণ করছি। আমার নেতা সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি আমার পূর্ণ আনুগত্য জানাচ্ছি এবং আমি সর্বদাই এই প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য আমার জীবন ও আমার যা কিছু আছে তা দিতে প্রস্তুত থাকব।' নেতাজি সকলের সঙ্গে হৃদ্যতার সঙ্গে করমর্দন করলেন। সভাগৃহে বার বার জয়ধ্বনি উঠতে লাগল।

মিস্টার এ এম সহায় ঘোষণাটি হিন্দিতে পড়লেন,
মিস্টার চিদাম্বরম পড়লেন তামিল ভাষায়, এবং নেতাজি নিজে পড়লেন ইংরেজিতে।

১৭৫৭ সালে বঙ্গদেশে ব্রিটিশদের হাতে তাদের প্রথম পরাজয়ের পর থেকে এই বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণ এক শত বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বহুবার যুদ্ধ করেছে। এই সময়ের দীর্ঘ ইতিহাসে অতুলনীয় বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগের বহু উদাহরণ আছে। এবং সেই ইতিহাসের পাতায় যে যোদ্ধাদের নাম চিরকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তার মধ্যে আছেন বাংলার সিরাজ-উদ্-দৌল্লা ও মোহনলাল, দক্ষিণ ভারতের হায়দার আলি, টিপু সুলতান ও ভেলু থামপি, মহারাষ্ট্রের আপ্পা সাহিব ভোঁসলে ও পেশওয়া বাজি রাও, অযোধ্যার বেগমেরা, পঞ্জাবের সর্দার শ্যাম সিং এবং নানাসাহেব ও আরও অনেকে। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের পূর্বসূরীরা কেউই প্রথমে উপলব্ধি করেননি যে ব্রিটিশ সমগ্র ভারতের জন্যই বড় বিপজ্জনক শত্রু, এবং সেই কারণে তাঁরা তখন এই শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াননি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা যখন বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হলেন, তখন তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রতিরোধ করলেন। ১৮৫৭ সালে স্বাধীন জাতি হিসাবে তাঁরা তাঁদের শেষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন বাহাদুর শাহের পতাকার তলায়। এই যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় কোনও কোনও ক্ষেত্রে চমকপ্রদ জয় সত্ত্বেও, দুর্ভাগ্য ও নেতৃত্বের ত্রুটি চূড়ান্ত পর্যায়ে ডেকে আনল পরাজয় ও দাসত্ব। তা সত্ত্বেও, ঝাঁসির রানি, তাঁতিয়া তোপি, কুনওয়ার সিং এবং নানাসাহেবের মতো বীর যোদ্ধাদের নাম আমাদের জাতির স্মৃতিতে ধ্রুবতারার মতো চির উজ্জ্বল থাকবে এবং আমাদের মহত্তর স্বার্থত্যাগে ও সাহসী যোদ্ধার ভূমিকায় অনুপ্রাণিত করতে থাকবে।

১৮৫৭ সালের পরে বেশ কিছুদিনের জন্য ব্রিটিশ ভারতীয়দের পদানত করে রেখেছিল, জোর করে তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ও সমগ্র জাতির উপরে নির্মম সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। কিন্তু ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হল, সেই সঙ্গে এল এক নবজাগরণের নব উপলব্ধির যুগ। ১৮৮৫ সাল থেকে শুরু করে গত বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ভারতীয়েরা তাদের হৃত স্বাধীনতাকে ফিরে পাবার জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেছে। বিক্ষোভ প্রদর্শন ও প্রচার, ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন, অন্তর্ঘাত ও বিপ্লবী কার্যকলাপ এবং সবশেষে সশস্ত্র বিদ্রোহ। কিন্তু প্রথম দিকে এইসব প্রচেষ্টাই বিফলে গেছে। শেষে, যখন হতোদ্যম ভারতীয়েরা যে কোনও ভাবে একটা নতুন পন্থা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে, তখন ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী এলেন তাঁর অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের নতুন অস্ত্র নিয়ে।

তার পরে আরও দুই দশক ধরে স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়দের মধ্যে একটা বিরাট কর্মোদ্যম দেখা দিয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হতে লাগল। স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রয়োজন হলে যে কষ্ট স্বীকার, স্বার্থ ত্যাগ ও মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে দেশবাসী তা ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে লাগল। শহরে ও শহর থেকে দূর দূরান্তরের গ্রামগুলিতেও দেশবাসীরা একই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করল। ভারতীয়েরা যে শুধু তাদের সচেতনতা ফিরে পেল তা নয়, তারা যেন এবারে একটা রাজনৈতিক আত্মপরিচয় খুঁজে পেল, তাদের গলায় শোনা যেতে লাগল একই ধ্বনি ও একই লক্ষ্যের অভিমুখে শুরু হল তাদের যাত্রা। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত

সর্বমোট আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভার মাধ্যমে প্রমাণ দিল যে স্বদেশের শাসনভার পরিচালনা করবার মতো ক্ষমতা তাদের আছে ও সেই কার্যভার নেবার জন্য তারা প্রস্তুত।

কাজেই এই বর্তমান বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে ভারতের মুক্তির জন্য চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল সর্বতোভাবে। যুদ্ধ শুরু হবার পর, একদিকে যেমন ইউরোপে জার্মানি তার মিত্রগোষ্ঠীর সাহায্যে আমাদের শত্রুপক্ষের উপরে তীব্র আঘাত হেনেছে—তেমনই পূর্ব এশিয়ায় নিপ্পনও তাদের মিত্রগোষ্ঠীর সাহায্যে আমাদের শত্রুপক্ষের উপরে আক্রমণ চালিয়েছে। তার ফলে পরিস্থিতির একটা চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে যা আমাদের ভারতীয়দের জাতীয় মুক্তি লাভের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে এই প্রথম, প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও প্রবল রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা গেছে এবং তারাও উৎসাহের সঙ্গে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। তারা যে কেবলমাত্র স্বদেশবাসীদের চিন্তার পরোক্ষ দোসর হয়েছে তা নয়, এই প্রথম তারা নিজেরাও ভারতবাসীদের সঙ্গে পা মিলিয়ে স্বাধীনতা লাভের লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে। বিশেষত পূর্ব এশিয়ায় বিশ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয় 'সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি'-র আহ্বানে সাড়া দিয়ে এখন এক বিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে। এবং তাদের সামনেই রয়েছে সারিবদ্ধ আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনারা, তাদের কণ্ঠের ধ্বনিত হচ্ছে 'চলো দিল্লি'।

ব্রিটিশদের দেশ শাসনের কপট নীতির তাড়নায় ভারতবাসীদের অবস্থা সঙ্গীন, তাদের অবাধ লুণ্ঠন ভারতবাসীদের অনাহার ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে ভারতীয়দের কাছে তাদের সুনাম একেবারেই বিলুপ্ত হয়েছে, ভারতবর্ষে তাদের আধিপত্য ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাদের এই দেশ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করবার জন্য এখন আমাদের শুধু একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন, এবং আজ়াদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্ব হল সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গটুকু জ্বালানো। দেশের অভ্যন্তরে, সাধারণ জনগণের ও ব্রিটেনের ভারতীয় সেনাদলের এক বিরাট অংশের উৎসাহী সমর্থন এবং দেশের বাইরে অমিতবিক্রম মিত্রবাহিনীর অকুণ্ঠ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আজ়াদ হিন্দ বাহিনীকে শক্তিশালী করেছে ঠিকই, কিন্তু নিজশক্তির উপর নির্ভরশীলতাই এই ফৌজকে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে।

এখন আমাদের পরাধীনতার কালরাত্রির শেষে স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের লগ্নে ভারতীয় জনগণের দায়িত্ব হল তাদের নিজস্ব আপৎকালীন সরকার গঠন করা, এবং সেই সরকারের নেতৃত্বাধীনে স্বাধীনতার শেষ লড়াই শুরু করা। কিন্তু এখন ভারতের সব নেতারা কারাগারে বন্দি এবং দেশের জনসাধারণের হাত থেকে সর্বপ্রকার অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন ভারতের অভ্যন্তরে আপৎকালীন সরকার গঠন ও সরকারের নেতৃত্বাধীনে স্বাধীনতার শেষ লড়াই শুরু করা সম্ভব নয়। অতএব ভারতের ভিতরে ও বাইরে বসবাসকারী সকল স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়দের সমর্থনপুষ্ট পূর্ব এশিয়ার ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগকেই এখন সেই দায়িত্বভার নিতে হবে। স্বাধীন ভারতের আজাদ হিন্দ সরকার গঠন করে স্বাধীনতার শেষ লড়াইয়ের নেতৃত্ব তাদেরই দিতে হবে। লীগের পরিচালনাধীনে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ সেই শেষ লড়াই লড়বে।

পূর্ব এশিয়ার ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ থেকে এই আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকার গঠিত হবার পরে এখন আমাদের উপরে যে কার্যভার দেওয়া হল আমরা সেই দায়িত্বের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করছি। আমরা প্রার্থনা করব যে ভাগ্য আমাদের সহায় হোক,

মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমাদের সংগ্রাম সফল হোক। আমরা আজ এখানে আমাদের ও আমাদের সেনাবাহিনীর কমরেডদের জীবন আমাদের দেশের স্বাধীনতার কাজে, দেশের মঙ্গলে ও সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের মাঝে আমাদের দেশকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম।

ব্রিটিশ ও তার মিত্রশক্তিকে ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু ও পরিচালনা করাই হবে আজ়াদ হিন্দ সরকারের কাজ। এবং তার পরে এই আপৎকালীন সরকার স্বাধীন ভারতের স্থায়ী সরকার গঠন করবে যা ভারতীয় জনগণের সম্পূর্ণ সমর্থনে ও তাদেরই ইচ্ছানুসারেই গঠিত হবে। ব্রিটিশ ও তার মিত্রশক্তিকে ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করার পরে যতদিন না স্বাধীন ভারতের স্থায়ী সরকার গঠিত হয়, ততদিন আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকার দেশের শাসনভার পরিচালনা করবে।

এই আপৎকালীন সরকারের প্রতি প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্য থাকা উচিত এবং আজ তারা সেই আনুগত্যের স্বীকৃতি দাবি করছে। এই সরকার তার প্রতিটি নাগরিককে তাদের নিজস্ব ধর্ম আচরণের স্বাধীনতা, সমান অধিকার ও সমান সুযোগ দেবার অঙ্গীকার করছে। এই সরকার আজ তাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করছে যে তারা ধূর্ত বিদেশি সরকারের সৃষ্ট ও পরিপোষিত সর্ব ধরনের বৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠে সমভাবে সমগ্র জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করবে।

ঈশ্বরের নামে, ও অতীত প্রজন্মের মানুষ যাঁরা ভারতবাসীদের এক জাতিতে পরিণত করেছেন, এবং সেই গতপ্রাণ বীর যোদ্ধা যাঁরা আমাদের বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগের ঐতিহ্যে দীক্ষা দিয়েছেন, তাঁদের সকলের নামে আজ আমরা ভারতীয় জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছি যেন তারা আমাদের পতাকার তলায় সমবেত হন এবং আসুন আজ আমরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য একযোগে শেষবারের মতো আমাদের শত্রুদের উপরে আঘাত হানি। সাহস ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, যুদ্ধান্তে অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে আসুন আমরা ভারতে ব্রিটিশ ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে আমাদের শেষ লড়াই শুরু করি এবং সেই যুদ্ধ চলবে যতদিন না ভারতের মাটি থেকে আমরা শত্রুদের উচ্ছেদ করতে পারি ও ভারত আবার একটি স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি পায়।

২৪

ইতিহাসের পদরেখা অনুসরণ করে

[২১ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখে সাংবাদিকদের কাছে বিবৃতি][১]

আজ আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকারের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সভায়, রাষ্ট্রপ্রধান রূপে নির্বাচিত নেতাজি বসু বলেন:

গত কয়েক মাস ধরে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পরিস্থিতির যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তাতে যদিও সাধারণ মানুষের কষ্ট ক্রমশ আরও বেড়েছে, কিন্তু এর ফলে আমাদের আন্দোলনের জন্য সেই পরিস্থিতি বিশেষ উপযোগী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভারতবর্ষের বহু অঞ্চল— বিশেষ করে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে গত প্রায় চার বছর ধরে যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষের খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য রসদ লুণ্ঠনের যে নির্মম নীতি ব্রিটেন গ্রহণ করেছে, সেই নীতিই এই দুর্ভিক্ষের অন্যতম প্রধান কারণ। আপনাদের জানা আছে যে আমাদের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্বদেশবাসীর জন্য লীগের পক্ষ থেকে প্রথম কিস্তি হিসাবে আমি এক লক্ষ টন চাল দেবার নিঃশর্ত অঙ্গীকার করেছিলাম। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শুধু যে এই দান গ্রহণ করতে অসম্মত হয়েছে তা নয়, উপরন্তু এর জন্য আমাদের অপমানিতও হতে হয়েছে।

আপনাদের হয়তো জানা আছে যে গত জুলাই মাস থেকে আমি একাধিক বার মালয়, থাইল্যান্ড বর্মা ও ইন্দোচিন সফর করেছি। এই সফরের সর্বত্র আমাদের স্বদেশবাসীর মধ্যে আমি যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখেছি তা যে শুধু আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তা নয়, সেইসঙ্গে আমার আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যাশাকেই অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে।

আমি আপনাদের জানাতে চাই যে শুধু আমাদের সংগ্রামের জন্য নয়, যুদ্ধাবসানের পরে দেশের পুনর্গঠনের জন্যও আমরা পরিকল্পনা করছি ও প্রস্তুত হচ্ছি। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত হবার পরে আমরা আমাদের দেশকে কোন অবস্থায় পাব তা আমরা কল্পনা করতে পারি। সেই উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের হেড-কোয়ার্টার্সে একটা পুনর্গঠন দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে পুনর্গঠন সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। সামরিক অভিযানের পাশাপাশি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে দ্রুতগতিতে পুনর্গঠনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য জনগণকেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সংক্ষেপে বলতে হলে, আগামী স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য, ও তার পরেও আমাদের যে দায়িত্ব নিতে হবে তার প্রস্তুতিতে আমরা কোনও ফাঁক রাখতে চাই না। প্রতিটি দৃষ্টিকোণ থেকেই সংগ্রামের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত। সামরিক ও রাজনৈতিক দুই ধরনের লক্ষ্য সাধনের জন্যই আমাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

---

১. *Testament of Subhas Bose*, pp. 209-210.

স্বভাবতই এই সরকার যদি আমরা ভারতের অভ্যন্তরে গঠন করতে পারতাম এবং সেই সরকারের অধীনে যদি আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ যুদ্ধে সামিল হতে পারতাম, তা হলে সেটাই আমাদের সর্বাধিক কাম্য ছিল, ভারতবর্ষের অবস্থা এখন যেমন এবং যেহেতু প্রায় সব শীর্ষস্থানীয় নেতারা এখন কারাগারে বন্দি, সেই কারণে ভারতের সীমানার ভিতরে একটা আপৎকালীন সরকার গঠনের চিন্তা একেবারেই অর্থহীন। ঠিক সেই একই কারণে এটাও আশা করা অর্থহীন যে দেশের অভ্যন্তরে আমাদের স্বাধীনতার চূড়ান্ত লড়াইয়ের সূচনা করা বা পরিচালনা করা সম্ভব হবে। কার্যত পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দেরই এই গুরু দায়িত্বের ভার নিতে হবে।

আমাদের মনের মধ্যে আর কোনও সন্দেহ নেই যে যখন আমাদের সেনাবাহিনী ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে দেশে প্রবেশ করবে ও ভারতের মাটিতে যখন আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করব তখন সারা দেশে প্রকৃত বিপ্লব দেখা দেবে— যে বিপ্লব আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবে।

আমাদের এই জাতীয় সেনাবাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে পূর্ব এশিয়াতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বাস্তব অস্তিত্ব ও গুরুত্ব অনুভব করা গেছে। এবং এই বাহিনী গড়ে তুলতে না পারলে পূর্ব এশিয়ায় ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ শুধুমাত্র একটা প্রচারযন্ত্রে পরিণত হত। কিন্তু সেনাবাহিনী সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারতবর্ষের একটা আপৎকালীন সরকারও গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে এবং তার প্রয়োজনও ছিল। ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের থেকেই এই সরকারের উদ্ভব হয়েছে এবং তার উদ্দেশ্য হল ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চূড়ান্ত লড়াইয়ের সূচনা ও পরিচালনা করা।

এই আপৎকালীন সরকার গড়ে তোলার জন্য আমরা একাধারে যেমন ভারতবর্ষের জরুরি ও সংকটময় পরিস্থিতিগুলির সমাধানের চেষ্টা করছি এবং সেই সঙ্গে অন্যদিকে ইতিহাসে আগে যে ঘটনাগুলি ঘটেছে আমরা তার পদক্ষেপ অনুসরণ করছি। সাম্প্রতিককালে আয়ারল্যান্ডের জনগণ তাদের আপৎকালীন সরকার গঠন করেছিল ১৯১৬ সালে। চেকোস্লোভাকিয়ার জনগণও সেই একই কাজ করেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। তুর্কিরাও মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে আনাতোলিয়াতে তাদের আপৎকালীন সরকার গঠন করেছিল।

—সিঙ্গাপুর রেডিয়ো, ২১ অক্টোবর ১৯৪৩

২৫

রানি ঝাঁসি বাহিনী

[২২ অক্টোবর ১৯৪৩, সিঙ্গাপুরে ঝাঁসির রানির জন্মোৎসব পালন এবং রানি ঝাঁসি বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রথম শিবিরের উদ্বোধন উপলক্ষে ভাষণ][১]

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু যখন পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় মহিলাদের আহ্বান জানালেন ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের পদরেখা অনুসরণ করে এগিয়ে এসে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য, তখন এই মহিলাদের কাছ থেকে তিনি বিপুল সাড়া পেলেন। সিঙ্গাপুরে ২২ অক্টোবর তারিখে ঝাঁসির রানির জন্মোৎসব পালন এবং রানি ঝাঁসি বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবীদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রথম শিবিরের উদ্বোধন উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে নেচাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আবেগাপ্লুত বক্তৃতায় রানি লক্ষ্মীবাঈ ও চাঁদ বিবির সাহসদৃপ্ত ভূমিকার কথা বললেন এবং গত বিশ বছরে ভারতের তরুণীরা যেভাবে স্বার্থশূন্য নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন তার উল্লেখ করলেন।

নেতাজি যখন ভারতীয় মহিলাদের আজ়াদ হিন্দ ফৌজে তাদের সেনানী ভাইদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন, তখন সমবেত জনতা, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন বিভিন্ন বয়সী মহিলা, সকলে উঠে দাঁড়িয়ে নেতাজিকে বিপুল জয়ধ্বনিতে ভূষিত করল।

সিঙ্গাপুরের মহিলা বিভাগের প্রেসিডেন্ট মিসেস এম কে চিদাম্বরম নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে স্বাগত জানালেন। তারপরে ক্যাপ্টেন মিসেস লক্ষ্মীর নেতৃত্বে রানি ঝাঁসি বাহিনীর সশস্ত্র ইউনিট নেতাজিকে গার্ড-অফ-অনার জানাল। জাতীয় সংগীতের প্রেক্ষাপটে নেতাজি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন।

শিবিরের উদ্বোধন করে নেতাজি বললেন:

আমার বোনেরা ও ভাইয়েরা— রানি ঝাঁসি বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান; পূর্ব এশিয়ায় আমাদের আন্দোলনের অগ্রগতির কথা বিবেচনা করলে তার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে।

এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে আপনাদের যে কথাগুলি মনে রাখতে হবে তা হল আমাদের এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র রাজনৈতিক জয় নয়। আমাদের জাতিকে পুনর্জীবন দানের মহান দায়িত্বভার আমাদের উপরে ন্যস্ত হয়েছে।

১. *Cholo Delhi, pp.* 170-174.

প্রকৃতপক্ষে, আমরা ভারতীয় জাতির যে নতুন জীবন গড়ে তুলতে চলেছি তার জন্য আমাদের এক সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের প্রয়োজন। মনে রাখবেন যে প্রচারের চমক দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের নবজন্ম ঘটছে। সুতরাং আমাদের মহিলাদের মধ্যেও যে এই ঘটনার একটা সাড়া জাগানো প্রভাব পড়বে সেটাই এখনকার পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আমাদের অতীত ছিল মহান ও গৌরবময়। এবং এই গৌরবময় ঐতিহ্য না থাকলে ভারতবর্ষে ঝাঁসির রানির মতো একজন নেত্রীর জন্ম হত না। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহিয়সী নারীদের সংখ্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ভিত্তিক সভ্যতার মধ্যেই ভারতীয় মহিলাদের মহত্বের বীজ সুপ্ত রয়েছে। অতীতে যে ভারতবর্ষ বহু মহিয়সী মহিলার জন্ম দিয়েছে সেই একই ভারতে ঝাঁসির রানির আবির্ভাব হয়েছে যখন আমাদের দেশের চরম দুর্দিন এবং আজ যখন আমরা আমাদের ইতিহাসের চরমতম দুর্দিনের মুখোমুখি হয়েছি তখন আমি জানি ভারতীয় মহিলারা আবার বিপত্তারিণীর ভূমিকায় দেখা দেবে, তাদের উপর আমার সেই আস্থা আছে। ঝাঁসির স্বাধীনতার যুদ্ধে এক রানি লক্ষ্মীবাঈ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, আজ যখন সমগ্র ভারতের ৩৮ কোটি ভারতীয়দের মুক্তির জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়েছে তখন ভারতের শত সহস্র নেত্রীর প্রয়োজন এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে অবশ্যই আপনাদের মধ্য থেকেই সেই নেত্রীরা উঠে আসবেন।

ভারতের অতীত ইতিহাসে যেমন মৈত্রেয়ীর মতো মহিলাদের উদাহরণ আছে, তেমনই সাম্প্রিতককালের ইতিহাসেও আরও অনেক নারী চরিত্রের কাছ থেকে আমরা অনুপ্রেরণা পেতে পারি, যেমন মহারাষ্ট্রের অহল্যাবাঈ, বাংলার রানি ভবানী, রাজিয়া বেগম ও নুরজাহান যাঁরা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আসার আগে দেশ শাসনের কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে অতীতের মতো এই যুগেও ভারতের উর্বরা জমিতে অনেক স্বনামধন্য নারীরা ফুলের মতো বিকশিত হয়ে উঠবেন।

১৯২১ সালে যখন ভারতবর্ষে এক নতুন রাজনৈতিক যুগের সূচনা হয়েছে তখন আমাদের বোনেরা বিপুল সংখ্যায় এগিয়ে এসেছে, স্বার্থশূন্যভাবে আমাদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। সেই সময়ে কারাবরণ করা একটা গৌরবের বিষয় ছিল। আমাদের ভারতীয় ভাই ও বোনেরা কারাগারের অভ্যন্তরের যন্ত্রণা স্বীকার করবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমার এখনও মনে আছে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা, কলকাতার জেলগুলিতে তখন আর কোনও বন্দিকে স্থান দিতে না পেরে ব্রিটিশ আরও দু'টি জেলখানা নির্মাণ করল এবং সেই দু'টি জেলও কিছুদিনের মধ্যে ভরে গেল।

ব্রিটিশ যখন উপলব্ধি করল যে জেলে বন্দি করার ভয় দেখিয়ে ভারতীয়দের আর দমন করা রাখা যাবে না তখন তারা নতুন কৌশল অবলম্বন করল। তারা নেতাদের জেলে বন্দি করে রেখে সাধারণ মানুষের উপরে লাঠি ও গুলি চালাতে শুরু করল। তখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেবার অর্থই লাঠি ও গুলির জন্য প্রস্তুত থাকা এবং ভারতীয়রা, শুধু পুরুষরাই নয়, তার সঙ্গে মহিলারাও সেই আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য এগিয়ে এল দলে দলে। আমি কলকাতার একটি ঘটনার কথা আজও ভুলিনি যেদিন আমরা সরকারের একটা আদেশের বিরুদ্ধে একটা মিছিলে বেরিয়েছি এবং পুলিশ সেই মিছিল ভাঙবার জন্য লাঠি চার্জ শুরু করেছে। তখন কয়েকজন মহিলা সেই লাঠির আঘাতকে অগ্রাহ্য করে আমাদের

চার পাশে ঘিরে দাঁড়াল (অর্থাৎ আমাদের ও পুলিশের মাঝখানে এসে)। কাজেই, ভারতবর্ষে থাকার সময়েই আমি উপলব্ধি করেছি কীভাবে ধাপে ধাপে আমাদের বোনেদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে ও সংকল্প দৃঢ় হচ্ছে।

শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নয়, বিপ্লবী দলগুলির কার্যকলাপেও আমাদের সাহসী বোনেদের মহিয়সী ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। আমি এমন অনেক বোনেদের জানি যারা অসমসাহসী বিপ্লবীতে পরিণত হয়েছে। শন্তিপূর্ণ প্রতিরোধের জন্য যেমন এক ধরনের সাহসিকতার প্রয়োজন হয়, তেমনই বিপ্লবাত্মক কাজের জন্যও আরেক ধরনের এবং আরও সক্রিয় সাহসিকতার প্রয়োজন। এবং আমাদের বোনেদের মধ্যে সেই সাহসের অভাব আমি কখনও দেখিনি। ১৯৩১ সালে দু'টি বোন একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করে, তাদের একজনের বয়স তখন ১৬, অন্যজনের ১৭। ভারতবর্ষে সাধারণ পুরুষেরাও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দাঁড়ালে কাঁপতে থাকে, সেখানে এই দু'টি মেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে গিয়ে তাকে গুলি করে। আপনারা কল্পনা করে দেখুন কি অসাধারণ সাহসের পরিচয় তারা সেদিন দিয়েছিল। এই সাহস মানুষ হঠাৎ করে আকাশ থেকে পায় না, ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মাটিতে এই সাহসিকতার শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত; সেই মাটি, সেই বীজ থেকেই তারা এই সাহস পেয়ে থাকে।

১৯২৮ সাল থেকে আমি ভারতবর্ষে মহিলাদের প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে আরও জানতে উৎসুক হয়েছি এবং আমি দেখেছি যে আমাদের দেশের মেয়েদের যদি সুযোগ দেওয়া হয় তা হলে তারা যে কোনও পরিস্থিতিতে মাথা উঁচু করে তাদের কৃতিত্ব দেখাবার মতো যোগ্যতা রাখে। বাংলাদেশে রাষ্ট্র মহিলা সঙ্ঘ নামে মেয়েদের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল যারা চমৎকার কাজ করত। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে, ৫০০ জন মহিলার এক স্বেচ্ছাসেবী দল গঠিত হয় যাদের নিয়মানুবর্তিতা ও দল পরিচালনার যোগ্যতা আমাদের বিপুল আশা জুগিয়েছিল ও আমার বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল যে মহিলাদের যথেষ্ট উদ্দীপনা ও সুযোগ দেওয়া গেলে যেকোনও কর্তব্যের ভার তারা যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারে। আমি আরও দেখেছি এ ছাড়া আর কোনও অস্ত্র তাদের পাওয়া সম্ভব নয়, এবং কীভাবে আমাদের বোনেরা সেই অস্ত্র নিয়েই লড়াইয়ে কতটা পারদর্শী হয়ে উঠছে।

সুতরাং আমি যখন আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার ভার নিতে শুরু করলাম, তখন আমার মনে হল যে এই গুরুতর পরিস্থিতিতে আমাদের বোনেদেরও সমানভাবে দেশের সেবা করবার সুযোগ দিতে হবে। আমি অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছি এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে বলেছেন যে ভারতের একটা রেজিমেন্ট গঠন করা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু পূর্ব এশিয়ায় তা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তাঁদের মতামত আমার বিশ্বাস ও সংকল্পকে টলাতে পারেনি। এবং আজ আপনারা সকলেই স্বচক্ষে দেখেছেন আমাদের বোনেরা সফল হতে পারে কিনা। এখানে তাদের কাজ শুরু হয়েছে জুলাই মাসে, এবং এখন তাদের প্রথম প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হচ্ছে। এই কাজ আরও আগেই করা সম্ভব হত, না হবার কারণ তাদের অক্ষমতা নয়। আমরা এর আগে শিবিরের উপযুক্ত স্থান না পাওয়াতে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করতে পারার জন্যই এই বিলম্ব হয়েছে। আমি জানি আমার বোনেরা এর জন্য অধৈর্য ও চিন্তিত ছিল এবং আমি তাদের কথা ভুলে গিয়েছি কিনা সেই বিষয়ে জানবার জন্য তারা আমার কাছে প্রতিনিধি পাঠাবার কথা ভেবেছে। আজ আমরা যে শিবির উদ্বোধনের পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছি এবং ঝাঁসির রানির শুভ জন্মদিনে

সেই শিবিরের উদ্বোধন হতে চলেছে সেইজন্য আমি অত্যন্ত প্রীত।

আমি এইখানে ঝাঁসির রানির বিষয়েও দু'চারটি কথা বলতে চাই। যখন তিনি যুদ্ধে যোগ দেন তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। রণক্ষেত্রে ঘোড়ার পিঠে বিশ বছরের এক তরুণী, হাতে উন্মুক্ত তরবারি— আপনারা সহজেই কল্পনা করতে পারেন কেমন তেজস্বিনী ও নির্ভীক তিনি ছিলেন। বিপক্ষে যুদ্ধরত ইংরেজ সেনাধিপতি ঝাঁসির রানির বিষয়ে বলেছিলেন, "তিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সব থেকে সাহসী"। এই সেনাধিপতিকে রানির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছিল, কাজেই তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। রানি প্রথমে ঝাঁসির কেল্লার ভিতর থেকে লড়াই চালাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন সেই কেল্লা শত্রুর করায়ত্ত হয় তখন তিনি কিছু সেনানী নিয়ে কলপিতে পশ্চাদপসরণ করে সেখান থেকেই কিছুদিন লড়াই করলেন। তারপর যখন সেখান থেকেও তাঁকে সরতে হল, তখন তিনি তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে সন্ধি করে গোয়ালিয়রের দুর্গ আক্রমণ করে দখল করলেন। গোয়ালিয়রের দুর্গকে যুদ্ধের প্রধান ঘাঁটি করে যতদিন পেরেছিলেন শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি তাঁর প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছিলেন এবং তারপরে সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই তিনি তাঁর প্রাণ বিসর্জন দেন।

ভেবে দেখুন বারে বারে পরাভূত হওয়া সত্ত্বেও লড়াই চালিয়ে যাবার মতো সাহস কতজনের থাকে। এই বিশ বছরের তরুণীর যে অদম্য সাহস ও নির্ভীকতা ছিল তা ভারতীয়দের বহু প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। দুর্ভাগ্যবশত যুদ্ধে রানি পরাস্ত হলেন বটে, কিন্তু সেটা তাঁর পরাজয় ছিল না, ছিল গোটা ভারতবর্ষের। তিনি তাঁর প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন কিন্তু তাঁর অমিতবিক্রম তেজস্বিনী নেতৃত্বের প্রভাব থাকবে চির উজ্জ্বল। ভারতবর্ষে আবার নতুন প্রজন্মের ঝাঁসির রানির আবির্ভাব হবে ও তারা বিজয়ের পথে এগিয়ে যাবে।

আজ যে শিবিরের উদ্বোধন হল সেখানে এখন ১৫৬ জন বোনেরা প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করবেন। আমার আশা যে সেই সংখ্যা অচিরেই সহস্র অতিক্রম করবে। থাইল্যান্ড ও বর্মাদেশেও মহিলাদের প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছে, তবে সায়োনানে থাকবে আমাদের কেন্দ্রীয় শিবির এবং আমার ধারণা এই কেন্দ্রীয় শিবিরে অন্ততপক্ষে সহস্র জন ভবিষ্যতের ঝাঁসির রানির প্রশিক্ষণ নিতে থাকবে।

সায়োনানের রানি ঝাঁসি বাহিনীর নির্ভীক অধিনায়িকার বক্তৃতা আপনারা শুনেছেন। দিল্লি অভিমুখে আমাদের বিজয় বাহিনীর যাত্রার প্রস্তুতি নেবার জন্য তিনি দিনে রাতে তাঁদের কাজ অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা করেছেন। আমাদের ভাইদের মতো বোনেদের কণ্ঠেও যখন শুনি "দিল্লি চলো" তখন তা আমাকে বড় আনন্দ দেয়।

আজ এখন তবে আমি এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সমবেত জনগণকে আমার অনুরোধ তাঁরা যেন আমার বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেন এবং আমাদের কর্মোদ্যমের যে পরিকল্পনা আপনাদের কাছে আমি ঘোষণা করেছি তা যেন তাঁরা কাজে পরিণত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

২৬

আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা

[ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা উপলক্ষে বেতারবার্তা এবং সিঙ্গাপুরের মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংয়ের বিপরীত দিকে পাদাং ময়দানে ৫০,০০০ ভারতীয়র সমাবেশে ভাষণ, ২৩-২৪ অক্টোবর ১৯৪৩][১]

২৩ অক্টোবরের রাতে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের হেড কোয়ার্টার্স থেকে নিম্নলিখিত ঘোষণাটি করা হল:

২৩ ও ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৩ তারিখের মধ্যরাতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সরকারি বাসভবনে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের মন্ত্রীসভার দ্বিতীয় মিটিংয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল:

'আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। নিপ্পন সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত এক বার্তায় আজ়াদ হিন্দের এই আপৎকালীন সরকারকে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, আজ়াদ হিন্দ সরকার সেই বিষয়ে তাদের গভীর সন্তোষ প্রকাশ করছে। এই বার্তায় নিপ্পন সরকারের পক্ষ থেকে যে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তারজন্য আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।'

২৪ অক্টোবর বিকাল ৪টার সময় সায়োনানের মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংয়ের বিপরীত দিকে পাদাং ময়দানে ৫০,০০০ ভারতীয়দের সমাবেশে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ঘোষণা করলেন 'গতকাল মধ্যরাত্রির ৫ মিনিট পরে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।'

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'আজ়াদ হিন্দ জিন্দাবাদ' ও 'নেতাজি কি জয়' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ভরে উঠল।

'আমাদের শক্তি শতগুণ বেড়েছে, আমরা তাই আজ যুদ্ধ ঘোষণা করতে প্রস্তুত।' নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বললেন।

তিনি বললেন: 'আমি চাই, আপনারা সকলে আজ একযোগে সমগ্র পৃথিবীর কাছে প্রমাণ করে দিন যে এই ঘোষণাকে বাস্তবে পরিণত করবার কাজে নিজেদের নিয়োগ করবার ক্ষমতা আপনাদের আছে। আজ যে যুদ্ধ ঘোষণা আমরা করছি, আমরা জানি যে সেই যুদ্ধ হবে নির্মম ও রক্তাক্ত। ব্রিটিশের খুব ভাল করেই জানা আছে যে আমার যেমন কথা তেমন কাজ। সুতরাং আমি যখন মুখে বলছি যুদ্ধ, প্রকৃতপক্ষে কাজেও আমি তাই

---

১. Chalo Delhi, pp. 174-187, যুদ্ধ ঘোষণার বিবৃতিটি ছিল ইংরেজিতে এবং জনসমাবেশের ভাষণটি মূল হিন্দি থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

করতে চাই, এবং সেই লড়াই চলবে যতদিন না ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে।

'কিন্তু আমি আপনাদের সকলের কাছে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে চাই— ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার এই সিদ্ধান্তকে হাত তুলে সমর্থন জানাবার আগে আপনারা খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবেন। আপনাদের সকলের চিন্তাভাবনা যদি একইভাবে কাজ করে, আজকেই এই ঘোষণাকে কার্যে পরিণত করবার জন্য আপনারাও যদি সকলে আজকের এই মুহূর্ত থেকে আপনাদের জীবন, ও পৃথিবীতে আপনাদের যা কিছু আছে সব বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন, ভারতের স্বাধীনতা জিতে নেবার জন্য আগামী যুদ্ধে আপনারা যদি আপনাদের প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে আপনারা উঠে দাঁড়ান ও আপনাদের হাত তুলে আমাকে সমর্থন জানান।' নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ঘোষণা করলেন।

এই ঘোষণায় সমবেত জনগণ যেন এক প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। ৫০,০০০ জনের বিশাল জনতা এক যোগে উঠে দাঁড়াল, বিপুল জয়ধ্বনি উঠতে লাগল মুহুর্মুহু, প্রায় পনেরো মিনিট ধরে পঞ্চাশ হাজার কণ্ঠে অবিরাম বিপ্লবী স্লোগান গর্জিত হতে থাকল; কয়েক মুহূর্ত আগেই যেখানে ৫০ হাজার মানুষের মুখ দেখা যাচ্ছিল এখন সেখানে দেখা গেল বেয়নেটের জঙ্গল, জমি থেকে প্রায় বারো ফুট উপরে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনারা ও স্বেচ্ছাসেবকের দল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের কাঁধের উপরে রাইফেল ধরে উঠে দাঁড়াল ও তাদের কণ্ঠ থেকে বিপ্লবী স্লোগান শোনা যেতে লাগল। তাদের পিছনে সাধারণ জনতা, স্ত্রীপুরুষ ও ছোট ছেলেমেয়েরা যে যেখানে ছিল, দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে নেতাজির উদ্দেশ্যে তাদের জয়ধ্বনি দিতে থাকল। এবং ১৫ ফুট উঁচু মঞ্চে নেতাজি স্থির সিংহের মতো দাঁড়িয়ে, গম্ভীর ও সংকল্পবদ্ধ, সম্মুখের বিশাল জনতার চরম উৎসাহ ও উত্তেজনার নীরব সাক্ষী।

তারপরে জনতা তাদের চারদিকে বেষ্টনী ভেঙে একের পর এক বিশাল ঢেউয়ের মতো মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল, যেখানে নেতাজি নীরবে দাঁড়িয়ে এবং তারা তাঁর জয়ধ্বনি দিতে থাকল যতক্ষণ তাদের গলা থেকে আওয়াজ বার করতে পারল।

জনসমাবেশে নেতাজির বক্তৃতা:

গত ১৭ অক্টোবর ফিলিপাইনের স্বাধীনতা লাভ উপলক্ষে তাদের অভিনন্দন জানাবার জন্য যে জনসমাবেশের আয়োজন করেছিলাম সেখানে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে এখন বর্মাদেশ ও ফিলিপাইন স্বাধীন হয়েছে, এবং এর পরেই ভারতবর্ষের সুযোগ আসবে। আজ আমি অতি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সেই সুযোগ এখন ভারতবর্ষের সামনে এসেছে, আমরা স্বাধীন ভারতের আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার গঠন করেছি যা বিশ্বের কাছে স্বীকৃতিলাভ করেছে।

ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে যেভাবে ঘটনার ক্রমপর্যায় আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পৌঁছে দিয়েছে সেই দিকে পিছন ফিরে তাকালে আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করব যে ভাগ্যের নির্দেশ ও সহায়তাতেই আমরা আজ এখানে পৌঁছতে পেরেছি। ঈশ্বর আমাদের সহায়, এবং এই আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার যাকে আজ আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি, বিশ্বের দরবারে সেই সরকারের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করবার জন্য আজ আমরা সেই মাহেন্দ্রক্ষণে পৌঁছেছি যখন আমাদের প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ হয়েছে।

ইউরোপে বর্তমান যুদ্ধের শুরুতে আমাদের আজীবনের শত্রু— ব্রিটিশ শক্তি পশ্চিমের যুদ্ধে তাদের প্রথম আঘাত পায় ও নিশ্চিতভাবে সেখানে তাদের শক্তিক্ষয় হয়েছিল। যদি তারা কেবলমাত্র পশ্চিমের যুদ্ধক্ষেত্রেই ক্রমাগত পরাজয় স্বীকার করত তা হলে তা থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথ কিছু মাত্র প্রশস্ত হত না। কিন্তু পূর্বদিকের যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা একের পর এক হার স্বীকার করে চলেছে এবং তাদের চূড়ান্ত শক্তিক্ষয় হয়েছে। এবং পূর্বদিকের যুদ্ধক্ষেত্রে এই পরাজয় ও শক্তিক্ষয়ের থেকে আরও যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল পূর্ব দিকে আজ এক নতুন দরজা খুলে গেছে— যা ব্রিটিশের কাছে অকল্পনীয় ছিল, এবং সেই উন্মুক্ত দরজা দিয়েই ভারতবর্ষের মুক্তি আসবে বলে আমি মনে করি।

ব্রিটিশ যুদ্ধকৌশলীরা সব সময়েই ভেবেছিল যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকেই তাদের বিপদের সম্ভাবনা; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত থেকে ভারতে প্রবেশ করতে পারে সেটা তাদের চিন্তার অতীত ছিল। এটা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি এবং এই দিকের আক্রমণ থেকে ভারতকে সুরক্ষা দেবার জন্য তাদের কোনও প্রস্তুতিও ছিল না।

এই প্রশ্নের আরও একটা বৈচিত্র্যময় দিক আছে। যদিও এমনও ভেবে নেওয়া যায় যে ব্রিটিশরা পশ্চিমের যুদ্ধক্ষেত্রে একের পর এক পরাজয় স্বীকার করতে করতে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এসে পৌঁছে গেছে, তাহলেও সেই পরিস্থিতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে কোনও সাহায্য করত না। কারণ পশ্চিম এশিয়াতে ভারতীয়দের কোনও বসতি নেই। অপরপক্ষে দেখুন ভাগ্য আমাদের সহায়, পূর্ব এশিয়াতে ৩০ লক্ষ ভারতীয়দের বসবাস। এখন পূর্ব এশিয়া থেকে শত্রুদের বিতাড়িত করা গেছে ও এশীয়দের কাছ থেকে সাহায্য আসছে, তখন এই ৩০ লক্ষ ভারতীয়দের সহায়তায় আমরা প্রকৃত অর্থেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হতে পেরেছি।

ব্রিটিশদের ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত— ভারত-বর্মার সীমা পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাবার ফলে ভারতকে স্বাধীন করবার একটা সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গেছে, এবং পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা যদি এই সন্ধিক্ষণে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে না আসতেন তা হলে এমন সুযোগও হাতছাড়া হয়ে যেত। কিন্তু আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা এই শুভক্ষণে দেশের ডাককে অবহেলা করেননি; তাঁরা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের মাধ্যমে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করেছেন ও আজ়াদ হিন্দ ফৌজ গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছেন। গত কয়েক বছরের ঘটনাবলীর একটা সমীক্ষা করলে স্পষ্টই দেখা যাবে যে ভারতের চূড়ান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ভাগ্য এমন একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে যা আমাদের স্বপ্নের অতীত ছিল। ঘটনার পরম্পরা নিশ্চিতভাবে এগিয়েছে যতদিন না সঠিক সময় হয়েছে ও আমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি যদি এখন বলি যে ঈশ্বরের কৃপায় ভারতের সময় হয়েছে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের শুভ লগ্ন আসন্ন, তা হলে আপনারা কি কেউ তা অস্বীকার করতে পারবেন?

আমি যখন পূর্ব এশিয়ায় আসি ও এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করি তখন আমার প্রথম উদ্দেশ্যই ছিল ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ও সেইসঙ্গে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের পুনর্গঠন ও শক্তিবৃদ্ধি।

গত ১৫ অগাস্টে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে এই বছর অতিক্রান্ত হবার আগে ভারতের পুণ্যভূমিতে পা দিতে আমি দৃঢ়সংকল্প। আমার যে কথা সর্বদাই আমার সেই কাজ। সেই দিন থেকেই আমাদের প্রস্তুতি চলছে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবে। আমি ভিত্তিহীন

আস্ফালন বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী নই। আপনাদের ৯ জুলাই তারিখের সামরিক শক্তির কুচকাওয়াজের কথা মনে আছে, যা এই ময়দানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবং আজ সকালে আপনারা লক্ষ করে থাকবেন বর্তমান আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সদস্য যারা আজকের কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করল তাদের সংখ্যা গত জুলাইয়ের অংশগ্রহণকারীদের তুলনায় অনেক কম। আজ সকালে বক্তৃতায় আমি আপনাদের জানিয়েছি যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের এক বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই সায়োনান ছেড়ে ভারতবর্ষের পথে যাত্রা শুরু করেছে। আমাদের সব প্রস্তুতি চলছে সন্তোষজনকভাবে এবং সম্প্রতি আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথে আরও একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ও নিশ্চিত পদক্ষেপ নেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

স্বভাবতই এখন যে প্রশ্ন উঠছে তা হল কোন নেতৃত্বের অধীনে আমাদের আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সামরিক অভিযান পরিচালিত হবে। এবং সেই বিষয়ে এখনই আমাদের একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। সমগ্র বিশ্বকে এবং বিশেষভাবে ভারতীয়দের আমাদের জানাতে হবে যে কার নেতৃত্বে আমাদের বাহিনী যুদ্ধ করবে, এবং যখন আমরা আমাদের শত্রুদের বিতাড়িত করতে পারব তখন ভারতবর্ষের শাসনভার কার কাছে হস্তান্তরিত হবে। কাজেই আমরা যথার্থ সময়েই, ২১ অক্টোবর তারিখে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সমাবেশে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার গঠন করেছি।

যদি আরও তিন বছর আগে আমরা এই সরকার গঠন করতাম তা হলে বিশ্বজন সেই ঘটনাকে হাস্যকর বলে উপহাস করত; এবং আমাদের শত্রুরা হয়তো বলত আমরা মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছি। কিন্তু আজকের এই আপৎকালীন সরকারের উত্থান ঘটেছে পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের স্বাভাবিক বিবর্তনের মাধ্যমে ও শক্তিশালী ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠনের পথ অনুসরণ করে। এই সরকারকে মিথ্যা প্রচারের চমক বলবার আগে আমাদের শত্রুপক্ষকেও এখন দু'বার ভাবতে হবে। আজ়াদ হিন্দের বর্তমান আপৎকালীন সরকার খেলাচ্ছলে গঠন করা হয়নি। এই সরকার একটি সুদৃঢ় ও শক্তিশালী সংগঠন যার পিছনে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের ৩০ লক্ষ ভারতীয়দের সম্মিলিত অনুমোদন রয়েছে ও আর রয়েছে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সমর্থন।

এই সরকার গঠন করবার জন্য আমাদের কোনও নতুন চিন্তা ভাবনার শরণ নিতে হয়নি কারণ স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত লড়াইয়ের ঠিক আগেই আপৎকালীন সরকার গঠন ও ঘোষণা বিপ্লবের রীতির একটা আবশ্যিক অঙ্গ। ইতিহাসে এর বহু উদাহরণ আছে। চেকোস্লোভাকিয়া ও আয়ারল্যান্ডের জনগণ এই নীতি অনুসরণ করেছিল এবং তুর্কিদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঠিক আগে মুস্তাফা কামালও আনাতোলিয়াতে একটা আপৎকালীন সরকার গঠন করেছিলেন। ২১ অক্টোবর আমাদের এই সরকার গঠনের সময় কেবল যে আমাদের সময় নির্বাচন নির্ভুল ছিল তাই নয়, আমরা নির্ভুল পদ্ধতিও অনুসরণ করেছি। এটা সত্য যে এই আপৎকালীন সরকার যদি ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে কোনও স্থানে গঠিত হয় তা হলে সেটাই সর্বোত্তম হত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের সীমানার ভিতরে কোথাও ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের মতো কোনও প্রতিষ্ঠান অথবা আজ়াদ হিন্দ ফৌজের মতো একটা সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা বাস্তবে সম্ভব নয়। এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে গঠিত আপৎকালীন সরকার যার পিছনে প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠন ও সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থন নেই তাদের প্রকৃতপক্ষে কোনও ক্ষমতাই থাকত না এবং অনতিবিলম্বে শত্রুদের হাতে তার বিনাশ হত। এই বাস্তব পরিস্থিতিকে স্বীকার করে নিয়ে এবং আরও বহুবিধ কারণগুলি বিবেচনা করে স্বদেশপ্রেমী

ভারতীয়দের পক্ষে একটা সিদ্ধান্তই নেওয়া সম্ভব ছিল এবং আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আজ আমরা যে পন্থা অবলম্বন করেছি সেটাই একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ।

২১ অক্টোবর আমাদের আপৎকালীন সরকার গঠনের কথা ঘোষণার সময় আমি খুব স্পষ্ট ভাষায় এই সরকারের লক্ষ্য ও সীমাবদ্ধতার কথা ব্যাখ্যা করেছি। এই সরকার সাধারণ সময়ে সাধারণ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এবং সেই কারণেই আমরা প্রথাগত পদ্ধতিতে সরকার গঠন করিনি এবং সাধারণ সময়ে দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য যে সব দপ্তর সরকারের থাকে, সেই দপ্তরগুলিরও কোনও অস্তিত্ব এই সরকারে নেই। এই সরকারের প্রথম ও প্রধান কাজ হল স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিচনালনা করা; সুতরাং আমাদের মন্ত্রীসভা হল যুদ্ধকালীন সরকারের মন্ত্রীসভা।

দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র পালাবদলের সময়টুকুর জন্য এই সরকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলির শাসনভাল গ্রহণ করবে। যতদিন না শেষ ইংরেজ আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়, যতদিন না ভারতবর্ষ স্বাধীন হয় এবং স্বাধীন দেশে আইন, শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যতদিন না আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর ইচ্ছানুসারে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্থায়ী সরকার নির্বাচিত হয়, ততদিন এই আপৎকালীন সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকবে। আপনাদের সকলের কাছে এবং পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি ভারতীয়র কাছে আমার অনুরোধ যে ২১ অক্টোবরে আমাদের সরকার গঠনের সময়ে প্রচারিত ঘোষণাপত্রটি পড়ে তার অর্থ অনুধাবন করবেন যাতে আমাদের আপৎকালীন সরকার সম্বন্ধে আপনারা যথার্থ ধারণা পেতে পারেন।

আমি এই সময়ে আরও যে বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই তা হল সরকারের সদস্যরূপে মাত্র কয়েকজন নির্বাচিত হলেও, তার অর্থ এই নয় যে বিপুল সংখ্যক ভারতীয়, যারা সরকারের সদস্য নন, তাঁদের কোনও দায়িত্ব বা কর্তব্য থাকবে না। শাসনকার্যের পরিচালনার সুবিধার জন্য মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে সরকারের সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সরকারের দায়িত্বভার আছে আপনাদের সকলের উপরে সমানভাবে, পূর্ব এশিয়ার সমগ্র ভারতীয় গোষ্ঠীর উপরে।

যাঁরা নতুন সরকারের সদস্যরূপে নির্বাচিত হয়েছেন, মনে করবেন না যে তাঁদের বিশেষ কোনও একটি সম্মানের আসনে বসানো হয়েছে; প্রকৃতপক্ষে তাঁদের উপরে কর্তব্য ও দায়িত্বের গুরুভার আরও বেশি। এই সরকারের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ হবে না, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের প্রথম বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। এমন ভাবনা আপনারা চিন্তাতেও আনবেন না যে কোনও কোনও ব্যক্তিবিশেষকে উচ্চপদে আসীন করা হল।

বরং বলা যেতে পারে এর ফলে ভারতবর্ষ ও ভারতীয়দেরই উচ্চপদে আসীন করা হয়েছে। এই আপৎকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার পরে ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে স্বীকৃতি পাবার পরে বিশ্বের মাপকাঠিতে ভারতীয়দের সম্মান ও পদমর্যাদা বাড়েনি, এমন কথা কি কেউ বলতে পারেন? আপনাদের অবশ্যই যা উপলব্ধি করতে হবে তা হল, এই সংগ্রাম আপনাদের সংগ্রাম, এই সরকার আপনাদের সরকার, এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সদস্যরূপে আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এখন শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের সামনে এখন দু'টি বিশাল দায়িত্ব। প্রথম দায়িত্ব হল এই বছর অতিক্রান্ত হবার আগে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের পুণ্যভূমিতে পা দেবার জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি নেওয়া। দ্বিতীয় দায়িত্ব হল দীর্ঘকালীন লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ ও প্রস্তুতি অব্যাহত

রাখা। ভারতভূমি থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নের অর্থ হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষ উপনিবেশটি তাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া; কাজেই এই উপনিবেশ যাতে তাদের হারাতে না হয় সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সর্বশক্তি নিয়োগ করবে ও ভারতের মাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইবে।

ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করা কিছু সহজ কাজ হবে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে একবার ভারতের মাটিতে পা দিতে পারলে আমরা ভারতে বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সমর্থন পাব, যদিও পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মনে রাখতে হবে যে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের সাহায্য ও রসদের যোগান অব্যাহত রাখতে হবে।

আমি আবারও আমাদের সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। আপৎকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার পর এই প্রস্তুতি আমাদের নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতে হবে আরও উদ্দীপনার সঙ্গে। আমি আরও একবার আপনাদের কাছে আমার আবেদন করব— জনসম্পদ, অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রীর জন্য। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সামনে আজ একটাই কর্তব্য, আমাদের আরব্ধ কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত, যুদ্ধক্ষেত্রে জয়ী না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের নিশ্চিতভাবে জনসম্পদ, অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখতে হবে।

এই সূত্রে আমি উল্লেখ করতে চাই, যে যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমি যে ডাক দিয়েছিলাম তাতে আশাতীত সাড়া পাওয়া গেছে। পূর্ব এশিয়ার যুবকেরা যে ভাবে স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসছেন, এবং রানি ঝাঁসি বাহিনী গড়ে তোলার কাজে আমার বোনেরা যে ভাবে সাড়া দিয়েছেন তা আমাকে বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

এবং অর্থ ও সামগ্রীর সংগ্রহে, আমি বলব, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সমাজের কাছ থেকে বিপুল ভাবে সাড়া পাওয়া গেছে। দরিদ্র ভাইদের কাছ থেকে ত্যাগের মহান দৃষ্টান্তের যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা পাথরের চোখেও জল আনবে। এক ধোবা আমার কাছে এসে তার যা ছিল 'সর্বস্ব' উজাড় করে দিয়ে আরও বলেছে যে সে ঝাঁসির মানুষ। কাজেই সে আমাদের রানি ঝাঁসি বাহিনীর বোনেদের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চায় যেখানে সে তাদের কাপড় ধোওয়ার কাজ করবে। এক গরিব নাপিত, পরনে তার ছেঁড়া পোশাক, সে এসে হাসিমুখে আমার হাতে ২০০ ডলার তুলে দিয়েছে যা তার বেশ কয়েক বছরের সঞ্চয়।

সব থেকে নাড়া দিয়েছে আমার গোয়ালা ভাইদের ত্যাগের দৃষ্টান্ত। তাদের সঞ্চয়ের সবটুকু অর্থ তারা আমাদের দিয়েছে, গোরু-মহিষ যা ছিল তা আমাদের দিয়েছে, এবং সব শেষে তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে আজ়াদ হিন্দ ফৌজে স্বেচ্ছাসেবীরূপে যোগ দেবার জন্য। দরিদ্র জনসাধারণ তাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির অর্থ কী? আজ ধনী ব্যক্তিরাই শুধু জানতে চাইছেন যে সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতিতে তাঁদের কত দিতে হবে। সঞ্চয়ের ৫ শতাংশ না ১০ শতাংশ? গরিবরা এগিয়ে আসছেন তাঁদের সর্বস্ব নিয়ে, তদুপরি তাঁরা নিজেদেরকেও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

আজ সময় এসেছে যখন ধনী ব্যক্তিদেরও দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। ধনীদের উপলব্ধি করতে হবে যে যখন স্বেচ্ছাসৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তখন তারা এই প্রশ্ন করে না যে তাদের দেহের কত শতাংশ রক্ত তারা দেশের জন্য দেবে— ৫ বা ১০। তারা দেহের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে। এমন একজন স্বেচ্ছাসৈনিকের প্রাণ আমার কাছে লক্ষ ডলারের থেকেও বেশি মূল্যবান। আমি ধনী ব্যক্তিদের বলব, যে তাঁরা যদি তাদের প্রাণ দিতে প্রস্তুত না থাকেন তা হলে অন্ততপক্ষে তাঁদের ধনসম্পদ দিয়ে আমাদের সাহায্য করুন।

আমি শুনেছি যে কিছু কিছু ধনবান ব্যক্তি আমাদের বিরক্তিজনক উপদ্রব বলে অভিহিত করছেন এবং বলছেন যে আমরা সায়োনান ছেড়ে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করলে তাঁরা এই উপদ্রবের হাত থেকে নিস্তার পাবেন। আমি তাঁদের বলব যে আমরা সায়োনান ছেড়ে গেলেও ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ এখানে তাদের কাজ অব্যাহত রাখবে। আমরা ধনী ব্যক্তিদের নিস্তার দিতে পারি না, আমরা কোনও ভারতীয়কেই নিস্তার দিতে পারি না কারণ আমাদের এই সংগ্রাম জীবন-মরণের সংগ্রাম। যে কোনও ভাবেই হোক এবং তার জন্য আমাদের যা মূল্য দিতে হোক না কেন, আমরা এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর।

আমি এও জেনেছি যে আমাদের কোনও কোনও ধনী বন্ধু ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের অর্থের দাবি থেকে নিস্তার পাবার জন্য তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পরিবর্তন করবার কথা ভাবছেন। এই বিভ্রান্ত বন্ধুদের আমি শুধু এই কথাই বলব যে তাঁদের কাছে দু'টি রাস্তা খোলা আছে। হয় তাঁরা প্রকৃত ভারতীয় বলে নিজেদের পরিচয় দেবেন ও দেশের এই দুঃসময়ে তাঁদের কর্তব্য করবেন অথবা তাঁরা নিজেদের ব্রিটিশদের বন্ধু বলে ঘোষণা করবেন এবং তার যথোপযুক্ত পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকবেন। পূর্ব এশিয়ার, ব্রিটিশ অথবা ব্রিটিশবন্ধুদের জন্য কারাগারের বাইরে কোনও স্থান নেই, এবং সেই দিন আসন্ন যখন ভারতবর্ষেও তাদের কোনও স্থান থাকবে না। আমি আশা করব যেসব ধনী বন্ধুরা আমাদের ডাকে এখনও সাড়া দেননি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পরিবর্তন দেখা যাবে।

এখন আমি আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের ক্যাবিনেটের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা আপনাদের জানাতে চাই এবং অনুমোদনের জন্য আপনাদের কাছে সেই প্রস্তাব দু'টি উপস্থাপনা করতে চাই। এমন একটা সময় ছিল যখন ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র পূর্ব এশিয়ায় আমাদের এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করত অথবা বিদ্রূপ করত। এখন তারা আমাদের গুরুত্ব অনুভব করেছে ও অন্য কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে তারা তাদের রেডিয়ো স্টেশনগুলি থেকে আমার বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেছে। অপরের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করা দুর্বলের শেষ অস্ত্র আমরা জানি, কিন্তু এর ফলে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে শত্রু আমাদের আর অপেক্ষা করতে পারছে না, তারা উপলব্ধি করছে যে আমাদের আন্দোলন শুধু মিথ্যা প্রচারের চমক নয়। আমাদের আপৎকালীন সরকারের প্রতিষ্ঠার প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে সারা বিশ্ব জুড়ে এবং যদি আমি বলি লন্ডন ও ওয়াশিংটনে সেটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে তা হলে সেটা অতিশোয়ক্তি হবে না।

আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠার সংবাদ প্রচার করতে এইবার শত্রুপক্ষের রেডিয়ো স্টেশনগুলি বিন্দুমাত্র দেরি করেনি। ইতিমধ্যে আমরা নিপ্পন সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছি এবং আমি অবশ্যই বলব যে এই ঘটনার একটা বিশাল ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। কোনও পূর্ব ইতিহাস ছাড়া এই স্বীকৃতিদান যদি একটা একক দৃষ্টান্ত হত তা হলে লোকে স্বাভাবিক ভাবেই এর যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই স্বীকৃতি হঠাৎ করে আসেনি। নিপ্পন সরকারের ন্যায়পরায়ণ ও সাম্যবাদী এশীয় রাজনীতির পরিচয় পাওয়া গেছে এই স্বীকৃতি মাধ্যমে। সমগ্র বিশ্ব এই নীতির সঙ্গে পরিচিত; তারা ইতিমধ্যেই বর্মাদেশ ও ফিলিপাইনের স্বাধীনতা লাভের কথা শুনেছে। আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের স্বীকৃতিদান সেই নীতিরই স্বাভাবিক পরিণতি।

ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয় উচ্চৈঃস্বরে এতদিন ঘোষণা করে এসেছে যে স্বাধিকার ও গণতন্ত্রের তারাই সর্বসেরা প্রবক্তা, কিন্তু বারে বারেই দেখা গেছে তাদের কাজ ও কথার বিস্তর ফারাক।

ভারতের উপর তাদের প্রভুত্বের বন্ধন তারা মোটেই শিথিল হতে দেবে না, এ ছাড়া ইরাক ও ইরানের মতো স্বাধীন দেশগুলিকেও তারা দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধেছে। স্বাধীন বর্মাদেশের উপরেও তারা অধিকার বিস্তার করতে চেষ্টা করেছিল এবং সেই চেষ্টা এখনও অব্যাহত আছে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিপ্পনের ভূমিকার কথাও বিচার করে দেখতে পারি। তারা স্বাধীন বর্মাদেশ ও ফিলিপাইনকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এখন তারা আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। এ যাবৎ আমরা সর্বদাই আমাদের নিপ্পনের বন্ধুদের সহানুভূতি পেয়েছি এবং এখন আমাদের সরকারকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে তারা আমাদের যে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে তার জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। নিপ্পন সরকারের এই ভূমিকায় তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজ়াদ হিন্দ সরকারের মন্ত্রীসভায় একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। আমি আপনাদের কাছে এই প্রস্তাব রাখছি আপনাদের অনুমোদনের জন্য।

'নিপ্পন সরকারের পক্ষ থেকে প্রেরিত এক বার্তায় আজ়াদ হিন্দের এই আপৎকালীন সরকারকে যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, আজ়াদ হিন্দ সরকার সেই বিষয়ে তাদের গভীর সন্তোষ প্রকাশ করছে। এই বার্তায় নিপ্পন সরকারের পক্ষ থেকে যে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে তার জন্য আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার কৃতজ্ঞচিত্তে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।'

'জেনারেল তোজোকেও আমাদের ধন্যবাদ জানাই ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর উল্লেখযোগ্য সহযোগিতার জন্য। এ ছাড়া, হিকারি কিকানের প্রধান কর্নেল ইয়ামামোতোকেও আমাদের ধন্যবাদ জানাতে হবে, বিশেষভাবে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর সহযোগিতার জন্য।'

পরের প্রস্তাব, যা আমার কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছে, সেটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি বিবেচনা করার পর কাউন্সিল সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধ যুদ্ধ ঘোষণার উপযুক্ত সময়ে আমরা পৌঁছেছি।

গতকাল রাত ১২.৫৫ মিনিটে আমরা রেডিয়োর মাধ্যমে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি এবং আশ্চর্যজনক ভাবে রাত ২.০০-র সময় শত্রু পক্ষের রেডিয়োতে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণার কথা প্রচারিত হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় যে কতটা তৎপরতার সঙ্গে তারা আমাদের কার্যকলাপ অনুসরণ করছে। ভারতবর্ষে থাকার দিনগুলিতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমার লড়াইয়ের মাধ্যমে তারা আমার কর্মপদ্ধতির সঙ্গে খুব ভালভাবেই পরিচিত এবং তাদের জানা আছে যে আমি এমন কোনও ঘোষণা কখনওই করব না যদি সেই ঘোষণাকে কার্যে পরিণত করবার মতো সামর্থ্য আমার না থাকে। আমাদের ঘোষণা প্রচারের কারসাজি নয়। আগামী দিনের কার্যাবলী প্রমাণ করে দেবে যে আমরা যখন যেমন বলেছি সেই অনুসারেই আমাদের কাজ করে চলেছি।

ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব আপনাদের অনুমোদনের জন্য পেশ করার আগে, আমি আপনাদের অনুরোধ করব যাতে আপনারা এই প্রস্তাবের সমগ্র কার্যপদ্ধতি, কারণ ও পরিণতির কথা চিন্তা করে দেখে তার পরেই আপনাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন। আমি আবারও বলছি আমাদের এই ঘোষণা শূন্য আস্ফালন নয়। আমাদের শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলবে, এই আমাদের অঙ্গীকার। এবং যখন আমি আপনাদের কাছে প্রস্তাবের

অনুমোদন চাইছি তখন আমি আনুষ্ঠানিক রীতিমাফিক অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করছি না। যখন আপনারা অনুমোদন করবেন তখন তার অর্থ হবে যে এই ঘোষণাকে কার্যকরী করবার জন্য আপনারাও ঠিক আমার মতোই দেহের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত পণ করবেন। আমি জানি আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীর কাছে এই প্রশ্ন রাখার প্রয়োজন নেই, কারণ আমি তাঁদের মন জানি এবং এও জানি দিল্লির পথে যাত্রা করবার জন্য তাঁরা কতটা উদগ্রীব। আমার প্রশ্ন এখন এখানকার বেসামরিক জনগণের কাছে, আমাদের এই যুদ্ধ ঘোষণায় তাঁরা আমাদের সঙ্গে একমত কিনা, কারণ তাঁরা যদি আমাদের সঙ্গে এই যুদ্ধে সামিল হন তা হলে আমাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতিতে তাঁদের কাছ থেকে আমি পূর্ণ সহযোগিতা আশা করব।

বন্ধুরা! আজ আমরা যে সমাবেশে মিলিত হয়েছি, এই সমাবেশ প্রচারের প্রদর্শনী নয়, এটা একটা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম নয়, আমি চাই যে আপনারা সেটা সম্যকভাবে উপলব্ধি করবেন। আজ জীবন-মরণের সিদ্ধান্ত নেবার উদ্দেশ্যে এই ঐতিহাসিক সমাবেশে আমরা যোগ দিয়েছি। আমরা যদি সফল হতে পারি তা হলে ৩৮ কোটি ভারতীয়েরা স্বাধীনতা পাবেন। অপরপক্ষে, ঈশ্বর না করুন, আমরা যদি সফল না হই তাহলে অন্তত পক্ষে আরও হয়তো এক শতাব্দী আমাদের দেশ দাসত্বের মর্মান্তিক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে। আমি আপনাদের আগেই বলেছি যে আমি মনে করি এক ঐশ্বরিক প্রভাবেই আমাদের সামনে আজ এই সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। আমি আগেই আপনাদের দেখিয়েছি কীভাবে এক পর্যায় থেকে পরের পর্যায়ে আমাদের অগ্রগতি হয়েছে এবং কীভাবে আমাদের সামনে আজ সেই মুহূর্ত এসেছে যখন আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্রস্তুত। আমি আপনাদের জানিয়েছি কীভাবে আমাদের সংগঠনের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে— আমাদের সেনাবাহিনী এখন প্রস্তুত, বিশ্ব আমাদের আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কীভাবে প্রতিটি সম্ভাব্য স্থান থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি। ভারতের ইতিহাসের এই গৌরবময় অধ্যায়ে আমরা কি আমাদের দেশের ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হব?

এই পরিস্থিতি আপনারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করুন, যুদ্ধ ঘোষণার সর্বপ্রকার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। আপনাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনারা যদি এই আশ্বাস পান যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে আপনারা যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত; যদি আপনারা অনুভব করেন যে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যতদিন না জয় করায়ত্ত হয় ততদিন আপনারা আপনাদের দেহ, মন সব কিছু দিতে প্রস্তুত, তা হলে আপনারা উঠে দাঁড়ান আর আমাদের যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তকে করতালি দিয়ে অনুমোদন করুন।'

(সমবেত ৫০,০০০ জনগণের কাছে এই হল তাঁর সংকেত, সে সংকেত পেয়ে সেই বিপুল জনতা উঠে দাঁড়াল, ৫০ হাজার কণ্ঠ থেকে অবিরাম বিপ্লবাত্মক জয়ধ্বনি উঠতে লাগল ১৫ মিনিট ধরে। বেষ্টনী ভেঙে একের পর এক বিশাল ঢেউয়ের মতো জনগণ মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল, যেখানে নেতাজি নীরবে দাঁড়িয়ে এবং তারা তাঁর জয়ধ্বনি দিতে থাকল যতক্ষণ তাদের গলা থেকে আওয়াজ বার করতে পারল।)

নেতাজি বলতে লাগলেন:

'বন্ধুগণ! আপনাদের উৎসাহের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের মাধ্যমে সংকল্পের দৃঢ়তা ও স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষার যে প্রমাণ আপনারা দিয়েছেন আমি আজ তার সাক্ষী, আজ আমার আনন্দ ও গর্বের সীমা নেই। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের প্রাণে আজ যে তেজস্বিতার

সঞ্চার হয়েছে তা থেকে আমি বলতে পারি পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের জন্য একটি পথই খোলা আছে, সে হল যুদ্ধ। এবং এই সে যুদ্ধ, যে যুদ্ধে আমরা কোনও মতেই পরাভব স্বীকার করতে রাজি নই। ভারতীয় জাতির এই সম্মিলিত ইচ্ছা ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে মনে হচ্ছে হয়তো শত্রুদের বিরুদ্ধে জয় আমাদের সহজেই করায়ত্ত হবে। আজকের সভার এইখানেই সমাপ্তি। আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা নিজেদের শান্ত করুন, ঘরে ফিরে যান, যুদ্ধের শেষে আমাদের জয়কে নিশ্চিত করবার জন্য যা কিছু করণীয় আছে, তা করবার জন্য আপ্রাণ প্রস্তুতির সংকল্প গ্রহণ করুন। সব শেষে আমি আপনাদের বিপ্লবের নামে, স্বাধীন ভারতের নামে ও নিষ্পন সরকারের নামে তিন বার জয়ধ্বনি দিতে আহ্বান করব।

(জয়ধ্বনি)

২৭

আপনাদের ব্যাঙ্কের খাতা কোথায়?

[অল মালয় চেট্টিয়ার্স এবং অন্যান্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সমাবেশে ভাষণ, ২৫ অক্টোবর ১৯৪৩][১]

বন্ধুরা! আমার ভাই ও বোনেরা, যাঁরা মালয়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আজকের সমাবেশে যোগ দেবার জন্য এসেছেন প্রথমেই তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাই। আপনারা আজ যে কারণে এখানে এসেছেন সেই সমাবেশের বিপুল গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আপনারা যে অনুভব করবেন সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। স্বাধীনতা অর্জনের এই মহান সংগ্রামে আমি অনেকের কাছ থেকেই আনুগত্যের আশ্বাস পেয়েছি। আজকের এই সমাবেশে এই আনুগত্যের প্রমাণ দেবার সময় এসেছে।

আমি দীর্ঘ বক্তৃতা দেব না কারণ তার কোনও প্রয়োজন নেই। যদি আপনাদের উপরে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার দায়িত্ব থাকত তা হলে আপনারা প্রত্যেকে কী করতেন সেটা উপলব্ধি করবার জন্য আজ প্রথমেই আপনাদের কাছে আমি আবেদন জানাব; প্রকৃতপক্ষে পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি ভারতীয়ের উপরেই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার দায়িত্ব এসে পড়েছে এবং সেই দায়িত্বের মহান গুরুভার যে আপনাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে, আমার আশা আপনারা তা উপলব্ধি করবেন।

সেনাবাহিনী যখন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হয়, তখন বাহিনীর প্রতিটি সেনার উপরেই সমানভাবে লড়াই করা ও যুদ্ধে জেতার দায়িত্ব থাকে, সে তাঁরা অফিসার, বা সাধারণ সেনানী যাই হন না কেন। প্রতিটি সেনা যখন তাদের কর্তব্য পালনে প্রস্তুত থাকে তখনই সাফল্য করায়ত্ত হয়। আজ আপনাদের মনে এই চেতনা আনতেই হবে যে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা এখন এক সেনাবাহিনীতে পরিণত হয়েছে এবং সেই সেনাবাহিনীকে আসন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করতেই হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি প্রত্যেক সেনার মতোই পূর্ব এশিয়ার প্রতি ভারতীয়ের উপরেও এক মহান দায়িত্বের ভার এসে পড়েছে। আমি জানি আপনাদের মধ্যে কেউ ধনবান, আবার কেউ ধনবান নন। আমি জানি আপনাদের মধ্যে কেউ শিক্ষাপ্রাপ্ত, আবার কেউ নন। আমি চাই যে আপনারা মনে রাখবেন, আপনাদের জীবনে ও জীবিকায় যাই পার্থক্য থাক না আপনাদের কর্তব্যে কোনও পার্থক্য নেই। আমি চাই পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি ভারতীয় তাঁর কর্তব্যসাধনে এগিয়ে আসবেন।

সেনাবাহিনীতে যখন কাউকে অফিসারের পদ দেওয়া হয়, তখন তাঁর কর্তব্য হল নিজে এগিয়ে যাওয়া এবং অন্যদেরও এগিয়ে যেতে প্রেরণা দেওয়া। পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধে সায়োনান আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের হেডকোয়ার্টার্স

---

১. On to Delhi, pp. 100-110.

এখানে; আইএনএ বা ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স এখানে এবং অতি সম্প্রতি আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের হেডকোয়ার্টার্সও এখানেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সায়োনানকে এক সময়ে ব্রিটিশের দুর্গ বলে অভিহিত করা হত, কিন্তু এখন সায়োনান পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে।

সায়োনানের সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার অন্য কেন্দ্রগুলির সম্পর্ক ঠিক একজন সেনাবাহিনীর অধিনায়কের সঙ্গে তাঁর অধীনস্থ সেনানীদের মতোই। যুদ্ধে সাফল্য শুধু যে প্রতিটি সেনার নিঃস্বার্থ কর্তব্যসাধনের উপরে নির্ভর করে তাই নয়, সেনানায়কের যথোপযুক্ত নেতৃত্ব ও নির্ভুল দৃষ্টান্তের উপরেও তা নির্ভর করে।

অতএব আপনারা জানবেন যে সায়োনানে যে ধ্বনি উঠবে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে। আপনারা এখানে যে কোনও কাজ করবেন তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে। আপনারা সায়োনানে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসকারী ভারতীয়েরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন। আপনাদের মনে রাখতে হবে যে নেতৃত্বের অগ্রণী ভূমিকা নেবার ফলে সায়োনানের ভারতীয়দের দায়িত্ব আরও বেশি, কারণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ভারতীয়রা আপনাদের কাছ থেকেই অনুপ্রেরণা পাবেন।

কোনও বিদেশি শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হবার মতো সঙ্কটকালে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় সরকারের কর্তব্য কী হত সেটা আমি আপনাদের চিন্তা করে দেখতে বলব। মনে করুন ভারতবর্ষ যেন একটা স্বাধীন দেশ এবং মনে করুন যেন বিদেশি শত্রু আমাদের আক্রমণ করবে এমন একটা আশঙ্কা আছে, সেই অবস্থায় স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় সরকারের কী করা উচিত হত? তখন তারাও কি 'সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি'-র জন্য ডাক দিত না? আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করছেন যে কোনও স্বাধীন দেশের সরকারের এইটাই স্বাভাবিক কর্তব্য। এই কথা মনে রেখে এবার আমি আপনাদের চিন্তা করতে অনুরোধ করব যে স্বাধীনতা পাবার ও তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমাদের এই মহান সংগ্রামে আপনাদের কর্তব্যই বা কী।

আপনারা আরও ভেবে দেখুন যে কোনও স্বাধীন দেশে যুদ্ধাবস্থায় কী ঘটে থাকে? এখানে জনসমাবেশে আমি যেমন অর্থদানের আবেদন জানাচ্ছি, তারাও কি তাই করবে? না! স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকার দেশের সক্ষম ও সবল ও নির্দিষ্ট বয়সের নাগরিকদের একটা নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে জমায়েত হবার জন্য শুধুমাত্র একটা ডাক দেবে এবং দেশের নাগরিকেরাও কোনও অসন্তোষ প্রকাশ না করে স্বেচ্ছায় সেই ডাকে সাড়া দেবে। কেন? কারণ স্বাধীন দেশের নাগরিকেরা জানে যে স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য তাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এবং স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য যখন অর্থের প্রয়োজন হবে তখন স্বাধীন দেশের সরকারকে জনসভার আয়োজন করে অর্থভিক্ষা করতে হবে না।

প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীন দেশের সরকার তাদের নিজস্ব প্রয়োজনমতো অর্থ বরাদ্দ করবে, কীভাবে সেই বরাদ্দ অর্থ সংগ্রহ করা হবে সেই বিষয়ে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবে এবং সেইসঙ্গে তারা দেশের জনগণের আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে তখনই যেমন প্রয়োজন সেই মতো কর আদায় করার ব্যবস্থা করবে। আমি আপনাদের এই কথাই আজ জিজ্ঞাসা করব, স্বাধীন দেশের নাগরিক হলে আপনারা কি সৈন্যদলে যোগ দিতে অথবা যুদ্ধের জন্য আরোপিত কর দিতে নারাজ হতেন? ভারতবর্ষ এখনও স্বাধীনতা পায়নি কিন্তু মনে প্রাণে আমরা স্বাধীন। এবং এই আপৎকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার পরে আমরা আমাদের স্বাধীন নাগরিকও বলতে পারি।

এখন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা ও ভারতে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা আমাদেরই দায়িত্ব। যদি আমরা মনে প্রাণে এবং প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা চাই, তা হলে আমরা এখন থেকেই সেইভাবে জীবন যাপন করব ও সেই ভাবেই আচরণ করব যেন আমরা স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক ও শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় আমরা এক সঙ্কট মুহূর্তে পৌঁছেছি। স্বাধীন ভারতবর্ষের সরকারের ডাকে ভারতের স্বাধীন নাগরিক আমাদের যা যা করণীয় হত, আজ থেকে ঠিক সেই কাজগুলি করাই হবে আমার পবিত্রতম কর্তব্য। জার্মানি ও জাপানের জনগণের দিকে তাকিয়ে দেখুন, এবং দেখুন এই দুই দেশে কীভাবে দেশের প্রয়োজনে জনগণের সব সম্পদ সরকার অধিগ্রহণ করেছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যখন সরকারের দায়িত্ব তখন তাদের সেই কাজ করতে হবে যে কোনও মূল্যে এবং প্রয়োজন হলে সেই কাজে দেশের সব সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে।

আইনের বিচারে, দেশ যখন যুদ্ধাবস্থায় পৌঁছেছে তখন কোনও সম্পদকেই আর ব্যক্তিগত সম্পদ বলে বিবেচনা করা যায় না। সেই ধরনের সঙ্কটকালে দেশের জনগণের জীবন ও সম্পদের উপর সরকারের চূড়ান্ত অধিকার থাকে। আমরাও স্বাধীন নাগরিক যারা স্বাধীন সরকার গড়েছি। আপনারা যদি ভাবেন যে আপনাদের ধন-সম্পদে কেবল আপনারই অধিকার তা হলে আপনি সত্যকে অস্বীকার করছেন। দেশ যখন যুদ্ধে রত, প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও প্রত্যেকের ধন-সম্পদ তখন দেশের সরকারের সম্পত্তি। আপনাদের জীবন ও ধন-সম্পদ এখন আর আপনাদের নয়, সবই এখন ভারতের ও কেবলমাত্র ভারতেরই।

আমার বিশ্বাস যে আপনারা যদি এই সহজ সত্য উপলব্ধি করতে পারেন যে আমাদের যেন তেন প্রকারেণ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতেই হবে এবং এখন আমরা সকলে যুদ্ধরত স্বাধীন নাগরিক তা হলে আপনারা বুঝবেন যে আপনাদের জীবন, ধনসম্পদ, সম্পত্তি কিছুই আপনাদের নিজস্ব নয়। আর আপনারা যদি এই সহজ সত্য উপলব্ধি করতে না পারেন, সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য আরেকটা রাস্তা খোলা আছে। স্বাধীন সরকারের অধীনে স্বাধীন ভারতীয় নাগরিকের কর্তব্য যদি আপনারা পালন করতে না চান, আপনারা যদি স্বাধীনতা পেতে না চান ও স্বাধীনতার মূল্য দিতে যদি আপনারা প্রস্তুত না থাকেন তা হলে ইংরেজদের জন্য যে রাস্তা আপনাদের জন্যও সেই রাস্তা।

একদা ইংরেজরা এখানে বসবাস করত শাসকরূপে, কিন্তু এখন তাদের জন্য একটা জায়গাই আছে, সে হল কারাগার। আপনারা চাইলে কারাগারে ইংরেজদের সঙ্গ দিতে পারবেন। কিন্তু মনে রাখবেন যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, ভারত স্বাধীন হবে, তখন সেই স্বাধীন দেশে আপনাদের আর কোনও স্থান থাকবে না। যদি ভারতের সরকার আপনাদের প্রতি করুণা করে, তা হলে হয়তো আপনাদের তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে ভারতের পুণ্যভূমি ছেড়ে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেবে।

আমি শুনেছি যে মালয়ের কিছু কিছু ধনী ভারতীয়েরা অভিযোগ করছেন যে আমি তাঁদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছি। আমি তাঁদের সঙ্গে একটা সোজা কথা বলতে চাই যাতে তাঁরাও এরপর থেকে একটা সোজা রাস্তা নিতে পারেন। আমি শুনেছি যে কিছু ধনী ভারতীয় তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব বদল করতে চাইছেন যাতে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধের তহবিলে তাঁদের কোনও অর্থ দিতে না হয়। আমি এও শুনেছি যে তাঁরা আপাতত কোনও তত্ত্বাবধায়কের হাতে সম্পত্তি তুলে দেবার, এবং যুদ্ধ মিটে গেলে আবার তা ফিরিয়ে নেবার কথা ভাবছেন। আবার কেউ কেউ একটা বড় অঙ্কের টাকা দেবার অঙ্গীকার করে সেটা ছোট ছোট কিস্তিতে

দেবার চেষ্টা করছেন এবং ভাবছেন হয়তো সব টাকাটা হাতছাড়া হবার আগেই আমরা এ দেশ ছেড়ে বর্মাতে ও তারপরে ভারতে চলে যাব এবং তাদের পুরো টাকা দিতে হবে না। কিন্তু আমাদের তাঁরা এইভাবে ফাঁকি দিতে পারবেন না, আমাদের ঠকিয়ে নিজেদের কর্তব্যে অবহেলা করা এত সহজ কাজ হবে না। আমাদের অবস্থান সায়োনান বা বর্মা যেখানেই হোক না কেন, অথবা যখন আমরা ভারতেও পৌঁছে যাব, আমাদের প্রতিষ্ঠান এখানে থাকবে ও তারা তাদের কাজ অব্যাহত রাখবে যতদিন না ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় ও শেষ ইংরেজ আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়।

আমি সকল ভারতীয়দের কাছে আমার আবেদন রাখছি, সে তিনি হিন্দু, শিখ, মুসলমান বা খ্রিস্টান যাই হন না কেন, যে, আপনারা আপনাদের কর্তব্যে অবহেলা করবেন না। আমি জানি কারা তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন আর কারা সেই কর্তব্যের দায় থেকে নিস্তার পাবার চেষ্টা করছেন। আমার হাতে ভারত স্বাধীন করার ভার দেওয়া হয়েছে, এবং আমি যে কোনও ভাবে দেশকে স্বাধীন করবই, তার জন্য আমাকে যে মূল্যই দিতে হোক না কেন এবং আপনাদের কাছেও আমার সেই আবেদন যে, ভাল না লাগলেও এই দায়িত্বের কিছুটা ভার যে আপনাদের বহন করতেই হবে সেই উপলব্ধি আপনাদের হোক। আপনারা যদি এই বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চান তা হলে স্পষ্ট ভাষায় বলুন যে আপনারা স্বাধীনতা চান না এবং সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদের ইতিমধ্যেই বলেছি যে তা হলে আপনাদের পথ আমাদের থেকে ভিন্ন। যতদিন আপনারা নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দেবেন, এবং সেই পরিচয়ের দাবিতেই পূর্ব এশিয়ায় অর্থোপার্জন করতে থাকবেন ততদিন স্বাধীন ভারতীয় হিসাবে আপনাদের যা কর্তব্য, সেই কর্তব্যের দায় থেকে আপনারা পরিত্রাণ চাইতে পারেন না। আপনাদের কর্তব্য আপনারা করবেন কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেবার অবকাশ আপনাদের আছে সে কথা চিন্তাও করবেন না।

সায়োনানে আমার শেষ বক্তৃতায় আমি বলেছি যে আমি শেষবারের মতো আপনাদের কাছে আবেদন করছি। আজ এখানে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি আবারও একবার আবেদন করবার জন্য নয় এবং ভিক্ষুকের মতো আমি আপনাদের কাছে হাতও বাড়াচ্ছি না। আমি আজ এখানে দাঁড়িয়েছি আমাদের স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারের প্রতিনিধি রূপে, আপনাদের জীবন ও ধনসম্পদের উপরে যে সরকারের চূড়ান্ত অধিকার। বন্ধুরা, আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে লম্বা-চওড়া কথা বলা আমার অভ্যাস নয় এবং শূন্য আস্ফালনেও আমার আস্থা নেই। আমি অনেক চিন্তাভাবনা করবার পরে তবেই কথা বলি এবং যা বলি সেই মতো কাজ করতেই আমি অভ্যস্ত। এমনকী আমার শত্রুরাও জানে যে যা আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি না তেমন কথা আমি কখনও বলি না। আমি বলেছি যে কোনও পন্থায় ও যে কোনও মূল্যে আমাদের ভারতকে স্বাধীন করতে হবে এবং সেইজন্য আমাদের রসদ সংগ্রহের জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি নিতে হবে, সম্ভব হলে আমরা স্বেচ্ছামূলক দানের মাধ্যমে সেই রসদ সংগ্রহ করব, কিন্তু প্রয়োজন হলে আমরা তা বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করব। এবং আমি আপনাদের আবারও বলছি, আমার যেমন কথা, তেমনই কাজ। আমি আজ আপনাদের কাছে এই দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলছি যাতে আপনাদের মনে কোনও সংশয় না থাকে, যাতে আপনারা পরে বলতে না পারেন যে আপনাদের স্বেচ্ছামূলক দানের পরিপূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়নি। আপনারা যদি স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন তা হলে আমি আপনাদের জন্য গর্বিত বোধ করব ও আপনাদের জন্যও সেটা হবে একটা মর্যাদাপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

কিন্তু আপনারা যদি স্বেচ্ছায় এগিয়ে না আসেন তা হলে মনে রাখবেন আমরা আপনাদের ইচ্ছার দাসত্ব করব না।

আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি যখন শুনেছি কতিপয় ব্যক্তি বলেছেন যে, তাঁদের ধনসম্পদ উপার্জন করতে বহু বছর লেগেছে এবং তাঁদের অনেক ছেলেমেয়ে আছে যাদের জন্য তাঁরা সেই সম্পত্তি রেখে যেতে চান। যদি এই একই কারণে স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সরকারের ডাকে তাঁরা ত্যাগ স্বীকার করতে নারাজ হতেন তা হলে তাঁদের অবস্থা কী হত সেটা আপনাদের আমি চিন্তা করে দেখতে বলি। নিশ্চিতভাবে তাঁদের দেশের শত্রু বলে বিবেচনা করা হত এবং তাঁদের সঙ্গে শত্রুর মতোই আচরণ করা হত। আপনি হয় আমাদের মিত্র, অথবা আপনি আমাদের শত্রু। এ কথা মনে ভাববেন না যে কেবল ব্রিটিশরাই আমাদের শত্রু। যে কেউ ব্রিটিশকে সাহায্য করছেন তাঁরা আমাদের শত্রু, যে কেউ আমাদের সংগ্রামকে সাহায্য করছেন না তাঁরাও আমাদের শত্রু কারণ আজ আমরা একটা জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি।

ভারতের জাতীয় সেনাদলে যাঁরা স্বেচ্ছায় যোগ দিয়েছেন এবং যাঁদের আমরা অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে পারছি না, তাঁদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। তাঁরা জানেন না তাঁদের মধ্যে কতজন তাঁদের জীবদ্দশায় স্বাধীন ভারতের অস্তিত্ব দেখতে পাবেন। কিন্তু তাঁরা একাগ্র চিত্তে প্রস্তুত হচ্ছেন দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য। তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছেন স্বাধীন ভারতের মাটিতে পা দেবার জন্য অথবা সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার যাত্রাপথে নিজের প্রাণ দেবার জন্য। পিছনে ফেরার কথা চিন্তা করার কোনও অবকাশ তাঁদের নেই। পশ্চাদপসরণের ভূমিকা শুধু ওয়াভেল ও তাঁর সেনাবাহিনীর জন্যই তোলা থাক। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়ার পদে আসীন করেছে কারণ দেখা গেছে তাঁর নিজের জীবনরক্ষার জন্য একের পর এক যুদ্ধক্ষেত্রে পশ্চাদপসরণ করে সেই যুদ্ধকৌশলটিকে তিনি প্রায় একটা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন। কিন্তু প্রাণ বাঁচাবার জন্য পশ্চাদপসরণের কোনও অভিপ্রায় আইএনএ-এর নেই। যেখানে আইএনএ-র সেনানীর প্রশিক্ষণের মূলমন্ত্র হল তারা দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করবে যতক্ষণ না জয় করায়ত্ত হয়, সেখানে ধনী ব্যক্তিরা প্রশ্ন তুলছেন রসদ সংগ্রহের জন্য সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতিতে তাঁদের কতটা দিতে হবে, মূল সম্পত্তির শতকরা দশ ভাগ না পাঁচ ভাগ। এই ধনী ব্যক্তিরা যাঁরা পাঁচ না দশ সেই শতকরা হিসাব নিকাশে ব্যস্ত আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আমরা কি আমাদের সেনাদের বলতে পারব যে তোমরা এমনভাবে যুদ্ধ করবে যাতে শুধুমাত্র ১০ শতাংশ রক্তপাত ঘটে, বাকি ৯০ শতাংশ তোমরা তুলে রাখবে।

যে সব তরুণতরুণীরা স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে এগিয়ে এসেছেন আপনারা নিজের চোখে তাঁদের অসম সাহসিকতার পরিচয় দেখেছেন। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সেনানীর অভাব নেই। সাধারণ জনগণের কাছ থেকে যে অসামান্য সাড়া আমরা পেয়েছি, এবং যে বিপুল সংখ্যায় ছেলেরা সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য ইচ্ছুক তাতে এমনকী দীর্ঘকালীন লড়াই চালিয়ে যাবার মতো সেনা আমাদের আছে। আমাদের এখন যা প্রয়োজন তা হল অর্থ ও সামগ্রী, সেই অর্থদানের ও ত্যাগস্বীকারের কাজে একই প্রকার আগ্রহ। আমরা যদি দরিদ্র হতাম তা হলে বিদেশিদের কাছে সাহায্য চাইবার যুক্তি থাকত, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক ধনী ব্যক্তিও আছেন যে কথা আমাদের বিদেশি বন্ধুদেরও অজানা নয়। আমাদের নিজেদের হাতেই যখন যথেষ্ট রসদ রয়েছে তখন অন্যের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়ানো আমাদের পক্ষে সম্মানহানিকর।

যখন আমার ভাইবোনেরা বিপুল সংখ্যায় প্রাণ দেবার জন্য এগিয়ে আসছেন তখন যাঁরা

প্রাণ দিতে নারাজ তাঁরা যে কেন তাঁদের ধনসম্পত্তি হাতছাড়া হবার অভিযোগ তুলছেন সে কথা আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না। প্রাণের সঙ্গে তুলনা করলে ধনসম্পদের মূল্য কতটুকু? যদি কোনও বিদেশি সরকার আপনাদের বলে— হয় তোমরা আমাদের কোটি টাকা দাও না হলে তোমাদের প্রাণ দাও, নিশ্চিতভাবে আপনারা প্রাণ দেবার পরিবর্তে আপনাদের টাকাই তাদের হাতে দেবেন। ঠিক একই যুক্তিতে যখন লক্ষ লক্ষ নবীন যুবক তাদের প্রাণ দেবার জন্য এগিয়ে আসছে, তখন দরিদ্রেরা আসছেন উৎসাহভরে তাঁদের যথাসর্বস্ব নিয়ে। ভারতীয়দের মধ্যে দরিদ্র যাঁরা, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, পাহারাদার, ছোট দোকানের মালিক সকলে এসেছেন এবং তাঁদের যা কিছু ছিল সব কিছু দান করেছেন।

এর পরেও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ স্বেচ্ছাসেনা হিসাবে যোগ দিতে চেয়েছেন। কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন "সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি" কথাটার অর্থ কী। এই দরিদ্র জনসাধারণ যাঁরা তাঁদের নিজেদের ধনসম্পদ দেবার পরেও নিজেদের প্রাণ দিতে প্রস্তুত তাঁরাই নিজেদের জীবনের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পেরেছেন "সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি" কথাটার প্রকৃত অর্থ কী। এদের মধ্যে কেউ কেউ যা কিছু টাকা তাঁদের ছিল আমার হাতে তুলে দেবার পরেও তাঁদের ব্যাঙ্কের সঞ্চয়ের খাতা অর্থাৎ সারা জীবনের সঞ্চয় আমাকে দিয়েছেন। মালয়ের ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে কি এমন একজনও নেই যিনি ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য ঠিক একই ত্যাগের মহিমায় এগিয়ে এসে বলতে পারেন "এই নিন আমার ব্যাঙ্কের খাতা"?

জাতি হিসাবে ভারতীয়েরা আত্মত্যাগের আদর্শে বিশ্বাস করে। হিন্দুদের মধ্যে আছে সন্ন্যাসী, মুসলমানদের মধ্যে ফকির, যাদের আমরা সম্মান করি। আমাদের ইতিহাসে এমন রাজা মহারাজার উদাহরণ আছে যাঁরা ধর্ম, ন্যায় ও সত্যের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ফকির হয়েছেন। ৩৮ কোটি মানুষের মুক্তিদানের থেকে বৃহত্তর, মহত্তর ও পবিত্রতর কাজ আর কী হতে পারে এবং এমন একজনও ধনী ব্যক্তি কি নেই যিনি এগিয়ে এসে বলতে পারেন, এই মহান কাজে ব্যয় করবার জন্য "এই নিন আমার ব্যাঙ্কের খাতা"? এ কথা আমার একেবারেই বোধগম্য হচ্ছে না যে, আপনারা যদি জীবন বিসর্জনের মতো ত্যাগে রাজি না থাকেন তা হলে আপনাদের মধ্যে অন্তত কিছু সংখ্যক মানুষও কেন এই কথা বলতে পারছেন না যে, "আমরা জীবন দেব না কিন্তু আর যা আছে সে সব আমরা দিতে রাজি।"

আমি এখন আপনাদের কাছে স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারের কার্যাবলী উপস্থাপনা করব। এই কাজগুলি সম্পন্ন করবার জন্য আমাদের অগ্রসর হতে হবে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে এবং সুশৃঙ্খলভাবে, যেমন অন্য যে কোনও সরকারই করত। যুদ্ধের আগে করা আনুমানিক হিসাব অনুসারে মালয়ের ভারতীয়দের সম্মিলিত ধনের পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি টাকা এবং আপনারা সকলেই জানেন যে এই ধনের পরিমাণ আরও বেড়েছে। সাধারণত যে কোনও সরকারই বার্ষিক আয়ব্যয়ের একটা বাজেট করে থাকে এবং, প্রয়োজন হলে সেই একই বছরে তারা আরেকটা বাড়তি বাজেটের ব্যবস্থা করে থাকে। আমিও তাই করতে চলেছি। সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির আদর্শে আপনারা স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে পারেন কিন্তু তা না হলে আপনাদের মাঝে মাঝে আমাদের দাবির মুখোমুখি হতে হবে যতদিন না যুদ্ধ শেষ হয়।

মালয়ের কাছ থেকে আমার প্রথম কিস্তির দাবি হল ১০ কোটি টাকা, যা আপনাদের সমগ্র ধনসম্পদের আনুমানিক ১০ শতাংশ। আজকের সমাবেশে যেহেতু মালয়ের বহু ধনী ব্যক্তি উপস্থিত আছেন আমি আশা করব অন্তত এক কোটি টাকা আজই এখনই সংগৃহীত হবে এবং আগামী এক মাসের মধ্যে মালয়ের থেকে আমরা ১০ কোটি টাকা তুলতে পারব।

২৮

বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সম্মেলনে নেতাজি

[৩১ অক্টোবর ১৯৪৩, নেতাজির টোকিওতে আগমন ও প্রধানমন্ত্রী হিদেকি তোজোর সঙ্গে মতামত বিনিময়, ৫ নভেম্বর ১৯৪৩ তারিখে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সমাবেশে ভাষণ এবং ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সফরকালে দেওয়া অন্যান্য বিবৃতিগুলি][১]

৩১ অক্টোবর দ্বিপ্রহরে জাপানের বোর্ড অফ ইনফরমেশন (তথ্য দপ্তর) থেকে নিম্নলিখিত বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হয় যে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের প্রধান সুভাষচন্দ্র বসু টোকিও-তে এসে পৌঁছেছেন।

"আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারকে স্বীকৃতি ও সাহায্য দেবার জন্য সেই সরকারের প্রধান সুভাষচন্দ্র বসু নিপ্পন সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে আজ টোকিও-তে এসে পৌঁছেছেন।"

এটা জানা ছিল যে জাপানে তাঁর স্বল্পকালীন সফরের সময় নেতাজি বসু প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজো ও নিপ্পন সরকারের অন্য নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মতামত বিনিময় করবেন, নিপ্পন সরকারের সঙ্গে স্বাধীন ভারতবর্ষের আপৎকালীন সরকারের ভবিষ্যৎ সহযোগিতার বিষয়টিও আলোচিত হবে।

হানেদা বিমানবন্দরে পৌঁছবার পরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ জাপানি অফিসারেরা সাদর স্বাগত জানান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিদেশমন্ত্রী মামোরু শিগেমিতসু, বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সংক্রান্ত দপ্তরের মন্ত্রী কাজুও আওকি, তথ্য দপ্তরের প্রেসিডেন্ট এইজি আমাউ এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের টোকিও শাখার উচ্চপদস্থ সদস্যেরা।

নেতাজির সঙ্গে সাত সদস্যবিশিষ্ট দলে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জে কে ভোঁসলে, সুপ্রিম কমান্ডের চিফ অফ্ স্টাফ ও দপ্তরবিহীন মন্ত্রী; এ এম সহায়, দপ্তরবিহীন মন্ত্রী ও ক্যাবিনেট সেক্রেটেরিয়েটের প্রধান; লেফটেন্যান্ট কর্নেল ডি আই রাজু, সুপ্রিম কমান্ডের সঙ্গে যুক্ত; এবং এ হাসান, একান্ত সচিব। বিমান থেকে নামার পর নিপ্পনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করে নেতাজি ও তাঁর সহযাত্রীরা বিমানবন্দর ছেড়ে ভাইকাউন্ট কাইজো শিবুজায়ার বাসস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন, তাঁদের ঘিরে ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠতে লাগল।

১ নভেম্বর সকাল ১১টা ২০ মিনিটে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রধানমন্ত্রী জেনারেল

---

১. Chalo Delhi, pp. 188-194; 'Subhas Chandra Bose and Japan', 4th Section, Asian Bureau, Ministry of Foreign Affairs, Government of Japan, August 1956; এবং নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালা থেকে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে নেতাজির দেওয়া বক্তৃতার অডিও এবং ভিডিও রেকর্ডিং।

হিদেকি তোজোর সঙ্গে সরকারি সাক্ষাৎকারে মিলিত হলেন এবং ৪০ মিনিট কথাবার্তা বলার পরে নেতাজি বিদায় নিলেন। ২ নভেম্বর বিদেশমন্ত্রী মামোরু শিগেমিতসু তাঁর সরকারি বাসভবনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সম্মানে সান্ধ্য ভোজের আয়োজন করেন। প্রধান অতিথির উদ্দেশে স্বাগত ভাষণে বিদেশ মন্ত্রী ঘোষণা করেন, "আমরা সব কমরেডরা যখন একযোগে এশিয়ার মুক্তি ও অগ্রগতির একই মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছি, তখন আসুন আজ আমরা শপথ নিই যে আমাদের সম্মিলিত শক্তি নিয়োগ করে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতদিন না শত্রু পরাভূত হচ্ছে ও আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে।"

তিনি আরও যোগ করেন, "পূর্ব দিক থেকেই আলো আসে। ভোরের আকাশে সূর্যোদয় হতে সময় লাগে ঠিকই, কিন্তু রাতের নক্ষত্রখচিত আকাশ যখন ক্রমশ ম্লান হয়ে আসে তখন পূর্বদিকের জানলা দিয়ে নবোদিত সূর্যের উজ্জ্বল আলো আসে ঘরের ভিতরে। ভারতবর্ষ এখন সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় আছে। ভোরের ধূসর অন্ধকার যা এখন ভারতের দিকচক্রবালকে ঢেকে রয়েছে তা ভেদ করে সূর্য উঠতে আর বিলম্ব নেই।"

বিদেশমন্ত্রী বলেন যে, অতি দুঃসময়ে মিস্টার বোস ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, কিন্তু এখন সেই দুঃসময় আর নেই। "এখন অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে।" তিনি বলেন যে, পূর্ব এশিয়া ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে, নিপ্পনের বিজয়ী সেনারা আজ ভারতের সীমান্তে উপনীত। "সমগ্র এশিয়া এখন উত্তাল, এশিয়ার জনগণ নিজের হাতে তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবার আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্পে জেগে উঠেছে" এবং তার ফলে ভারতীয়েরা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আরও অনুপ্রেরণা পাচ্ছে।

বিদেশমন্ত্রীর ভাষণের উত্তরে, নেতাজি ঘোষণা করলেন যে বিদেশি শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হবার পরে এশিয়ার কোনও কোনও দেশ পরাজয় স্বীকার করলেও নিপ্পনে সেই বিদেশি আগ্রাসনের বিপদ সম্বন্ধে নতুন সচেতনতা দেখা দিয়েছে এবং বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার এই যুদ্ধে নিপ্পনের চমকপ্রদ জয়গুলি সমগ্র পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিকেও চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জনের পথে অনুপ্রাণিত করেছে। সমগ্র এশিয়াকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে নিপ্পন যে ভাবে পা বাড়িয়েছে ও সাহয্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সেইজন্য তিনি তাদের কৃতজ্ঞতা জানালেন। "আমাদের আপৎকালীন সরকারের প্রতি জাপানের বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সাহায্যের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে এই সরকারকে স্বীকৃতি দেবার মাধ্যমে।"

"শুধুমাত্র যখন একই উদ্দেশ্যের সিদ্ধিতে আমাদের দুই দেশের সেনানীদের দেহের রক্ত মিশে যাবে তখনই আমাদের একতা ও বন্ধুত্ব— এশিয়ার প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বের সৃষ্টি হবে।" তিনি শেষ করলেন।

৬ নভেম্বরের দ্বিপ্রহরে, প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজোর আমন্ত্রণে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তর দেশগুলির সমাবেশে যোগ দিলেন। সমাবেশে ২০ মিনিট ব্যাপী এক সাড়া জাগানো বক্তৃতায় নেতাজি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও সহানুভূতির জন্য পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানালেন এবং তিনি এই কথাও জানালেন যে এই সাহায্যের আশ্বাস ভারতীয়দের মধ্যে এক বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার উদ্দেশ্যে অদূর ভবিষ্যতে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধ ঘোষণা করবেন বলে তিনি শপথগ্রহণ করলেন।

তিনি বক্তৃতা দেবার জন্য উঠে দাঁড়ালে সমাবেশে উপস্থিত সমগ্র জনতা তাঁকে বিপুল

অভিনন্দন জানাল। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকার জন্য তাঁকে যে সুযোগ ও সম্মান দেওয়া হয়েছে, সেই জন্য এবং বিশেষ ভাবে আগামী সংগ্রামের জন্য সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে তিনি তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন। সজল চক্ষে তিনি বললেন, "মহানুভব, আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে আজকের এই সিদ্ধান্ত এই প্রাসাদের সীমানা পার হয়ে দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বে এবং ব্রিটিশ শাসনে শৃঙ্খলিত লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মনে আশা, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা জাগাবে। একই সঙ্গে অপরাধীর মনে তা ত্রাসের সঞ্চার করবে।" জাপানের অপরাজেয় সামরিক বাহিনী ও সদ্য স্বাধীন পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সহায়তায় শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা তিনি ঘোষণা করলেন।

তাঁর বক্তৃতার ওজস্বিতায় সম্মেলনের প্রতিটি সদস্য তাঁর প্রতিটি কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি বললেন, "মহানুভব, আমি কাল থেকে এই সমাবেশে উপস্থিত সদস্যদের বক্তৃতা শুনছি এবং ধীরে ধীরে আমার মানসচক্ষে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস ভেসে উঠছে। আমার মন চলে যাচ্ছে গত ১০০ বছর বা তারও বেশিদিন ধরে যে সব আন্তর্জাতিক কংগ্রেস ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই দিকে। নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের পতনের পরে ১৮১৫ সালে অনুষ্ঠিত ভিয়েনা কংগ্রেস থেকে শুরু করে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরে ১৮৫৬ সালে অনুষ্ঠিত প্যারিস কংগ্রেস, ১৮৭৮ সালে রুসো-টার্কিশ যুদ্ধের পরে অনুষ্ঠিত বার্লিন কংগ্রেস, তারও পরে ১৯১৯ সালে গত বিশ্বযুদ্ধের পরে ভার্সেইতে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলন এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলি ও দূর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলগুলিতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগুলির আধিপত্য নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ১৯২১ সালে অনুষ্ঠিত ওয়াশিংটন সম্মেলন, এবং সব শেষে ১৯২৫ সালে অনুষ্ঠিত লোকার্নো সম্মেলন যেখানে জার্মান জনগণের হাত চিরকালের মতো অকেজো করে দেওয়া হল। আরও মনে পড়ছে লীগ অফ নেশনস (জাতিসঙ্ঘ)-এর কথা, যে জাতিসঙ্ঘের বারান্দায় ও লবিতে আমি বৃথাই বহুদিন কাটিয়েছি, এক দরজা থেকে অন্য দরজায় করাঘাত করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আবেদন করে।

আজকের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে সদস্যদের বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার মনে কেবলই প্রশ্ন জাগছে এই সম্মেলনের সঙ্গে অতীতের অন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনগুলি, পৃথিবীর ইতিহাস যার সাক্ষী আছে, সেগুলির কোনও পার্থক্য আছে কিনা।

মহানুভব, এই সম্মেলন যুদ্ধের বিজয়ীদের মাঝে জয়ের কৃতিত্বের ভাগ বাঁটোয়ারা করবার জন্য নয়। কোনও শক্তিহীন প্রতিপক্ষের উপরে দোষারোপের ষড়যন্ত্রের জন্য অথবা কোনও দুর্বল প্রতিবেশীকে প্রতারণা করবার জন্যও এই সম্মেলন ডাকা হয়নি। আজকের এই সম্মেলনে যে উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি একত্র হয়েছে তা হল, বিশ্বের এই অঞ্চলে ন্যায়বিচার, জাতীয় স্তরে স্বশাসনের অধিকার, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার সুমহান নীতির ভিত্তিতে এক নতুন শক্তিগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করা। এই সম্মেলন যে আজ উদীয়মান সূর্যের দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, আমি মনে করি তার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। আলো ও পথনির্দেশের জন্য সারা বিশ্ব আজ প্রাচ্যের দিকে তাকিয়ে, এবং এই ঘটনা এই প্রথম ঘটছে না। এর আগেও বিশ্বের অন্যত্র নতুন শক্তিগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সেই শক্তিগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব দেশ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল তাদের স্বার্থপরতা, ধনলিপ্সা ও সন্দেহপরায়ণতাই ছিল ব্যর্থতার

কারণ। অতএব, ঐতিহাসিক পারম্পর্য বজায় রেখে সমগ্র বিশ্ব আবারও একবার নতুন পথের দিশারীরূপে প্রাচ্যের দিকে তাকিয়েছে।

মহানুভব, আমার বিশ্বাস যে ঐতিহাসিক ভাগ্যবিধাতার আদেশক্রমে যেন এক নতুন, স্বাধীন ও সমৃদ্ধশালী প্রাচ্য সৃষ্টি হতে চলেছে, নিপ্পনের সরকার ও জনসাধারণ এই নবজাগরণের পুরোধা। নিপ্পনের সরকার ও জনসাধারণের এই বিশেষ ভূমিকা অনেক আগেই নির্ধারিত হয়েছে, যখন ১৯০৫ সালে সেই প্রথম একটি এশীয় জাতি পাশ্চাত্যের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল।"

তাঁর বক্তৃতায় সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক বিষয়টি হল বিশ্বজনীনতার সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সমকালীন প্রগতি এবং যে দেশগুলির মধ্যে এই সমকালীন প্রগতি ঘটতে পারে, তার বিস্তার সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাভাবনা। তিনি বর্ণনা করেন মধ্যযুগ থেকে ভারতবর্ষ কীভাবে তার বিশ্বজনীনতার নীতিকে বিসর্জন দিয়েছিল ও তার ফলে কীভাবে তাদের অন্যের অধীনতা স্বীকার করে নিতে হয়েছিল এবং এখনও কীভাবে তাদের নিদারুণ দুর্দশাগ্রস্ত ও শোচনীয় জীবনযাপনে বাধ্য করা হচ্ছে কারণ তারা প্রকৃত বিশ্বজনীনতার সঙ্গে মেকি বিশ্বজনীনতার পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়নি।

তিনি বলেন, "এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে এই কথা স্বীকার করতেই হচ্ছে যে মধ্যযুগে ভারতে এক মেকি বিশ্বজনীনতার ধারণা গড়ে ওঠে এবং এই কারণেই ইউরোপীয় শক্তিগুলি এত সহজে আমাদের দেশে গুছিয়ে বসতে সক্ষম হয়েছিল, এবং এক সময়ে তারা আমাদের উপরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। কিন্তু আমরা এখন অনেক দুঃখ, নির্যাতন ও অবমাননার মধ্য দিয়ে মেকি বিশ্বজনীনতা ও যথার্থ বিশ্বজনীনতার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শিখেছি। আমরা এখন উপলব্ধি করেছি যে প্রকৃত বিশ্বজননীনতা জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করে না, বরং জাতীয়তাবাদের মধ্যেই বিশ্বজনীন চিন্তা ভাবনার মূল অস্তিত্ব।" তিনি আরও বলেন, "ইউরোপে ও অন্যত্র যখন কোনও নতুন আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, সেই ঘটনাগুলি আমরা খুবই ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ করেছি। এই পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং পরিশেষে তাদের ফলাফলের ব্যর্থতা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পেরেছি। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এখন নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে রাষ্ট্রসমূহের এক আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী তখনই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে যখন আমরা আঞ্চলিক গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়া শুরু করতে পারব, যেমন আমাদের বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সহ-সমৃদ্ধি গোষ্ঠী (গ্রেটার ইস্ট এশিয়া কো-প্রসপ্যারিটি স্ফিয়ার)।"

"মহানুভব, আমি সবিনয়ে যে বিষয়টিতে আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সহসমৃদ্ধি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা শুধুমাত্র পূর্ব এশিয়ার জনসাধারণের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, তা সমগ্র এশিয়ার জনগোষ্ঠী তথা বিশ্বজনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।" তিনি আরও বলেন, যে এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ আছে তা থেকে তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছে যে ভারতবর্ষ পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার মাঝে সেতুবন্ধন ঘটানোর থেকেও আরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে এবং বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সহ-সমৃদ্ধি গোষ্ঠী সমগ্র এশিয়ার জনসাধারণের কাছে এক তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ বলে গণ্য হবে। "এশিয়া হবে এশিয়াবাসীদের জন্য" অর্থাৎ বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সহ-সমৃদ্ধি গোষ্ঠী পরবর্তী পর্যায়ে একটা বিশ্বজনগোষ্ঠী রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে, যা প্রকৃত অর্থেই এক আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী বলে চিহ্নিত হবে এবং যা পরদ্রব্য-অপহরণকারী দস্যুদের গোষ্ঠীতে পরিণত হবে না। তবে এই

নতুন পৃথিবী, নতুন এশিয়া— বৃহত্তর এশিয়ার ভবিষ্যতের এই যে ভাবমূর্তি যেখানে এশিয়ার দেশগুলি স্বাধীনতা পাবে ও তাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে, তা সম্ভব হবে শুধুমাত্র তখনই যদি আমরা এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হতে পারি। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান ও তার মিত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে... ভারতবর্ষের সামনে একটা পথই খোলা আছে, তা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। ইংল্যান্ডের সঙ্গে কোনওরকম আপোষ মীমাংসার পথ বেছে নেওয়া দাসবৃত্তি স্বীকার করে নেওয়ারই সমতুল্য হবে।

ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যাগুলির বিষয়ে নেতাজি বলেন ইউরোপীয়দের কাছে ভারতীয়দের পরাভবের কারণ নিহিত আছে বহু শতাব্দী আগে করা ভুলের মধ্যে। তিনি বলেন যে বর্তমান যুগের ভারতীয়দের সেই উপলব্ধি হয়েছে এবং তারা আরও উপলব্ধি করেছে যে ইংল্যান্ডের সঙ্গে কোনও ভাবেই কোনও আপোষ মীমাংসা করা উচিত হবে না। তিনি ঘোষণা করেন যে যুদ্ধে ব্রিটিশদের পরাভূত করাই ভারতীয়দের জন্য স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র পথ।

বহু সহস্র ভারতীয়েরা যে আজ অনাহারে মৃত্যুমুখে পড়েছে নেতাজি সেই বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে ভারতীয় জাতীয় সেনাদল আজ দিল্লি অভিমুখে যাবার জন্য প্রস্তুত। এর পরে তিনি বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সহসমৃদ্ধি গোষ্ঠী গঠনের কাজে ও জাপানের গঠনমূলক কাজের সাফল্য কামনা করেন। তিনি বলেন বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার পক্ষ থেকে করা যৌথ ঘোষণা হল ১৯৪৩ সালের ম্যাগনা কার্টার সমতুল্য— এ হল পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণা, যা পৃথিবীর ইতিহাসে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সব শেষে, ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে যত শীঘ্র সম্ভব স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন এই কথা তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন।

শ্রীযুক্ত বসু আরও বললেন, "আমি আপনাদের সকলকে আজ এই আশ্বাস দিতে চাই যে, ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, আমাদের সংগ্রাম যত দীর্ঘ আর যতই দুরূহ হোক না কেন, আমাদের দুঃখ-যন্ত্রণা ও স্বার্থত্যাগ যতই দুঃসহ মনে হোক না কেন, আমরা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সংগ্রামের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ এবং সংগ্রামের শেষে যে চূড়ান্ত জয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সেই বিষয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের কাজ যে কি বিশাল সেই বিষয়েও আমার কোনও ভ্রান্ত ধারণা নেই। শত্রুর শক্তিকে আমি খর্ব করে দেখি না। ব্রিটিশ জনসাধারণের সম্বন্ধে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত ধারণা আছে। আমার বয়স যখন পাঁচ তখন থেকে তাদের সঙ্গে আমার পরিচয়, এবং সেই পরিচয় এতটাই ঘনিষ্ঠ যে ভারতবর্ষের এই শত্রুর শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে আমার সম্যক ধারণা আছে। এবং আমাদের নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধেও আমি সম্পূর্ণরূপে অবহিত। সেইজন্য আমাদের জয় সম্বন্ধে আমি সুনিশ্চিত।

আমাদের মধ্যে যাঁরা আজ এই সংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন আমি জানি না তাঁদের মধ্যে কতজন তাঁদের জীবদ্দশায় স্বাধীন ভারতবর্ষ দেখে যেতে পারবেন। কিন্তু বাঁচি কিংবা মরি, দেশ স্বাধীন হল সেই অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের হল কিংবা হল না, আমাদের যে জয় হবেই সেই বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে একদিন ভারতবর্ষের মানচিত্র থেকে মুছে যাবে এবং আজ সমগ্র পূর্ব এশিয়ার বুকের উপরে এই যে পরাধীনতার দুর্বহ ভার, তা চিরকালের মতো অপসারিত হবে।"

"আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে এই যৌথ ঘোষণা যা আজকের অপরাহ্নের এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল তা যেন পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির জন্য, এক অধিকার দাবির সনদ হিসাবে পরিচিতি পায়। পৃথিবীর ইতিহাসে এই যৌথ ঘোষণা যেন ১৯৪৩ সালের এবং তার পরবর্তী কালে স্বাধীনতাকামী সাধারণ মানুষের অধিকারপত্র, নতুন অধিকারপত্রের মর্যাদা পায়। শুধু এক নতুন নিপ্পনের প্রতিষ্ঠাতারূপেই নয়, এক নতুন এশিয়ার প্রতিষ্ঠাতারূপেও নয়, ইতিহাসের পাতায় আপনাদের নাম লেখা থাকবে এক নতুন বিশ্বের প্রতিষ্ঠাতা ও স্থপতি হিসাবে।"

এই কথাগুলি বলে তিনি যখন তাঁর মহতী বক্তৃতা শেষ করলেন সমবেত জনসাধারণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল। তীব্র অনুভূতির প্রতিফলন দেখা গেল তাঁর কণ্ঠস্বরে ও অশ্রুতে। তাঁর বক্তৃতায় বক্তব্যের গভীরতা, দূরদৃষ্টি ও বিপুল জ্ঞানের প্রকাশ, সর্বোপরি তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা যা তাঁর প্রতিটি কথায় ফুটে উঠল— সব মিলিয়ে এই বক্তৃতা এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে রইল। তাঁর উপস্থিতি ও তাঁর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সম্মেলনের মূল বক্তব্যটি যেন প্রকাশ পেল।

শ্রীযুক্ত বসুর বক্তৃতা শেষ হবার পর প্রধানমন্ত্রী তোজো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্যের জন্য তাঁদের অবিচলিত সঙ্কল্পের কথা জানালেন: "স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতবর্ষের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে পরিণত করার কাজে জাপান সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে সেই প্রতিশ্রুতি আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের বহু ঘোষণায় স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছি। স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার গঠিত হবার পরে আমরা যখন দেখছি জনসাধারণ কালবিলম্ব না করে সেই সরকারের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, তখন প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে জাপান অদূর ভবিষ্যতে বর্তমানে জাপানের অধিকৃত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের আপৎকালীন সরকারের হাতে ফিরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

এর স্বল্পক্ষণ পরেই বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটল এবং এই সম্মেলনে আমাদের সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতি বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার মহাকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো প্রতিভাত হল। পূর্ব এশিয়ায় তিনি যে দীর্ঘ দু'বছর ধরে কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সমগ্র সময়ের মধ্যে এই দিনটি তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও বিশেষ হয়ে রইল। ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকবৃন্দ বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সম্মেলনের যে মূল্যায়নই করুন না কেন, কোনও ভাবেই তাঁরা শ্রীযুক্ত বসুর ব্যক্তিত্বপূর্ণ উপস্থিতির কথা ভুলতে পারবেন না। তিনি সেই দিন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমগ্র ভার একা নিজের কাঁধে বহন করেছিলেন।

১০ নভেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় রাজপ্রাসাদের ফিনিক্স হলে জাপানের সম্রাট তেনো হেইকার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে নেতাজির প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়ে সম্রাট তাঁকে সম্মানিত করলেন।

সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর নেতাজি নিম্নলিখিত বিবৃতি দিলেন:

আজ সকালে তেনো হেইকা আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের প্রধানরূপে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সম্মান দিয়েছেন, এই সাক্ষাৎকারকে আমার নিজের জন্য ও আমার দেশের জন্য সর্বোচ্চ সম্মান বলে গণ্য করব। আমি আবার নতুন করে তেনো হেইকার সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই চালিয়ে যাবার সঙ্কল্প নিয়েছি, যতদিন না আমাদের দুই সরকারের শত্রুকে আমরা পর্যুদস্ত করতে পারি। তেনো হেইকার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের স্মৃতি আমার মনের মধ্যে চির জাগরূক থাকবে।

১৫ নভেম্বর স্বনামধন্য জাপানি নাগরিক মিতসুরু তোয়ামা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁর সঙ্গীদের মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ন করলেন। আপৎকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শ্রীরাসবিহারী বসুও এই মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রিত ছিলেন। ৪০ জনের বেশি নামী অতিথি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন সামরিক দপ্তরের উল্লেখযোগ্য অফিসার জেনারেল শিগেরু হোনজো এবং ইয়োশিহিহিসা কুজু।

১৮ নভেম্বর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নানকিংয়ে এসে পৌঁছলেন। সকালে এসে পৌঁছবার পরেই তিনি চুঙসুঙ স্মৃতিসৌধে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন, যেখানে 'আধুনিক চিনের জনক' পরলোকগত ডক্টর সান ইয়েত-সেনের চিতাভস্ম রাখা আছে। পরে তিনি প্রেসিডেন্ট ওয়াঙ চিঙ-ওয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। প্রেসিডেন্ট ওয়াঙয়ের দেওয়া মধ্যাহ্ন ভোজে তাঁকে প্রধান অতিথির সম্মান জ্ঞাপন করা হল। ভোজে চিনের জাতীয় সরকারের অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারেরাও উপস্থিত ছিলেন। বিকেলে নেতাজি চিনদেশে নিপ্পন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল শুনরোকু হাতার হেডকোয়ার্টার্সে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন এবং এ ছাড়াও তিনি নিপ্পনের দূতাবাসে গিয়ে রাষ্ট্রদূত মাসায়ুকি তানির সঙ্গে দেখা করলেন। জার্মানি ও মাঞ্চুকুও-র দূতাবাসে দেখা করার পর যখন নেতাজি বসু ফিরে এলেন তখন জেনারেল হাতা ও রাষ্ট্রদূত তানি এলেন সরকারি অতিথিশালায় তাঁর কাছে সাক্ষাৎ বিনিময়ের জন্য।

সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় নেতাজি বিদেশমন্ত্রী চু মিন-ইর দেওয়া ভোজোৎসবে যোগ দিলেন। ১৯ নভেম্বর সকাল ১০ টায় নানকিংয়ে কর্মরত জার্মান রাষ্ট্রদূত ডক্টর আর্নস্ট ওয়োরম্যান এবং মাঞ্চুকুও রাষ্ট্রদূত লু ইয়ুং-হুয়ান অতিথিশালায় এলেন নেতাজির সঙ্গে দেখা করতে। তার পরে সকাল ১১ টায় তিনি নানকিংয়ের নাগরিকদের দ্বারা আয়োজিত জাতীয় সভাঘরে এক মিটিংয়ে যোগ দিলেন, এই সভার আয়োজন করা হয়েছিল বিশেষভাবে তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য।

এই স্বাগত সমাবেশে নেতাজি ঘোষণা করলেন, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরাস্ত করে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চিন ও ভারতের হাত মেলানো প্রয়োজন। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির প্রভাব কাটিয়ে উঠে অখণ্ড চিন গড়ে তোলবার জন্য এবং ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের জন্য তিনি চিয়াঙ কাই-শেক ও অন্যান্য নেতাদের আহ্বান জানালেন। গত বছরে ভারত সফরের সময় শ্রীমতী চিয়াঙ ভারতীয় নেতাদের অনুরোধ করেছিলেন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য। সেই সফরের কথা উল্লেখ করে নেতাজি বলেন যে চিয়াঙ কাই-শেক যদি প্রকৃতই চিনদেশের স্বাধীনতালাভের কথা চিন্তা করে থাকেন তা হলে তাঁর উচিত ছিল ভারতীয় জনগণের পরিবর্তে ব্রিটিশ শাসকদের সহযোগিতা করবার জন্য অনুরোধ করা, কারণ এরাই ৩৮.৮ কোটি ভারতীয়দের ক্রীতদাস করে রেখেছে। নেতাজি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলেন চিন ও ভারত, এই দুই দেশের নাগরিকদেরই উচিত বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার মুক্তির জন্য সংগ্রামে যোগ দেওয়া।

নেতাজি বসু বলেন ১৯৩৮ সালে তিনি যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি ভারতের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার প্রতীক হিসাবে একটি চিকিৎসকের দল পাঠিয়েছিলেন চুঙকিঙয়ে। নেতাজি বলেন, "ভারতীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা চুঙকিঙয়ের উচিত হবে না, তাদের উচিত হবে ভারতীয়দের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উভয় দেশের একই শত্রু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, কেন না ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির অধীনে কখনওই চিন দেশের

কোনও উন্নতি হবে না।" তিনি বলেন ডক্টর সান ইয়েত-সেন ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন উৎসাহী সমর্থক ও তিনি সমগ্র পূর্ব এশিয়াকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার কাজে একজন অগ্রণী কর্মী ছিলেন।

এই জনসমাবেশের পর চিন দেশে নিপ্পনের রাষ্ট্রদূত মাসায়ুকি তানির দেওয়া এক মধ্যাহ্ন ভোজে নেতাজি যোগ দিলেন প্রধান অতিথি রূপে। বিকেল ৩ টেতে তিনি প্রেসিডেন্ট ওয়াঙ চিঙ-ওয়ের বাসস্থানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসলেন এবং বিকেল ৪টেয় ডক্টর আর্নস্ট ওয়োরম্যানের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলায় তিনি সম্মানীয় প্রধান অতিথি রূপে সান্ধ্যভোজে যোগ দিলেন নিপ্পন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল শুনরোকু হাতার নিমন্ত্রণে।

টোকিওতে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সম্মেলনে যোগ দেবার পর, নানকিং ও সাংহাই সফর শেষ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানযোগে ম্যানিলায় এসে পৌঁছলেন ২২ নভেম্বর বিকেল ৩ টে ১৫ মিনিটে। বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট হোজে পি. লরেল, রাষ্ট্রদূত শোজো মুরাতা, ফিলিপাইনে নিপ্পন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল শিজেনোরি কুরোদা এবং ফিলিপাইন সরকারের আরও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারেরা। মালাকানানে প্রেসিডেন্ট হোজে পি. লরেলের সঙ্গে দেখা হতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এই নবতম প্রজাতান্ত্রিক ফিলিপাইনের জন্মলগ্নে প্রেসিডেন্টকে তাঁর অভিনন্দন জানালেন। ফিলিপাইনে অবস্থানকালে নেতাজি মালাকানানে ছিলেন, যেখানে সন্ধ্যাবেলায় তিনি প্রবাসী ভারতীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রেসিডেন্ট লরেল নেতাজির সম্মানার্থে এক সান্ধ্যভোজের আয়োজন করেছিলেন যেখানে নেতাজি প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশের মন্ত্রীরা, নিপ্পনের রাষ্ট্রদূত শোজো মুরাতা, এবং আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ফিলিপিনো, জাপানি ও ভারতীয় নেতারা।

ভোজসভায় দেওয়া বক্তৃতায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সতর্ক করে দিলেন, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এখন মৃত। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ এখন খুব সাফল্যের সঙ্গে ব্রিটিশদের নির্মম ও অন্যায় শাসনপদ্ধতির অনুকরণ করে চলেছে। আজকের পৃথিবীকে বেছে নিতে হবে, এই সাম্রাজ্যবাদীদের আমরা অপ্রতিহতভাবে চলতে দেব অথবা ন্যায়বিচার ও সাম্যের ভিত্তিতে বিশ্বে এক নতুন শাসনপদ্ধতি আমরা প্রতিষ্ঠা করব, এই দুটি পথের মধ্যে একটিকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করার অর্থই হল দাসপ্রথার সঙ্গে আপোষ করা, কারণ এর দ্বারা মানুষকে তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক, সর্বতোভাবে পায়ের তলায় রেখেছে।"

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের উত্থান সম্পর্কে নেতাজি আরও বলেন, "এই নতুন বিপদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং এর শিকড় গভীরে যাবার আগেই উন্মূলিত করতে হবে।" তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে এক সময় ভারতীয়েরা সহ সমগ্র এশিয়াবাসী যুক্তরাষ্ট্রকে সম্মানের চোখে দেখত। "কিন্তু এখন আমরা জানি যে, আমেরিকানদের উপনিবেশবাদের নীতি ক্ষুদ্রতর দেশগুলির পক্ষে প্রকৃত অর্থেই বিপজ্জনক।"

তিনি সকল পূর্ব এশিয়াবাসীদের আহ্বান করে ঘোষণা করেন, "আমি চিরকালই মানুষ বা জাতিকে অন্যায়ভাবে পায়ের তলায় রাখার নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশ্বাসী। একক ব্যক্তি হিসাবে আমাদের স্বতন্ত্র কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। সকলেই আমরা একদিন মরব। আমাদের মরতেই হবে, কিন্তু আমরা যাতে আমাদের দেশকে চিরদিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখতে

পারি সেই লক্ষ্যের উদ্দেশে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে।" তিনি মনে করিয়ে দেন যে একসময় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বলতে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বশ্যতাই বোঝাত কিন্তু এখন তার মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বকেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি টোকিও-তে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সম্মেলনের কথা উল্লেখ করে নেতাজি বলেন, "আমার পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার স্বপ্ন আজ বাস্তবে রূপ পেয়েছে।"

শেষদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য ভারতীয়দের সঙ্কল্পের কথা আবারও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করে বলেন, "আমাদের দেশকে বিদেশি শাসনের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ভারতীয়েরা তাদের জীবন দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমাদের জীবন দিতেই হবে কারণ আজ যে দেশের জন্য জীবন দেবে সে দেশের জন্যই বাঁচবে। আমরা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত এবং আমরা জানি সেই লড়াই হবে দীর্ঘ ও নির্মম।"

তিনি প্রেসিডেন্ট লরেলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "মহানুভব, আমি আপনার প্রতি, ফিলিপাইনের সরকার ও জনগণের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাই। আপনাদের প্রজাতন্ত্র চিরজীবী হোক এবং ফিলিপাইনের জনগণের অগ্রগতি অব্যাহত থাকুক।"

নিপ্পন থেকে সায়োনানে ফেরার পথে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ম্যানিলা থেকে রওনা দিয়ে সায়গনে পৌঁছলেন ২৪ নভেম্বর দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। নিপ্পন হোটেলে অল্প সময়ের জন্য বিশ্রাম নিয়ে নেতাজি নিপ্পনের সেনা ও নৌবাহিনীর স্থানীয় কমান্ডারদের সঙ্গে দেখা করলেন। সন্ধ্যাবেলায় তিনি তাঁরই সম্মানে আয়োজিত এক ভোজসভায় যোগ দিলেন। এই ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন নিপ্পন মন্ত্রী শেগিনোরি তাশিরো। পরে নেতাজি এক জনসভায় স্থানীয় এলাকায় বসবাসকারী স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন তাঁরা যেন দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করার সংগ্রামে যোগ দেন। ২৫ নভেম্বর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ফিরে এলেন আপৎকালীন সরকারের প্রধান কেন্দ্রে।

২৯

ভারতবর্ষ ও আয়ারল্যান্ড

[১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে আইরিশ রিপাবলিকানদের অভিনন্দনের উত্তরে][১]

আইরিশ রিপাবলিকানদের কাছ থেকে পাওয়া অভিনন্দন বার্তা আমাকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছে। আমরা ভারতীয়েরা যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছি এবং যা থেকে আমরা অনুপ্রেরণা পেয়েছি, তাদের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য আয়ারল্যান্ডের জনগণের প্রয়াসের উদাহরণ সম্ভবত অদ্বিতীয়। সেই একই অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসক আইরিশ ও ভারতীয় জনগণকে পায়ের তলায় রেখেছে এবং এই দুই দেশের সম্পদ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। আমাদের মতো তাদেরও সেই একই ভণ্ড শাসকের নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়েছে। অতীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নারকীয় নীতি আয়ারল্যান্ডকে দ্বিখণ্ডিত করেছিল এবং এখনকার এই যুদ্ধের শেষে যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ জয়ী হয় তা হলে ভারতের অদৃষ্টে সেই একই ভবিতব্য অপেক্ষা করে আছে। ১৯১৬ সালে, ইস্টার বিদ্রোহের ঠিক আগে আইরিশ রিপাবলিকানরা তাদের আপৎকালীন সরকার গঠন করেছিল। ১৯৪৩ সালে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও তাদের শেষ যুদ্ধে ব্রতী হবার আগে আপৎকালীন সরকার গঠন করেছে। আমাদের এই দুই দেশের মধ্যে পরিস্থিতির এতটাই সাদৃশ্য যে আইরিশ ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমমর্মিতার একটা স্বাভাবিক ও গভীর বন্ধন আছে।

নির্মম ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বহু শতাব্দী ব্যাপী দীর্ঘ সংগ্রামে আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা তাঁদের অতুলনীয় বীরত্ব, আত্মত্যাগ এবং আরব্ধ কাজে সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত রেখেছেন। অনেক সময় সংগ্রামে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে, কিন্তু তাদের মনোবল অটুট থেকেছে। বিশেষ করে বর্তমান শতাব্দীর সংঘর্ষগুলিতে আইরিশ জনগণ দেশপ্রেমের আদর্শকে ও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য জীবনদানকে যে মহিমান্বিত উচ্চতায় উন্নীত করতে পেরেছেন— তা মানুষের জন্মগত অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখার সংগ্রামের একটি মহান অধ্যায় বলে বিবেচিত হবে। ভারতের দেশপ্রেমিকরা বীর আইরিশ যোদ্ধাদের কাছ থেকে যে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ্য নয়। বস্তুত বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত যে সব বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছে, তাদের মধ্যে সেই সব মহিলা ও পুরুষ যাঁরা আইরিশ রিপাবলিকের জন্য অপরিসীম সাহসের সঙ্গে আপোষহীন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের বন্ধুত্ব আমার কাছে সব প্রিয় এ কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

---

১. On to Delhi, pp. 117-118.

পৃথিবীর কোন দূরান্তে, এক কোনায় বসে যখন আমি আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা করছি তখন সমুদ্রপার থেকে আসা আইরিশ বিপ্লবী বন্ধুদের এই বার্তা আমার প্রাণে অনুপ্রেরণা ও আনন্দের শিহরন এনেছে। কাজের বহুবিধ চিন্তার মাঝে বসেও আমার মানসচক্ষে ভাসছে আয়ারের পান্না-সবুজ দ্বীপ এবং মনে আসছে সেই দেশের অনেক তীর্থে ভ্রমণের ও বন্ধুত্বের স্মৃতি, সেখানকার স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক বীরত্ব ও আত্মবিসর্জনের ঘটনা।

আমার আইরিশ রিপাবলিকের বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া বার্তার প্রত্যুত্তরে আমিও তাঁদের এই আনন্দ বার্তা পাঠাতে চাই— "আমাদের যুদ্ধ হল ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ। আমাদের দাবি হল আমাদের জন্মসূত্রে অর্জিত অধিকার ফিরে পাবার দাবি। আমরা তার জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত। সুতরাং আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের স্বাধীনতা আসবেই।"

৩০

আই এন এ-র পরিকল্পনা

[সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ৩ নভেম্বর ১৯৪৩][১]

ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী (ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি) ও আপৎকালীন সরকার (প্রোভিশনাল গভর্নমেন্ট) সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে, শ্রীযুক্ত বসু বলেন যে, আপৎকালীন সরকারের দক্ষ পরিচালনায় সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি সম্পূর্ণ এবং যে কোনও শত্রুকেই পরাস্ত করবার ক্ষমতা তাঁদের আছে। তিনি আরও বলেন যে মহিলারাও সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন কারণ তাঁদের দক্ষতা ও সাহস পুরুষদের থেকে কিছু কম নয়। এর পরে প্রশ্ন ও উত্তরগুলি নীচে দেওয়া হল:

প্রশ্ন: ভারতবর্ষের খাদ্য সমস্যা মেটাবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী ও আপৎকালীন সরকার কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে?

উত্তর: প্রথমে বর্মাদেশ ও পরে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী ভারতের ক্ষুধাপীড়িত জনগণের কাছে ১০০,০০০ টন চাল পাঠাতে চেয়েছিল এবং ব্রিটিশ সরকারকে সেই চাল গ্রহণ করবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি। কিন্তু সেনাবাহিনী যে কোনও উপায়ে খাদ্য সামগ্রী ভারতে পাঠাবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প, কাজেই আমরা কোনও একটা পথ খুঁজে বার করবই।

প্রশ্ন: চাল পাঠাবার বিষয়ে বর্মাদেশ কেন আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করেনি?

উত্তর: ব্রিটিশ সরকারই যখন সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি তখন রেড ক্রস কী করতে পারে?

প্রশ্ন: ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে দেশে ঢোকার পরে তাদের সাফল্য সম্পর্কে আপনার কতটা আস্থা আছে? ভারতে যদি একটা বিদ্রোহ দেখা দেয়, তা হলে তার মোকাবিলা করবার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর: ১২,০০০-এর বেশি ভারতীয় সেনা, যারা এখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে আছে, ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী ভারতবর্ষে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তারা আমাদের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছে। এই সেনানীরা তাদের ব্রিটিশ অফিসারদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পায় না এবং তারা প্রতিশোধের অপেক্ষায় আছে। এ ছাড়াও আমি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহলের ক্রিয়াকর্ম সম্বন্ধে নিয়মিত সংবাদ পাচ্ছি। ভারতবর্ষে কোথায় কী ঘটছে

---

১. Testament of Subhas Bose, pp. 152-153.

সেই বিষয়ে আমাদের এজেন্টরা আমাদের সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল রেখেছে। অনুরূপভাবে ভারতেও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা রয়েছেন যাঁরা বিদেশে কোথায় কী ঘটছে সেই বিষয়ে খোঁজখবর রাখছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে দেশের বাইরে ও ভিতরে ভারতীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে আমরা সক্ষম হয়েছি।

প্রশ্ন: আপৎকালীন সরকারের পক্ষে কি দক্ষতার সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা সম্ভব হবে? দীর্ঘদিনের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার মতো অস্ত্র ও রসদের ব্যবস্থা কি এই সেনাবাহিনীর আছে?

উত্তর: আমি মনে করি সেনাবাহিনী পরিচালনার জন্য সর্বোত্তম যোগ্যতা আপৎকালীন সরকারের আছে এবং তাদের সেনাবাহিনীও সুসজ্জিত। স্বাধীনতার যুদ্ধ জিততে হলে দুটি প্রতিষ্ঠানের অবশ্য প্রয়োজন: এক হল জাতীয় সেনাবাহিনী; এবং দ্বিতীয় হল জাতীয় সরকার। ভারতের আজ দুটিই আছে। অধিকন্তু তারা শক্তিশালী জাপান ও জার্মানির স্বীকৃতি ও সমর্থন পেয়েছে।

প্রশ্ন: শোনা যাচ্ছে যে আপৎকালীন সরকারের প্রধান কেন্দ্রটি সায়োনান থেকে বর্মাদেশে স্থানান্তরিত করা হবে। আপৎকালীন সরকারের সঙ্গে বর্মাদেশের সম্পর্কটি কেমন?

উত্তর: পরিস্থিতি অনুকূল হলে তবেই প্রধান কেন্দ্রটি স্থানান্তরিত করা হবে। বর্মার সরকারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুজনোচিত। আমরা যেন একই পিতামাতার দুটি সন্তান। বর্মা ও ফিলিপাইনের স্বাধীন সরকার এবং স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারকে জাপান স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের এই তিনটি দেশ যেন একই অভিভাবক জাপানের তত্ত্বাবধানে একটি সুখী পরিবারের সদস্য।

প্রশ্ন: ভারতবর্ষের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

উত্তর: ভারতবর্ষের খাদ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয়। চার্চিল ও রুজভেল্ট যে ভারতীয়দের আবেদন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন, তাতে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে ব্রিটিশ সরকার ও তার আমেরিকান সহযোগীরা ভারতীয়দের দুর্দশা দেখেও সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সন্তোষজনক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকী ভারতবর্ষে খাদ্য আমদানির জন্য উপযুক্ত জাহাজের ব্যবস্থা পর্যন্ত তারা করেনি।

প্রশ্ন: দেখা যাচ্ছে যে আপনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছেন, যথা, ভারতীয় সেনাবাহিনী গড়ে তোলা, ভারতের জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করা এবং জাপানের পূর্ণ সমর্থন জয় করা। আগামী দিনগুলির জন্য আপনার আর কোনও লক্ষ্য আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, আরও একটি— ও এইটি আমাদের শেষ লক্ষ্য এবং তা হল ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা, স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধে লড়াই করে ইঙ্গ-মার্কিন শত্রুপক্ষকে আমাদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত করা, ভারতের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে স্বদেশের কোটি কোটি পদদলিত মানুষের জীবনে চিরকালীন শান্তি ও অগ্রগতি আনা।

টোকিও রেডিয়ো (হিন্দিতে), ৩ নভেম্বর ১৯৪৩।

৩১

চুঙকিঙের কাছে আবেদন

[সাংহাই থেকে বেতার সম্প্রচার, ২১ নভেম্বর ১৯৪৩][১]

সাংহাইকে যখন একই পৌরসভা, এক সরকার ও এক পৌরপ্রধান বা মেয়রের অধীনে আনা হল আমি তখন টোকিওতে। এখন আর তিনটি সাংহাই নেই, কেবল একটিই সাংহাই। আমার মনে হয়েছে যে ভবিষ্যতে কী ঘটতে চলেছে, এটা যেন তারই ইঙ্গিতবাহী। অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র চিন দেশ যে এক সরকার ও এক নেতার শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ হবে সেই বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।

এখান থেকে আমি এখন দক্ষিণে আমার প্রধান কর্মকেন্দ্রে ফিরে যাব। তার পরে সেখান থেকে শীঘ্রই আমি বর্মাদেশ ও ভারতবর্ষের সীমানার দিকে যাত্রা করব। আমার কর্তব্য আমাকে বর্মার দিকে টানছে। আমি জানি আমরা যখন ভারতবর্ষের সীমানায় গিয়ে পৌঁছব, ভারতের স্বাধীনতা ফিরে পেতে হলে আমাদের ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়তে হবে এবং হয়তো চিনাদের সঙ্গেও আমাদের লড়তে হবে। কেন যে চিনারা ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে সেটা একেবারেই আমার বোধগম্য হচ্ছে না। যে সরকার গঠিত হয়েছে জনগণের সমর্থনে, যে সরকার নিজেদের দেশের জাতীয় সরকার বলে দাবি করছে, সেই সরকার কেন যে একটি প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে যাতে একটি বিদেশি শক্তি সেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষদের উপর তাদের অন্যায় শাসন বজায় রাখতে পারে, সেটাও আমার একেবারেই বোধগম্য হচ্ছে না।

চিনদেশ ও সেখানকার জনগণের প্রতি ভারতীয়দের যথার্থ সহানুভূতি আছে। আপনারা জানেন যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতীয় জনগণ চুঙকিঙ সরকারকে সাহায্য করেছে। ১৯৩৮ সালে আমি যখন জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, তখন চিন দেশের জনগণ ও চুঙকিঙ সরকারের প্রতি ভারতের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছার প্রতীক হিসাবে চুঙকিঙয়ে চিকিৎসকদের একটি দলকে পাঠাবার দায়িত্ব ছিল আমারই উপরে। তার পরেও তাদের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাবার জন্য আমরা ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সংক্রান্ত জিনিসপত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সাহায্য পাঠিয়েছি। আমার প্রশ্ন হল, মার্শাল চিয়াং কাই-শেক ও তাঁর সরকার কি আজ ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য সৈন্য পাঠিয়ে আমাদের সেই শুভেচ্ছার উত্তর দিতে চাইছেন?

চুঙকিঙ সরকার যে ভারতে সৈন্য পাঠাচ্ছে সেই জন্য আমি দুঃখিত। চিরকালই আমার চুঙকিঙয়ের জন্য গভীর সহানুভূতি ছিল, অথচ চিনা সৈন্যদল এখন ভারতে আসছে আমাদেরই বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য করবার জন্য। এই

১ *On to Delhi*, pp. 111-113.

প্রসঙ্গে আজ আমি আপনাদের বলি, পূর্ব এশিয়ার সামনে আজ একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে পরিস্থিতির কথা কেউ কয়েক বছর আগে স্বপ্নেও ভাবেনি। আজ পূর্ব এশিয়াতে নিপ্পন একেবারে অচিন্ত্যনীয় নতুন নীতি প্রয়োগ করতে চলেছে, যে নীতির প্রকাশ ঘটেছে বর্মাদেশ ও ফিলিপাইনের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারকে স্বীকৃতিদানের মাধ্যমে। নিপ্পনের সরকার চিন দেশের জাতীয় সরকারের সঙ্গে তাদের সাম্প্রতিক নতুন চুক্তি অনুসারে ঘোষণা করেছে যে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে তারা তাদের সৈন্যদলকে ফিরিয়ে নেবে।

আমি একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী। আমি মনে করি যে প্রতি ভারতীয়েরই উচিত তাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা এবং ঠিক একই কারণে প্রতি চিন দেশবাসীরও উচিত চিনের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা। বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধের শুরু থেকে নিপ্পন প্রকৃতপক্ষে যে পন্থা অনুসরণ করছে সেই বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত ধারণা থাকায় আমি আপনাদের বলতে পারি যে পূর্ব এশিয়ায় যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা চিন দেশ ও চিন দেশের জনসাধারণের সামনে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।

চিনের এক মাত্র সমস্যা হল একতার অভাব এবং এই সমস্যার সমাধান করতেই হবে। এ ছাড়া চিন যা চায় তা ইতিমধ্যেই করা সম্ভব হয়েছে জাপানের নতুন নীতি অবলম্বনের ফলে আমি পূর্ব এশিয়ার বহু দেশে গেছি, তার ফলে আমি এখন বর্তমান যুদ্ধের বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত নেবার অবস্থায় পৌঁছেছি। আমি জানি যে যুদ্ধ চলবে দীর্ঘকাল ধরে এবং সে যুদ্ধ সহজ হবে না কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ যে এই যুদ্ধে ব্রিটিশদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই যুদ্ধ আমাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য ন্যায়যুদ্ধ, কিন্তু শুধুমাত্র সেই কারণেই নয়, এই যুদ্ধে কৌশলগত দিক থেকেও জাপানিরা এগিয়ে আছে। যুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে পরাস্ত না করতে পারলে আপনারা কোনও দিনও চিন বা পূর্ব এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না।

চিন একদিন এক নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং সেই দিন বেশি দূরেও নয়। চিন ও নিপ্পনের মধ্যে সম্মানজনক শান্তি চুক্তির মাধ্যমে নিপ্পন চিন থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। শান্তি অর্জনের জন্য এই যুদ্ধের শেষ দেখার অপেক্ষা বারবার কোনও প্রয়োজন নেই; তার আগেই যুদ্ধ চলা কালীন, আপনারা শান্তি অর্জন করতে পারেন ও জাতীয় স্তরে আপনাদের পুনর্গঠন ও চিনের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন শুরু হতে পারে।

৩২

ভাগ্যের আশীর্বাদ

[৮ ডিসেম্বর ১৯৪৩ তারিখের বিবৃতি] [১]

দু'বছর আগে ঠিক এই দিনে পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। পূর্ব এশিয়ার মানচিত্রে, সেই দিন থেকে যে পরিবর্তনগুলি হয়েছে, পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির উপরে সেই পরিবর্তনের গুরুত্ব যে কী অপরিসীম, সেই বিষয়ে সকলেরই জানা আছে। কাজেই আমি আবার তার উল্লেখ করতে চাই না। আজ আমি অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনগুলি দেখবার চেষ্টা করব।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে পৃথিবীর ইতিহাসে বিশাল পরিবর্তনগুলি এসেছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, তখন তার জলের উচ্ছ্বাস স্থলভূমিকে ভাসিয়ে দিয়ে যতদূর সম্ভব ভিতরে ঢুকেছে এবং তার পরে ঢেউয়ের প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেলে ঢেউ আবার সঙ্কুচিত হয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেছে। অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাসে বড় পরিবর্তনগুলির চরিত্র হল প্রথমে প্রসারণ ও তার পরে সঙ্কোচন। সেই অনুসারে প্রথমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারণ হয়েছে, ব্রিটেনকে কেন্দ্র করে যার শুরু তা ক্রমে সুদূর প্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অগ্রগতি ও বিস্তারের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছিল। তার পরের দুই দশক ধরে এই শক্তিমত্ত সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে যেন তার প্রাণশক্তি হারাতে শুরু করেছিল। পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ শুরু হবার আগে এই সাম্রাজ্যের সীমারেখা প্রসারিত হয়ে সুদূর হঙকঙ পর্যন্ত পৌঁছেছিল, কিন্তু তার পর থেকে সেই সীমারেখা সঙ্কুচিত হতে শুরু হয়েছে। একের পর এক যুদ্ধক্ষেত্রে তারা পরাজয় স্বীকার করছে, হঙকঙ থেকে শুরু করে বর্মা পর্যন্ত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, "এই সঙ্কোচন কি রোধ করা সম্ভব, এই পিছু হঠা কি থামানো সম্ভব? ঘুণ ধরা অংশগুলি কেটে বাদ দিতে পারলে কি এই সাম্রাজ্যকে পতনের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব?" ইতিহাস কিন্তু নেতিবাচক উত্তর দিচ্ছে। একবার পতন শুরু হলে ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে অবধারিত ভাবে, যেন তাদের পথরেখা আপনা থেকেই চিহ্নিত হয়ে আছে এবং বিশ্বের কোনও শক্তিই সেই গতিপথ বদলাতে পারে না। এক সময় তুর্কিদের যে সাম্রাজ্য কন্সটান্টিনোপল থেকে ভিয়েনার সিংহদ্বার পর্যন্ত বিস্তারিত ছিল, তাকে সঙ্কুচিত হয়ে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে হয়েছিল। ঠিক সেই ভাবেই অবক্ষয়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকেও সঙ্কুচিত হয়ে তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে হবে। সেটাই তাদের অদৃষ্টে লেখা আছে।

ভারতবর্ষের জন্য পূর্ব এশিয়ার এই যুদ্ধও ভাগ্যের আশীর্বাদ থেকে কম কিছু নয়। ভারতে শাসনকালে ব্রিটিশ সর্বদাই আশঙ্কা করেছে দেশের উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে শত্রুর আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। কোনও দিন কোনও ইংরেজ জেনারেল বা কূটনীতিবিদের মনে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সম্পর্কে কোনও চিন্তা ছিল না। কোনও ইংরেজ কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে

[১] *On to Delhi*, pp. 114-116.

ভারতের পূর্ব সীমান্ত অকস্মাৎ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু সেই ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আজ ভারতের পূর্ব সীমান্ত উন্মুক্ত হয়ে গেছে। সেখান দিয়ে ভারতে প্রবেশ বা প্রস্থান কোনওটাই আজ দুরূহ নয়। এবং তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল, পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করলে সেখানে ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসীর বসবাস। পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ তাদের সামনে যে সুযোগ এনে দিয়েছে, এই ত্রিশ লক্ষ ভারতবাসী তা অতি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেছে। এর পরিবর্তে যদি ভারতের উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত আজ উন্মুক্ত হয়ে যেত, তাহলে সেখান থেকে কোনও প্রবাসী ভারতীয়ের পক্ষে তাদের স্বদেশবাসীর জন্য যুদ্ধের রসদ ভারতের অভ্যন্তরে আনা সম্ভব হত না। অধিকন্তু, ভারতের পক্ষে আরও সৌভাগ্যের বিষয় হল, যে শক্তি আজ ভারতের পূর্ব সীমান্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছে তারাও বিশ্বের এই অঞ্চল থেকে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে ও তাদের সব রকমের প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর।

অন্যেরা আমার সঙ্গে একমত হবেন কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ ভারতবর্ষে তাদের অন্তিম যুদ্ধ শুরু করেছে। কোনও সাম্রাজ্যই বিনা যুদ্ধে তাদের অধিকার হস্তান্তর করেনি। কাজেই এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে ব্রিটিশ ভারতের মাটিতে জেতবার জন্য আপ্রাণ লড়বে এবং তার জন্য তারা বিশ্বের যে কোনও স্থান থেকে যতদূর সম্ভব সাহায্য পাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু ইতিহাসের চাকা যে দিকে ঘুরতে চলেছে তার দিক বদল হবে না। এক সময়ে ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ছাড়তেই হবে। এবং ভারত স্বাধীন হবার পরে, নিতান্ত আহাম্মকও এ কথা বিশ্বাস করবে না যে পশ্চিম এশিয়ার অধিকৃত দেশগুলি তখন ঘুমিয়ে থাকবে। আরব, পারস্য ও অন্যান্য যে সব দেশগুলি আজ ব্রিটিশ শাসকের পায়ের তলায় রয়েছে তারা স্বভাবতঃই তখন সেই সুযোগ গ্রহণ করবে এবং তারা ব্রিটিশ নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে। বস্তুতঃপক্ষে আজ তারা অতি আগ্রহে সেই দিনের জন্য যখন ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকে পশ্চাদপসরণ করতে শুরু করবে। আমি যে আজ এই কথাগুলি বলছি, এ আমার 'যদি এমনটি হত' গোছের দিবাস্বপ্ন নয়। এই যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে পশ্চিম এশিয়ার অধিকৃত দেশগুলির নেতা ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমার মিলিত হবার সুযোগ ঘটেছে। আমি জানি তারা কতটা মনোযোগ দিয়ে বিশ্বের ঘটনাবলী অনুসরণ করছে ও কীভাবে তারা অপেক্ষা করে আছে যে কখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আরও কী ভাবে ভাঙন ধরবে। তারা অতন্দ্র প্রহরায় আছে এবং সুযোগ যখন আসবে তখন দুই হাতে সেই সুযোগ গ্রহণ করতে তারা ব্যর্থ হবে না।

১৯০৫ সালে জাপান পশ্চিমের আক্রমণকে প্রতিহত করতে সফল হয়েছিল। গত ৩৫ বছর ধরে তারা শক্তিসঞ্চয় করেছে এবং একদিন ক্ষমতাশালী যে শক্তির জোয়ার এশিয়াকে প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আজ তারা সেই একই শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আক্রমণের জোয়ারে আজ ভাটা পড়েছে, জলস্রোত এখন এশিয়া থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে। এত কিছু ঘটে যাবার পরেও যদি কেউ এখনও ভাবতে থাকে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে এর পরেও টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে তাহলে তাকে অর্বাচীন শিশু ছাড়া আর কীই বা বলা যায়? অতীতের সব সাম্রাজ্যের মতোই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও একদিন পতন হবে, অনিবার্য ভাবে।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস এশিয়ার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, যা বিশ্বের ইতিহাসেও এক নতুন অধ্যায় বলে চিহ্নিত হবে।

৩৩

ভারতীয় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা

[৯ ডিসেম্বর ১৯৪৩ তারিখে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের মন্ত্রীসভার বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবগুলি, এবং ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ সুমাত্রা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সফরকালে নেতাজির দেওয়া বক্তৃতাসমূহ][১]

১৯৪৩ সালের ৯ ডিসেম্বর, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর সরকারি বাসভবনে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার (প্রোভিশনাল গভর্নমেন্ট অফ্ আজ়াদ হিন্দ)-এর মন্ত্রীসভার এক বৈঠক বসে, উপদেষ্টারাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দু'টি ক্যাবিনেট সাব-কমিটির প্রস্তাবিত রিপোর্টের বিষয়ে আলোচনা হয় এবং কিছু রদবদলের পরে সেই প্রস্তাব দু'টি গৃহীত হয়। এর মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের জন্য পুরস্কার, সাম্মানিক পদক এবং পেনশনের বিষয়ে, ও অন্যটি ছিল জাতীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ হবার পরিকল্পনার বিষয়ে।

আগামী যুদ্ধে যদি কোনও আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনা আহত বা পঙ্গু হন, বা যদি তাঁর মৃত্যু হয় তাহলে মন্ত্রীসভা তাঁর পরিবার ও তাঁর উপরে নির্ভরশীল ব্যক্তিদের যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। মন্ত্রীসভা আরও সিদ্ধান্ত নেয় যে ব্রিটিশ সেনাদলে আগে কাজ করেছে এমন ভারতীয় অফিসার ও সেনা যারা এই যুদ্ধের সময় আজ়াদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেবে তাদের পেনশন ইত্যাদি নির্ধারণ করবার সময় আজ়াদ হিন্দ ফৌজে যোগ দেবার আগেকার কর্মজীবনের বছরগুলিও হিসাবের মধ্যে নেওয়া হবে।

জাতীয় ঐক্যের বিষয়ে ক্যাবিনেট সাব-কমিটির যে সুপারিশ মন্ত্রীসভা গ্রহণ করে, তাতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র ভারতীয় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

মন্ত্রীসভা আরও সিদ্ধান্ত নেয় যে হিন্দি হবে ভারতের প্রধান ভাষা। 'জয় হিন্দ' হবে ভারতীয়দের সাধারণ সম্ভাষণ। বর্তমানের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতকা হবে ভারতের জাতীয় পতাকা, 'শুভ সুখ চায়' যে গানটির মুখবন্ধ, সেই গানটি হবে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত, ভারতের জাতীয় প্রতীক হবে বাঘ; 'চল দিল্লি' হবে জাতীয় যুদ্ধের আহ্বানধ্বনি, যতদিন না যুদ্ধের শেষ হয় এবং 'আজ়াদ হিন্দ জিন্দাবাদ', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ও 'নেতাজি কি জয়' হবে জাতীয় স্লোগান, যতদিন না বিপ্লবের সার্থক সাফল্য অর্জন করা যায়।

খাদ্য, পোশাক ইত্যাদি বিষয়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার বিষয়গুলিও আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের বিচারাধীন ছিল এবং ঐক্যবদ্ধ করার পরিকল্পনাগুলি প্রথমে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে চালু করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আসেন দক্ষিণ সুমাত্রায়। আজ়াদ

---

[১] *Chalo Delhi*, pp. 194-197

হিন্দ ফৌজকে সৈন্য ও রসদ জোগানোর বিষয়ে স্থানীয় ভারতীয়দের অকুণ্ঠ সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানিয়ে নেতাজি এক উদ্দীপনাময় বক্তৃতা দেন পালেমবুঙ নামক স্থানে এক বিশাল জনসভায়, যেখানে সমগ্র দক্ষিণ সুমাত্রার ভারতীয়েরা সমবেত হয়েছিলেন।

নবগঠিত সরকারের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন ও আনুগত্য প্রকাশের জন্য নেতাজি তাঁর বক্তৃতায় ভারতীয়দের ধন্যবাদ জানান এবং মাতৃভূমি থেকে চিরদিনের মতো ব্রিটিশদের বিতাড়নের জন্য ভারতীয়দের সংগ্রাম যে আসন্ন সেই বিষয়টির উপরে তিনি বিশেষভাবে জোর দেন।

'বৃহত্তর এশিয়ার সর্বত্র আমার স্বদেশবাসীরা যে অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ করেছেন, এবং আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র নিপ্পন আমাদের যে ভাবে সাহায্য করেছে তাতে দিল্লি অভিমুখে আমাদের আগামী অভিযান সফল হতে বাধ্য এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হবে লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষের মুক্তি লাভ।' নেতাজি বলেন।

২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৩ তারিখে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এলেন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ও আসার পরেই তিনি পোর্ট ব্লেয়ারে নিপ্পনের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করে, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে ও আপৎকালীন সরকার গঠনে নিপ্পন সেনাবাহিনীর সাহায্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন। পরে নেতাজি নিপ্পনের সামরিক কর্মকেন্দ্রের প্রধান কার্যালয়ে গিয়ে দ্বীপপুঞ্জের শাসনকার্য পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ শুনলেন। এছাড়াও তিনি রস দ্বীপে গেলেন। সন্ধ্যাবেলায় নেতাজি নিপ্পনের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের আয়োজিত এক সান্ধ্য ভোজে যোগ দিলেন এবং তিনি রাত কাটালেন পূর্বতন ব্রিটিশ গভর্নরের সরকারি বাসভবনে।

একদিন সকালে নেতাজি পোর্ট ব্লেয়ারে এক বিশাল জনসভায় যোগ দিলেন। সেখানে প্রথমেই তিনি ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন, ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের আবহে। তাঁর ভাষণে তিনি ঘোষণা করলেন যে ব্রিটিশ সরকারের কবল থেকে আন্দামান ও নিকোবরকে মুক্ত করেছে এশিয়ার সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য দেশ নিপ্পন। "অদূর ভবিষ্যতে এই দ্বীপপুঞ্জ ভারতীয়দের অধীনে আসবে। ভারতের প্রতি নিপ্পনের আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের ঋণ শোধ করবার শুধুমাত্র দু'টি পথই আছে, আমাদের রক্তের বিনিময়ে দিল্লিতে প্রবেশের অধিকার জয় করে নেওয়া অথবা এই স্বাধীনতা সংগ্রামে আমৃত্যু লড়াই করে যাওয়া।" নেতাজি বললেন। "এই দুই পথের মধ্যে একটিকে আপনাদের বেছে নিতে হবে।" সমবেত জনগণের প্রতি এই সনির্বন্ধ অনুরোধ করে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করলেন।

নেতাজি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সভাপতি শ্রীযুক্ত রামাকৃষ্ণকে, সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ ও নবাব আলিকে তাঁদের বিশ্বস্ত সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানালেন। আপৎকালীন সরকারের মন্ত্রী কর্নেল (পরে তিনি মেজর জেনারেল হয়েছিলেন) লোগানাদানকে আন্দামান ও নিকোবরের প্রথম চিফ কমিশনার নিয়োগ করা হল। আন্দামান ও নিকোবরের নাম পরিবর্তন করে রাখা হল যথাক্রমে শহীদ ও স্বরাজ।

৩৪

দিল্লি অভিমুখে

[বিবৃতি, ডিসেম্বর ১৯৪৩][১]

স্মরণাতীত কাল থেকে যত সৈন্যবাহিনী ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে, শত্রু বা মিত্র, সকলেরই লক্ষ্য ছিল দিল্লি এবং স্মরণাতীত কাল থেকে যে কোনও ভারতীয় সৈন্যবাহিনী দেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে তাদেরও প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল দিল্লি। বস্তুতঃ, এ কথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে দিল্লির মাঠে ঘাটে প্রান্তরে প্রস্তরে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা আছে। ভারতের জনসাধারণের মুখে মুখে একটা কথা ফেরে, "যে দিল্লি শাসন করে, সমগ্র ভারতবর্ষকেও সে শাসন করে।" এমনকী এক সময়ে ভারতীয় কবিরা এমন কথাও বলেছেন "দিল্লির সম্রাট হলেন সারা বিশ্বের সম্রাট।"

রোম নগরীর ভৌগোলিক অবস্থান এমনই যে চারদিক থেকে পথগুলি এসে রোমে মিলিত হয়। কিন্তু দিল্লি অভিমুখে যারাই এসেছে তারা এসেছে পশ্চিম দিক থেকে। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে এবং ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশরা যখন আমাদের দেশবাসীকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে, তখন তারাও এই শিক্ষাকে ভাল মতো কাজে লাগিয়েছিল। প্রথমে তারা আফগানিস্তানকে অধিকার করতে চেষ্টা করেছিল যাতে ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্য সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও যখন আফগানিস্তানকে বশ্যতা স্বীকার করানো গেল না তখন ব্রিটিশ আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের সীমান্ত বরাবর সুরক্ষার প্রাচীর তুলতে চেষ্টা করে।

নিজেদের প্রচারযন্ত্রের ক্ষমতার উপরে ব্রিটিশ শক্তির সর্বদাই গভীর আস্থা ছিল। সাম্প্রতিক কালে তারা যেমন বহির্বিশ্বে সর্বত্র প্রচার করেছিল যে সিঙ্গাপুরের সুরক্ষা অভেদ্য, তেমনই এক সময় তারা প্রচার করত যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এত সুরক্ষিত যে সেদিক দিয়ে এ দেশে প্রবেশ অসম্ভব। কিন্তু ভারত-আফগান সীমান্ত যথেষ্ট সুরক্ষিত থাকলেও প্রকৃতপক্ষে বালুচিস্তানের পারস্য অঞ্চল দিয়ে ভারত সহজেই আক্রান্ত হতে পারত। কিন্তু পারস্য (বা ইরান)-এর সামরিক শক্তি না থাকায় সেই দিক দিয়ে আক্রমণের কোনও আশঙ্কা ব্রিটিশের ছিল না। তাদের প্রধান আশঙ্কা ছিল যে হয়তো কোনও দিন রাশিয়া আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে এসে ভারত আক্রমণ করবে। সুতরাং প্রতিরক্ষার সব ব্যবস্থা তারা গড়েছিল আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষের সীমান্ত বরাবর, যাতে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে কোনও বহিঃশত্রু তাদের আক্রমণ করতে না পারে।

যতদিন রাশিয়ার জারতন্ত্র বিশ্বের একটা অগ্রগণ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন ভারতের ব্রিটিশ শাসকরা সর্বদাই আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে রাশিয়ার ভারত আক্রমণের

---

[১] On to Delhi, PP. 119-122.

আশঙ্কায় ছিল। ব্রিটিশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল যখন জারতন্ত্রের পতন হল। অপরপক্ষে ১৯১৭ সালে মস্কোতে বলশেভিকরা শাসন ক্ষমতা হাতে পাওয়ার ফলে দেখা গেল তাদের সহানুভূতি এশিয়ার সব ক'টি পরাধীন দেশের প্রতি এবং ১৯১৯ সালে আফগানিস্তানে রাজা আমানুল্লা যখন ক্ষমতায় এলেন তখন তিনিও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন জানালেন। এর ফলে বহু ভারতীয় বিপ্লবীর মনে আশার সঞ্চার হল যে তারা হয়তো আফগানিস্তানের কাছ থেকে অথবা বলশেভিক রাশিয়ানদের কাছ থেকে সাহায্য পেতে পারে। ফলস্বরূপ, ১৯১৯ সালে এবং তার পরে, বহু ভারতীয় বিপ্লবী স্থলপথে কাবুলে আসেন ও তার পরে সেখান থেকে মস্কোতে এসে পৌঁছান সাহায্য ও সহযোগিতার আশায়।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষার প্রচার যে সর্বতোভাবে সত্য নয় সেটা রাজা আমানুল্লার জানা ছিল এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে মতবিরোধ হতে তিনি ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে দ্বিধা করলেন না। ১৯১৯ সালে আফগান সেনাবাহিনী যখন ভারতে প্রবেশ করতে সফল হল, আতঙ্কিত ব্রিটিশ শাসকেরা তখন আফগান রাজার সঙ্গে, তাঁর নিজের শর্তই মেনে নিয়ে, আপোষ করতে বাধ্য হল। কিন্তু দশ বছর পরে, ব্রিটিশ কৌশল ও ষড়যন্ত্রে আমানুল্লাকে সিংহাসন ও দেশ ছেড়ে চলে যেতে হল। ১৯২৯ সালে ব্রিটিশ আবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারল।

আরও দশ বছর পরে, অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে আবারও একবার পরিস্থিতির পট-পরিবর্তন ঘটল। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি এবং সেই একই বছরে সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেন ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আরও একবার ব্রিটিশদের মনের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার ভীতি প্রকটভাবে জেগে উঠল। তার ফলে তারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে আবার নতুন করে সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে শুরু করল যাতে ভারতের সীমান্তে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

১৯৪১ সালের জুন মাসে যখন জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল তখন সেটা ব্রিটিশদের জন্য একটা প্রবল স্বস্তির কারণ হল ও তাদের আতঙ্ক গেল। যদিও মাঝের কিছুদিন রাশিয়ার ককেশিয়া দিয়ে জার্মান সেনাবাহিনীর দুর্বার অগ্রগতি ও শেষে ইরানে এসে পৌঁছান তাদের চিন্তায় ফেলেছিল কিন্তু ব্রিটিশদের মনে হতে লাগল যে সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধ হয়তো পরিশেষে ভারতে তাদের সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে সাহায্য করল।

কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতি একেবারেই ওলটপালট হয়ে গেল যখন পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হল। হঠাৎ করেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গুরুত্ব, যা বহুদিন ধরে বহাল ছিল, সেটা কমে গেল এবং তার জায়গায় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের গুরুত্ব বেড়ে গেল রাতারাতি। ভারত-বর্মা সীমান্তের অরণ্য ও পর্বতসঙ্কুল অঞ্চল দেখা গেল সহজেই পার হয়ে আসা যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে ও উপর দিয়ে পথ তৈরি হতে লাগল এবং এই নতুন পথ ধরে বর্মাদেশের গভর্নর, তাঁর পারিষদবর্গ ও ভয়ার্ত সেনাবাহিনী বাংলায় এসে পৌঁছাল এবং তারপরে তারা দিল্লি অভিমুখে রওনা দিল।

বর্মাদেশের ব্রিটিশ গভর্নর এখন নিরাপদে দিল্লিতে বিরাজ করছেন, তাঁর সাথে বর্মা থেকে পালিয়ে আসা উদ্বাস্তুদের সাহায্যে তিনি সেখানে তাঁর দরবারে বসছেন। কিন্তু তাঁর পিছনে তিনি রেখে এসেছেন দীর্ঘ পথ, আমাদেরই ব্যবহারের জন্য, যে পথ ধরে পাঁচ লক্ষ নারীপুরুষ বর্মাদেশ থেকে ভারতে এসে পৌঁছেছে।

রেঙ্গুন ছেড়ে দিল্লি আসার পর এই পথগুলির আরও উন্নতিসাধন করা হয়েছে, অন্য নতুন পথও নির্মাণ করা হচ্ছে। অধিকন্তু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করবার জন্য শুধুমাত্র স্থলপথ নয়, জলপথ ও বায়ুপথও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেটা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সম্ভব ছিল না। তার ফলে উত্তর-পূর্ব এবং পূর্ব দিক থেকে দিল্লি অভিমুখে যাবার জন্য শুধুমাত্র একটা পথ নয়, বহু পথই রয়েছে। এই সব পথগুলিই একসময় আমাদের কাজে লাগবে।

ইউরোপে লোকমুখে একটা কথা শোনা যায়, "সব পথই শেষ হয় রোমে গিয়ে"। এখানেও পূর্ব-এশিয়াতে উপরে বর্ণিত সব পথগুলি গিয়ে শেষ হবে ভারতের রাজধানীতে শহরের বুকে যেখানে প্রাচীন লাল কেল্লা আছে সেইখানে। দিল্লির উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রা এবং আমরা বহু পথ ধরে সেখানে পৌঁছাব। এই পথে কোথাও কোনও দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা নেই যেমন আছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যদিও আমাদের যেতে হবে অরণ্য-পর্বত পেরিয়ে, জল ও হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু এই পথগুলি খুলে দিয়ে প্রকৃতি আমাদের প্রতি সদয় হয়েছে এবং প্রকৃতির বাধাগুলিও আমরা অতিক্রম করতে পারব অল্প আয়াসে।

কিন্তু এখান থেকে ভাইসরয়ের প্রাসাদ ও ভারতের রাজধানী দিল্লির লাল কেল্লায় পৌঁছতে হলে আমাদের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। আসুন কোনও কালক্ষেপ না করে আমরা কোমর বেঁধে আমাদের যাত্রা শুরু করি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। দিল্লি অভিমুখে আমাদের যাত্রা হল স্বাধীন ভারতের দিকে যাত্রা।

৩৫

আই এন এ (ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী) এখন প্রস্তুত

[১ জানুয়ারি ১৯৪৪, সিঙ্গাপুর থেকে বেতারবার্তা][১]

আজ সকল ভারতীয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপ দেবার জন্য প্রস্তুত এবং নতুন বছরের চূড়ান্ত সংগ্রামে আমরা যে নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করতে চলেছি সে বিষয়ে আমার আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বেড়ে চলেছে যতই আমি আমাদের অতীত সাফল্যের দৃষ্টান্তগুলি মনে করছি। পূর্ব এশিয়াতে জাপান আরও শক্তিবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এশিয়ার সদ্যস্বাধীন দুটি দেশ, বর্মা ও ফিলিপাইনস খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করতে পেরেছে এবং ছ'টি বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রের যে সম্মেলন কিছুদিন আগে টোকিওতে হয়ে গেল তারই ফলশ্রুতি আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমানে সেই দেশগুলির শক্তির সংহতিতে।

গত বছরে পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয় নাগরিক তাদের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি বিপ্লবী সত্তায় পরিণত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য তারা আজ সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। তাদের পিছনে আছে অমিতবিক্রম ভারতীয় সেনাবাহিনী, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। সেই সেনাবাহিনী ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বালাবে, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভস্মীভূত করে নিঃশেষ করে দেবে। আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ যাদের অধিকারে এবং জাপান ও জার্মানিসহ বিশ্বের আরও ন'টি রাষ্ট্র যাদের স্বীকৃতি দিয়েছে, সেই সরকার আমাদের সেনাবাহিনীকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আজ সেই শুভক্ষণ উপস্থিত যখন আমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারতের স্বাধীনতা জয় করে নেবার জন্য প্রস্তুত। ভারতে আমার স্বদেশবাসীরা বিবেকহীন ব্রিটিশদের অত্যাচারে ক্লান্ত, এই শাসকদের তারা চিনে নিতে পেরেছে এবং আমেরিকা, চিন ও আফ্রিকা থেকে আনা ভাড়াটে সৈন্যদের সাহায্যে চিরকালের মতো তাদের দাসত্বে বন্দি করে রাখাই যে ব্রিটিশদের পরিকল্পনা তাও তারা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছে। ওয়াভেলের বক্তৃতার পিছনে যে অসৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে, তা তাদের অজানা নয়। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর উপরে আমাদের স্বদেশরাসীর পরিপূর্ণ আস্থা আছে যে তারা অচিরেই সীমান্ত অতিক্রম করে এগোবে ও ভারতকে স্বাধীন করবে।

---

১. Testament of Subhas Bose, pp. 68-69.

৩৬

ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধে যোগ দিল

[১৯৪৪ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত আই এন এ-র উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণ এবং বিবৃতিগুলি][১]

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ সফরের পরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ৭ জানুয়ারি ১৯৪৪ তারিখে বর্মাদেশে ফিরে এলেন। স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারের প্রধান কেন্দ্র ও ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের প্রধান কেন্দ্র বর্মাদেশে স্থানান্তরিত করা হল, এখন থেকে মুক্তিযুদ্ধের ক্রিয়াকর্ম বর্মাদেশ থেকেই পরিচালনা করা হবে।

'ভারতে বসবাসকারী ভারতীয়েরা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেছেন এমন এক স্থানে, কলকাতা থেকে আকাশপথে যার দূরত্ব কয়েক ঘণ্টা মাত্র।' আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের প্রচার দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এস এ আয়ার সরকারি ভাবে ঘোষণা করলেন যে স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারের প্রধান কেন্দ্র বর্মাদেশে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। 'নেতাজি ভারতবর্ষ ও ব্রিটিশদের রাজধানী দিল্লির অভিমুখে যে অপ্রতিরোধ্য অভিযান চালিয়েছেন এটা তারই একটা নিশ্চিত পদক্ষেপ।' মন্ত্রী বললেন। 'নেতাজি এখন ভারতের পূর্বদিকের সীমান্তে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর শিরোভাগে দাঁড়িয়ে। এই মুক্তি সেনাবাহিনী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যে কখন তিনি যুদ্ধ শুরু করার জন্য প্রথম গুলি চালনার আদেশ দেবেন; সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে ভারতবর্ষের চতুর্দিকে এবং তা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী এক বিদ্রোহের সূচনা করবে; কেবলমাত্র কল্পনাশক্তিরহিত ব্রিটিশরাই বর্তমানে ভারতবর্ষে তাদের বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্বন্ধে অনবহিত থাকতে পারে।' শ্রীযুক্ত আয়ার জানান। তিনি আরও বলেন ছ'মাস আগে যখন থেকে নেতাজি পূর্ব এশিয়ায় এসে পৌঁছেছিলেন তখন থেকে তাঁর অনুগামী লক্ষ লক্ষ মানুষ তিনি কী করছেন সেই দিকে চোখ রেখেছে; টোকিও, সায়োনান, ব্যাঙ্কক ও রেঙ্গুন থেকে নেতাজির দেওয়া রেডিয়ো ভাষণগুলির প্রত্যেকটি তারা শুনেছে; স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার গঠনের কথা তারা জানে, যার প্রধান কর্মকেন্দ্র এখন বর্মা দেশে স্থানান্তরিত করা হল; তারা জানে যে নেতাজি এখন পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ সেনা শিবিরের কাছে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীকে এনে দাঁড় করিয়েছেন যেখানে তারা প্রথম আঘাত হানবার জন্য উদ্যত; কাজেই চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য সব প্রস্তুতি যে সম্পূর্ণ সেই বিষয়ে ভারতবর্ষে নেতাজির অনুগামীরা সম্পূর্ণরূপে অবহিত।

জানুয়ারি মাসের ১১ তারিখে, যেদিন ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী ও স্বাধীন ভারতের

---

১. Chalo Delhi, pp. 197-200, Subhas Chandra Bose, Blood Bath (Singapore: The Publicity and Propaganda Department, Indian Independence League Headquarters, 1944,...

আপৎকালীন সরকারের সঙ্গে বর্মাদেশে প্রবেশ করল, ঠিক তার আগের দিন বিকেলবেলা নেতাজি ঘণ্টাব্যাপী যে অগ্নিগর্ভ ভাষণ দিলেন তাতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য তাঁর অদম্য সাহস ও অটুট সঙ্কল্পের পরিচয় পাওয়া গেল। দিল্লি অভিমুখে সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হবে যে কোনও দিন। যাত্রার প্রাক্কালে নেতাজি তাদের মনে করিয়ে দিলেন যে পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয় এবং সেইসঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরে ৩৮ কোটি ভারতবাসীর শুভেচ্ছা তাদের সঙ্গে রয়েছে। আরও আছে শক্তিশালী অক্ষগোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলির দৃঢ় সমর্থন। ঐতিহাসিক বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সম্মেলনের পরে বিভিন্ন বন্ধু রাষ্ট্রগুলিতে সফর করবার সময় তাদের কাছ থেকে তিনি যে উষ্ণ ও আন্তরিক সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন বিশেষভাবে সেই কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন।

নেতাজি বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবে তাদের যতটা ক্ষমতা আছে তার সবটুকু দিয়ে লড়াইয়ে সামিল হবার জন্য, যাতে তারা সমগ্র ভারতীয় জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে এবং সেইসঙ্গে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন বন্ধু রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে পাওয়া সমর্থন ও সহযোগিতার ঋণশোধ করতে পারে।

পরদিন সকালবেলা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারের মহিলা বিভাগের প্রধান ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর সঙ্গে ভারতীয় মহিলাদের দলটিকে পরিদর্শন করলেন। তাদের কঠোর প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিতে নেতাজি বিশেষ অভিভূত হলেন, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির কবল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্তি দেবার চূড়ান্ত লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য তিনি এই মহিলা সেনাদের উৎসাহ দিলেন। ২৩ জানুয়ারি রেঙ্গুনে স্বাধীন বর্মা দেশের সরকারের তরফ থেকে আয়োজিত এক বিশাল সম্বর্ধনা সভায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের সদস্যেরা যোগ দিলেন। এই সভায় নেতাজি ছাড়াও ভাষণ দিলেন বিদেশমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ঘোষণা করলেন, 'বর্মাদেশের তরফ থেকে আপৎকালীন সরকারকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া ও আমাদের প্রতি এই উদার অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ দেবার উপযুক্ত ভাষা আমার জানা নেই। অধিকন্তু তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁদের অবিমিশ্র সহমর্মিতা জানিয়েছেন ও সাহায্য দিয়েছেন।' নেতাজি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে স্বাধীন ভারতবর্ষ কোনও দিন বর্মার পক্ষ থেকে এই সৌহার্দ্যের কথা ভুলে যাবে না।

৯ জানুয়ারি ১৯৪৪, নেতাজি রেঙ্গুন থেকে নিম্নলিখিত বেতারভাষণটি দিলেন:

এর আগে শেষবার আপনারা রেডিয়ো মারফত যখন আমার কণ্ঠস্বর শুনেছেন, তখন আমি সায়োনান থেকে কথা বলছিলাম। আজ আমি আপনাদের আরও অনেক কাছে, কারণ আমি রেঙ্গুন শহরের বেতার ভবন থেকে কথা বলছি। 'স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার'-এর প্রধান কেন্দ্র সায়োনান থেকে বর্মাদেশে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বর্মাতে এসে পৌঁছবার পরে প্রথমেই আমি যা অনুভব করছি, তা হল— বর্মা দেশের সরকারের উদ্দেশ্যে আমার তরফ থেকে অপরিসীম আন্তরিক কৃতজ্ঞতাবোধ আমাদের প্রতি তারা যে উদার আতিথেয়তা

প্রকাশ করেছেন তার জন্য, এবং নিপ্পন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে, কারণ তাদের কাছ থেকে আমরা যে সহায়তা পেয়েছি তা না পেলে সায়োনান থেকে বর্মাদেশে আমাদের আপৎকালীন সরকারের প্রধান কেন্দ্র স্থানান্তরিত করা প্রায় অসম্ভব হত। স্বাধীন বর্মি জাতির প্রধান মহানুভব ডক্টর বা ম-কে আমরা যে ভারতবর্ষের বাইরে এখন অন্যতম বিশেষ বন্ধু হিসাবে পেয়েছি, এই কথা জানাতে পেরে আজ আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি। মহানুভব বা ম এবং তাঁর সরকার ও জাতির কাছ থেকে আমরা যে উষ্ণ আতিথেয়তা ও আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি ও পাচ্ছি তা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমাদের আগামী সংগ্রামে এক অমূল্য সম্পদ বলে গণ্য হবে। এবং পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে জাপানের কাছ থেকে আমরা যে নিরন্তর সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি, তার উত্তরে আমি শুধু এই কথাই বলতে পারি, আমরা নিপ্পনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই লড়াই চালিয়ে যাব যতদিন না আমাদের উভয়েরই শত্রুকে পরাস্ত করতে পারি এবং ভারতবর্ষ থেকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে চিরতরে মুছে দিতে পারি।

বন্ধুরা! আমি এখন আপনাদের একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সংবাদ দিতে চলেছি। বর্মাতে আসবার পর আমি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিলাম। আপনাদের মনে থাকতে পারে যে ১৯৪৩ সালের ৬ নভেম্বর তারিখে টোকিওতে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সমাবেশে, শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী জেনারেল হিদেকি তোজো এক ঐতিহাসিক ঘোষণা করে জানিয়েছিলেন যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ 'আজ়াদ হিন্দ আপৎকালীন সরকার'-এর কাছে হস্তান্তর করা হবে। সেই ঘোষণার পর এই বিষয়ে আমি টোকিও ও শোনানে নিপ্পনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করি এবং এই আলাপ আলোচনার পর নিপ্পনের রাজকীয় নৌবাহিনী এই দ্বীপপুঞ্জে আমার যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। আমার সরকারের সদস্যেরা ও আমার ব্যক্তিগত সহকর্মীরাও আমার সঙ্গে ছিলেন এবং সেই সফর শেষে আমরা আবার ফিরে এসেছি। 'আজ়াদ হিন্দ আপৎকালীন সরকার'-এর কাছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাজগুলি সম্বন্ধে স্থানীয় নিপ্পন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করাই ছিল আমার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে যাবার উদ্দেশ্য। সেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এখন আপনাদের কাছে ঘোষণা করতে পারি যে আমি ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ জি লোগানাদানকে আমি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চিফ কমিশনার হিসাবে নিয়োগ করেছি। তাঁর যাবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে পারলেই, তিনি যত শীঘ্র সম্ভব সেখানকার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। আমাদের সফরের সময় আমার ও আমার দলের অন্য সদস্যদের জীবনে একটা অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা হল, যখন আমরা স্বাধীন ভারতের মাটিতে পা রাখলাম, এই প্রথম। যখন রস দ্বীপে পূর্বতন ব্রিটিশ চিফ কমিশনারের বাড়িতে আমাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উড়তে দেখলাম, সে এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য। সফরকালে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল পূর্বতন ব্রিটিশ চিফ কমিশনারের বাড়িতেই এবং আমাদের বারে বারেই মনে হয়েছে যে বিজয়রথের চাকা যেন ধীরে ধীরে ভারতের দিকেই ঘুরতে শুরু করেছে। চিফ কমিশনারের বাড়িতে আমাদের জাতীয় পতাকা ওড়ার দৃশ্য আমাদের সকলকে সেইদিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল যখন সেই একই পতাকা নতুন দিল্লিতে ভাইসরয়ের বাড়িতে উত্তোলিত হবে।

আমার স্বদেশবাসীরা, আপনাদের মনে আছে গত বছরের আগস্ট মাস থেকে আমি

আমার আশা ও বিশ্বাসকে ভাষায় প্রকাশ করতে শুরু করেছিলাম যে ১৯৪৩ সাল শেষ হবার আগে আমরা স্বাধীন ভারতের মাটিতে পা রাখতে পারব। সেই স্বপ্ন যে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৩ তারিখের আগেই প্রকৃতই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারল, সেটা আমাদের সকলকে বড়ই আনন্দ দিয়েছে। আন্দামানে থাকাকালীন আমরা পোর্ট ব্লেয়ারের কুখ্যাত সেলুলার জেলে গিয়েছিলাম আমাদেরই দেশভক্ত ভারতবাসীদের নীরব শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। এই স্বদেশবাসীরা, অতীতে যাদের সেই একই জায়গায় অবর্ণনীয় অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রিটিশ শাসকদের পাশবিক নির্মমতার শিকার হয়ে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। জেলের প্রাক্তন সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাদের জানান যে জাপান অধিকার করে নেবার ঠিক আগে প্রায় ২০০ জন রাজনৈতিক বন্দি, যাদের কোর্ট মার্শালের আদেশ হয়েছিল তাদের ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় কিছু ব্রিটিশ অফিসারের সঙ্গে। এই দ্বীপপুঞ্জগুলিতে সফরের সময় এই প্রথম আমার সুযোগ হয় নিজের চোখে সেখানকার পরিস্থিতি দেখবার এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মেলবার। ব্রিটিশদের বিতাড়নের পর সেখানকার জনগণ অত্যন্ত উল্লসিত ছিল এবং তারা যখন গত নভেম্বরে এই দ্বীপগুলি সম্পর্কে নিপ্পন সরকারের ঘোষণা শুনল তখন তাদের আনন্দ আর বাঁধ মানল না। সেখানকার জনগণের মধ্যে সাধারণভাবে একটা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখা যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তারা স্বাধীন ভারতবর্ষের সৎ ও দেশভক্ত নাগরিকে পরিণত হবার সঙ্কল্প নিয়েছে।

সেখানে যে জনসভায় আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম তাতে আমি উপস্থিত জনগণকে বলি যে অতীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে তাদের অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল, বর্তমানে তাদের এই স্বাধীনতা ও পরিতৃপ্তি দিতে পেরে ভাগ্যও আজ সুপ্রসন্ন বোধ করছে। বস্তুত নিরানন্দ অতীতকে ভুলে গিয়ে তাদের এখন এক উজ্জ্বল ও আনন্দময় ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য পরিশ্রম করতে হবে যাতে তারা স্বাধীন ভারতের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। এই দ্বীপগুলি ও সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের কথা আমি চিন্তা করে দেখেছি এবং আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে একদিন স্বাধীন ভারতের অঙ্গরূপে সংস্কৃতিবান ও প্রগতিশীল মহিলা ও পুরুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। আমি নিশ্চিত যে ভবিষ্যতে যদি ব্রিটিশ এই দ্বীপপুঞ্জ পুনর্বার অধিকার করবার চেষ্টা করে তা হলে এখানকার অধিবাসীদের কাছ থেকে তাদের এক প্রচণ্ড ও অনমনীয় প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে কারণ এরা একবার যখন স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে তখন তারা আর কখনও দাসত্বের বন্ধন স্বীকার করতে চাইবে না।

'আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের' নিজস্ব সেনাবাহিনী থাকলেও তাদের কোনও নৌবাহিনী নেই। কাজেই এই দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার আমাদের হাতে এলেও, ভবিষ্যতে আমাদের নিপ্পনের নৌসেনার কাছ থেকে সাহায্য ও সুরক্ষার প্রয়োজন হবে। আমরা যে অব্যাহতভাবে নিপ্পনের নৌবাহিনীর কাছ থেকে এই সাহায্য পেতে থাকব সেই কারণে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং কৃতজ্ঞ।

বন্ধুরা, এবার যখন আমি আপনাদের এতটাই কাছে এসেছি, আপনারা আমার কণ্ঠস্বর আরও বার বার শুনতে পাবেন, এবং হয়তো অতীতের থেকে আরও স্পষ্টভাবে। আজ শেষ করার আগে, আমি বর্মাদেশ থেকে আপনাদের অভিনন্দন পাঠাতে চাই। বর্মাদেশে আজকের দিনটি বড়ই সুন্দর। যদিও বহুদিন ধরেই শত্রুপক্ষের অপপ্রচার চলছে এবং আকাশে মাঝে মাঝে শত্রুপক্ষের বিমানেরও আসাযাওয়া অব্যাহত আছে, তবু চারিদিকের আবহাওয়াতে যেন এক

পরম আশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সদ্যস্বাধীন বর্মি জাতি তাদের বহু কষ্টে উপার্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিয়ে লড়বার জন্য বদ্ধপরিকর। বর্মি ও ভারতীয়দের মধ্যে আজ সহযোদ্ধার একটা গভীর বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে— বলতে পারেন রক্তের শপথ। আমরা আমাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্কল্পে অবিচল আছি, বর্মিরা তাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য আর আমরা ভারতীয়েরা ভারতের মাটি থেকে আমাদের শত্রুকে বিতাড়িত করার জন্য। আজ বর্মাকে ভারতের প্রয়োজন এবং ভারতকেও বর্মার প্রয়োজন। আমাদের সম্মিলিত শক্তি আমাদের রক্ষা করবে আর অপরাজেয় নিপ্পনের সাহায্য আমাদের সম্মিলিত শক্তিকে জয়যুক্ত করবে।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজ়াদ বর্মা জিন্দাবাদ!
আজ়াদ হিন্দ জিন্দাবাদ।

২৬ জানুয়ারি ১৯৪৪ ভারতের স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নেতাজি স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে এই বার্তা পাঠালেন:

১৯৩৯ সালে বর্তমান যুদ্ধ শুরু হবার পর, আমরা আগামী ২৬ জানুয়ারিতে আমাদের পঞ্চম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে চলেছি। আমরা এই পাঁচ বছরে কী করেছি ও কী ফলাফল পেয়েছি আজ তার হিসাব নেবার সময় এসেছে।

প্রথমত, আমি বলব যে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের পরিকল্পনা মতোই এগোচ্ছে। প্রথম বারো মাস আমাদের কেটেছে স্বদেশে ভারতীয়দের উদ্দীপিত করে তুলতে যাতে তারা ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ও ব্রিটেনের যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে— যাতে এই বিষয়ে ভারতীয়দের মনোভাব কী সেটা বিশ্বের কারওর অজানা না থাকে। যখন এই উদ্দেশ্য সফল হল এবং ভারতের আত্মসম্মান ও মর্যাদা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল— তখন যে পদক্ষেপগুলি নিলে স্বাধীনতা আমাদের করায়ত্ত হবে সেই পদক্ষেপগুলি নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। অস্ত্রহীন ভারতীয়দের পক্ষে যদি ভারতের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলন বা গোপন বিপ্লবী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হত তা হলে আমাদের সমস্যা সহজেই সমাধান হতে পারত। কিন্তু আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের যা জানা ছিল— তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার ও আমার সহযোগীদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে ভারতের স্বাধীনতা কেবলমাত্র তখনই আসবে যদি নতুন বিশ্বের সংগ্রামী শক্তির সঙ্গে আমরা আমাদের নিজেদের সংগ্রামের মেল বন্ধন ঘটাতে পারি।

ভারতের সংগ্রামকে বৃহত্তর বিশ্বের সংগ্রামের অঙ্গীভূত করবার জন্য আবশ্যক ছিল বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা ও ভারতের জন্য কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুসন্ধান করা। সুতরাং আমাদের স্বদেশবাসীদের বৃহদংশের ইচ্ছানুসারে আমি তিন বছর আগে ঘর ছেড়ে, দেশ ছেড়ে চলে আসি। আমার উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ— প্রথমত, বিশ্বের পরিস্থিতির পর্যালোচনা ও এই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফলের পূর্বাভাস সম্বন্ধে ধারণা করা; দ্বিতীয়ত, ভারতের প্রতি অক্ষশক্তির নীতি ও মনোভাব কী তার বিশ্লেষণ করা, এবং তৃতীয়ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়তার জন্য বহির্বিশ্ব থেকে সাহায্য পাবার সম্ভাবনা আছে কিনা তা বিচার করে দেখা।

এই তিনটি উদ্দেশ্যই ধীরে ধীরে পূর্ণ হয়েছে। প্রথমত খুব সতর্কভাবে বিচার করার পরে আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে এই যুদ্ধের কালসীমা যত দীর্ঘই হোক না কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে চূড়ান্ত পর্যায়ে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ ঘটবেই। দ্বিতীয়ত, গভীর সন্তোষের সঙ্গে আমার এই উপলব্ধিও হয়েছে যে অক্ষশক্তি ও তাদের মিত্রগোষ্ঠীর সঙ্গে ভারতের একটা স্বাভাবিক বন্ধুত্বের বন্ধন রয়েছে, এবং ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রতি তাদের সমর্থনও রয়েছে। তৃতীয়ত, নিরস্ত্র ভারতবাসীদের পক্ষে ব্রিটিশ শাসকদের বিতাড়িত করবার জন্য ভারতবর্ষের বাহির থেকে যথেষ্ট সাহায্য ভারতের অভ্যন্তরে আনা সম্ভব। অধিকন্তু আমার বিদেশ ভ্রমণের ফলে, আমি ভারতবর্ষকে একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে তুলে ধরতে পেরেছি।

ভারতবর্ষের জন্য বহির্বিশ্ব থেকে সাহায্য জোগাড় করার জন্য— একদিকে যেমন স্বাধীনতাকামী প্রবাসী ভারতীয়েরা যাঁরা বন্ধুভাবাপন্ন বা নিরপেক্ষ দেশগুলির বাসিন্দা, তাঁদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল, তেমনই বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল। এখন সমগ্র বিশ্ব অবহিত যে এই দুই প্রচেষ্টাই কালক্রমে সফল হয়েছে, বিশেষ করে ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়দের রাজনৈতিক ও সমরনৈতিক উদ্দেশ্যে একত্র করতে পারা গেছে।

এই সূত্রে যে বিশেষ সমস্যাটি দেখা দিয়েছিল সেটা হল বহির্বিশ্ব থেকে পাওয়া এই সাহায্য কীভাবে ভারতবর্ষের ভিতরে আনা সম্ভব হবে। সেই সমস্যারও সমাধান হল যখন ১৯৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হল এবং জাপানি সৈন্যবাহিনীর অমিত বিক্রম পূর্ব এশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ায় একই সঙ্গে পূর্ব দিক থেকে দিল্লি পর্যন্ত ভারতে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল।

পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয়েরা যেন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন। তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুললেন— আজ়াদ হিন্দ সঙ্ঘ বা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ এবং তাঁরা এ ছাড়াও গড়ে তুললেন আজ়াদ হিন্দ ফৌজ বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী)। যখন তাঁদের প্রস্তুতি বেশ কিছুটা এগোল এবং আজ়াদ হিন্দ ফৌজের দলগুলি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগোতে লাগল তখন সায়োনানে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার বা প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট অফ ফ্রি ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হল। এই আপৎকালীন সরকার সাধারণভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বভার নিজেদের হাতে নিল ও বিশেষ ভাবে ভারতের মুক্তিবাহিনীকেও তারা নেতৃত্ব দিতে থাকল। আপৎকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দিল জাপান, জার্মানি ও আরও সাতটি বন্ধু রাষ্ট্র।

আপৎকালীন সরকার একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল ২৩ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখে যখন তারা ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করল, এই ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশ্বের নতুন শক্তিগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হল।

এর পরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হল জাপানের হাত থেকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জগুলির শাসনভার অধিগ্রহণ। এর জন্য আমরা জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি ১৯৪৩ সালের ৬ নভেম্বর টোকিওতে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সমাবেশে এই ঘোষণাটি করেছিলেন। এখন সমগ্র পৃথিবী অবহিত যে আমি যখন ২৯ ডিসেম্বর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সফরে গেলাম তখন এই দ্বীপপুঞ্জের প্রাক্তন ব্রিটিশ কমিশনারের

বাসগৃহে আমাদের জাতীয় ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উড়ছে। এইভাবে ১৯৪৩ সাল শেষ হবার আগেই আমরা স্বাধীন ভারতের অন্তর্গত প্রথম ভূখণ্ডটিতে পা রাখতে পারলাম।

আমরা শেষ যে পদক্ষেপটি নিয়েছি তা হল আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের প্রধান কর্মকেন্দ্রটিকে ও ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের প্রধান দপ্তরটিকেও সায়োনান থেকে বর্মাদেশে স্থানান্তরিত করে আনতে পেরেছি। গত চার বছরের ঘটনাবলীর ইতিবৃত্ত থেকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যাবে যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, অনেক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও, আমাদের পরিকল্পনা অনুসারে এগোচ্ছে। হয়তো আমাদের ঘটনাক্রম সামান্য পিছিয়ে গেছে কিন্তু আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। এর পরের পদক্ষেপটির জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি— এবং সেইজন্য আমাদের ব্যস্ত প্রস্তুতি চলছে— সেটা হল ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা এবং তার পরে শুরু হবে দিল্লি অভিমুখে আমাদের ঐতিহাসিক যাত্রা।

আমরা জানি যে আমরা যখন আমাদের সৈন্যবাহিনীর বৃহত্তর অংশকে নিয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছব, তখন ভারতীয় জনগণ এবং ব্রিটেনের ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ সেনাই আমাদের সঙ্গে এসে হাত মেলাবেন আমাদের একই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য। কিন্তু আমি সকলকেই সতর্ক করে দিতে চাই যে এখন থেকে আমাদের দীর্ঘ ও নির্মম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। ভারতের এই যুদ্ধ মালয়ের যুদ্ধের মতো বিদ্যুৎ গতিতে এগোবে না। আমাদের শত্রুরা পূর্ব এশিয়াতে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হওয়ার পরে শিক্ষাগ্রহণের সময় পেয়েছে এবং তারা বিশ্বের সুদূরতম দেশ থেকে সৈন্য আনিয়ে ভারতের সেনাবাহিনীকে পুষ্ট করবারও সময় পেয়েছে। ভারতবর্ষের মাটিতেই ব্রিটেন তাদের শেষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে, সেই কারণেই পরাজয় স্বীকার করার আগে তারা জীবনপণ করে লড়াই করবে। আমরা জানি ও ব্রিটেনেরও জানা আছে যে ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নের অর্থই হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি এবং বর্তমান যুদ্ধের সমাপ্তি। সুতরাং দীর্ঘ ও নির্মম যুদ্ধের জন্য আমাদের প্রস্তুতি নেওয়া হলে তবেই আমরা এই শেষ যুদ্ধ শুরু করব। এবং একবার যুদ্ধ শুরু হলে আমাদের সে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না জয় আমাদের করায়ত্ত হচ্ছে ও আমাদের রাজধানীর লালকেল্লা ও ভাইসরয়ের প্রাসাদে আমাদের জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছে।

বন্ধুরা! শেষ করবার আগে আমি আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই যে বাইরে ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতারা যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন, গোপনে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ভারতীয় জনসাধারণকে প্রতারণা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাদের এমন একটা সমঝোতায় আনবার চেষ্টা করছে যেটা ভারতের জন্য ন্যায্য নয় এবং ভবিষ্যতেও তারা সেটা করতে থাকবে। এবং সেই কারণেই শত্রুপক্ষের প্রচারযন্ত্র আপ্রাণ চেষ্টায় ভারতীয়দের কাছে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করতে চাইছে যে তাদের, অর্থাৎ আমাদের শত্রুপক্ষের জয় অনিবার্য। যুদ্ধান্তে পুনর্গঠনের পরকল্পনার কথাও তাদের প্রচারযন্ত্র অহরহ বলে চলেছে— তাদের জয় সম্বন্ধে তারা এতটাই নিশ্চিত। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে কী ঘটে চলেছে সেই বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত থাকায় আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে চূড়ান্ত যুদ্ধে শত্রুপক্ষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তার ফলে যে সাম্রাজ্য পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে তাদের সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতায় আসা একেবারেই মূর্খের মতো কাজ হবে— বলা যায় সেটা পুরোপুরি পাগলামির পর্যায়ে পড়বে।

সুতরাং আমার স্বদেশবাসীরা, দেশে ও প্রবাসে যে যেখানে আছেন, দেশকে স্বাধীন

করবার জন্য আপনাদের পক্ষে যা করা সম্ভব সকলে তাই করুন— শেষ জয় আমাদেরই যে হবে সেই বিশ্বাস অটুট রেখে। আমরাও এখানে আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করছি। ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্ত ক্রমেই এগিয়ে আসছে, যখন আমরা সকলে একসঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে এগোব, এক সঙ্গে লড়ব ও এক সঙ্গেই জয় করায়ত্ত করব।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

আজ়াদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী আরাকান অঞ্চলে ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ শুরু করল।

৯ ফেব্রুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত বিশেষ বিবৃতি দিলেন:

"সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি এখন আরাকান যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে নিবদ্ধ, সেখানে আজ যে ঘটনাগুলি ঘটছে তার প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হবে। এই অঞ্চলে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের অসমসাহসী ও শৌর্যদীপ্ত সেনাবাহিনী নিপ্পনের রাজকীয় সেনাদলের পাশাপাশি লড়াই চালিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনীর পালটা আক্রমণের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে।"

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস আরাকান যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের কমরেডদের পরাক্রম আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সব অফিসার ও সেনাদের বিপুল অনুপ্রেরণা দেবে, এই মুহূর্তে তারা যেখানেই থাকুক না কেন। আমাদের বহু প্রতীক্ষিত দিল্লি অভিযান শুরু হয়েছে, এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আমরা সেই অভিযান অব্যাহত রাখব যতদিন না আমাদের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা, যা আজ আরাকান পর্বতে শোভা পাচ্ছে, সেই পতাকা ভাইসরয়ের প্রাসাদে উত্তোলিত হবে এবং সুপ্রাচীন লালকেল্লার সম্মুখে আমাদের বিজয় অভিযান শেষ হবে।

কমরেডগণ! ভারতের মুক্তি বাহিনীর অফিসার ও সেনারা, মনের মধ্যে যেন একটিই গভীর সঙ্কল্প নিয়ে আপনারা অগ্রসর হতে পারেন— হয় মুক্তি নয় মৃত্যু। এবং আপনাদের মুখে যেন একটি মন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকে— চলো দিল্লি, দিল্লির অভিমুখে পথ হল স্বাধীনতার অভিমুখে যাত্রাপথ। এই পথ ধরেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। একদিন আমরা নিশ্চিতভাবে জয়কে করায়ত্ত করব।"

নিপ্পনের বিদেশমন্ত্রী মামোরু শিগেমিতসুর কাছ থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিম্নলিখিত অভিনন্দনবার্তা পেলেন: 'মহানুভব, নিপ্পন সেনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে আপনার অসমসাহসী সেনাদল যে চমকপ্রদ কৃতিত্ব দেখিয়েছে তার জন্য আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। বর্তমানের সমরাভিযানের নতুন সাফল্য আমাকে বড়ই আনন্দ দিয়েছে ও আমার বিশ্বাস তা সব ভারতীয় জনগণের মনেই নতুন উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস জাগাবে, যারা আপনার অনন্যসাধারণ নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং এশিয়া নবজাগরণের অগ্রদূত রূপে আপনার মুক্তি সংগ্রামে যারা যোগ দিয়েছে।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ, মামোরু শিগেমিতসু, নিপ্পনের বিদেশমন্ত্রী।'

ফেব্রুয়ারি মাসের ২১ তারিখে, আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়কের প্রধানকেন্দ্র থেকে তাদের প্রথম বিবৃতি এল:

'আরাকান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাওয়া সর্বশেষ সংবাদে আমাদের সেনাদলের আরও

সাফল্যের কথা জানা গেছে। আকিয়াব এলাকায় যুদ্ধে নিযুক্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী, নিপ্পনের প্রধান সেনাদলের সঙ্গে একযোগে শত্রুব্যূহ ভেদ করে অগ্রসর হচ্ছে।

এ ছাড়াও, ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রগামী দল এখন নিপ্পন সেনাবাহিনীর সঙ্গে নিয়ানগাঙয়ের কাছে শত্রুপক্ষের পশ্চাদপসরণকে ব্যর্থ করবার কাজে ব্যাপৃত আছে, তারা সেই এলাকার সেতুগুলিকে ধ্বংস করেছে ও বাউলি বাজার এলাকায় অগ্রসর হয়েছে, যেখানে এখন যুদ্ধ চলছে।

যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর আরেকটি দল মায়ু নদীর বরাবর অগ্রসর হচ্ছিল, এখন সেই দলটি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একটি ভারতীয় ইউনিটকে আমাদের দলভুক্ত করতে সফল হয়েছে। বর্তমান সময়ে সেই দলের অফিসার ও সেনাদের সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না।

ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর সেই একই দল থাউঙ বাজার এলাকায় ঢুকে শত্রুপক্ষকে পিছন দিক থেকে আক্রমণ করেছে এবং তারা ক্রমশই সফলভাবে অগ্রসর হতে পারছে। আকিয়াব অঞ্চলে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান দলটি পরিকল্পনা অনুসারে আরও আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।'

ইঙ্গ-মার্কিন শত্রুর বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম সাফল্য উপলক্ষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এক বিশাল জনসভায় [হিন্দিতে] ভাষণ দিলেন:

'ভাই ও ভগিনীরা,

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আমাদের চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু হয়েছে এবং আমাদের প্রথম আক্রমণে যে ভাবে আমরা সাফল্য পেয়েছি সেই আনন্দ প্রকাশের জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। এমন কোনও ভারতীয় নিশ্চয় নেই যে এই খবরে উল্লসিত বোধ করেনি, যে খবর এসেছে আরাকান সীমান্ত থেকে, যে খবরে জানা গেছে যে বহু প্রতীক্ষিত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে, যে খবর আমাদের বলছে যে আইএনএ-র সেনারা নিপ্পনের সাহসী সেনাবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে, এবং তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে না পেরে শত্রুপক্ষ পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। আজকের এই যুদ্ধের শুরুতেই আমরা যে সাফল্য লাভ করেছি তা বড় গর্বের বিষয় এবং বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও বটে।

যখন বিশ্বে এই খবর প্রথম ছড়িয়ে পড়ল যে পূর্ব এশিয়াতে দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের নিয়ে সেনাবাহিনী গঠিত হচ্ছে তখন বহু লোকেই এই সেনাবাহিনীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনি। তারপরে এল সেই পর্যায় যখন ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র দেখল যে আইএনএ গঠনের কথা আর গোপন রাখা যাচ্ছে না, তখন তারা বলতে লাগল যে জাপানিদের চাপে পড়ে আইএনএ গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু যখন ৫ ডিসেম্বর, আইএনএ রেডিয়ো স্টেশন গঠিত হল এবং আইএনএ-র অফিসারেরা ভারতের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন তাঁদের নিজের নামে পরিচয় দিয়ে, তখন ব্রিটিশ বুঝল যে তাদের অপপ্রচারের সুর বদল করতে হবে। এর উপরে যখন আরও খবর আসতে লাগল যে স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার ও আইএনএ-র সর্বাধিনায়কের প্রধান কর্মকেন্দ্রের স্থানান্তরকরণ শুরু হয়েছে এবং প্রথম পর্যায়ে এই কর্মকেন্দ্রগুলি বর্মা দেশে এসেছে, তখন ব্রিটিশদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভীতির সঞ্চার হতে লাগল।

এই আতঙ্ক ও ভীতি এখন দশগুণ বৃদ্ধি হয়েছে কারণ আরাকানের যুদ্ধক্ষেত্রে আইএনএ প্রকৃতই তাদের সমরাভিযান শুরু করেছে। আমাদের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এই প্রথম আক্রমণ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কারণ বহুদিন ধরে দাসত্বের গ্লানি সহ্য করবার পর আমরা এই প্রথম লড়াই শুরু করেছি এবং একই সঙ্গে এ হল স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য আমাদের শেষ ও চূড়ান্ত লড়াই। এবার আমরা আমাদের যুদ্ধ শুরু করেছি আমাদের পুরনো সত্যাগ্রহ ও আইনঅমান্য আন্দোলনের অস্ত্র দিয়ে নয়, আমাদের এবারকার লড়াই অস্ত্র নিয়ে ও সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে। প্রথম আঘাত আমাদের সাফল্য এনে দিয়েছে, এবং আমরা সুনিশ্চিত যে আরও সাফল্য আসতে থাকবে একের পরে এক। শেষ যুদ্ধ শুরু করার পর ও প্রথম সাফল্য অর্জন করার পর, আসুন আমরা স্বল্পক্ষণের জন্য অতীতের পর্যালোচনা করে নিই, আমরা এ পর্যন্ত কী করতে পেরেছি, এবং তারপরে আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দেখব আরও আমাদের কী করতে হবে।

আরাকান যুদ্ধক্ষেত্রে আজ যা ঘটেছে তাকে এক দুর্ঘটনা বা হঠাৎ অর্জন করা কৃতিত্ব বলে ভাবলে ভুল হবে, কারণ আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছি একটা সুসংবদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে। আমাদের সাফল্য আসছে একের পরে এক, এবং গত বহু বছর ধরে আমরা আমাদের লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছি ধীরগতিতে কিন্তু নিশ্চিতভাবে। ভারতবর্ষে আমাদের শক্তিকে সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে আমাদের কাজের শুরু। বিশেষ করে শেষ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর, ভারতে এক চেতনা জাগে ও ভারতবাসীরা স্বাধীনতা পাবার জন্য তাদের শক্তিকে সংহত করতে শুরু করে। তাদের কোনও সেনাবাহিনী ছিল না, কাজেই সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যে তাদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী পর্যায় এল যখন ভারতের বাইরে অন্যান্য স্বাধীন দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের যুদ্ধের জন্য সমবেত করার চেষ্টা শুরু হল। প্রবাসী ভারতীয়রাও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিষয়ে ক্রমশই আরও আগ্রহান্বিত হতে লাগলেন। বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ শুরু হবার পরে যখন পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়েরা নব প্রচেষ্টায় পুনরায় একত্রিত হল। ব্রিটিশ শক্তি স্বপ্নেও আশঙ্কা করেনি যে কখনও দেশের পূর্ব প্রান্ত থেকে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হতে পারে। তাদের রাষ্ট্রপ্রধান ও সেনাপতিরা সর্বদাই ভেবেছিল ভারতে তাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিপন্ন হতে পারে যদি পশ্চিম দিক থেকে কোনও আগ্রাসন শুরু হয় এবং সেই কারণে অতীতে তাদের প্রতিরক্ষার জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতি ছিল পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রদেশগুলিতে সীমাবদ্ধ। 'কোমাগাটা মারু'-র ঘটনা হল এর মধ্যে একটি। বিপ্লবীদের মধ্যে অনেক জনকেই হত্যা বা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। ভারতে প্রবেশ করার পথ আমাদের জন্য খোলা এবং আমরা অতি সহজেই এখন ভারতের সীমান্তে পৌঁছতে পারি। যদিও রেল বা মোটরগাড়ি নেই, কিন্তু আমরা পায়ে হেঁটে ভারতের সীমান্তে পৌঁছতে পারি। এখন প্রশ্ন হল কীভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও সশস্ত্র সৈন্যদের ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? কীভাবে ভারতের মাটিতে আমরা এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারব, যতদিন না শত্রুদের সম্পূর্ণভাবে দেশ থেকে বিতাড়িত করা যায়।

ভারতের পূর্ব দিকের দরজা খুলে যাওয়ায় পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের দায়িত্ব এখন অনেক বেড়ে গেছে। পূর্ব এশিয়াতে এসে পৌঁছবার পরে আমি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সামনে "টোটাল মোবিলাইজেশন বা সর্বাত্মক প্রস্তুতি"-র প্রস্তাব রাখি এবং ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর

সেনাদের আমি "চলো দিল্লি" এই স্লোগানটি দিই যাতে তারা তাদের মানসচক্ষে চূড়ান্ত গন্তব্যস্থলটি সর্বদা দেখতে পায়। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ও ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস করা হয় যার ফলে সেখানে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়। আমাদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ এই কারণে যে বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ব্রিটিশ শক্তিকে হঙকঙ ও সিঙ্গাপুর, মালয় ও বর্মা থেকে হটে যেতে হল এবং এর ফলে পূর্ব এশিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আধিপত্য সর্বাংশে লোপ পেল। তিন বছর আগে ব্রিটিশ ছিল বর্মা দেশের অধিপতি, কিন্তু এখন আপনারা তাদের কোথায় দেখতে পাবেন? তাদের দেখতে পাবেন বর্মার কয়েদখানায়। আপনাদের চোখের সামনে বর্মায় যা ঘটতে দেখলেন, এবারে তারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে ভারতবর্ষে। এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে ব্রিটিশ যদি দ্রুত পশ্চাদপসরণ না করে তা হলে ভারতেও স্থান হবে কয়েদখানায়।

পূর্ব দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করার দরজা খুলে গেল যখন ব্রিটিশদের পূর্ব এশিয়া থেকে বিতাড়িত করা হল। কয়েক বছর ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রশ্ন ছিল কীভাবে ভারতবর্ষে সশস্ত্র সেনা বা অস্ত্র প্রবেশ করতে পারবে? এমনকী বিশ্বযুদ্ধের সময়ও বহু চেষ্টা করা হয়েছিল। আমি যখন দেখলাম আমাদের প্রস্তুতি এগিয়েছে পরিকল্পনা অনুযায়ী তখন সেনাবাহিনী কীভাবে অগ্রসর হতে পারবে সেই বিষয়েও চিন্তা করতে হল। প্রথম পদক্ষেপে আমি আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার গঠন করলাম যাতে আমাদের বক্তব্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা স্পষ্টভাবে বলতে পারি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার করছিল যে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী নিপ্পনের হয়ে লড়বে। সেই প্রচারের মুখ বন্ধ হল যখন আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার গঠিত হল এবং ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী কাদের নেতৃত্বে ভারতে প্রবেশ করবে সেই সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ রইল না।

আমাদের সরকার প্রচারের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট মেকি চমক নয় কারণ পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয়দের সমর্থনপুষ্ট ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের অনুমোদনে এই সরকার গঠিত হয়েছে, এবং শক্তিশালী সেনাবাহিনী আমাদের পাশে রয়েছে। আমাদের সরকার জাপান, জার্মানি ও আরও সাতটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পেয়েছে। ব্রিটিশরা প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়লেও প্রত্যুত্তরে বলতে লাগল যে আমরা কোনও ভূখণ্ডের অধিকারী নই এবং দিল্লি রেডিয়ো থেকে প্রচারে এই কথাই বিশেষ গুরুত্ব পেতে লাগল। ঠিক তার দু'দিন পরেই নিপ্পনের পক্ষ থেকে এক ঐতিহাসিক ঘোষণায় আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজ়াদ হিন্দ আপৎকালীন সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হল। তার ফলে আমরা আইনমতে ও প্রথাসিদ্ধমতে পূর্ণাঙ্গ সরকারে পরিণত হতে পারলাম যাদের অধীনে ভূখণ্ড আছে। এবং যখন আমি পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে সফরে গেলাম তখন জাপান, চিন ও ফিলিপাইনসে আমাকে যে সম্মান ও সমাদরে আপ্যায়ন করা হল, কোনও পরাধীন দেশের প্রতিনিধিকে কখনও সেই সম্মান দেখানো হয়নি।

এই সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানানো হয়েছিল বলে আমি মনে করি না। এ সম্মানের অধিকারী হল ভারতবর্ষ ও ৩৮ কোটি ভারতবাসী। আমার পূর্ব এশিয়ার সফরের পরে ২৯ ডিসেম্বর আমি আন্দামান গেলাম ও আন্দামানের ব্রিটিশ কমিশনারের সরকারি বাসভবনে আমাদের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করলাম। আন্দামান আমাদের হাতে পাওয়া ও সেখানে আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কারণ প্রতিটি বৈপ্লবিক সংঘাতেই, যেমন ফ্রান্সে ও আয়ারল্যান্ডেও প্রথম প্রচেষ্টাতে কারাগারগুলিকে

মুক্তি দেওয়া হয়েছিল এবং আপনারা সকলেই জানেন ব্রিটিশরা সব উল্লেখযোগ্য ভারতীয় বিপ্লবীদের আন্দামানের কারাগারেই নিক্ষেপ করেছিল।

আন্দামান থেকে ফিরে আসার পরে, তখন আর একটা কাজ বাকি ছিল এবং তা হল সম্মুখ পানে এগিয়ে যাওয়া। এর আগে ভারতীয় জাতীয় সেনার অগ্রণী বাহিনীর সেনাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখন সময় এসেছে যখন সব সেনানীদেরই যুদ্ধে যেতে হবে। সেই কারণেই স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারের প্রধান কেন্দ্র ও ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের প্রধান কেন্দ্র বর্মাদেশে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখন আমাদের সামনে প্রশ্ন একটাই, সেটাই আজ প্রতিটি ভারতীয়ের মনের মধ্যে এক মাত্র প্রশ্ন হওয়া উচিত। 'কবে আমরা ভারতে আমাদের পতাকা উত্তোলন করতে পারব, এবং যুদ্ধকে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে নেবার জন্য যে প্রস্তুতি লাগে, কত শীঘ্র আমরা সেই প্রস্তুতি নিতে পারব?'

যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করতে হলে আমাদের কার্য পরিচালনার জন্য একটা কেন্দ্র প্রয়োজন। বর্মাদেশকে অধিকার করবার জন্য ব্রিটিশ যেমন ভারতবর্ষকে তাদের যুদ্ধকেন্দ্র রূপে ব্যবহার করেছিল। ইতিহাসের ঘটনাচক্রে আজ ভারতকে স্বাধীন করবার জন্য আমরা বর্মা দেশকে যুদ্ধকেন্দ্র রূপে ব্যবহার করতে চলেছি। বর্মা দেশের প্রতিটি ভারতীয়কে আজ আমি এই কথা উপলব্ধি করতে বলব যে, প্রথমত আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে সম্মুখ ভাগে রয়েছেন, এবং দ্বিতীয়ত আজকের এই লড়াই হল ভারতকে স্বাধীন করবার লড়াই, আর এই দেশই হল সেই লড়াইয়ের কেন্দ্র। আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলে আমাদের প্রয়োজন তিনটি— সেনা, অর্থ ও রসদ। পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির কাছ থেকে আমরা সাহায্য পেতে পারি এবং তারা আমাদের সাহায্য করছেও। কিন্তু যে কথা আপনাদের উপলব্ধি করতে হবে যে বর্মা থেকে আপনারা যা সংগ্রহ করতে পারবেন তার উপযোগিতা অনেক বেশি কারণ বর্মা থেকে অনেক দ্রুত সেই সাহায্য যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছবে।

বর্মা দেশের ভারতীয়দের কাছে আমার আবেদন হল তাঁরা যেন সর্বাত্মক প্রস্তুতিতে অর্থাৎ সেনা ও রসদ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। যা এখানে ভারতীয়দের কাছে পাওয়া যাবে তা আমি পরের কাছে চাইব না। যদি ভারতীয়দের কাছে অর্থ ও রসদ পাওয়া যায় তা হলে অন্যের কাছ থেকে সেটার জন্য ভিক্ষার হাত বাড়ানো অত্যন্ত লজ্জাকর। আমরা ভারতমাতার সেবক এবং ৩৮ কোটি ভারতবাসীকে পরাধীনতার থেকে মুক্তি দিতে আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প। সেই কারণে, আপনাদের কাছে যা আছে তা চাইবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে। আমাকে এ কথা বলতেই হচ্ছে যে এখনও পর্যন্ত বর্মার ভারতীয়েরা সেনা, অর্থ ও রসদ সংগ্রহের কাজে পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা ভবিষ্যতে অন্য দেশকে পিছনে ফেলে আরও এগিয়ে যেতে পারবে না। আমি চাই বর্মা দেশের প্রতিটি ভারতীয়, আপনাদের ধর্মীয় বিশ্বাস যাই হোক না কেন, ভারতের যে প্রদেশে আপনাদের পূর্বপুরুষের বাস হোক না কেন, যে ভাষায় আপনারা কথা বলুন না কেন, জাতিধর্মভাষা নির্বিশেষে সকলে আপনারা এগিয়ে আসুন ও ভারতবর্ষের প্রতি আপনাদের কর্তব্য করুন। আগামী কাল থেকে আমরা জোর কদমে আমাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতির কাজ শুরু করছি, এবং আমি চাই প্রতিটি ভারতীয় এগিয়ে এসে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করুন।

আমাদের সামনে যে সুবিশাল কাজের দায়িত্ব আছে, সেখানে আপনাদের সকলের জন্য কিছু কাজ আমরা দিতে পারব। দেশোদ্ধারের এই মহান ব্রতে ধনী ও দরিদ্র, তরুণ এ প্রবীণ সাক্ষর ও নিরক্ষর, সকলেরই স্থান আছে। আপনাদের আর কোনও সমস্যা বা প্রশ্ন থাকতেই

পারে না। একমাত্র যে প্রশ্ন আপনাদের থাকবে তা হল, আজ এই সঙ্কট মুহূর্তে কীভাবে আপনারা দেশের সেবা করতে পারবেন। হয়তো আজও আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের জীবন ও নিজেদের সমস্যায় নিমজ্জিত হয়ে আছেন কিন্তু আগামীকাল থেকে আমি চাই যে আপনারা নিজেদের কথা ভুলে গিয়ে ভারতবর্ষের কথা, এবং শুধুমাত্র ভারতবর্ষের কথাই চিন্তা করুন। আমার একান্ত কামনা যে দেশের সেবা করবার জন্য এক আন্তরিক ইচ্ছা আপনাদের প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করুক, আপনাদের যা কিছু আছে সব কিছু দিয়ে, আপনাদের পক্ষে যা করা সম্ভব সবকিছু করে দেশকে স্বাধীন করবার সঙ্কল্প আপনারা নিন। আমি সর্বদাই আমার সেনাবাহিনীকে বলে থাকি যে ১০০ জনের মধ্যে ৯৯ জন সেনা যদি সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ হয় তা হলে সেটাই যথেষ্ট নয় কারণ ১০০ জনের মধ্যে একজনও যদি কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয় তা হলে তার দোষে অন্য ৯৯ জনেরও সৎ প্রচেষ্টা কালিমালিপ্ত হয়। আমি ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীকে বলেছি যে আপনাদের ১০০ জনের মধ্যে ১০০ জনকেই আমি সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ দেখতে চাই। এবং আজ অসামরিক ব্যক্তিদের জন্য আমার বক্তব্য হল, আমি আপনাদের কাছ থেকেও ঠিক সেই একই সাড়া পেতে চাই। ১০০ জন অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে ১০০ জনকেই আমি অকৃত্রিম দেশপ্রেমিকরূপে দেখতে চাই, যারা সব কিছুর ঊর্ধ্বে দেশকে স্থান দেবে।

আমি শুনছি বর্মা দেশে নাকি শত্রুপক্ষের গুপ্তচর আছে। আরও শুনছি ভারতীয়দের মধ্যেও নাকি গুপ্তচর আছে। কথাগুলি কতদূর সত্য তা আমার জানা নেই। কিন্তু আমি এই কথা জোর গলায় বলতে চাই যে যে কোনও ভারতীয় যারা শত্রুর চর হিসাবে কাজ করছে বা শত্রুর প্রতি যাদের সামান্যতম সহানুভূতি আছে তারা শুধু নিপ্পনের শত্রু নয়, শুধু বর্মার শত্রু নয়, তারা ভারতেরও শত্রু। তারা ৩৮ কোটি ভারতবাসীর শত্রু। এবং এই বিশ্বাসঘাতকদের শুধু একটা শাস্তিই বরাদ্দ আছে, তা হল মৃত্যু।

বন্ধুরা! আপনারা অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারছেন যে আমরা এখন এক জীবনমরণ সংগ্রামে ব্রতী হয়েছি। হয় আমরা আমাদের দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে পারব অথবা আমাদের চিরকালের মতো দাসত্ব বরণ করতে হবে। আমাদের দিক থেকে আমরা আমাদের স্বাধীনতা জয় করে নিতে বদ্ধপরিকর, যে কোনও ভাবে ও যে কোনও মূল্যে। আমাদের পথে যে কেউ এসে বাধা সৃষ্টি করবে সে আমাদের শত্রু ও তাকে আমরা চূড়ান্ত শাস্তি দেব। যদি কেউ আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করে থাকে বা আমাদের কাজের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় তা হলে আমি আজ এই সুযোগে তাদের সাবধান করে দিতে চাই। যদি কোনও কাপুরুষ থাকে যারা লড়াই করতে ভয় পায়, যদি কেউ কৃপণ থাকে যারা ত্যাগ স্বীকার করতে অনিচ্ছুক, তারা যদি তাদের কর্তব্য না করতে চায় তা হলে তারা তাদের ঘরে লুকিয়ে থাক। তাদের আচরণ আমাদের কাছে নিন্দার্হ কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ যদি আরও অন্য কাউকে এগিয়ে আসতে বাধা দেয় তা হলে তাদের আমরা ক্ষমা করব না।

বন্ধুরা! এখন লড়াই শুরু হয়ে গেছে এবং হয়তো খুব শীঘ্রই আমরা শুনব, এতজন ভারতীয় সেনার মৃত্যু হয়েছে, এবং প্রতিটি মৃত সৈনিকের জায়গায় আমাদের নতুন সেনানী পাঠাতে হবে। যুদ্ধের রসদ সংগ্রহের জন্য প্রচুর দাবি আসবে। যখন আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ছি তখন কীভাবে আমরা অন্যের কাছে সাহায্য চাইব? আমাদের নিজেদের যা কিছু আছে সবটুকু উজাড় করে দেবার পরেই তবে আমরা অন্যের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে পারি। এটা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কাজেই সেনা, অর্থ ও রসদ

জোগাড় করবার জন্য আমাদের শেষ ক্ষমতার শেষ বিন্দু পর্যন্ত দিতে হবে। আমাদের শুধু মাত্র সৈন্যের প্রয়োজন আছে তা নয়, সব ধরনের কাজের জন্য উপযুক্ত ক্ষমতার মানুষ আমাদের প্রয়োজন। আমরা চাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, নার্স, মেকানিক ও শ্রমিক। আমাদের সংগ্রামের জয়ধ্বনি হল "চলো দিল্লি"। কিন্তু দিল্লি যাবার পথ কোথায়? আমাদের যাত্রাপথে রয়েছে অরণ্য ও পাহাড়, এবং তার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবার জন্য পথ আমাদের নিজেদেরই গড়ে নিতে হবে এবং সেই পথ নির্মাণ কি ভারতীয় শ্রমিকদেরই দায়িত্ব নয়? আমি আবারও আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্মা দেশের প্রতিটি ভারতীয় জনগণের স্থান আছে, সে অফিসার বা সাধারণ সৈন্য অথবা সে কারিগর বা শ্রমিক যাই হোক না কেন। আমরা সকলেই সমান কারণ আমরা সকলেই আমাদের দেশমাতৃকার সেবক। আমাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই কারণ আমরা সকলেই দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত মানুষ।

যে কাজ আমাদের সামনে রয়েছে তার বিশালত্ব ও কর্তব্যের পবিত্রতার কথা উপলব্ধি করুন। উপলব্ধি করুন যদি আপনি দেশকে ভালবাসেন তা হলে দেশের সেবা করবার জন্য এর থেকে সার্থক সুযোগ আর আসবে না। আমার সেনাবাহিনী ও আমার দেশের মানুষের প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। যদি আপনি সর্বান্তঃকরণে সাড়া দিয়ে না থাকেন তা হলে সেটা আমাদেরই সংগঠনের ত্রুটি। কিন্তু আগামী কাল থেকে আমরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করব পুরো দমে, এবং কাল থেকে আমি দেখতে চাই বর্মাদেশের ভারতীয়দের এক নতুন জীবন, নব উদ্যম, এক সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নব উদ্দীপনা ও নব সঙ্কল্প। এবং আজ আপনারা যখন এই জনসমাবেশ থেকে ঘরে ফিরে যাবেন, তখন যেন আপনাদের কানে এই কথাগুলি মন্ত্রের মতো বাজতে থাকে 'ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করেছে। আমরাও তাদের সঙ্গে আছি।' এবং কাল থেকে আপনাদের এক নতুন জীবন শুরু হোক যেখানে আপনারা আমাদের সেনানীদের সঙ্গে একসাথে পা ফেলে চলতে থাকুন।'

[২২ মার্চ ১৯৪৪ তারিখে সিঙ্গাপুরের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের প্রধান কর্মকেন্দ্র থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'আজ়াদ হিন্দ'-এর প্রথম পাতায় বেরোল চাঞ্চল্যকর আনন্দসংবাদ যে (১৮ মার্চ ১৯৪৪ তারিখে) ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী ভারতে প্রবেশ করেছে।]

এই উপলক্ষে নেতাজি এক বিশেষ বার্তা প্রচার করলেন:

"...ওই দূরে, অনেক দূরে— নদী পার হয়ে, অরণ্যের শেষে, পর্বত অতিক্রম করে রয়েছে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত দেশ— যার মাটিতে আমাদের জন্ম— যে দেশের অভিমুখে এখন আমাদের যাত্রা। ওই শোনো! আজ ভারত আমাদের ডাক দিয়েছে। ভারতের রাজধানী আমাদের ডাকছে— ৩৮ কোটি স্বদেশবাসী আমাদের ডাকছে। রক্তের টানে তারা আমাদের টানছে। ওঠো, নষ্ট করার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। অস্ত্র তুলে নাও হাতে। তোমাদের সামনে রয়েছে পথ যা তোমাদের পথিকৃৎরাই গড়েছে। আমরা সেই পথ দিয়ে এগিয়ে যাব। আমরা শত্রুর ব্যূহ ভেদ করে আমাদের পথ করে নেব। আর ঈশ্বর যদি তাই চান, তা হলে আমরা শহীদের মৃত্যুবরণ করব। আমাদের অন্তিম শয়নে আমরা সেই পথকে চুম্বন করব, যে পথ দিয়ে হেঁটে আমাদের সেনা দিল্লি পৌঁছবে। দিল্লি অভিমুখে আমাদের যাত্রা হল স্বাধীন ভারতের দিকে যাত্রা। চলো দিল্লি।"

৩৭

ভারতীয় জনগণের জননীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য

[২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ তারিখে শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধীর প্রয়াণে দেওয়া বিবৃতি] [১]

শ্রীমতী কস্তুরবা গান্ধী আজ পরলোকে। ৭৪ বছর বয়সে পুনায় ব্রিটিশ সরকারের কারাগারে বন্দি অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হল। ভারতে ও প্রবাসে ৩৮৮,০০০,০০০ ভারতীয় কস্তুরবার মৃত্যুতে গভীর শোকাপ্লুত, আমিও সেই শোকাহতদের মধ্যে একজন। বড় দুঃখজনক পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হল, কিন্তু পরাধীন জাতির এক সদস্যের পক্ষে এর থেকে সম্মানজনক বা গৌরবজনক মৃত্যু হতে পারে না। ভারতবর্ষ আজ তার পরিবারের একজনকে হারাল। কস্তুরবা হলেন দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পুনায় একই কারাগারে বন্দি ছিলেন গত দেড় বছর ধরে এবং মহাত্মার চোখের সামনেই যাঁর মৃত্যু হল। প্রথম জন ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর সারা জীবনের কর্মসঙ্গী ও ব্যক্তিগত সচিব মহাদেব দেশাই। কারাগারে বন্দিদশায় থাকাকালীন এই দ্বিতীয় বার মহাত্মা গান্ধীর জীবনে ব্যক্তিগত শোকের ছায়া পড়ল।

ভারতীয় জনগণের মাতৃস্থানীয়া এই মহীয়সী মহিলার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি আমার বিনীত শ্রদ্ধা জানাই, এবং গান্ধীজিকে জানাই আমার সুগভীর সমবেদনা। শ্রীমতী কস্তুরবার সঙ্গে অনেকবারই আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগের সৌভাগ্য হয়েছিল এবং আমি কয়েকটি কথায় তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাব। তিনি ছিলেন ভারতীয় নারীত্বের এক আদর্শ উদাহরণ, ব্যক্তিত্বে দৃঢ়, ধৈর্য্যশীলা, নীরব ও স্বাবলম্বী। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মহিলা যাদের সঙ্গে তিনি তাঁর মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে কাজ করেছেন, তাদের কাছে কস্তুরবা ছিলেন মূর্তিমতী অনুপ্রেরণা। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের দিনগুলি থেকে শুরু করে গত ত্রিশ বছর ধরে তাঁর স্বামীর সঙ্গে পাশাপাশি থেকে নানা দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন তিনি সহ্য করেছেন। বহু বার জেলে বন্দি থাকার কারণে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল তবু ৭৪ বছর বয়সেও জেলে যেতে তিনি ভয় পাননি। যখনই মহাত্মা গান্ধী কোনও আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন, কস্তুরবা ছিলেন সেই আন্দোলনের পুরোভাগে স্বামীর পাশে; ভারতীয় মহিলাদের সামনে তিনি ছিলেন এক অনন্যসাধারণ চরিত্র এবং স্বাধীনতার লড়াইয়ে ভারতীয় পুরুষরাও যাতে মহিলাদের থেকে পিছিয়ে না থাকে সেই জন্য তাদের প্রতিযোগিতায় আহ্বান করবার মতো ব্যক্তিত্বও তাঁর ছিল। কস্তুরবা একজন শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। গত চার মাস ধরে হৃদরোগে তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন, কিন্তু চিকিৎসার জন্য তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেবার জন্য সমগ্র ভারতের জনগণের আবেদন সত্ত্বেও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। ব্রিটিশ সরকার বোধ হয় ভেবেছিল যে মহাত্মা গান্ধীর উপরে এই ধরনের মানসিক নির্যাতন চালালে তাঁর শরীর ও মন ভেঙে পড়বে এবং তিনি ব্রিটিশদের

[১] *Testament of Subhas Bose*, pp. 69-70.

কাছে নতি স্বীকার করবেন। এই মনুষ্যেতর প্রাণীগুলির উপরে অনুকম্পা প্রকাশ করা ছাড়া আমরা কীবা করতে পারি, যারা বলে স্বাধীনতা, সুবিচার ও ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করে যেতে তারা প্রস্তুত অথচ এই ভাবে ঠান্ডা মাথায় মানুষের প্রাণ নিতে পিছপাও হয় না। এরা ভারতীয় জনগণকে এখনও বুঝতে শেখেনি। মহাত্মা গান্ধী বা ভারতীয়দের উপরে তারা যত মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারই করুক না কেন মহাত্মা যে শপথ নিয়েছেন তা থেকে তারা তাঁকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারবে না। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তে ডাক দিয়েছিলেন যাতে ভারতবর্ষকে আধুনিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করা যায়। উত্তরে দুর্বিনীত ব্রিটিশ শক্তি তাঁকে সাধারণ অপরাধীর মতো জেলে নিক্ষেপ করল। নিজ দেশে পরাধীন হয়ে জেলের বাইরে থাকার চেয়ে তিনি ও তাঁর মহীয়সী স্ত্রী জেলে মৃত্যুবরণই শ্রেয় মনে করেছিলেন। ব্রিটিশ বদ্ধপরিকর ছিল যাতে কারারুদ্ধ অবস্থাতেই স্বামীর চোখের সামনে হৃদরোগে কস্তুরবার মৃত্যু হয়। এখন তাদের খুনী প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়েছে, কারণ একে হত্যা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কিন্তু আমরা ভারতীয়রা, যারা দেশের ভিতরে ও বাইরে আছি, আমাদের কাছে কারাগারে শ্রীমতী কস্তুরবার মৃত্যু আরেক বার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে ব্রিটিশ নিতান্ত নৃশংসভাবে একে একে আমাদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে কৃতসঙ্কল্প। যতদিন ব্রিটিশ আমাদের দেশে থাকবে ততদিন আমাদের জাতির বিরুদ্ধে এই অনাচার চলবেই। একটি মাত্র পথই আছে যার মাধ্যমে ভারতের ছেলেমেয়েরা শ্রীমতী কস্তুরবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারে, তা হল ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা যারা ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছে তাদের উপরে একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে, যদিও এই দায়িত্বের অংশীদার আমরা সকলে, বিশেষতঃ এখানকার বোনেরা। এই শোকের মুহূর্তে আসুন আমরা আরও একবার আমাদের শপথবাক্য উচ্চারণ করি যে আমরা লড়াই চালিয়ে যাব যতদিন না ভারতবর্ষ থেকে শেষ ব্রিটিশ বিতাড়িত হয়।

৩৮

ভারতের মাটিতে আই এন এ

[১৯৪৪ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে বর্মা দেশ থেকে বেতার ভাষণ ও বিবৃতি][১]

[২১ মার্চ বর্মা দেশের কোনও এক অজ্ঞাত স্থান থেকে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটি করলেন:]

'আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী ও জাপানের সেনাবাহিনী, যারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করছে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে, এখন তারা একটি মহান ব্রতে মনোনিবেশ করেছে। আজ এই মাহেন্দ্রক্ষণে যখন ভারত ও জাপানের সেনাবাহিনী সীমানা পেরিয়ে ভারতের মধ্যে প্রবেশ করছে তখন আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে এই ঘোষণাটি করা হচ্ছে :

১৮৫৭ সালের রক্তাক্ত যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদল ব্রিটেনের আগ্রাসী শক্তির কাছে পরাস্ত হলেও ভারতীয় জনগণ কখনওই মানসিকভাবে ব্রিটিশদের কাছে নতি স্বীকার করেনি। অমানুষিক অত্যাচার এবং বলপূর্বক অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য হওয়া সত্ত্বেও তারা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছিল। কখনও প্রচার ও বিক্ষোভ, কখনও বা সন্ত্রাস, অন্তর্ঘাত ও সশস্ত্র বিদ্রোহ, এবং সাম্প্রতিক কালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সত্যাগ্রহ বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে তারা যে শুধু স্বাধীনতার সংগ্রামকে জাগিয়ে রেখেছিল তাই নয়, স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে তারা বহুদূর অগ্রসরও হয়েছিল। বর্তমান যুদ্ধ শুরু হবার সময় থেকে, ব্রিটিশদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ চুক্তির মাধ্যমে মুক্তিলাভের জন্য ভারতীয় জনগণ ও তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কোনও ফললাভ হয়নি। উপরন্তু যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ব্রিটিশ ভারতের উপরে তাদের আধিপত্য আরও দৃঢ়তর করেছে নির্মম শোষণ ও অমানবিক দমননীতির প্রয়োগে, এবং তারা তাদের সাম্রাজ্যের প্রসারের উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতবর্ষকে একটা প্রকাণ্ড সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করেছে।

তাদের এই সামরিক নীতির প্রয়োগের জন্য তারা ভারতবর্ষে বিদেশি সেনা আমদানি করেছে বহু দেশ থেকে—অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, চিন ও আফ্রিকা এবং দরিদ্র ভারতবাসীদের উপরে এই বিদেশি সৈন্যদের খাদ্য জোগানোর অসহনীয় ভার চাপিয়ে দেওয়ার ফলে দেশের বহু অঞ্চলে দেখা দিয়েছে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ, যেমন এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি। ভারতবর্ষকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী শেষ বারের মতো চেষ্টা করেছিলেন যাতে ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতার জন্য ভারতীয়দের দাবিকে স্বীকার করে নেয় ও ভারত ছাড়ে। তার উত্তরে ব্রিটিশ সরকার আরও শত শত দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের সঙ্গে

---

১ *Chalo Delhi*, pp. 200-205.

তাঁকেও জেলে নিক্ষেপ করে। তাদের শেষ বর্বরোচিত কাজ হল যখন তারা ব্রিটিশ কারাগারে কস্তুরবা গান্ধীকে কার্যত হত্যা করল।

ভারতে পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হতে দেখে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা, সংখ্যায় তারা আনুমানিক ৩০ লক্ষ হবে, ভারতে বসবাসকারী ভারতীয়দের হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য সক্রিয়ভাবে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করবার জন্য শপথ নিল। তারা আজ়াদ হিন্দ সঙ্ঘ বা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের পতাকাতলে রাজনৈতিক ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলল এবং ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর তারিখে তারা আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার গঠন করল। আজ়াদ হিন্দ ফৌজের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে ১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বর্মা দেশের আরাকান অঞ্চলে প্রথম শুরু হল পবিত্র মাতৃভূমিকে পরাধীনতা থেকে মুক্তি দেবার জন্য তাদের চূড়ান্ত লড়াই। সেই যুদ্ধে ভারত ও নিপ্পনের যৌথ সেনাবাহিনীর সাফল্যের ফলে এখন ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে দিল্লি অভিমুখে তাদের যাত্রা শুরু করেছে।

পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধে নিপ্পনের সেনাবাহিনীর নজিরবিহীন সাফল্য পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সামনে এক অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দেয় এবং তারা ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে। নিপ্পনের সরকার সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে বারংবার ঘোষণা করেছে যে এই যুদ্ধ শুধু মাত্র তাদের নিজদেশের নিরাপত্তা রক্ষা করবার জন্য নয়, তারা পূর্ব এশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করবার জন্যও লড়ছে, অধিকন্তু ভারতবর্ষ যাতে সম্পূর্ণ ও নিঃশর্ত মুক্তিলাভ করতে পারে সেই জন্যও এই যুদ্ধে নিপ্পনের সমর্থন আছে।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রতি এই সমর্থনের নীতিতে বিশ্বাস থাকাতে নিপ্পন সরকার বারে বারে ভারতের সংগ্রামের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা দেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ দেখিয়েছে, আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবার পরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে আপৎকালীন সরকারের কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন ভারতীয় সেনাবাহিনী তাদের আক্রমণ শুরু করেছে ও নিপ্পনের সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় তারা একই শত্রু অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে একই যুদ্ধে সামিল হয়েছে। যতদিন না এই আগ্রাসী বিদেশি সেনাদলকে ভারতের বাইরে বহিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে ততদিন পূর্ব এশিয়াতে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার কোনও নিশ্চয়তা নেই এবং ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই বর্তমান যুদ্ধ শেষ হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। সেই কারণে ভারতীয়দের জন্যই ভারতবর্ষ সৃষ্টি করার কাজে ভারতীয়দের সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি নিপ্পন দিয়েছে সেই প্রতিশ্রুতি তারা রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার এই মর্মে আজ ঘোষণা করছে যে তারা নিপ্পন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে কৃতসঙ্কল্প যতদিন না ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। আমরা সব ভারতীয়দের যাদের সঙ্গে আমরা রক্তে-মাংসে-হাড়ে-মজ্জায় অভিন্ন ভাবে যুক্ত তাদের কাছে আজ এই আহ্বান জানাই যে স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের সেনানীদের আপনারা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ যেমনভাবে পারেন, সাহায্য করুন।

আমরা সকল দেশপ্রেমী ভারতীয়দের ডাক দিচ্ছি স্ত্রী, পুরুষ ও ছোট ছেলেমেয়েরা, ভারতে আমাদের ভাই ও বোনেরা, এই শেষ যুদ্ধে আসুন আমরা প্রাণপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমরা প্রতিটি ভারতীয়র কাছে সাহায্য চাইছি, যাতে তারা ভারতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির

এই যুদ্ধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেবার জন্য সকল শক্তি দিয়ে অন্তর্ঘাত শুরু করে, যাতে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য এই লড়াইকে আমরা আরও দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত করতে পারি।

আমরা আজ আমাদের ভাইদের ডাক দিচ্ছি, যে ভারতীয় সেনা ও অফিসারেরা এখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে রয়েছেন, আপনারা আমাদের স্বেচ্ছাচারী শাসকদের পক্ষে আর যুদ্ধে যোগ দেবেন না। আপনারা এসে আমাদের সঙ্গে হাত মেলান, আমাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিন। ভারতীয়রা যে যেখানে ব্রিটিশদের বিভিন্ন দপ্তরে কাজ করছেন, আসুন এই পবিত্র যুদ্ধে যে যেমনভাবে পারেন আমাদের সাহায্য করুন।

আমরা আমাদের ভারতীয় ভাইবোনেদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে আপনাদের কোনও ভয় নেই যদি না আপনারা ভারতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠীকে বা তাদের সহযোগীদের সাহায্য করেন। আমরা আপনাদের আরও আশ্বাস দিতে চাই যে ভারতের যে সব অঞ্চল আমরা ব্রিটিশ কবল থেকে মুক্ত করতে পারব, সেখানে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে ও তারাই সেই অঞ্চলগুলির শাসনভার হাতে তুলে নেবে।

ভারতীয় জনগণ, যাঁরা আমাদের আত্মীয় পরিজন, তাদের আমরা এই উপদেশ দেব যে আপনারা ইঙ্গ-মার্কিন সেনাদের থেকে, তাদের বিমানবন্দর, তাদের সেনাদের ব্যারাক, তাদের অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা, তাদের বন্দর, সামরিক ঘাঁটিগুলি ও তাদের যুদ্ধ সম্পর্কীয় যাবতীয় কলকারখানা থেকে দূরে থাকবেন, কারণ তাদের পরাস্ত করতে গেলে এই স্থানগুলি আমাদের ধ্বংস করতে হতে পারে।

ভারতে আমার ভাই ও বোনেরা! আপনাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। আপনারা যদি দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারেন, আপনাদের যা কর্তব্য তা করতে পারেন তাহলে অনতিবিলম্বে স্বাধীনতা আপনাদের হবে। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কটকালে, ভারতবর্ষ আশা করে তার প্রতিটি সন্তান তাদের কর্তব্য পালন করবে। জয় হিন্দ! আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের প্রধান ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।'

[৪ এপ্রিল ১৯৪৪ তারিখে ভারতে প্রবেশ করবার পর আপৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে এই দ্বিতীয় ঘোষণাটি করা হল]

২১ অক্টোবর ১৯৪৩ তারিখে সায়োনানে (আগে যা সিঙ্গাপুর নামে পরিচিত ছিল), পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয়ের সমর্থনে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ সেই সরকারের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত প্রবেশ করেছে।

আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার, আপনার নিজের সরকার, তাদের একটি মাত্র কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য হল তাদের সশস্ত্র সেনাবাহিনীর দ্বারা পবিত্র ভারতভূমি থেকে ইঙ্গ-মার্কিন শত্রুদের বিতাড়িত করা এবং তার পরে ভারতীয় জনগণের ইচ্ছানুসারে আজ়াদ হিন্দের একটি স্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

আজ়াদ হিন্দের এই আপৎকালীন সরকার ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবে যতদিন না তাদের ভারত থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন অথবা বিতাড়িত করা যায়।

একদিকে যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীন ভারতবর্ষের জন্য আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম চলতে থাকবে তেমনই যে সব অঞ্চল আমরা শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করতে পারব, আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার সেই অঞ্চলগুলির পুনর্গঠনের কাজ শুরু করবে।

আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার হল ভারতীয় জনগণের জন্য একমাত্র আইনসম্মত সরকার। ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীকে ও আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার দ্বারা নিযুক্ত সরকারি অফিসারদের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলির ভারতীয় জনগণকে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার আহ্বান জানাচ্ছে।

আপৎকালীন সরকার মুক্তিপ্রাপ্ত অঞ্চলগুলির ভারতীয় জনগণের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কে তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কিন্তু যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এমন কোনও কাজ করবে যার দ্বারা ইঙ্গ-মার্কিন শত্রুদের বা তাদের সহযোগীদের সাহায্য হয় অথবা আপৎকালীন সরকারের পুনর্গঠনের কাজ কোনওভাবে বাধা পায় তাহলে তাদের কঠিনতম শাস্তি দেওয়া হবে।

আপৎকালীন সরকার ভারতীয় জনগণকে আহ্বান জানাচ্ছে আমাদের সহযোদ্ধা নিপ্পনের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবার জন্য; শত্রুদের পরাস্ত করবার জন্য তারা আমাদের নিঃশর্তে ও বিপুলভাবে সাহায্য করছে। গত দুই বছর ধরে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তাদের সেনাবাহিনীকে সমৃদ্ধ করবার জন্য আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, চুঙকিঙ চিন, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে প্রচুর সংখ্যক সৈন্য আমদানি করছে। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপৎকালীন সরকারকেও নিপ্পন সরকারের দেওয়া সর্বপ্রকার উদার সাহায্য নিতে বাধ্য হতে হয়েছে। যুদ্ধের শুরু থেকেই পূর্ব এশিয়ায় নিপ্পন সেনাবাহিনী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। আপৎকালীন সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের সহযোদ্ধা নিপ্পনের অপ্রতিরোধ্য বাহিনীর সহায়তায় ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে পরাস্ত করে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করতে পারবে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি নিপ্পনের আন্তরিকতায় আপৎকালীন সরকারের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আপৎকালীন সরকার বিশ্বাস করে যে ভারতবর্ষের দখল নেবার জন্য নিপ্পন সরকারের কোনও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামরিক অভিপ্রায় নেই। আপৎকালীন সরকার বিশ্বাস করে যে কেবলমাত্র ইঙ্গ-মার্কিন শত্রুদের পর্যুদস্ত করা ছাড়া ভারতবর্ষে নিপ্পনের আর কোনও পরিকল্পনা নেই, কারণ এরা শুধু ভারতেরই শত্রু নয় তারা পুরো এশিয়া মহাদেশেরও শত্রু। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতে পারলে তবেই এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং বিশ্বে শান্তি আসবে।

স্বাধীন দেশের সরকার হিসাবে আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার তাদের নিজস্ব মুদ্রা চালু করবার ব্যবস্থা করছে। কিন্তু যেহেতু যুদ্ধের পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে এবং আমরা যত শীঘ্র পারি ভারতের ভিতরে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছি, সেই কারণে যথাসময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে আপৎকালীন সরকারের মুদ্রা চালু করা সম্ভব হয়নি। তার ফলে আপৎকালীন সরকারকে এখন নিপ্পনের সরকারের কাছে মুদ্রা ধার নিতে হচ্ছে (যেমন, মিলিটারি রুপি-র নোট), যে মুদ্রা ইতিমধ্যেই তারা ব্যবহার করছে এবং আমরাও অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে সেই মুদ্রা এখন ব্যবহার করতে থাকব। যখনই আপৎকালীন সরকারের নিজস্ব মুদ্রা চালু করা সম্ভব হবে, নিপ্পন সরকারের কাছ থেকে ধার নেওয়া মুদ্রা ধীরে ধীরে বাজার থেকে তুলে নেওয়া হবে।

ভাই ও বোনেরা! এখন আমরা সেই পর্যায়ে পৌঁছেছি যখন শত্রুদের আমরা ভারতের মাটি থেকে বহিষ্কার করতে পারছি, তখন বহুকাল আগে আপনাদের যে পরিচয় ছিল এখন থেকে আপনারাও সেই পরিচয়ে ফিরে যেতে পারবেন, অর্থাৎ আপনারা নিজেদের স্বাধীন দেশের নাগরিক রূপে পরিচয় দিতে পারবেন। আপনাদের নিজস্ব সরকারকে আপনারা সমর্থন করুন—আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার এবং সেই সমর্থনের মাধ্যমে আপনারা নবলব্ধ স্বাধীনতাকে রক্ষা করুন।

সুভাষ চন্দ্র বসু
দেশের সর্বাধিনায়ক

যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে রওনা দেবার ঠিক আগে, এপ্রিল মাসের ৫ তারিখে নেতাজি রেঙ্গুনে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ্ আজ়াদ হিন্দ (আজাদ হিন্দের জাতীয় ব্যাঙ্ক)-এর উদ্বোধন করলেন। রেঙ্গুনের চারজন দেশপ্রেমিক ভারতীয়ের প্রচেষ্টায় খুব অল্প সময়ের নোটিসে এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল ১ কোটি টাকার মূলধন নিয়ে। হাবিব সাহেব ও শ্রীমতী বেতাই তাঁদের যথাসর্বস্ব নেতাজির হাতে তুলে দিয়েছিলেন এবং এই দুই জনের স্বার্থত্যাগের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে রেঙ্গুনের ভারতীয়েরা কোটি কোটি টাকা আপৎকালীন সরকার যুদ্ধের তহবিলে দান করতে লাগলেন। হাবিব সাহেবের মোট সম্পত্তির পরিমাণ এক কোটি টাকার ঊর্ধ্বে ছিল বলে অনুমান করা হয়। নেতাজি হাবিব সাহেব, শ্রীমতী বেতাই ও বর্মাদেশের আরও কয়েকজন ভারতীয়কে "সেবক-এ-হিন্দ" শিরোপা দিলেন।

বর্মা দেশের আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের প্রধান কার্যালয় থেকে এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা পাঁচজন নতুন মন্ত্রী নিয়োগের কথা ঘোষণা করা হল। তাঁরা হলেন : মিস্টার এন রাঘবন, মিস্টার এ ইয়েলাপ্পা, মিস্টার ইশার সিং, লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি আর নাগর এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল হবিবুর রহমান। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হল যে মন্ত্রী হিসাবে তাঁদের নিয়োগ করার ফলে মিস্টার এ ইয়েলাপ্পা ও মিস্টার ইশার সিং এখন থেকে আপৎকালীন সরকারের উপদেষ্টার পদে থাকবেন না, কিন্তু আরও আদেশ না আসা পর্যন্ত তাঁদের উপরে যে কাজের ভার ন্যস্ত আছে সেইগুলি তাঁরা করে যেতে থাকবেন। এই বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হল রেঙ্গুনের মিস্টার এস এম বশিরকে আপৎকালীন সরকারের উপদেষ্টা নিয়োগ করা হল এবং দপ্তরবিহীন মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস সি আলাগাপ্পান তাঁর অন্যান্য কাজ ছাড়াও রসদ জোগানোর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে কাজ করতে থাকবেন।

৩৯

ভারত মাতার আদর্শ কন্যারা

[১৪ মে ১৯৪৪ তারিখে, বর্মা দেশের প্রধান কার্যালয় থেকে প্রচারিত ঝাঁসির রানি বাহিনীর প্রতি বিশেষ বিবৃতি][১]

আমার বোনেরা,

ঝাঁসির রানি বাহিনীর গঠন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অনন্যসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আজ়াদ হিন্দ ফৌজে আপনাদের ভাইদের মতো আপনারাও এগিয়ে এসেছিলেন দেশের সেবায়, দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবেন বলে। আপনাদের ঘর ছেড়ে, মাতৃভূমির পায়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার কাজে আপনাদের ডাক দিয়ে আমি এক গভীর দায়িত্বের ভার নিয়েছিলাম। আপনাদের বাহিনীর কাজ ও অগ্রগতির বিষয়ে জানতে আমি সব সময়ই অত্যন্ত উৎসুক ছিলাম। দিনে রাতে আমি সর্বদাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি যে আপনাদের উপরে যেন তাঁর আশীর্বাদ থাকে এবং আপনারা যেন আমাদের এই মুক্তি সংগ্রামে কার্যকরী অবদান রাখতে পারেন— চিরন্তন সাফল্যে মাতৃভূমিকে গৌরবান্বিত করতে পারেন। আপনাদের আপ্রাণ সহযোগিতা নিয়ে এই নতুন বাহিনীকে আমি ঠিক তেমনি করেই তত্ত্বাবধানে করতে চেয়েছি, যেমন করে প্রত্যেক পিতা, প্রত্যেক মাতা এবং প্রত্যেক অভিভাবক সন্তোষজনক ভাবে তাদের দায়িত্বপালন করতে চেষ্টা করেন। আপনারাও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যাতে ভারতমাতার আদর্শ কন্যাসন্তান রূপে আপনারা আপনাদের কর্তব্য সাধন করতে পারেন, তিনি যাতে আপনাদের সেই শক্তি দেন। আজ পর্যন্ত আপনাদের যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ঝাঁসির রানি বাহিনীর সাফল্য অবধারিত এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনাদের একটি বিশেষ স্থান থাকবে। আমি অতীতে আপনাদের অনেক বারই বলেছি যে ভারতের আজ, একজন নয়, হাজার হাজার ঝাঁসির রানির প্রয়োজন। ফ্রান্সের অবিস্মরণীয় জোন অফ্ আর্ক তাঁর দেশের জন্য যা করেছিলেন, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ যা করেছিলেন ভারতমাতার জন্য, আমি চাই আপনারা প্রত্যেকে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন। ভারতে স্বাধীনতার জন্য যখন আপনারা হাসিমুখে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকবেন কেবলমাত্র তখনই আপনারা তাদের সমতুল্য সম্মানে ও গৌরবে ভূষিত হবেন। সুতরাং মনে রাখবেন, এমন একদিন আসবে, যখন আপনাদের ভাইদের মতো আপনাদেরও কঠিন প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, শুধু সামরিক প্রশিক্ষণ নয়, সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণও বটে। ঝাঁসির রানি বাহিনীর প্রথম দলটি ইতিমধ্যেই রেঙ্গুন থেকে সীমান্তের দিকে রওনা দিয়েছে। আরেকটি আরও বড়

---

১. নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো-র সংরক্ষণশালা থেকে সংগৃহীত।

দল অধীর আগ্রহে সায়োনানে অপেক্ষা করছে তাদের যান ব্যবস্থার জন্য, যা তাদের সীমান্তে পৌঁছে দেবে ও আগামী যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ দেবে। আমাদের দেশের মহিলারা কী করতে পারেন, গত বিশ বছর ধরে আমি তা লক্ষ করেছি। এমন কোনও কাজ নেই, এমন কোনও স্বার্থত্যাগ নেই যা ভারতবর্ষের মেয়েদের সাধ্যের বাইরে। এই বিশ্বাস আমার ছিল বলেই আমি ঝাঁসির রানি বাহিনী গড়ে তোলার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি নিশ্চিত জানি যে আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই একই বিশ্বাস আছে যা আমি নিজে অনুভব করছি। আপাদের আজকের এই প্রশিক্ষণ সফল হোক, আপনাদের ভবিষ্যতের সংগ্রামে আপনারা জয়যুক্ত হোন, আমি এই প্রার্থনা করি।

জয় হিন্দ।

৪০

জাতীয় বাহিনী যখন কলকাতায় প্রবেশ করবে মহাত্মা গান্ধী তখন প্রীত হবেন

[১৮ মে ১৯৪৪, সাংবাদিকদের কাছে প্রদত্ত বিবৃতি][১]

জাপানের খবরের কাগজে ইয়োমিউরি হোচি-র যুদ্ধ সংবাদদাতার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেন, ব্রিটিশরা কীভাবে আমাদের অগ্রগতিকে বাধা দেবার পরিকল্পনা করছে সে প্রশ্ন আমার কাছে অবান্তর, কারণ আমি জানি তাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তারা কোনও মতেই আমাদের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

১৯৪১ সালের ২৬ জানুয়ারি যখন আমি ব্রিটিশ প্রহরা থেকে বেরিয়ে আসি, তখন থেকে আমাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য তাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এখন তারা ভারত-বর্মা সীমান্তে এক বিশাল বাহিনী মোতায়েন করেছে যাতে আমাদের ভারত প্রবেশ ব্যাহত হয়। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব দেখেছে ভারতের জাতীয় সেনাবাহিনী কীভাবে সাফল্যের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রতিরোধ ছিন্ন করে তাদের অভিযান অব্যাহত রেখেছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই সেনাবাহিনী কীভাবে সাফল্যের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রতিরোধ ছিন্ন করে তাদের অভিযান অব্যাহত রেখেছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই সেনাবাহিনী ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবে। ভারতের মুক্তির জন্য এই সমরাভিযান কিছুতেই ব্যর্থ হতে পারে না। ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীর এই অগ্রগতিই হল মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দেবার মূল কারণ। ব্রিটেন এখন কংগ্রেসের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে ইচ্ছুক, কিন্তু সেটা হবে আরেকটা পরাজয়। আমাদের জাতীয় বাহিনী যখন কলকাতায় প্রবেশ করবে তখন মহাত্মাজি প্রীত হবেন ও তিনি আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠাবেন। তখনই আমাদের ভারতবর্ষ থেকে সাহায্যের সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন হবে। স্বাধীনতা জয় করে নিতে গেলে আমাদের দুটি জিনিস অবশ্যই লাগবে: (১) মহান উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং (২) আমাদের বেছে নেওয়া পথ থেকে কোনও মতেই বিচ্যুত না হবার প্রতিজ্ঞা। ভারতীয় জাতীয় বাহিনী লড়াই চালিয়ে যাবে যতদিন না ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। এই সেনাবাহিনীর প্রচেষ্টা যে ফলবতী হচ্ছে তাতে আমি সন্তুষ্ট, যদিও তা হচ্ছে ধীরে। যারা দেশের জন্য তাদের প্রাণ দিয়েছে সেইসব পূর্বপুরুষদের প্রতি বাহিনীর সেনাদের আছে অসীম শ্রদ্ধা, এবং দেশের স্বাধীনতা পাবার জন্য আকণ্ঠ পিপাসা। যে সব সেনা প্রাণ দিয়েছে, তাদের আত্মার শান্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করি, এবং আমরা জানি যেদিন দেশ স্বাধীন হবে সেদিন তাদের আত্মাও প্রীত হবে। প্রত্যেক ভারতীয় যাতে এই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকে এই কামনা করি।

—রেঙ্গুন রেডিয়ো, ১৮ মে ১৯৪৪

---

১. Testament of Subhash Bose, pp.157-158.

পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ এখন আমাদেরই যুদ্ধ

[৪ জুলাই ১৯৪৪ তারিখে ডেকোরেশন প্যারেডে ভাষণ][১]

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ তারিখে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়েছে বর্মা দেশের আরাকান অঞ্চলে। সেই ঐতিহাসিক দিনে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের একটি দল শত্রুর সঙ্গে লড়াই শুরু করে। আরাকানের যুদ্ধ ঐতিহাসিক বিচারে যদিও বিরাট একটা ঘটনা নয়— কিন্তু দুটি কারণে আমাদের কাছে তার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। প্রথমত, এই আরাকানে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম যুদ্ধাভিযান শুরু হয়। দ্বিতীয়ত, এই আরাকানের যুদ্ধই হল আমাদের সেনাদলের সশস্ত্র যুদ্ধের প্রথম অভিজ্ঞতা। সেই প্রথম পরীক্ষায় তারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ভবিষ্যতের আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের জন্য একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই কারণেই আরাকান অঞ্চলের যুদ্ধাভিযানের যে সব সেনা ও অফিসার অংশগ্রহণ করেছেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে তাঁদের মাতৃভূমির জন্য সম্মান ও গৌরব বহন করে এনেছেন, তাঁদের কাছে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে।

২২ মার্চ, আরাকানে সাহসিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে দলকে নেতৃত্ব দেবার জন্য আমাদের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মেজর এল এস মিশ্রকে আমার নিজের হাতে 'সর্দার-এ-জং' পদকে ভূষিত করার দুর্লভ সম্মান আমি পেয়েছি। এ ছাড়া আরও বেশ কয়েকজন অফিসার ও সেনা যাঁরা কর্তব্যপালনে ও সাহসিকতায় বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদেরও পুরস্কারে ভূষিত করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য যিনি— লেফটেন্যান্ট পিয়ারা সিং— তিনি আজ এখানে উপস্থিত আছেন। সর্বোচ্চ মানের এই অফিসার অসীম দেশপ্রেম, সাহস ও কর্তব্যের প্রতি আনুগত্যের পরিচয় দিয়ে আমাদের সকলের সম্মানভাজন হয়েছেন ও আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের সামনে তিনি একটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ তারিখে শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষের সময় তিনি বীরত্ব, উদ্যম ও কার্যসাধনের এক বিরল উদাহরণ দিয়েছিলেন যার জন্য তাঁকে ব্যক্তিগত শৌর্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বীর-এ-হিন্দ' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। ৫ ফেব্রুয়ারির এই ঘটনার পরে তিনি আরও দু'বার অনুরূপ বীরত্বের পরিচয় রেখেছেন— ১৬ ফেব্রুয়ারি এবং আরও একবার ২০ ও ২১ ফেব্রুয়ারিতে। এই শেষ যুদ্ধে তিনি একটা ট্রেঞ্চ বোমায় আহত হন এবং তাঁর দুটি পা এখন ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে গেছে। বেশ কিছুদিন তাঁর অবস্থা অতি সঙ্কটজনক ছিল এবং তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনতে হয়েছিল। এখন হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে এবং অবস্থার উন্নতি হয়েছে এ কথা জানাতে পেরে আমার ভাল লাগছে। আজ আমি

---

১. Blood Bath, pp.22-23 (মূল হিন্দি থেকে অনূদিত)।

লেফটেন্যান্ট পিয়ারা সিং-কে ব্যক্তিগত ভাবে পদকে ভূষিত করবার সুযোগ পেয়েছি, যে পদক তিনি তাঁর রক্তের বিনিময়ে অর্জন করছেন এবং সে সম্মানের জন্য তিনি সর্বতোভাবে উপযুক্ত। এই বীর যোদ্ধাকে সম্মান জানাতে পেরে আমি নিজে সম্মানিত বোধ করছি এবং আমার সেনাবাহিনী ও আমার দেশকেও সম্মানিত করছি।

এই উপলক্ষে আমি আমার সেনাবাহিনীর মনোবল সম্বন্ধে ক'টি কথা বলতে চাই। আরাকানের যুদ্ধের পরে ভারত-বর্মা সীমান্তের আরও কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই শুরু হয়েছিল, বিশেষত হাকা, টিড্ডিম ও কালাদান অঞ্চলে। তার পরে মার্চ মাসের মাঝামাঝি এল সেই গৌরবময় ক্ষণ যখন আমাদের সৈন্যরা নিপ্পনের সেনাবাহিনীর বীর যোদ্ধাদের পাশাপাশি সীমান্ত অতিক্রম করে মণিপুর ও আসামে প্রবেশ করল। তারপর থেকে আমাদের সেনাদল স্বদেশের পবিত্র মাটিতে শত্রুর সঙ্গে লড়ছে। সীমান্ত অতিক্রম করে স্বদেশে প্রবেশের ঘটনা ফৌজের সেনাদের এক অনন্যসাধারণ অনুপ্রেরণা দিয়েছে। পূর্ব এশিয়ার এই যে যুদ্ধ, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে যা নিপ্পনের যুদ্ধ বলে শুরু হয়েছিল, তা আজ আমাদের যুদ্ধে— আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। তার ফলশ্রুতি হল আজ আমরা যে কোনও মূল্য দিতে রাজি আছি। বর্তমান যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে আমরা নিপ্পনের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে বেশ কয়েকবার অভিনন্দন বার্তা পেয়েছি, যার প্রতিটি শব্দ আমাদের সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করেছে ভবিষ্যতে আরও অগ্রসর হবার জন্য, শৌর্য্য ও সাহসিকতার শীর্ষে ওঠার জন্য। আমি আপনাদের আবারও এই আশ্বাস দিতে চাই যে এই যুদ্ধে আমরা জীবন-মরণ পণ করেছি। এবং এর জন্য আমাদের যে স্বার্থত্যাগ করতে হোক না কেন বা যত কষ্ট সহ্য করতে হোক না কেন আমরা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাব যতদিনে না আমাদের জয় করায়ত্ত হয়।

আজকের এই ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমি বর্মা দেশ সরকারের ও নিপ্পনের সেনাবাহিনীর মাননীয় প্রতিনিধিদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাঁদের সঙ্গে, তাঁদের সেনাবাহিনী ও তাঁদের দেশের সঙ্গে আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাব এবং অবশেষে আমরা জয়ী হব।

৪২

রক্ত ও স্বাধীনতা

[৪ জুলাই ১৯৪৪, বর্মাদেশের রেঙ্গুনে, নেতাজি সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে ভারতীয়দের জনসভায় ভাষণ][১]

বন্ধুরা!

আজ থেকে ১২ মাস আগে 'সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি' বা 'চরম স্বার্থত্যাগ'-এর এক নতুন প্রকল্প পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সামনে রাখা হয়েছিল। গত এক বছরে আমরা যে সাফল্য লাভ করতে পেরেছি তার একটা বিবরণ আজ আমি আপনাদের কাছে পেশ করব ও সেইসঙ্গে আগামী বছরের জন্য আমাদের দাবিগুলিও আপনাদের সামনে রাখব। কিন্তু তার আগে, আজ আমি আপনাদের আরও একবার উপলব্ধি করতে অনুরোধ করব যে আমাদের সামনে স্বাধীনতা লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। ব্রিটিশদের এখন সারা পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে এবং একের পর এক যুদ্ধে তারা পরাজয় স্বীকার করছে। তার ফলে আমাদের শত্রু দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে এবং স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ পাঁচ বছর আগে যতটা দুরূহ ছিল এখন আর নেই। এমন একটা বিরল, ঈশ্বরপ্রদত্ত সুযোগ শতাব্দীতে একবারও আসে কিনা সন্দেহ। আমরা শপথ নিয়েছি যে মাতৃভূমিকে ব্রিটিশ কবল থেকে উদ্ধার করবার এই সুযোগের আমরা পূর্ণ সদ্ব্যবহার করব।

আমি আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল সম্বন্ধে খুবই আশাবাদী, কারণ আমি তো শুধুমাত্র পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয়ের প্রচেষ্টার উপরে নির্ভর করছি না। ভারতবর্ষের ভিতরে এই মুহূর্তে এক বিশাল আলোড়ন চলছে এবং লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী স্বাধীনতা লাভের জন্য এখন চূড়ান্ত কষ্ট ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৫৭ সালের সেই বিরাট বিদ্রোহের পর, আমাদের দেশবাসীর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে অথচ শত্রুপক্ষের অস্ত্রাগার ক্রমেই ভরে উঠছে। অস্ত্র ও আধুনিক সৈন্যবাহিনী ছাড়া আজকের এই যুগে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু এখন ভাগ্যের আশ্চর্য দাক্ষিণ্যে ও নিপ্পনের উদার সাহায্যে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের পক্ষে অস্ত্রসজ্জিত আধুনিক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এবং ধর্ম ও অন্যান্য সর্বধরনের বিভেদ যা ব্রিটিশ ভারতীয়দের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, পূর্ব এশিয়াতে তার চিহ্ন মাত্রও নেই। তার ফলে আমাদের সামনে আজ অনুকূল পরিস্থিতির এক আদর্শ সমন্বয় ঘটেছে যা আমাদের

---

১. মূল হিন্দি থেকে অনূদিত এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের প্রধান কার্যালয়ের প্রচার দপ্তর (Publicity, Press and Propaganda Department) থেকে প্রকাশিত (নেতাজি রিসার্চ ব্যুরো-র সংগ্রহশালা)।

সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করবে। আজ আমাদের একমাত্র যা প্রয়োজন তা হল মুক্তিলাভের জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতে ভারতীয়দের নিজেদের এগিয়ে আসতে হবে।

'সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি'-র উদ্যোগে আমি আপনাদের সকলের কাছে দাবি করেছিলাম জনবল, অর্থবল ও রসদের অফুরন্ত জোগান। যদি জনবলের কথা বলতে হয় তা হলে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাতে পারব যে আমরা ইতিমধ্যে বহু সৈন্য জোগাড় করতে সক্ষম হয়েছি। এই বিষয়ে আমাদের কোনও সমস্যা হয়নি এবং একমাত্র যে সমস্যা আমাদের আছে তা হল কীভাবে এই রংরুটদের যত শীঘ্র সম্ভব ট্রেনিং দেওয়া যায়। শুধু যে পুরুষরা এসেছেন তাই নয়, মহিলারাও এগিয়ে এসেছেন যে কারণে রানি ঝাঁসি বাহিনী গঠনে আমরা সফল হতে পেরেছি। রানি ঝাঁসি বাহিনীর যে দলটি সম্প্রতি মালয় দেশ থেকে এখানে এসে পৌঁছেছে সকলেই তাদের সপ্রতিভ দক্ষতায় চমৎকৃত হয়েছে। আমি আনন্দের সঙ্গে আরও জানাতে পারি যে আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিয়েছে ও আমরা যে 'বালসেনা' গঠন করেছি তাও এক অতি সফল উদ্যোগে পরিণত হয়েছে। পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র— চিন, জাপান, ইন্দোচিন, ফিলিপাইন, জাভা, বোর্নিও, সেলেবেস, সুমাত্রা, থাইল্যান্ড ও বর্মা থেকে বহু মানুষ এসেছেন সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য। আমার একমাত্র আক্ষেপ হল বর্মা দেশে ভারতীয়দের জনসংখ্যার অনুপাতে আমরা যথেষ্ট সাড়া পাইনি। আমি আশা করব, ভবিষ্যতে আপনারা এই অঞ্চল থেকে আরও বেশি সংখ্যায় সৈন্য জোগাড় করতে সক্ষম হবেন।

অর্থবলের বিষয়ে, আপনাদের মনে থাকবে আমি পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কাছ থেকে তিন কোটি দাবি করেছিলাম।

বাস্তবে এখন পর্যন্ত আমি তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি, এবং যে সব ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করা গেছে তা থেকে ভবিষ্যতে যে নিয়মিত অর্থ আসতে থাকবে সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তিন মাস আগে বর্মা দেশে আমরা আমাদের নিজস্ব একটি ব্যাঙ্ক খুলেছিলাম— দ্য ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ আজাদ হিন্দ লিমিটেড। এই ব্যাঙ্ক সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে চলেছে, কয়েকটি শাখা ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও খুলতে হবে।

বন্ধুরা! আমাদের সেনাবাহিনী ও অন্যান্য কর্মীদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করবার জন্য একটা ডিপার্টমেন্ট অফ সাপ্লাইস বা রসদ যোগানোর দপ্তরের প্রয়োজনীয়তার কথা আমি একেবারে প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিলাম। গত ১২ মাসে সেই দপ্তরটি ভালভাবেই কাজ করেছে। সমগ্র পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় বণিক ও ব্যবসায়ীরা এই কাজে প্রভূত সাহায্য করেছেন এবং আমরা আমাদের নিজস্ব তহবিলের অর্থ দিয়েও বহু সামগ্রী কিনতে পেরেছি। তবে এই বিষয়ে আমাদের ভবিষ্যতে আরও অনেক বেশি কাজ করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের যানবাহনেরও সমস্যা আছে যা পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের দ্রব্য সামগ্রী আনার কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে, সেই সমস্যারও সমাধান করতে হবে। এতদিন পর্যন্ত আমরা এই কাজের জন্য অন্যদের উপরে নির্ভর করেছি— এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের সামগ্রী আনা নেওয়ার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। এই বিষয়ে আগামী দিনগুলিতে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন হবে।

বন্ধুরা! এ ছাড়া গত এক বছরে আমরা আরও যা যা করতে পেরেছি এবার আমি সেই বিষয়ে আপনাদের জানাব। তিন মাস প্রচণ্ড পরিশ্রমের পরে আমরা আমাদের সৈন্যবাহিনীর প্রশিক্ষণ শেষ করতে, এবং সেইসঙ্গে আমাদের বাহিনীর প্রসারণের কাজও শুরু করতে

পেরেছিলাম। যখন যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যদের প্রেরণের ব্যবস্থা করবার সময় এল তখন আমরা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিলাম, অর্থাৎ আমরা আমাদের নিজস্ব একটি আপৎকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করলাম। আজ়াদ হিন্দের এই প্রভিশনাল অথবা আপৎকালীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল ২১ অক্টোবর, ১৯৪৩ তারিখে এবং সেই সরকার আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বের অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিচালনার ভার নিল। এখন আমরা যে যুদ্ধ শুরু করেছি তার নেতৃত্ব দিচ্ছে আমাদের নিজেদের সরকার। ২৩ অক্টোবর এই আপৎকালীন সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। হয় সেই সময় একই সঙ্গে বা ঠিক তার পরেই এই আপৎকালীন সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয় জাপান, জার্মানি এবং পৃথিবীর আরও সাতটি বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্র যাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বের জনগণের একটা বৃহৎ অংশের পূর্ণ সমর্থন আছে।

যখন আমাদের আপৎকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন এক বিষয়ে আমাদের একটা ঘাটতি ছিল— বিশ্বের কোথাও কোনও ভূখণ্ডের উপরে আমাদের দখল ছিল না, যে কারণে শত্রুপক্ষ আমাদের নিয়ে উপহাস করেছে— কিন্তু শীঘ্রই সেই ঘাটতি পূরণ হল ৬ নভেম্বর ১৯৪৩ তারিখে, যখন মহানুভব প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো টোকিও-তে এশিয়ার বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির সম্মেলনে ঘোষণা করলেন যে তাঁর সরকার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের হাতে তুলে দেবে। আমরা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আমাদের নিজেদের চিফ কমিশনার নিয়োগ করেছি কর্নেল এ ডি লোগানাদান— যিনি ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁর নতুন পদে যোগদান করেছেন।

১৯৪৩ সালের শেষের দিকে, পরিস্থিতির এতটাই অগ্রগতি হল যে আমাদের মনে হল আমাদের প্রধান কার্যালয়টি বর্মা দেশে স্থানান্তরিত করা উচিত হবে। ১৯৪৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথমে আপৎকালীন সরকার, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ও আজ়াদ হিন্দ ফৌজের প্রধান কার্যালয়গুলি বর্মা দেশে নিয়ে আসা হল এবং তারপরে এক মাস ধরে চলল বিপুল প্রস্তুতি।

ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখে বর্মা দেশের আরাকান অঞ্চলে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হল। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আরাকানের যুদ্ধ চিরকাল একটা স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত থাকবে— দুটি কারণে। প্রথমত, এখানেই আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলাম এবং দ্বিতীয়ত, এটাই ছিল আজ়াদ হিন্দ ফৌজের প্রথম পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় তারা সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারল। আরাকান যুদ্ধের পরে আর আমাদের কোনও সংশয় রইল না। যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনারা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য সাহসের সঙ্গে ও প্রাণপণ করে লড়াই করবে।

আরাকান যুদ্ধ শুরু হবার এক মাস পরে উপযুক্ত সুযোগ এল যখন আমাদের ফৌজ আরও অগ্রসর হতে পারল। ২১ মার্চ সারা বিশ্বের কাছে আমি ঘোষণা করার সম্মান পেলাম যে আমাদের ফৌজ ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এবং ভারতের মাটিতে লড়াই শুরু হয়েছে। তখন থেকে এই যুদ্ধ ভারতের নিজস্ব যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। এই যুদ্ধ ভারতের মুক্তি যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। এই অনুভূতি যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সেনাদের, এবং সমগ্র পূর্ব এশিয়াব্যাপী ভারতীয়দের মধ্যে এক অভূতপূর্ব অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছে।

আমাদের সেনারা ভারতের সীমানা অতিক্রম করার পরে আমাদের হঠাৎ এক নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হল— ভারতের সদ্য 'মুক্তিপ্রাপ্ত এলাকা'গুলির শাসন ও পুনর্গঠনের সমস্যা। ভাগ্যক্রমে গত বছরেই আমরা এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেছিলাম ও আগে থেকেই কিছু লোককে প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাদের সাহায্যে, ও বিভিন্ন পেশা ও জীবিকায় নিযুক্ত নতুন নাগরিকদের সাহায্যে আমরা গত মার্চ মাসে 'আজ়াদ হিন্দ দল' নামে একটি নতুন সংগঠন গড়ে তুলি। আজ়াদ হিন্দ দল মূলত একটি বেসামরিক প্রতিষ্ঠান হলেও স্বাধীন ভারতবর্ষে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কাজ করবার জন্য এবং আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মতো কঠিন ও দুরূহ অবস্থার মুখোমুখি হবার জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পরম উৎসাহ ও ত্যাগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই আজ়াদ হিন্দ দলের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি, তা থেকে বোঝা যায় যে এই মুহূর্তে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মধ্যে কি বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। আজ়াদ হিন্দ দলের সংগঠনের মাধ্যমে মুক্ত ভারতের শাসন ও পুনর্গঠন সংক্রান্ত যে কোনও দায়িত্ব বহন করবার জন্য আমরা এখন পুরোপুরি প্রস্তুত।

বন্ধুরা! আমাদের গত বছরের কাজের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে আপনারা স্পষ্টই উপলব্ধি করবেন যে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি। ভারতের অভ্যন্তরে আমার বিশ বছরেরও বেশি কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এখানে যে কাজ করা হয়েছে তার ব্যাপ্তি ও প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা আমার আছে। অকৃপণ সহযোগিতার জন্য আমি অবশ্যই আপনাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাব এবং একই সঙ্গে আমি আপনাদের এই কথাও মনে রাখতে বলব যে, অনেক পথই বাকি আছে। আরও উৎসাহের সঙ্গে জনবল, অর্থবল ও রসদ সংগ্রহের কাজ আপনাদের অব্যাহত রাখতে হবে। বিশেষ করে রসদ জোগানো ও যানবাহনের সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান আমাদের করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রশাসন ও পুনর্গঠনের বিভিন্ন ধরনের কাজ করবার জন্য আমাদের প্রয়োজন আরও মহিলা ও পুরুষ। আমাদের সেই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যখন হয়তো শত্রুপক্ষ কোনও একটা নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে চলে যাবার আগে ব্যাপক ক্ষতি করে, সবকিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে তবে পশ্চাদপসরণ করবে এবং সেইসঙ্গে তারা জনসাধারণকে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করবে, যেটা তারা বর্মা দেশে করবার চেষ্টা করেছিল। সব শেষে, কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য ও রসদ পাঠানোর সমস্যা। সেই কাজ যদি আমরা করতে না পারি তা হলে যুদ্ধে আমাদের সাফল্য আমরা অব্যাহত রাখতে পারব না এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আমরা বেশি দূর অগ্রসরও হতে পারব না।

আপনারা যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে কাজ করতে থাকবেন তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা কখনও ভুলে যাবেন না পূর্ব এশিয়া এবং বিশেষ ভাবে বর্মা দেশই আমাদের সমরাভিযানের মূলকেন্দ্র। এই মূল ঘাঁটি দৃঢ় না হলে আমাদের যুদ্ধরত সেনারা কখনই জয়যুক্ত হতে পারবে না। মনে রাখবেন এটা হল একটা 'সামগ্রিক যুদ্ধ'— এই যুদ্ধ শুধু বিবদমান দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে নয়। যে কারণে আমি গত এক বছর ধরে পূর্ব এশিয়াতে 'সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি'-র উপরে এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছি।

আরও একটা কারণে আমি আপনাদের এই ঘরের কর্মক্ষেত্রের উপরে নজর রাখতে অনুরোধ করব। আগামী কয়েক মাস আমার ক্যাবিনেটের যুদ্ধ কমিটির সহকর্মীদের সহায়তায় যুদ্ধ পরিচালনায় আমি আমাদের সবটুকু সময় দিতে চাই এবং ভারতের অভ্যন্তরে বিপ্লবের

উপযুক্ত আবহাওয়া গড়ে তুলতে চাই। সুতরাং আমরা সম্পূর্ণ রূপে নিশ্চিত হতে চাই যে আমাদের অনুপস্থিতিতে এখানকার মূল ঘাঁটিতে কাজ চলতে থাকবে মসৃণ ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

বন্ধুরা! আমি জানি না আপনারা শত্রুপক্ষের প্রচারকৌশলের সঙ্গে পরিচিত আছেন কিনা। সেটা যে শুধু চিত্তাকর্ষক তাই নয়, সেই সঙ্গে মজাদারও বটে। প্রথম তারা আমাদের সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। তারপরে তারা ধীরে ধীরে এর অস্তিত্ব স্বীকার করল ঠিকই, সেইসঙ্গে এও বলতে থাকল যে এটা নিতান্তই প্রচারের কারসাজি। যখন আরাকান অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হল তখন আমাদের সেনাদের যুদ্ধের ক্ষমতা অস্বীকার করবার আর কোনও উপায় রইল না, তবু তাদের বক্তব্যে অনড় থাকল যে এই সেনাবাহিনী কোনওদিন ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে পারবে না। যখন আমরা বাস্তবিক ভারতের সীমানা অতিক্রম করে মণিপুর ও আসামে প্রবেশ করলাম এবং যখন বিশ্বের চোখে আর ধুলো দেওয়া গেল না তখন থেকে শত্রুপক্ষ ও তাদের ভাড়া করা সেনাদল আমাদের উদ্দেশ্যে নিরন্তর বিষোদ্গার করে চলেছে।

আমাদের সেনাদল হল অন্যের হাতের পুতুল— যে প্রচার তারা এখন চালাচ্ছে— এই ক্রীড়নক সেনাদল কোনওদিনই দিল্লি পৌঁছতে পারবে না, কারণ মণিপুর থেকে দেশের রাজধানী বহু বহু দূর। উত্তরে শুধু এটাই বলতে পারি যে মানচিত্রে কোথায় কী অবস্থিত সেই বিষয়ে আমরাও একেবারে অজ্ঞ নই এবং আমরা জানি মণিপুর থেকে দিল্লির দূরত্ব ঠিক কতখানি। আমাদের সেনাদলের বহু সদস্য এসেছেন পূর্ব এশিয়ার দূর দূরান্ত থেকে এবং তাঁরা ইতিমধ্যেই যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসেছেন তা মণিপুর ও দিল্লির দূরত্বে থেকে অনেকই বেশি। এঁরা সকলেই দীর্ঘ যাত্রার জন্য— পাহাড়, উপত্যকা ও গভীর নদী পেরিয়ে তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছবার জন্য প্রস্তুত।

আমাদের শত্রুরা যতক্ষণ আমাদের গালিগালাজ করতে থাকবে ততক্ষণ আমরা নিশ্চিত জানব যে আমরা ঠিক পথে আছি। যখন তারা গালি দেওয়া বন্ধ করে আমাদের প্রশংসা করতে শুরু করবে তখনই জানব আমাদের বিপদ ঘনিয়েছে। এবং যে গালি তারা আমাদের দিচ্ছে, সেই বিষয়ে আমরা বলতে পারি যে কোনও মানুষকে ক্রীড়নক বললেই সে ক্রীড়নক হয়ে যায় না। কোনও একজন ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে কিন্তু ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় যারা পূর্ব এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের বাসিন্দা তাদের সকলকে এক কথায় বিশ্বাসঘাতক বা ক্রীড়নকে পরিণত করা যায় না, শুধুমাত্র দিল্লিতে ভারতবিরোধী রেডিয়োর ভাড়া করা সংবাদপ্রচারকরা তাদের সেই অপবাদ দিচ্ছে বলেই। যাই হোক আমি আপনাদের সকলকে এই সত্য উপলব্ধি করতে বলব যে আমাদের প্রচেষ্টা এ পর্যন্ত এতটাই কার্যকরী হয়েছে যে শত্রুরা আমাদের এবং শুধুমাত্র আমাদেরই বেছে নিয়েছে তাদের গালিবর্ষণের জন্য। আমাদের যে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে তা আমাদের পুরোপুরি উপভোগ করা উচিত হবে।

বন্ধুরা! এক বছর আগে, যখন বিভিন্ন দাবি নিয়ে আমি আপনাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন আমি বলেছিলাম যে আপনারা আমাকে 'সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি'তে সাহায্য করুন, আমি আপনাদের 'দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র' দেব। আমি সেই কথা রেখেছি। আমাদের সংগ্রামের প্রথম পর্যায় সম্পূর্ণ হয়েছে। আমাদের বিজয়ী সেনাদল নিপ্পনের সেনাদলের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে শত্রুদের পিছু হঠিয়েছে ও এখন তারা আমাদের পুণ্য মাতৃভূমিতে অসীম সাহসের সঙ্গে লড়াই করছে। এখন আমাদের সামনে যে কাজ রয়েছে তার জন্য আপনারা

কোমর বাঁধুন। আমি আপনাদের কাছে সৈন্য, অর্থ ও রসদ চেয়েছিলাম, আপনারা তা আমাদের দিয়েছেন অকৃপণ হাতে। এখন আপনাদের কাছে আমার আরও দাবি আছে। শুধুমাত্র সৈন্য, অর্থ ও রসদ দিয়ে যুদ্ধজয় করা যায় না, স্বাধীনতাও অর্জন করা যায় না। আমাদের সেই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন যা আমাদের অমিত শৌর্যে ও সাহসিকতায় অনুপ্রাণিত করবে। জয় আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে— কিন্তু কেবলমাত্র সেইজন্যই যদি আপনারা ভাবেন যে আপনাদের জীবদ্দশায় আপনারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ রূপে দেখতে পাবেন, তা হলে সেটা একটা মারাত্মক ভুল হবে। এখানে উপস্থিত কোনও ব্যক্তি যেন স্বাধীনতা উপভোগ করবেন বলে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা না করেন। আমাদের সামনে দীর্ঘ লড়াই। আমাদের আজ শুধু একটাই আকাঙ্ক্ষা থাকবে— যে আকাঙ্ক্ষা হল আমরা আমাদের জীবন দেব— যাতে ভারতবর্ষ জীবন পায়— সেই আকাঙ্ক্ষা হবে শহীদের মতো মৃত্যুবরণের ইচ্ছা, যাতে আমাদের স্বাধীনতার পথ শহীদের রক্তে ধোওয়া হয়ে যায়।

বন্ধুরা! মুক্তিযুদ্ধে আমার সহযোদ্ধারা! আজ আমি আপনাদের কাছ থেকে সবকিছুর উপরে— একটা জিনিসই প্রার্থনা করব। তা হল রক্ত— শত্রুর আঘাতে সহযোদ্ধাদের যে রক্তক্ষরণ হয়েছে, রক্তই কেবল তার প্রতিশোধ নিতে পারে। রক্ত দিয়েই একমাত্র আমরা আমাদের স্বাধীনতার মূল্য দিতে পারি। আপনারা আমাকে রক্ত দিন, আমি শপথ করছি আপনাদের স্বাধীনতা দেব।

আমাদের জাতির জনক

[মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যে বার্তা, ৬ জুলাই ১৯৪৪ তারিখে বেতার ভাষণ][১]

মহাত্মাজি!

এখন আপনার স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছে এবং আপনি কোনও কোনও জনসভায় যোগ দিতে শুরু করেছেন। সেই জন্য আমার মনে হল আমি এখন আপনার কাছে কিছু কথা বলার সুযোগ নিতে পারি, ভারতবর্ষের বাইরে দেশপ্রেমিক ভারতীয়েরা কী পরিকল্পনা করছেন ও কী কী কাজে ব্যাপৃত আছেন সেই বিষয়ে যাতে আপনাকে কিছুটা আভাস দেওয়া যায়। কিন্তু তার আগে প্রথমেই আপনাকে যে কথা জানাতে চাই তা হল, ব্রিটিশ প্রহরা থেকে অসুস্থতার কারণে হঠাৎ আপনাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এই সংবাদ পাবার পর সারা বিশ্বে ভারতীয়েরা যে যেখানে আছেন সকলেই কয়েক দিন অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। ব্রিটিশ জেলে শ্রীমতী কস্তুরবার দুঃখজনক প্রয়াণের পর, আপনার স্বদেশবাসীরা যে আপনার স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও উদ্বিগ্ন বোধ করবেন সেটাই প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে আপনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন, এবং ৩৮.৮ কোটি ভারতবাসী আপনার পথনির্দেশ ও উপদেশ থেকে উপকৃত থাকবেন। আপনার স্বদেশীয়েরা যাঁরা ভারতের বাইরে বাস করেন আপনার সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব কী সেই বিষয়ে একটু বলি। এই প্রসঙ্গে আমি যা বলব তা আদ্যন্ত সত্য, এবং সত্য ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতবর্ষের বাইরে, এবং ভারতবর্ষের ভিতরেও কিছু ভারতীয় আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন যে ভারতের স্বাধীনতা কেবলমাত্র সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারাই জয় করা সম্ভব, ইতিহাসে সাধারণভাবে যা চিরকাল হয়ে এসেছে। এই পুরুষ ও মহিলারা আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করেন যে ন্যায়অন্যায়ের যুক্তি দিয়ে বা আলোচনার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করে অথবা অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে কোনও দিনও ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত করা যাবে না। তবে, ভারতের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছে, কীভাবে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে সেই পদ্ধতিতে পার্থক্যটা হল সাংসারিক মতবিরোধের মতো। ১৯২৯ সালে ডিসেম্বর মাসে যবে থেকে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্স রেজ়োলিউশন অথবা স্বাধীনতালাভের সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিয়েছেন সে দিন থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সব সদস্যদের সামনে একটাই লক্ষ্য রয়েছে। আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে এখন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার যে উন্মেষ হয়েছে, ভারতের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছে আপনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সেই জাগরণের স্রষ্টা। বিশ্বের সর্বত্র তাঁরা যে প্রচার চালিয়েছেন সেই প্রচারে আপনাকে তাঁরা সেই সম্মানের আসন

---

১ *Blood Bath*, pp. 24-34.

দিয়েছেন যা শুধুমাত্র আপনারই প্রাপ্য। জগতের দরবারে আমরা ভারতের জাতীয়তাবাদীরা সকলে এক—আমাদের একই লক্ষ্য, একই আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনে আমাদের একই শুভ ব্রত। ১৯৪১ সালে ভারত ছেড়ে চলে যাবার পর থেকে ব্রিটিশদের প্রভাবমুক্ত যে ক'টি দেশে আমার যাবার সুযোগ হয়েছে, সর্বত্র আমি দেখেছি আপনার জন্য তারা সর্বোচ সম্মানের আসনটি রেখেছে, গত শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত অন্য কোনও ভারতীয় নেতাকে যে সম্মান দেওয়া হয়নি। প্রতিটি দেশের রাজনীতিতেই আভ্যন্তরীণ জটিলতা থাকে এবং সেই জটিলতা সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব অভিমতেরও পার্থক্য থাকে। কিন্তু সেই পার্থক্যের কারণে, যে ব্যক্তি জাতির সেবায় তাঁর জীবন দিয়েছেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যিনি সারাটা জীবন একটা প্রথম শ্রেণীর আধুনিক শক্তিশালী জাতির সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছেন সেই ব্যক্তির অবদানকে কখনই সমগ্র জাতি তাদের স্বীকৃতি দেওয়া থেকে বিরত হবে না। বস্তুত যে সব দেশ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে থাকে তাদের থেকে, আপনার নেতৃত্বের মূল্য ও আপনার কৃতকর্মের সাফল্য সহস্রগুণ স্বীকৃতি পেয়েছে সেই সব দেশে যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি সহৃদয় নয়। ১৯৪২ সালে আপনি যখন সাহসভরে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করলেন তখন থেকে ভারতের বাইরের দেশপ্রেমিক ভারতীয় ও ভারতপ্রেমী বিদেশি বন্ধুদের মধ্যে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আরও শতগুণ বেড়ে গেছে।

আমি যখন ভারতে ছিলাম তখন ব্রিটিশ সরকারের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি যা শিখেছি এবং যখন আমি ভারতের বাইরে গেলাম তখন ব্রিটেনের নীতি সম্পর্কে গোপন যে সব তথ্য আমার কাছে এল এবং বিশ্বের সর্বত্র ব্রিটেনের যে উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় আমার চোখে পড়েছে, তা থেকে আমি নিশ্চিত যে ব্রিটিশ সরকার কখনই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকে মেনে নেবে না। আজকে ব্রিটিশদের একটাই মতলব, সেটা হল ভারতকে যতদূর সম্ভব শোষণ করে যাওয়া যাতে তারা বর্তমান যুদ্ধে জিততে পারে। এই যুদ্ধে ব্রিটেন তার সাম্রাজ্যের কিছুটা হারিয়েছে তাদের শত্রুদের হাতে ও কিছুটা তার বন্ধুদের হাতে। ব্রিটেনের সহযোগীরা যদি কোনও মতে এই যুদ্ধ জিততে পারে, সেই জিত হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ব্রিটেনের নয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ভবিষ্যতে সর্বপ্রধান শক্তিতে পরিণত হবে ও তার অর্থ হবে ব্রিটেন থাকবে তাদেরই কর্তৃত্বের অধীনে। সেই পরিস্থিতিতে, ব্রিটেনের বর্তমানে যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে সেটা পূরণ করবার জন্য ভারতবর্ষকে তারা আরও নির্মমভাবে শোষণ করতে থাকবে, যা তাদের আগের শোষণকেও হার মানাবে এবং সেই উদ্দেশ্যে, কী ভাবে তারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে চিরতরে নির্মূল করে দেবে তার পরিকল্পনা লন্ডনে ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। গোপন কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমি এই পরিকল্পনাগুলির বিষয়ে জানতে পেরেছি বলে আমি মনে করি যে আপনাকে এই বিষয়ে জানানো আমার কর্তব্য। আমরা যদি মনে করি যে এই বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জনগণের চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্য আছে তাহলে আমরা একটা মারাত্মক ভুল করব। এ কথা অনস্বীকার্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ব্রিটেনেও হয়তো কিছু অল্পসংখ্যক আদর্শবাদী মানুষ আছেন যাঁরা ভারতকে স্বাধীন দেখতে চান। তাঁরা ব্রিটিশ জনসমাজের একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ এবং তাঁদের স্বদেশীয়রাও এই আদর্শবাদীদের উদ্ভট, খেয়ালি বলে মনে করে থাকে। বাস্তবে, ভারতবর্ষের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জনগণের চিন্তাধারা একই প্রকার। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধনীতি ও তাদের উদ্দেশ্যের বিষয়ে আমার ধারণা যে ওয়াশিংটনের শাসকমণ্ডলী এখন সমগ্র বিশ্বের উপরে কর্তৃত্ব করবার স্বপ্ন দেখছে। এই শাসকগোষ্ঠী ও তাদের আদর্শে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীরা

ইতিমধ্যেই খোলাখুলিভাবে বর্তমান শতাব্দীকে 'আমেরিকান শতাব্দী' বলতে শুরু করেছে এবং এই শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এমন চরমপন্থীরাও আছে যারা ব্রিটেনকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঊনপঞ্চাশতম প্রদেশ বলে ঘোষণা করেছে। দেশের মানুষের রক্তক্ষয় না করে যে পদ্ধতিতে আপনি দেশের স্বাধীনতা পেতে চেয়েছেন, যা আপনি সারা জীবন বিশ্বাস করেছেন ও যে নীতি আপনি প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, দেশের ভিতরে ও বাইরে এমন কোনও ভারতীয় নেই যারা আপনার পদ্ধতিতে দেশ স্বাধীন হলে খুশি হবে না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমনই যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্বাধীনতা পেতে গেলে আমাদের রক্তাক্ত পথের মধ্যে দিয়েই এগোতে হবে। যদি আমাদেরই অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে নিজেদের প্রচেষ্টায় দেশের ভিতরে একটা সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হত, তাহলে সেটাই আমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হত। কিন্তু মহাত্মাজি, ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা আপনার থেকে ভাল করে আর কারুর জানা আছে বলে আমি মনে করি না। গত বিশ বছর ধরে আমি ভারতের জনগণের মধ্যে কাজ করছি, সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছি যে দেশের বাইরে থেকে পাওয়া সাহায্য ছাড়া ভারতের মধ্যে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করা অসম্ভব। এই সাহায্য আসতে পারে দেশের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছ থেকে এবং তা ছাড়াও কোনও বৈদেশিক শক্তি বা শক্তিগোষ্ঠীর কাছ থেকে। বর্তমান যুদ্ধ শুরু হবার আগে কোনও বিদেশি শক্তির কাছ থেকে, এমনকী দেশের বাইরে বসবাসকারী ভারতীয়দের কাছ থেকেও কোনও সাহায্য পাওয়া খুবই দুরূহ ছিল। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার পর, ব্রিটিশের শত্রুদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ও সামরিক দুই ধরনের সাহায্য পাবার সম্ভাবনাই এখন বেড়ে গেছে। তবে তাদের কাছ থেকে সাহায্য চাইবার আগে আমাকে আগে বুঝতে হয়েছে যে ভারতের স্বাধীনতার দাবির সম্বন্ধে তাদের অভিমত কী। অনেক বছর ধরে ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র সারা পৃথিবীকে বলেছে যে অক্ষশক্তির দেশগুলি স্বাধীনতার বিপক্ষে, সুতরাং তারা ভারতের স্বাধীনতা লাভেরও বিরুদ্ধে। সেটা কি সত্য? আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছি। সেই জন্যই আমাকে দেশ ছেড়ে বার হতে হয়েছে যাতে আমি সত্য কী সেটা জানতে পারি এবং আরও জানতে পারি অক্ষশক্তির দেশগুলি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছে কিনা।

ঘর ও দেশ ছেড়ে বেরোবার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমাকে ভাবতে হয়েছে বিদেশ থেকে সাহায্য নেওয়া আমার পক্ষে সঠিক হবে কিনা। এর আগে বিশ্বের সর্বত্র যেখানে যে সব বিদ্রোহ হয়েছে তার ইতিহাস আমি পড়েছি ও সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছি কারণ অন্যান্য দেশ যে প্রণালীতে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে আমি সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছি। কিন্তু আমি এমন একটা দৃষ্টান্তও খুঁজে পাইনি যেখানে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দি একটা জাতি তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে বিদেশের কোনও সাহায্য ব্যতিরেকে। ১৯৪০ সালে আমি সেই ইতিহাস আবার পড়ি, এবং আবারও আমি সেই একই সিদ্ধান্তে আসি যে ইতিহাসের পাতায় এমন কোনও উদাহরণ নেই যেখানে দুনিয়ায় কোথাও কোনও জাতি বাইরের কোনও সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতা পেয়েছে। সেই সাহায্য আমার চাওয়া উচিত হবে কিনা সেই নীতিগত প্রশ্নের উত্তরে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে, ও সর্বজনসমক্ষেও সেই একই কথাই বলেছি যে এই সাহায্য আমরা নিতে পারি ঋণ হিসাবে এবং ভবিষ্যতে সেই ঋণ আমরা শোধ করে দেব। উপরন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতো একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্য যদি ভিক্ষার পাত্র নিয়ে সমগ্র পৃথিবী ঘুরতে পারে তাহলে আমাদের মতো পরাধীন ও নিরস্ত্র জাতির পক্ষে ঋণ হিসাবে অন্যের কাছ থেকে সাহায্য

নিতে কী আপত্তি থাকতে পারে? আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে এই বিপজ্জনক পথটি বেছে নেবার আগে আমি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস কাটিয়েছি, এই কাজের পক্ষে ও বিপক্ষে সব যুক্তিগুলি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবার জন্য। এত বছর ধরে আমার যতটা সাধ্য সবটুকু দিয়ে দেশের জনগণের সেবা করার পরে দেশের মানুষের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করব না, এবং আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণও আমি অন্য কাউকে দেব না—আমার সে ধরনের কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই।

আমার পক্ষে সব থেকে সহজ হত ঘরে থাকা এবং এত দিন ধরে যে ভাবে আমি কাজ করে এসেছি সেই ভাবেই কাজ করে যাওয়া। যতদিন এই যুদ্ধ চলছে ততদিন কোনও ভারতীয় কারাগারে বন্দি হয়ে থাকাও আমার কাছে সহজ ছিল। ব্যক্তিগতভাবে তাতে আমার কোনও ক্ষতি ছিল না। স্বদেশের সেবা করবার জন্য সর্বোচ্চ যে সম্মান পাওয়া সম্ভব আমি তাই পেয়েছি দেশবাসীর কাছ থেকে, তাদের উদারতা ও ভালবাসাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এ ছাড়াও আমি বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিয়ে একটা দল গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, আমার উপরে যাঁদের আস্থা ছিল অবিচল। স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় দেশের বাইরে এই বিপজ্জনক ভ্রমণে আমি যে শুধুমাত্র নিজের প্রাণ ও ভবিষ্যতের কর্মজীবনকে বিপন্ন করবার ঝুঁকি নিয়েছিলাম তাই নয়, আমি আমার পার্টির ভবিষ্যৎকেও বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলাম। দেশের বাহির থেকে সাহায্য ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের যদি বিন্দুমাত্র আশাও আমার মনে থাকত তাহলে আমি কখনওই দেশত্যাগ করে ভারতের বাইরে পা বাড়াতাম না। এই যুদ্ধ শুরু হবার সময় থেকে এক সুবর্ণসুযোগ আমাদের হাতে এসেছে; যদি আমার মনে কোনও আশা থাকত যে আমাদের জীবদ্দশায় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই রকম সুযোগ আমরা আবারও পাব তাহলে আমার সন্দেহ আছে যে আমি দেশ ছাড়তাম কিনা। কিন্তু আমি দু'টি বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম : প্রথমত, আগামী একশো বছরে এই সুবর্ণসুযোগ আবার আসবে না, এবং দ্বিতীয়ত, দেশের বাহির থেকে কাজ শুরু না করলে, দেশের ভিতরে শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় আমরা স্বাধীনতা পাব না। এই কারণেই আমি এই বিপদসঙ্কুল কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

ভাগ্য আমার উপর সদয় ছিল এবং বহুবিধ সঙ্কট সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত আমার কাজ পরিকল্পনা অনুসারে চলছে। ভারতবর্ষ ছেড়ে বেরোবার পর আমার প্রথম কাজ ছিল আমার স্বদেশবাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, যেখানেই আমার সুযোগ হয়েছে সেখানেই আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করেছি এবং আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাকে জানাতে পারি যে আমি সর্বত্রই দেখেছি তাঁরা পরিস্থিতি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে কোনও কাজ করতে তাঁরা উদগ্রীব। এর পরে যে দেশগুলির সঙ্গে আমাদের শত্রুর যুদ্ধ চলছে সেই সব দেশের সরকারের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি, এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাদের অভিমত কী সেটা বোঝার চেষ্টা করি। এর ফলে আমি যা জানতে পারলাম তা হল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য অক্ষশক্তির দেশগুলির এখন প্রকাশ্য সমর্থন আছে ও তারা ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন—এত বছর ধরে ব্রিটিশ অপপ্রচার আমাদের ঠিক এর বিপরীত কথাটাই বলে এসেছে। আমি আরও আবিষ্কার করলাম যে আমাদের যে সাহায্যের প্রয়োজন আছে তা তারা দিতে প্রস্তুত, যদি সেটা তাদের সাধ্যের মধ্যে থাকে।

আমার বিরুদ্ধে আমাদের শত্রুরা কী প্রচার চালাচ্ছে তার সবই আমার জানা আছে। কিন্তু

আমার এও জানা আছে যে আমার দেশবাসী, আমার কর্মধারার সঙ্গে যাদের সম্যক পরিচয় আছে, তারা এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবে না। জাতির আত্মসম্মান ও গৌরব রক্ষার্থে আমি সারা জীবন কাজ করেছি এবং সেই জন্য আমি কোনও কষ্ট স্বীকার করতে পিছপা হইনি, সেই আমি অন্য আরেকটি বিদেশি শক্তির কাছে নতি স্বীকার করব, সেটা একেবারেই একটা অচিন্ত্যনীয় ঘটনা। উপরন্তু, কোনও বিদেশি শক্তির কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোনও লাভবান হবার সম্ভাবনা নেই। দেশের জনগণের কাছ থেকে একজন ভারতীয় সর্বোচ্চ যে সম্মান পেতে পারেন সেই সম্মান আমার দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন। বিদেশি শক্তির কাছ থেকে তার থেকে বেশি আমি কী আশা করতে পারি? যাদের কোনও আত্মসম্মান জ্ঞান নেই এবং অন্যের প্রভাব কাজে লাগিয়ে শুধু নিজের পদোন্নতি করাই যাদের জীবনের উদ্দেশ্য তারাই কেবল মাত্র অন্যের হাতের পুতুল হয়ে কাজ করতে পারে।

আমার নিকৃষ্টতম শত্রুও কখনও এ কথা উচ্চারণ করতে সাহস পাবে না যে আমি আমাদের দেশের ও জাতির গৌরব ও আত্মসম্মান অন্যের কাছে বেচে দিতে পারি। এবং আমার নিকৃষ্টতম শত্রুও কখনও এ কথাও জোর গলায় বলতে সাহস পাবে না যে, ভারতবর্ষে কেউ আমাকে চিনত না এবং আমার আত্মগরিমা প্রচার করবার জন্য এখন আমি বিদেশি শক্তির দ্বারস্থ হয়েছি। ভারত যখন ছেড়েছি তখন আমার যা ছিল তার সর্বস্ব, এমনকী আমার জীবনেরও ঝুঁকি আমাকে নিতে হয়েছিল। সেই ঝুঁকি আমি নিতে পেরেছিলাম তার কারণ শুধুমাত্র সেই ভাবেই আমি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করতে পারব বলে।

অক্ষশক্তির বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখনও বাকি আছে। এমনকী হতে পারে যে আমি তাদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছি? আমার বিশ্বাস ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতাদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান ও ধূর্ত রাজনীতিবিদ দুনিয়ায় পাওয়া যাবে না এবং এটা সর্বজনেই স্বীকার করে থাকে। আমি সারা জীবন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের সঙ্গে কাজ করেছি ও তাদের সঙ্গে লড়াই করেছি, আমাকে প্রতারণা করা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের রাজনীতিবিদদের সাধ্যের বাইরে বলেই আমি মনে করি। যদি ব্রিটিশ রাজনীতিবিদেরা আমাকে মিষ্টি কথায় ভোলাতে বা জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে না পেরে থাকে, সেই ক্ষেত্রে অন্য কোনও রাজনীতিবিদও তা পারবে না। এবং ব্রিটিশ সরকারের হাতে আমি বহুদিন কারাগারে বন্দি থেকেছি, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছি ও শারীরিক অত্যাচার সহ্য করেছি। কিন্তু তবু তারা যখন আমার মনোবল ভাঙতে পারেনি, অন্য কোনও শক্তিও তা পারবে না। তা ছাড়াও আপনি জানেন যে আমি আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের এক আগ্রহী ছাত্র এবং বর্তমান যুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই কিছু আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল। সুতরাং আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমি এতটা অনভিজ্ঞ নই যে কোনও তুখোড় ও ধূর্ত রাজনীতিবিদ আমাকে বোকা বানাবে। সব শেষে, যদিও সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি, সেটা হল যে আমি অক্ষশক্তির মতামত সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির শীর্ষস্থানীয় নেতা, যাঁরা তাঁদের নিজের দেশে গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলাম। সুতরাং আমি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারি যে আমার দেশবাসী আন্তর্জাতিক বিষয়গুলিতে আমার বিচারবুদ্ধির উপরে পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন। প্রবাসী ভারতীয়েরা সাক্ষ্য দেবেন যে ভারতবর্ষ ছাড়ার পরে আমি কখনও এমন কোনও কাজ করিনি যা আমার দেশের গৌরবহানি করবে বা আমাদের জাতীয় সত্তার অবমাননা করবে অথবা

আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হবে। অপরপক্ষে আমি যা কিছু করেছি সবই আমার দেশের মঙ্গলের জন্য, জগতের কাছে ভারতের গৌরববৃদ্ধির জন্য এবং ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের সাফল্যের জন্য।

মহাত্মাজি, পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ শুরু হবার সময় থেকে আমাদের শত্রুপক্ষ জাপানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অপমানজনক প্রচারাভিযান চালিয়েছে। সেই কারণে আমি সেই দেশটির বিষয়ে দুই এক কথা বলতে চাই, বিশেষত, এই মুহূর্তে যখন আমি জাপানের সরকার, সেনাবাহিনী ও সেই দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করছি। এমন একটা সময় ছিল যখন জাপানের সঙ্গে আমাদের শত্রুপক্ষের যথেষ্ট মিত্রতা ছিল। যতদিন ইংরেজদের সঙ্গে জাপানের মিত্রতা ছিল, আমি জাপানে আসিনি। যতদিন এই দুই দেশের মধ্যে সাধারণ কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল, আমি জাপানে আসিনি। আমি জাপানে এলাম আমার স্বাধীন ইচ্ছানুসারে যখন জাপান তার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিল, অর্থাৎ যখন তারা ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। বহুসংখ্যক দেশবাসীর মতো আমিও বহু বছর ধরে জাপান-বিরোধী প্রচারপত্রগুলি পড়েছি। আমার বহুসংখ্যক দেশবাসীর মতো আমিও বুঝতে পারিনি কেন ১৯৩৭ সালে জাপান চিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। এবং ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালের বহুসংখ্যক দেশবাসীর মতো আমারও সহানুভূতি ছিল চুঙকিঙের দিকে। আপনার হয়তো মনে থাকতে পারে যে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে আমার উপর চুঙকিঙে চিকিৎসকদের একটি দলকে পাঠানোর দায়িত্ব ছিল। কিন্তু জাপানে আসার পর আমি যা উপলব্ধি করেছি এবং যা হয়তো দেশের বহু লোকে এখনও উপলব্ধি করতে পারেনি তা হল পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে সারা বিশ্বের প্রতি, ও বিশেষভাবে এশিয়ার দেশগুলির প্রতি জাপানের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। এবং এই পরিবর্তন যে শুধু সরকারি স্তরে ঘটেছে তা নয়, জাপানের জনগণের মধ্যেও এই পরিবর্তন দেখা গেছে। এক নতুন সচেতনতা যেন জাপানবাসীদের মনকে আপ্লুত করেছে যা এশীয় জাতিদের প্রতি তাদের সচেতনতা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। ফিলিপাইন, বর্মা দেশ ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জাপানের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা আছে সেই পরিবর্তনের মধ্যেই। এবং চিনের বিষয়েও যে তাদের নীতির পরিবর্তন ঘটেছে তাও ওই একই কারণে। আমার জাপান ভ্রমণের পরে, সে দেশের বর্তমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তোলার পরে আমার মনের মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে এশীয় দেশগুলির প্রতি জাপানের বর্তমান নীতি যে সকলকে প্রতারণা করবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে তা নয়, বরং তার মূলে আছে তাদের আন্তরিকতা। ইতিহাসে এই প্রথম যে এমন ঘটনা ঘটল, অর্থাৎ সমগ্র জাতির মধ্যে অকস্মাৎ এক নতুন সচেতনতা দেখা দিল, তা নয়। ফরাসি বিপ্লবের সময় এবং রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লবের সময়েও এমন ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে আমার দ্বিতীয় বার জাপান ভ্রমণের পরে আমি ফিলিপাইনে গেলাম, ফিলিপিনো নেতাদের সঙ্গে দেখা করলাম ও সেখানে সব কিছু নিজের চোখে দেখলাম। আমি বর্মা দেশেও বেশ কিছুদিন আছি, এখানেও স্বাধীনতা ঘোষণার পরে সব কিছু নিজের চোখে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে। এবং আমি চিন দেশেও গিয়েছি দেখবার জন্য যে জাপানের এই নতুন নীতি কতটা বিশ্বাসযোগ্য, সেটা কি সত্য না মেকি। চিন দেশের জনসাধারণ যা চেয়েছিল তার প্রায় সব কিছুই তারা পেয়েছে জাপান ও চিন দেশের জাতীয় সরকারের মধ্যে সর্বাধুনিক চুক্তি অনুসারে। এই চুক্তির শর্ত

অনুযায়ী, তাদের মধ্যে সংঘর্ষ থামলে চিন দেশ থেকে জাপান তাদের সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে। তাহলে চুঙকিঙ-চিন আর কীসের জন্য লড়াই করছে? কেউ কি এমন কথা বিশ্বাস করবে যে ব্রিটেন ও আমেরিকা শুধু মাত্র পরোপকার করবার ইচ্ছাতে চুঙকিঙ-চীনকে সাহায্য করছে? এখন ব্রিটেন ও আমেরিকা জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য চুঙকিঙ-চিনকে যে সাহায্য করে চলেছে, একদিন কি তারা তার মূল্য অবশ্যই দাবি করবে না? আমি তো স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে অতীতে জাপানের প্রতি তাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল বলে আজ চুঙকিঙ-চিনকে ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছে বন্ধক রাখতে হচ্ছে। জাপান যদি চিন দেশের প্রতি তাদের নতুন নীতির প্রয়োগ না করত তাহলে না হয় জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ব্রিটেন ও আমেরিকার কাছে চিনাদের সাহায্য চাইবার যুক্তি বা অজুহাত থাকত। কিন্তু এখন যখন চিন-জাপানের সম্পর্কের মধ্যে একটা নতুন পর্যায়ের সূচনা হচ্ছে তখন জাপানের বিরুদ্ধে চুঙকিঙয়ের এই অর্থহীন লড়াই চালিয়ে যাবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণই নেই। এতে চিন দেশের জনগণের কোনও মঙ্গল হবে না, নিশ্চিতভাবে এশিয়ারও কোনও উপকার হবে না। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে আপনি বলেছিলেন যে আপনি চিন ও জাপানের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করতেন যদি আপনার সেটা করবার স্বাধীনতা থাকত। কথাটার মধ্যে একজন বিরল কূটনীতিবিদের চিন্তার ছাপ রয়েছে। ভারতীয়দের দাসবৎ পরাধীন অবস্থাই চিনের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলার মূল কারণ। ভারতবর্ষের উপরে ব্রিটিশদের এই প্রভুত্বের জন্যই ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পক্ষে চুঙকিঙকে এই ভ্রান্ত আশ্বাস দেওয়া সম্ভব হয়েছে যে চুঙকিঙে যথেষ্ট সাহায্য পাঠানো যাবে যা তাদের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার রসদ জোগাতে থাকবে। আপনার এই চিন্তা সর্বাংশে নির্ভুল ছিল যে ভারত যদি স্বাধীন হত তাহলে তারা চিন ও জাপানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করত। আমি তার থেকে এক ধাপ এগিয়ে যাব ও বলব যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ আপনা থেকেই চুঙকিঙ ও জাপানের মধ্যে একটা সম্মানজনক পারস্পরিক বোঝাপড়ার সূচনা করবে, কারণ চুঙকিঙের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াতে তারা কী ধরনের অর্বাচীনতার পরিচয় দিচ্ছে। পূর্ব এশিয়াতে আসবার পরে চিন দেশের ভ্রমণের পর থেকে আমি সেখানকার পরিস্থিতি আরও গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছি। আমি জানি চুঙকিঙ এখন একনায়কত্বের শাসনব্যবস্থার অধীন। ব্যক্তিগতভাবে একনায়কত্বের নীতির সঙ্গে আমার কোনও বিরোধিতা নেই যদি সেটা ন্যায়সঙ্গত নীতি হয়। কিন্তু চুঙকিঙে যে একনায়কত্বের শাসন চলছে তা স্পষ্টতই বিদেশি আমেরিকানদের দ্বারা প্রভাবিত। যদি জাপানকে কোনওভাবে পরাস্ত করা যায় তাহলে তারাই এশিয়ার সব থেকে শক্তিশালী দেশে পরিণত হতে পারবে এই মিথ্যা আশার ভিত্তিতেই চুঙকিঙের শাসকগোষ্ঠী হোয়াইট হাউস ও হোয়াইটহলের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে এই অশুভ আঁতাতে যোগ দিয়েছে। চুঙকিঙ সরকার ভারতবর্ষে যে প্রচার অভিযান চালিয়েছে তার সঙ্গে আমার কিছুটা পরিচয় আছে এবং কী ভাবে তারা ভারতবাসীদের অনুভূতিতে ঘা দিয়ে তাদের কাছ থেকে সহানুভূতি আদায় করবার চেষ্টা করেছে তাও আমি জানি। কিন্তু, চুঙকিঙ যেখানে ওয়াল স্ট্রিট ও লম্বার্ড স্ট্রিটের কাছে নিজেদের বন্ধক রেখেছে, সেই ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবার আর কোনও প্রয়োজন নেই, এ কথা আমি অকপটে বলতে পারি, বিশেষতঃ জাপান যখন চিনের প্রতি তাদের নতুন নীতি প্রবর্তন করেছে।

মহাত্মাজি, কোনও ফাঁকা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে ভারতবাসীরা কী গভীর সন্দেহ পোষণ করে

থাকে সেই বিষয়ে আপনার থেকে ভালভাবে আর কারুরই জানা নেই। জাপান যে নীতি ঘোষণা করেছে তা যদি কেবলই ফাঁকা প্রতিশ্রুতি হত তাহলে আমি সেই প্রতিশ্রুতিতে মোটেই বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এই বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপান কী ভাবে ফিলিপাইনস, বর্মা ও জাতীয় চিনের মতো দেশগুলিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। জেনারেল তোজোর মধ্যে জাপান এমন একজন নেতা ও প্রধানমন্ত্রীকে পেয়েছে যাঁর কথার দাম আছে, তিনি যা ঘোষণা করেন তার সঙ্গে তাঁর কাজেরও সঙ্গতি আছে এবং তিনি এমন একজন ন্যায়নিষ্ঠ নেতা যিনি তুলনামূলক বিচারে তাঁর সমসাময়িক নেতৃমণ্ডলীর থেকে অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠতর।

এবারে ভারতের কথায় আসি। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে জাপান তার কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে তাদের প্রচেষ্টা আন্তরিক। এমন একটা সময় ছিল যখন লোকে বলত যে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে জাপানের স্বার্থান্বেষী উদ্দেশ্য আছে। যদি তাই সত্য হয় তাহলে তারা কেন স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দেবে? কেন তারা স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারের হাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিকার তুলে দেবে? পোর্ট ব্লেয়ারে কেন এই মুহূর্তে একজন ভারতীয় চিফ কমিশনার নিযুক্ত রয়েছেন? সব শেষে, যদিও সেটাও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কেন তারা পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিঃশর্তে সাহায্য করবে? পূর্ব এশিয়া জুড়ে সর্বত্র ভারতীয়েরা বসবাস করছেন এবং জাপানকে খুব কাছ থেকে দেখবার, জানবার অনেক সুযোগ তাঁদের হয়েছে। পূর্ব এশিয়ার এই ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়েরা যদি জাপানের উদ্দেশ্যের আন্তরিকতায় বিশ্বাস না করে থাকেন তাহলে কেন তাঁরা জাপানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতায় কাজ করবার নীতি গ্রহণ করছেন? আপনি হয়তো একজন ব্যক্তিকে জোর করে অথবা কোনওভাবে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আপনার কথা মতো কাজ করাতে পারেন কিন্তু পূর্ব এশিয়া জুড়ে বিভিন্ন স্থানে যে ভারতীয়েরা বাস করছেন তাঁদের সকলকে কি তাই করা সম্ভব?

পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা যদি নিজেদের তরফ থেকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা না করে এবং চূড়ান্ত স্বার্থত্যাগ ছাড়াই জাপানের কাছ থেকে সাহায্য চাইতেন তাহলে সেটা অন্যায় হত। কিন্তু, একজন ভারতীয় হিসাবে আমি এই কথা বলতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত বোধ করছি যে পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয়েরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সৈন্য, অর্থ ও রসদ সংগ্রহের জন্য যারপরনাই চেষ্টা করেছেন। গত বিশ বছর ধরে স্বদেশে অর্থ ও রসদ সংগ্রহের এবং জাতীয় সেবার জন্য সৈন্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আজ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়েরা যে অসাধারণ স্বার্থত্যাগ করছেন তার প্রকৃত মূল্যায়নের ক্ষমতা আমার আছে বলে আমি দাবি করতে পারি। তাঁদের প্রচেষ্টা এক কথায় চমকপ্রদ। এবং তাঁরা নিজেরা এই চমকপ্রদ প্রচেষ্টায় রত আছেন এবং সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করবার জন্য তাঁদের মানসিক প্রস্তুতি আছে বলেই কিছু কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা আমরা নিজেরা জোগাড় করতে পারছি না, যেমন অস্ত্র ও গোলাবারুদ ইত্যাদি, সেই সামগ্রীগুলি জাপানের কাছ থেকে সাহায্য হিসাবে নেবার বিষয়ে আমি কোনও আপত্তির কারণ দেখছি না।

মহাত্মাজি, এবার আমি আমাদের আপৎকালীন সরকার, যা আমরা এখানে গঠন করতে পেরেছি সেই বিষয়ে আপনাকে কিছু বলব। জাপান ও জার্মানি ছাড়াও বন্ধুভাবাপন্ন আরও সাতটি দেশ আজাদ হিন্দের (স্বাধীন ভারতের) আপৎকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা

ভারতবর্ষকে সমগ্র বিশ্বের চোখে এক নতুন সম্মান ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। আপৎকালীন সরকারের লক্ষ্য একটাই তা হল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। ভারতবর্ষ থেকে আমাদের শত্রুদের বিতাড়িত করার পর দেশে আইন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই এই সরকারের দায়িত্ব শেষ। তখন স্বাধীন ভারতবর্ষের জনগণ স্থির করবেন তাঁরা কী ধরনের সরকার চান এবং কে সেই সরকারের নেতৃত্ব দেবেন। আমি আপনাকে এই আশ্বাস দিতে পারি, মহাত্মাজি যে আমি এবং আমার সঙ্গে যাঁরা কাজ করছেন, আমরা সকলেই নিজেদের ভারতীয় জনগণের সেবক মনে করে থাকি। আমাদের এই প্রচেষ্টা, আমাদের সংগ্রাম ও আমাদের আত্মত্যাগের একটি পুরস্কার আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, তা হল আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে রাজনীতি থেকে অবসর নিতে চান। বাকিরা স্বাধীন ভারতবর্ষে যে কোনও কাজে নিজেদের নিযুক্ত করবেন, সে কাজ যত সামান্যই হোক না কেন। যে আদর্শ আজ আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করছে তা হল ব্রিটিশদের অধীনে কোনও উচ্চ পদে আসীন হবার থেকে স্বাধীন ভারতবর্ষে একজন ঝাড়ুদারের কাজ করাও ঢের বেশি সম্মানজনক। আমরা সকলেই জানি যে স্বদেশে লক্ষ লক্ষ সক্ষম স্ত্রী পুরুষ আছেন, স্বাধীনতা অর্জনের পরে যাঁদের উপরে নির্দ্বিধায় ভারতবর্ষের ভাগ্য সঁপে দেওয়া যেতে পারে।

শেষ ব্রিটিশ শাসক ভারতবর্ষের মাটি থেকে বিতাড়িত হওয়া পর্যন্ত জাপানের কাছ থেকে আরও কত সাহায্য আমাদের নিতে হবে তা নির্ভর করবে দেশের ভিতরে আমরা কতটা সহযোগিতা পাব তার উপরে। সাহায্য নেবার জন্য জাপানের দিক থেকে আমাদের উপরে কোনও অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হচ্ছে না এবং যদি ভারতীয় জনগণ তাদের নিজস্ব ক্ষমতায় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে তাহলে জাপানও আনন্দিত হবে। ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পরে আমরাই তাদের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলাম কারণ আমাদের শত্রুপক্ষও অন্যের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করছিল। তবে আমার আশা এই যে দেশে আমাদের স্বদেশবাসীর কাছ থেকে আমরা এত সহযোগিতা পাব যে জাপানের কাছ থেকে আমাদের ন্যূনতম সাহায্য নেবার প্রয়োজন হবে। নিজস্ব প্রচেষ্টায় ভারতবাসী যদি নিজেদের মুক্ত ও স্বাধীন করতে পারে, অথবা ব্রিটিশ সরকার যদি আপনার ‘ ভারত ছাড়ো’ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে সেই অনুসারে কাজ করে তাহলে আমাদের থেকে কেউ বেশি আনন্দিত হবে না। কিন্তু এই দু’টি ঘটনার কোনওটাই ঘটবে না এবং সশস্ত্র সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী এই অনুমানের উপর ভিত্তি করেই আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছে।

মহাত্মাজি, শেষ করবার আগে আমি আরও একটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই এবং সেই বিষয়টি হল এই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল। যুদ্ধে তাদের জয় অনিবার্য সেই বিষয়ে আমাদের শত্রুপক্ষ যে প্রচার চালাচ্ছে আমি সেই বিষয়ে ভাল মতোই অবহিত আছি কারণ তারা সেই ধারণাই মানুষের মনে গেঁথে দিতে চায়। আমার আশা যে আমার স্বদেশবাসী সেই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবে না এবং যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির জয় হবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে কোনও রকম আপোষ করবে না। যুদ্ধ চলাকালীন আমি সারা পৃথিবী পর্যটন করেছি আমার চোখ ও কান খোলা রেখে, ভারত-বর্মা সীমান্তে ও ভারতের অভ্যন্তরে আমি শত্রুপক্ষের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাগুলিও দেখেছি, এবং আমাদের নিজস্ব ক্ষমতা ও যুদ্ধের প্রয়োজনীয় রসদের কথা মনে রেখে চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাদের সাফল্য সম্পর্কে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আমি নির্বোধ নই, সেই কারণে শত্রুর ক্ষমতাকে আমি

তুচ্ছ করে দেখি না। আমি জানি এক অতি দীর্ঘ ও কঠিন সংগ্রাম আমাদের সম্মুখে রয়েছে। তাদের সাম্রাজ্যকে বাঁচাবার জন্য ভারতের মাটিতে ব্রিটেন মরণপণ করে লড়াই করবে, এবং তারা লড়বে সাহসের সঙ্গে। কিন্তু সেই লড়াই যত দীর্ঘ ও যত কঠিন হোক না কেন ফলাফল আমার জানা আছে—তা হল আমাদের জয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম শুরু হয়েছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাহসী সেনারা এখন ভারতের মাটিতে লড়ছে এবং অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তারা এগিয়ে চলেছে, ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে। এই সশস্ত্র অভিযান চলতে থাকবে, যতদিন না শেষ ব্রিটিশ শাসক ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয় এবং আমাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা নতুন দিল্লির ভাইসরয়ের প্রাসাদে সগৌরবে উত্তোলিত হয়।

আমাদের জাতির জনক আপনি : দেশের স্বাধীনতা অর্জনের এই পবিত্র যুদ্ধে আমরা আপনার আশীর্বাদ ও শুভকামনা প্রার্থনা করি।

জয় হিন্দ

৪৪

ইউরোপের পরিস্থিতি

[৮ জুলাই ১৯৪৪, একটি বেতার ভাষণ][১]

বন্ধুরা ও স্বদেশবাসীরা:

আজ আমি আপনাদের কাছে ইউরোপের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে চাই, বিশেষভাবে ভারতবর্ষ ও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে। যা বলব তা একান্তভাবেই আমার ব্যক্তিগত মতামত, অন্য কারুর নয়। আমি আশা করি ও বিশ্বাসও করি যে আমার তথ্যনির্ভর এই সমীক্ষা— অন্তত কিছুটা হলেও— বাস্তবকে দেখতে আপনাদের সাহায্য করবে। যে কোনও একটা রাজনৈতিক বা সামরিক পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে হলে সব সময়েই আশঙ্কা থাকে যে সেই মূল্যায়নে হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতসারে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন দেখতে চাই। ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অনিচ্ছা বা স্বপ্নচারিতাতে বিচারবুদ্ধি যদি এতটাই প্রভাবদুষ্ট হয় তা হলে সেই মূল্যায়নের কোনও বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। বর্তমান ক্ষেত্রে, ইউরোপের পরিস্থিতির এই বিচারে আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছি যাতে ব্যক্তিগত কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষা আমার বিচারক্ষমতাকে খর্ব না করে। সেটা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়নি কারণ এই বিষয়ে পক্ষপাতিত্বে আমার কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হবে না এবং তা ছাড়াও, ভারতবর্ষের পরিস্থিতি যে ইউরোপীয় পরিস্থিতির উপরে কোনওভাবেই নির্ভরশীল নয় ও ইউরোপে যাই ঘটুক না কেন ভারতীয় জনগণ যে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিজয়ী হবে সেই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

এই আলোচনার প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করবার জন্য আমি প্রথমেই যে প্রশ্নের উত্তর দেব তা হল, কীভাবে ও কেন মিত্রশক্তি গোষ্ঠী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জয়ী হল ও কেনই বা জার্মানির পরাজয় ঘটল। এর মূলে দুটি কারণ আছে। গত বিশ্বযুদ্ধে ফরাসি জনগণ মনে করেছিল যে তারা লড়াই করছে তাদের স্বদেশের জন্য— জীবনে সব থেকে যা মূল্যবান বলে তারা মনে করে— সেই ভিটেমাটি রক্ষা করবার জন্য এবং এ ছাড়াও অ্যালসাশ-লোরেইন যা আগে ফরাসিদের অধীনে ছিল সেই অঞ্চলটি পুনর্দখল করবার জন্য তাদের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল। তার ফলে ফরাসি জনগণ অত্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ও উদ্দীপ্তভাবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল— যাকে বলে জীবন-মরণ পণ করে। অপরপক্ষে জার্মান সেনাবাহিনী— যদিও তারা অত্যন্ত দক্ষ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্রেরও কোনও অভাব ছিল না কিন্তু ফরাসি সেনাদের মধ্যে যে উদ্দীপনা ছিল, জার্মানদের মধ্যে তার অভাব ছিল। দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে মানসিকতার এই পার্থক্য আরও ভালভাবে জানা যাবে মিত্রগোষ্ঠীর সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফশের স্মৃতিচারণ থেকে। আরও একটা কারণ হল জার্মানির আভ্যন্তরীণ

---

১. Blood Bath, pp. 35-43.

অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল দুর্বল ও তার ফলে দীর্ঘ অবরোধের ক্ষমতা তাদের ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতি ঠিক তার বিপরীত। জার্মানরা লড়ছে যা তারা তাদের ন্যায্য দাবি বলে মনে করে, তার জন্য। যুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই সমগ্র জাতির মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং এই ধারণা প্রতিটি জার্মান সেনার মধ্যে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছে যে যদি এই যুদ্ধে তাদের পরাজয় ঘটে তা হলে জার্মান জাতির আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। তার ফলে গত যুদ্ধের সময় মিত্রগোষ্ঠীর, বিশেষত ফরাসি সেনাদের মধ্যে যে বিপুল উদ্দীপনা ছিল— এখন সেই একই উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেছে জার্মান সেনাদের মধ্যে। তাদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বলতে হলে, গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে তারা যুদ্ধের জন্য সামরিক প্রস্তুতি নিতে শিখেছে ও চার-বছর ব্যাপী পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ। অধিকন্তু, রাশিয়া ছাড়া এখন ইউরোপের অধিকাংশ এলাকা তাদের করতলগত হওয়ার ফলে যুদ্ধ চলাকালীন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থারও প্রভূত উন্নতি হয়েছে, যে কারণে তারা দীর্ঘকালীন সমরাভিযানের ক্লেশ সহ্য করতে পারবে ও নৌবাহিনীর অবরোধও তারা দীর্ঘ দিন ধরে প্রতিহত করতে পারবে।

আমাদের আরও মনে রাখতে হবে যে গত যুদ্ধে ফরাসি ও ইতালীয়রা জার্মানির বিরুদ্ধে লড়ছিল। ফ্রান্সের দিক থেকে কখনওই তাদের শক্তি ও শৌর্যের অভাব ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স ও ইতালি ছাড়া ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল জার্মানির প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত। সেই পরিস্থিতির সঙ্গে আজকের এই যুদ্ধের পরিস্থিতির আকাশ-পাতাল তফাত! রাশিয়া ছাড়া সমগ্র ইউরোপ এখন জার্মানির অধিকৃত এবং রাশিয়াই হল জার্মানির একমাত্র গুরুতর সমস্যা। ইতালি ও ফ্রান্সে মিত্রশক্তির অগ্রগতি জার্মানদের জন্য অতিরিক্ত ক্লেশ ও চাপের সৃষ্টি করলেও তা তাদের মনোবলকে আরও সুদৃঢ় করেছে। মিত্রশক্তি গোপনে ইতালির রাজা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাদোলিও-র সঙ্গে চুক্তি করায় সেই বিষয়ে ইতালীয়দের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে তাতে যে মিত্রশক্তি অত্যন্ত নিরাশ হয়েছে সে কথা সকলের জন্য। তারা ঠিক ততটাই নিরাশ হয়েছে ফ্রান্সে তাদের অগ্রগতিতে ফরাসি জনগণের আগ্রহের অভাব দেখে। আমার এই বিবৃতি যদি কেউ অস্বীকার করতে চান তা হলে তাঁকে অনুগ্রহ করে ফ্রান্স থেকে পাঠানো আমেরিকান যুদ্ধ সাংবাদিকদের প্রতিবেদনগুলি পড়ে নিতে অনুরোধ করব।

জানি অনেকেরই এই কথা ভাবার অভ্যাস আছে যে ভাগ্য সর্বদাই ব্রিটিশদের অনুকূলে থাকে ও সব শেষের যুদ্ধে যেন তেন প্রকারেণ তারা ঠিক জয়কে করায়ত্ত করে নেবে। কিন্তু কেবলমাত্র সরলমতি অর্বাচীনের পক্ষেই এই কথা চিন্তা করা সম্ভব। ইতিহাস বড়ই কঠিন পর্যবেক্ষক এবং দেখা যাবে যে কোনও বিশাল অর্থবহ ঐতিহাসিক ঘটনা বিনা কারণে ঘটে না। প্রতিটি ঘটনার পিছনে বিশেষ কারণ থাকে। গত বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়ের পিছনেও কতগুলি কারণ ছিল। সুতরাং আমাদেরও চিন্তা করে দেখতে হবে ইউরোপে এখন কী ঘটনাসমূহ ঘটছে এবং সেই ঘটনাগুলি থেকে এই যুদ্ধের সম্ভাব্য ফলাফল কী হতে পারে।

আমি ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২-এর শেষ পর্যন্ত ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করব ও সেই সূত্র ধরে আজকের পরিস্থিতিতে কী ঘটতে চলেছে সেই বিষয়ে বলব। আপনাদের মনে থাকতে পারে যে ১৯৪০ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪১ ও ১৯৪২ সালে ব্রিটিশরা যখন একের পরে এক যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যুদস্ত হচ্ছে এবং তাদের অবস্থা যখন অত্যন্ত সঙ্গীন, তখন তারা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে যাতে তাদের দেশের জনসাধারণের মনোবল যেন অটুট থাকে।

সেই সময়ে তারা প্রতিদিন আমেরিকাতে কীভাবে বিপুল সংখ্যক যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন করা হচ্ছে সেই বিষয়ে প্রচার করে গেছে যা থেকে জনসাধারণের মনের মধ্যে এই ধারণা হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া যুদ্ধসামগ্রী এবং অর্থ সাহায্য ব্রিটেনকে যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করবে। ভারতের বিষয়ে তাদের প্রচারে ব্রিটেন অনবরত বলেছে যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে পুনর্গঠনের জন্য তারা কত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রেখেছে ও সেইজন্য তারা কত কমিটি গঠন করেছে— যুদ্ধে তাদের জয় যে অবশ্যম্ভাবী সেই ধারণা যাতে ভারতীয়দের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়, যদিও আমেরিকা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত সেই প্রচারে বিশেষ কোনও কাজ হচ্ছিল না। তারপর থেকে অবশ্য ইউরোপে যুদ্ধের মোড় কিছুটা ঘুরেছে মিত্রশক্তির পক্ষে। কিন্তু যদি কেউ সতর্কভাবে ইউরোপে যুদ্ধ পরিস্থিতি ও সাম্প্রতিক কালের সাফল্যের পর্যালোচনা করে তা হলে দেখা যাবে এই সাফল্যের পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে আমেরিকার সাহায্য ও রসদের জোগান। যদি দেখা যায় এই মুহূর্তে মিত্রশক্তির শিবিরে সেনাদের মনোবল দু'বছর আগে যা ছিল তার থেকে অনেক গুণ বেড়েছে— তার কারণও সেই একই, অর্থাৎ অংশত বা সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার কাছ থেকে রসদের যোগান পাওয়ার ফলে। পৃথকভাবে শুধুমাত্র ব্রিটিশদের মনোবলের কথা বলতে হলে কিন্তু দেখা যাবে— তুলনামূলকভাবে তা আগের মতোই দুর্বল। সেই কারণেই ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট রুজ়ভেল্টের কাছে পুরোপুরি নতি স্বীকার করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী মিস্টার উইনস্টন চার্চিল— আগে যাঁর অহমিকার শেষ ছিল না— প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে এখন একজন আমেরিকান সেনাপতির অধিনায়কত্ব স্বীকার করে নিতে হয়েছে— মূল্যবান ব্রিটিশ শাসিত ভূখণ্ডের অধিকার ছেড়ে দিতে হয়েছে আমেরিকান সহযোগীদের হাতে— এবং ব্রিটেনের অভ্যন্তরেও তাঁকে আমেরিকানদের জন্য বিশেষ অধিকার দিতে হয়েছে— যেখানকার আইনকানুন ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এর থেকে আরও যা উল্লেখযোগ্য— তা হল মিস্টার চার্চিলের অধীনস্থ শাসকমণ্ডলী এবং তাদের বুদ্ধিজীবী সমর্থকের গোষ্ঠী এক কথায় 'আমেরিকানদের শতাব্দী'-র মার্কিনি ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। অর্থাৎ তারা আমেরিকানদেরই বৃহত্তর শক্তি রূপে স্বীকার করে নিয়েছে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নিজেদের অধিকারভুক্ত রাখতে গেলে, কেবলমাত্র আমেরিকানদের সহায়তা বা অনুমোদন পেলেই যে তা করা সম্ভব হবে এটাও তারা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবির প্রশ্নে ব্রিটিশদের উপরে কোনও চাপ দিতে আমেরিকানদের অনিচ্ছুক মনোভাবের ব্যাখ্যার মূল সেইখানেই। স্পষ্টতঃই ব্রিটেনের অভিপ্রায় হল যে এই যুদ্ধের শেষ হওয়া মাত্রই তারা ভারতের উপরে আরও নির্মম শোষণ চালাবে এবং বর্তমান যুদ্ধে তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে— অংশত হলেও— সেই ক্ষতি তারা যথাসম্ভব উশুল করে নিতে চেষ্টা করবে। এই উদ্দেশ্যে লন্ডনে ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা রচিত হয়ে গেছে যে এই যুদ্ধের শেষে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন তারা নির্মূল করে দেবে চিরকালের জন্য। এখনও পর্যন্ত সেই আন্দোলনকে নির্মূল করতে তারা যে ব্যর্থ হয়েছে সেটা ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের জানা আছে। 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' বা বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে পদানত রাখার নীতি যা তারা এতদিন ধরে অনুসরণ করে এসেছে, এবং ভারতের রাজাদের, মুসলমানদের ও তথাকথিত দলিত শ্রেণীর জনগণের উসকানি দিয়ে তারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষতিসাধনের যে চেষ্টা তারা করে এসেছে, সব প্রচেষ্টাগুলি ঠিক একইভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সেই কারণে, ভবিষ্যতে ভারত সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য ব্রিটিশ রাজনীতিবিদেরা তাদের নিজস্ব যে পদ্ধতিটি

বেছে নিয়েছে তা অনেকাংশেই পৃথক। আমি এই বিষয়ে অন্য কোনও সময়ে আলোচনা করব।

১৯৪২ সালের নভেম্বর মাস থেকে মিত্রশক্তি উত্তর আফ্রিকাতে ও পরে ইতালিতে সাফল্য লাভ করেছে, তার জন্য আমেরিকান সাহায্য ও হস্তক্ষেপ এবং আমেরিকান কূটনীতির প্রয়োগ প্রায় সর্বতোভাবে দায়ী। আমেরিকান কূটনীতিজ্ঞদের সাহায্য ছাড়া ফ্রান্সে অ্যাডমিরাল ডারলানের বাহিনী মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিত না এবং অ্যাডমিরাল ডারলানের বাহিনীর সাহায্য না পেলে উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধক্ষেত্রে মিত্রশক্তির পক্ষে জয় করায়ত্ত করা সম্ভব হত কিনা সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ব্রিটিশ সরকার কিন্তু অ্যাডমিরাল ডারলানের প্রতিপক্ষ জেনারেল দ্য গলকে সমর্থন করেছিল এবং এখনও তারা তাই করে চলেছে। এই বিষয়ে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এখনও পর্যন্ত কোনও মতৈক্য হয়নি, যদিও ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন পাওয়াতে জেনারেল দ্য গল এখনকার মতো অ্যাডমিরাল ডারলান বা জেনারেল গিরাউদের সাফল্যের উপরে এক দফা জিতে গেছেন। এই মতানৈক্যের একটা ফল হল সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর আফ্রিকার ফ্রান্সের অধীনস্থ দেশগুলির উপরে তাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে এবং সেটাকে তাদের কূটনীতির জয় বলে স্বীকার করে নিতে হবে। ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই মতানৈক্যের আরেকটা ফল হল যে যদিও এই যুদ্ধ চলছে ফ্রান্সের মুক্তির জন্য— কিন্তু মিত্রশক্তির ইউরোপীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইজেনহাওয়ার জেনারেল দ্য গলকে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করেন না এবং সেই কারণে এই যুদ্ধে জেনারেল দ্য গলের কোনও ভূমিকাও নেই। মিত্রশক্তি যদি ফ্রান্সের কোনও এলাকা দখল করতে পারে তা হলে সেই এলাকা কিন্তু দ্য গলের হাতে তুলে দেওয়া হবে না বরং মিত্রশক্তির সামরিক সরকার তার শাসন ভার গ্রহণ করবে। অপরপক্ষে, দ্য গলের অধীনে যে সেনাবাহিনী আছে, যাদের স্বাধীন ফরাসি সেনা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে, ইতালিতে তাদের মিত্রশক্তির ভাড়া করা সৈন্য হিসাবে লড়াই করতে হচ্ছে। সারা বিশ্বের মানুষ জানে যে ইউরোপীয় বিষয়গুলিতে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েতদের মধ্যে কোনও মতৈক্য নেই। শুধুমাত্র এক শত্রুর বিরুদ্ধে তারা যে ঘৃণা পোষণ করে থাকে তার উপরে ভিত্তি করে এই তিন শক্তি জোটবদ্ধ হয়েছে, যাদের মধ্যে কোনও আভ্যন্তরীণ ঐক্য বা বন্ধন নেই। এই ধরনের জোট কখনওই দীর্ঘস্থায়ী কোনও সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না এবং একই কারণে তারা কোনও যুদ্ধেও জয়লাভ করতে পারে না। গত বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের মধ্যে যে জোটবদ্ধতা ছিল তা থেকে আজকের এই জোট অনেক আলাদা— তাদের মধ্যে যে সংহতি ছিল, সেই সংহতির প্রতীক ছিলেন ১৯১৮ সালে ফ্রান্সে মিত্রশক্তির সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফশ।

ইউরোপীয় মহাদেশে মিত্রশক্তির অগ্রগতিকে প্রথম দৃষ্টিতে জয় বলে মনে হতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এই জয় পাওয়ার জন্য তাদের অত্যন্ত চড়া মাশুল দিতে হয়েছে— যেমন নেপোলিয়নকে দিতে হয়েছিল মস্কো অধিকার করে রাশিয়া জয় করবার জন্য। যদি জার্মানরা ইংল্যান্ডে প্রবেশের চেষ্টা করত তা হলে ইংরেজরা যে সিংহবিক্রমে লড়াই করত সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু ইউরোপীয় মহাদেশের অন্যত্র সেটা তারা পারবে না— ও সেটা তারা করবেও না। সেনাবাহিনী একটা প্রাণহীন যন্ত্র নয়। সেনাবাহিনী মানুষ দিয়ে গড়া, তাদের মধ্যে আছে অনুভূতি ও আবেগ এবং তারা ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্নভাবে লড়াই করবে। নেপোলিয়ন যখন এক অনভিজ্ঞ তরুণ যুবক, তখন তাঁর অনভিজ্ঞ ফরাসি বাহিনী

ইউরোপের সর্বত্র লড়াই করেছে ও অমিতবিক্রমে জিতেছে। সমগ্র ফ্রান্স তখন প্রতিক্রিয়াশীল শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়েছে, বিপ্লব ও বিপ্লবের ফলে অর্জিত আদর্শকে বাঁচাবার জন্য। পরে নেপোলিয়ন যখন ইউরোপের পরাক্রমশালী সম্রাট এবং তাঁর অধীনে লড়ছে সেই একই ফরাসি সেনাবাহিনী, যদিও এখন তারা আরও অনেক বেশি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তখন কিন্তু তারা শত্রুদের হাতে পরাস্ত হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে তরুণ নেপোলিয়নের নেতৃত্বে ফরাসি সেনাবাহিনী একটা মহান আদর্শ রক্ষা করবার জন্য লড়াই করছিল। পরে সম্রাট নেপোলিয়ন যখন লড়াই করছেন ইউরোপে তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, তখন সেনাবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কোনও মহান আদর্শের লক্ষ্য তাদের সম্মুখে নেই এবং শেষে তারা পরাস্তও হয়েছে সম্রাট নেপোলিয়নের নেতৃত্বেই, কেননা ততদিনে সৈন্যেরা লড়াই করবার মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে— তাদের লড়াই করবার ইচ্ছাটাই চলে গিয়েছে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিজোটের সম্বন্ধে সেই একই যুক্তি প্রযোজ্য। তারা লড়াই করছে বিশ্বের উপরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য— কোনও মহান লক্ষ্যের অভিমুখে পৌঁছবার জন্য নয়— সেই পরিস্থিতিতে দীর্ঘকাল ধরে তাদের মনোবল অটুট রাখা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। ইউরোপের যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হবে, আমার ধারণা মিত্রশক্তির মনোবল ততই দুর্বল হতে থাকবে।

আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে আজ এই মুহূর্তে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মনোবল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। তবুও মিত্রশক্তি লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে যতদিন ইউরোপে যুদ্ধরত আমেরিকান সেনাদের মনোবল অটুট থাকবে। কিন্তু কতদিন তারা সেই লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে? সরকারি হিসাব মতে এই যুদ্ধে আমেরিকার ক্ষতি ইতিমধ্যেই গত বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতির পরিমাণ ছাড়িয়ে গেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনবল বিপুল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আমেরিকা যোদ্ধাদের দেশ নয়, তাদের মূলত শিল্পনির্ভর ও কৃষিনির্ভর সমাজ। ইউরোপের এই যুদ্ধ তাদের স্বদেশ থেকে অনেক দূরে টেনে এনেছে এবং সমগ্র জাতি হিসাবে আমেরিকানরা এই যুদ্ধের বিষয়ে মোটেই সন্তুষ্ট নয়। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কিছু অন্ধ সমর্থক অর্থাৎ ইহুদিরা এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক জগৎ, যারা বিশ্বের অর্থনীতিতে আধিপত্য বিস্তার করবার স্বপ্ন দেখছে— কেবলমাত্র তারাই ইউরোপের এই যুদ্ধ সম্বন্ধে উৎসাহী। আমেরিকার প্রভাবশালী স্বাতন্ত্র্যবাদী গোষ্ঠী (Isolationist Party) ইউরোপের যুদ্ধের বিষয়ে একেবারেই উৎসাহী নয় যদিও হয়তো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধ সম্বন্ধে তাদের ঔৎসুক্য থাকতে পারে। ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রগুলি ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধে মনোনিবেশ করবার জন্য একটা নিরবচ্ছিন্ন দাবি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শোনা যাচ্ছে অনেকদিন থেকেই। সুতরাং যুদ্ধে যেই আমেরিকার ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পেতে থাকবে, সেই বিষয়ে অভিযোগও বাড়তে থাকবে এবং তখন সৈন্যেরাও দেহে ও মনে ক্লান্তি অনুভব করতে থাকবে। সামরিক কলাকৌশলের দিক বিবেচনা করলে যোগাযোগের দূরত্ব বাড়লেই অতিরিক্ত সমস্যা আসে ও জটিলতা বাড়ে এবং সেটার জন্য বাড়তি চাপ সৃষ্টি হতে থাকে, যে চাপ এখন আমেরিকানদের বহন করতে হচ্ছে। আমেরিকান সৈন্যদের মধ্যে ক্লান্তির চিহ্ন দেখা দিলেই, বোঝা যাবে যে ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর পরাজয়ের সূচনা হয়েছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার প্রশ্নের আলোচনা এখনও বাকি আছে। সোভিয়েতরা কি জার্মানির অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারবে ও তারা কি জার্মানির বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানতে পারবে? মিত্রশক্তির প্রচার যে কথা বারে বারে দম্ভভরে ঘোষণা করছে, সেই কথা মতো তারা কি

বার্লিন পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে এই যুদ্ধে রাশিয়ার এ পর্যন্ত কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে— সেইসঙ্গে যুদ্ধের সরঞ্জাম নির্মাণে তাদের ক্ষমতার কথাও চিন্তা করতে হবে। সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জামের বিপুল পরিমাণে ক্ষতি যে রাশিয়ার হয়েছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। তার ফলে ভবিষ্যতে তারা আরও কতদিন এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারবে তারও একটা ঊর্ধ্বসীমা অবশ্যই থাকবে। মার্শাল স্টালিনের অত্যুৎকৃষ্ট প্রচারের ফলে রাশিয়ার জনগণের মনোবল এতটাই তুঙ্গে যে তারা এত ক্ষতি স্বীকার করেও তাদের লড়াই অব্যাহত রাখতে পেরেছে। কিন্তু তখন তারা তাদের জন্মভূমির জন্য লড়াই করছিল। তাদের বাড়িঘর, জমিজমা রক্ষা করবার জন্য লড়াই করছিল। রাশিয়ার বাইরে তাদের কি সেই মনোবল বজায় থাকবে? অধিকন্তু জার্মান সেনারা যখন স্টালিনগ্রাডের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন তাদের যে সমস্যা হয়েছিল রাশিয়ানদের ক্ষেত্রেও সেই একই সমস্যা দেখা দেবে। সেইজন্য আমার ধারণা যে সোভিয়েত সেনাদল তাদের ১৯৩৯ সালের সীমানা পর্যন্ত আসার পরে আর বিশেষ অগ্রসর হতে পারবে না। এ ছাড়া আরও যে কথা আমাদের মনে রাখতে হবে তা হল, যদি যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হয় তা হলে ইউরোপের ভাগ্য কীভাবে নির্ধারিত হবে সেই বিষয়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠী ও রাশিয়ার মধ্যে একেবারেই কোনও বোঝাপড়া হয়নি। বস্তুত ইউরোপের বহু অঞ্চল সম্পর্কেই দুই পক্ষের লক্ষ্য ও অভিপ্রায় একেবারেই বিপরীতমুখী। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে যেখানে আমেরিকানরা ইউরোপে তাদের অভিযানের বিষয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রচার চালাচ্ছে সেখানে সোভিয়েত বিদেশ দপ্তরের এক অংশ 'যুদ্ধ ও খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ (War and Working Class)' কিন্তু তথাকথিত 'সেকেন্ড ফ্রন্ট' বা দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের বিষয়ে নেহাতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাচ্ছে এবং রাশিয়ানরা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠীকে সতর্ক করে দিয়েছে যে তারা যদি এই দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের সীমা আরও প্রসারিত না করে, ও ফ্রান্সে আরও সৈন্য ও সামরিক সরঞ্জাম প্রেরণ না করে তা হলে জার্মানদের হাতে বিপর্যয় ঘটতে পারে।

আফ্রিকা ও এশিয়াতে অর্থাৎ উত্তর আফ্রিকার ফরাসি উপনিবেশগুলিতে এবং সিরিয়া, মিশর ও ইরানে সোভিয়েত সরকার যে আগ্রাসী রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়েছে সেই বিষয়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠী মোটেই সন্তুষ্ট নয়। এ ছাড়া পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী দেশগুলি, বলকান অঞ্চল এবং সেইসঙ্গে ডারডেনেলস্ প্রণালীতেও সোভিয়েত সরকারের অভিপ্রায় ইঙ্গ-মার্কিনরা ভাল চোখে দেখছে না। ১৯১২ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় বলকান শক্তিগুলির মধ্যে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, মিত্রশক্তি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এখন সেই ধরনের পরিস্থিতি দেখা দেবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ১৯৩৯ সালের রাশিয়ান সীমানা অতিক্রম করে সোভিয়েত সেনাবাহিনী আরও অগ্রসর হলে যদি তেমন ঘটনা আদৌ ঘটে— অপ্রত্যাশিত জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে সোভিয়েতদের মতবিরোধ তীব্রতর হতে পারে।

এই আলোচনা এখন তুরস্কের দিকে ফেরানো যাক। ব্রিটিশ প্রচার বিশ্বকে এই ধারণা দেবার চেষ্টা করছে যে তুরস্ক কোনও না কোনও সময়ে অবশ্যই মিত্রসক্তিকে সমর্থন করবে। তারা মনে করে যে এই প্রচার ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাবকে প্রভাবিত করবে ও ব্রিটিশদের প্রতি তারা সদয় হবে। কিন্তু বর্তমান যুগের তুরস্কের কথা যাদের বিন্দুমাত্র জানা আছে, এই ধারণার উপরে তাদের কোনও আস্থা বা বিশ্বাস থাকার কথা নয়। যদিও এটা

সত্য যে তুরস্কে কিছু গোষ্ঠী আছে যারা স্পষ্টই মিত্রশক্তির পক্ষ নিতে চায় ও আঙ্কারার বেতারকেন্দ্রের প্রচারের ধরণও মিত্রশক্তিকেই সমর্থন করে থাকে, কিন্তু এই যুদ্ধে কোনও পক্ষের সঙ্গেই তুরস্কের হাত মেলাবার কোনও সম্ভাবনা একেবারে নেই। ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন তুরস্ক নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা নেবে।

আমি প্রথমেই যে কথা বলেছি, আবারও বলব, শত্রুপক্ষের প্রচারযন্ত্র যে আমেরিকার বিপুল সামরিক ক্ষমতার কথা বলে চলেছে সেটা শুধুই মিত্রশক্তি গোষ্ঠীর মনোবল বাড়াবার জন্য। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমেরিকার সামরিক ক্ষমতাবৃদ্ধির একটা সীমা আছে। তাদের অস্ত্র নির্মাণের ক্ষমতা ইতিমধ্যেই তুঙ্গে পৌঁছেছে ও ভবিষ্যতে সেই ক্ষমতা বাড়ার পরিবর্তে কমতে বাধ্য। তুলনায়, সাম্প্রতিক বিমান আক্রমণ সত্ত্বেও জার্মানির সামরিক ক্ষমতা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, এমনকী কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা আরও শক্তিশালী হয়েছে। তার ফলে যুদ্ধের পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে সামরিক ক্ষমতা বাড়ানো জার্মানির পক্ষে খুবই সম্ভব।

ইউরোপীয় পরিস্থিতি তা হলে আমরা এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারি; পূর্ব প্রান্তে জার্মানির পক্ষে রাশিয়াকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়, তেমনই রাশিয়ার পক্ষেও জার্মানিকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে না। আমার যা মনে হয় এখানে এক ধরনের অচলাবস্থা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি— যাতে দুই পক্ষই স্বকীয় অবস্থানে অনড় থাকবে। পশ্চিম ইউরোপে কিন্তু কিছুদিন পরে জার্মানির স্বপক্ষেই যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হবে। তখন জার্মানির পক্ষে সম্ভব হবে ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিন সেনাদলকে পিছনে ঠেলে দেওয়া। ইতালিতে, জার্মানরা যখন উপদ্বীপ অঞ্চল ছেড়ে উত্তর ইতালির দিকে অগ্রসর হবে তখন শেষ অবরোধ বজায় রাখার জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এবং সেখানে তারা তাদের অবস্থানকে অটুট রাখবে ও ইঙ্গ-মার্কিন সেনারা জার্মানদের নড়াতে পারবে না।

ইতালীয় ও ফরাসি সীমান্তগুলির বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চিত যে সেখানে জার্মানরা তাদের অবস্থান দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে পারবে এবং এক সময় মিত্রশক্তির মনোবল ভেঙে পড়বে। আমার মনে হয় না জার্মানদের মধ্যে মানসিক দুর্বলতা দেখা দেবে। ইতিমধ্যেই জার্মানির উপরে বোমাবর্ষণ কমে এসেছে, এবং এখন জার্মানরাই আকাশপথে আক্রমণ শুরু করেছে তাদের 'উড়ন্ত বোমার' সাহায্যে। এই ঘটনা জার্মান সেনাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। আগামী কয়েক মাস জার্মানির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তারপরে জার্মানি ঠিকই সাফল্য লাভ করবে। মাত্র একটি কারণেই আমার এই ভবিষ্যৎ গণনা ভ্রান্ত হতে পারে, সেটি হল কোনওভাবে যদি জার্মানদের মনোবল ভেঙে পড়ে— গত বিশ্বযুদ্ধে যা ঘটেছিল। কিন্তু আমি এখনও পর্যন্ত তার কোনও পূর্ব লক্ষণ দেখছি না। জার্মান চ্যান্সেলর আগে থেকেই জার্মানির ভিতরে সব প্রতিরোধকে চুরমার করে এই বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। ঠিক মার্শাল স্টালিন যা করেছিলেন রাশিয়ার মধ্যে।

ইউরোপের যুদ্ধ শুধু অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ নয়, এ স্নায়ুযুদ্ধও বটে। চূড়ান্ত লড়াইয়ে জিত হবে তাদেরই যারা মনোবলের লড়াইয়ে জিতবে এবং তারা হল জার্মানরা। শুধুমাত্র যদি ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতের কথা বিবেচনা করি তা হলে বলব ইউরোপের যুদ্ধ যত দীর্ঘতর হবে আমাদের জন্য তা ততই সুবিধার, কারণ শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনী সেখানকার যুদ্ধেই ব্যস্ত থাকবে। ইঙ্গ-মার্কিন সেনারা যদি ইউরোপে না যেত, যদি তারা ইতালি ও ফ্রান্সে যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ত তা হলে হয়তো তারা তাদের স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সেনাদের ভারতবর্ষ ও পূর্ব এশিয়ার

অন্যতের পাঠাতে পারত। কিন্তু এখন সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ ইউরোপের যুদ্ধের দায়িত্ব তারা কাঁধে নিয়েছে। সুতরাং ইউরোপীয় যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির অংশগ্রহণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য করছে।

আমি সব শেষে আবার বলব, ভারতীয় পরিস্থিতি ইউরোপীয় পরিস্থিতির থেকে স্বতন্ত্র। ভবিষ্যতে ইউরোপে যাই ঘটুক না কেন, বর্তমানে ভারতীয়দের হাতে স্বাধীনতা অজর্নের জন্য ঈশ্বরপ্রদত্ত এক সুযোগ এসেছে। সুতরাং, ইউরোপের যুদ্ধের ফলাফলে আমাদের ঔৎসুক্য থাকলেও— সেখানে কী ঘটছে তা নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন নেই। আমাদের স্বাধীনতা এখন আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। আসুন আমরা তা দুই হাত দিয়ে এই সুযোগকে আঁকড়ে ধরি, তার সদ্ব্যবহার করি— লোহা গরম থাকতে থাকতে আসুন আমরা আঘাত হানি।

জয় হিন্দ

৪৫

পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি

[৯ জুলাই ১৯৪৪, একটি বেতার ভাষণ][১]

বন্ধুরা ও স্বদেশবাসীরা:

গতকাল আমি আপনাদের কাছে ইউরোপের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আজ আমি পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে চাই, বিশেষভাবে ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে, গতকালের মতো আজকেও যা বলব তা মূলত আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করা, কোনও তাত্ত্বিক গবেষণার ফলাফল নয়।

প্রথমে, গত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সাধারণভাবে পরিস্থিতি যে রকম ছিল, তার সঙ্গে বর্তমান যুদ্ধাবস্থার তুলনামূলক আলোচনার ভিতর দিয়ে আমি আজকের এই বিষয়টিকে উপস্থাপিত করতে চাই। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ছিল মিত্রশক্তির পক্ষে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শত্রুরা কেবলমাত্র ইউরোপে ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সময় ভারতীয় বিপ্লবী, যাঁরা ভারতবর্ষের বাইরে কাজ করছিলেন ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাহায্য পাবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের জন্য যোগাযোগের সমস্যা ছিল প্রকৃতপক্ষে অনতিক্রমণীয়। উত্তর-পশ্চিম থেকে ভারতের দিকে অগ্রসর হবার পথে ব্রিটিশদের কড়া পাহারা ছিল এবং 'কোমাগাটা মারু' ও অন্যান্য জাহাজের মাধ্যমে সমুদ্রপথে ভারতে সাহায্য পাঠাবার চেষ্টাও ব্রিটিশরা সহজেই বানচাল করে দিতে পেরেছিল। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে ভারতের পূর্ব সীমান্তের প্রবেশপথ খুলে গেছে, এবং আমাদের পক্ষে সেই দিকের সীমান্ত অতিক্রম করে স্বদেশে প্রবেশ করার কাজ অত্যন্ত সহজ হয়ে গেছে।

গত যুদ্ধে, আমাদের শত্রুরা যুদ্ধের সমগ্র প্রচেষ্টা ইউরোপে ও পশ্চিম এশিয়াতে সীমাবদ্ধ রাখতে পেরেছিল কারণ এশিয়ার অবশিষ্ট অঞ্চলগুলি তখন মিত্রশক্তির নিয়ন্ত্রণে, অথবা তাদের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু এখনকার যুদ্ধে, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে আমাদের শত্রুদের শুধু ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়াতে নয়, পূর্ব এশিয়াতেও লড়াই করতে হচ্ছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই বিশাল রণক্ষেত্রের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য তারা তাদের শক্তিকে সংহত করতে পারেনি এবং জাপানের সেনা ও নৌবাহিনীর হাতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যেভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ইউরোপে এবং ১৯৪১ সাল থেকে পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের ফলাফলে ভারতের জনসাধারণের কাছে স্পষ্টতঃই এই কথা প্রমাণিত হয়েছে ব্রিটিশ সিংহের যে পরাক্রমে এক সময় তারা এতটা ভীত ছিল প্রকৃতপক্ষে তা তত কিছু ভয়াবহ নয়। পূর্ব

---

১. Blood Bath, pp. 44-51.

এশিয়ায় জাপান ও ইউরোপে জার্মানির সেনাবাহিনীর বিক্রমে পরাস্ত হবার পর ভারতীয় জনসাধারণের চোখে ব্রিটিশ শক্তির সম্মান ধূলিলুণ্ঠিত হয়েছে। এই যুদ্ধ চলাকালীন একদা শক্তিশালী ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গুরুতরভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে ও তাদের সম্মান একেবারেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন তার অন্তিম দশায় পৌঁছেছে।

বিশ্বব্যাপী এই যে বিশাল যুদ্ধ এখন চলছে, তা ভবিষ্যতে ব্রিটেন পৃথিবীব্যাপী এই প্রভুত্ব চালিয়ে যেতে পারবে কিনা সেই ভাগ্যনির্ধারণের জন্য নয়। সেই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ দেখার অন্তর্দৃষ্টি আছে এমন যে কোনও ইতিহাসের ছাত্রই উপলব্ধি করতে পারবে যে ব্রিটিশদের প্রভুত্ব করার দিন ফুরিয়েছে। যে প্রশ্নের উত্তর এখনও অনিশ্চিত তা হল, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে কে প্রভুত্ব করবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র না পৃথিবীর ইতিহাসে যে নতুন সূর্যোদয় হতে চলেছে, সেই নব্য শাসনতন্ত্র, যেখানে সব জাতি ও সব দেশের সমান সম্মানের আসন থাকবে। আমার দেশে এখনও অনেকে আছে যারা স্বপ্ন দেখছে যে যুদ্ধোত্তর বিশ্বে তখনও ব্রিটিশ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং ভারতীয়েরা তাদের দাসত্ব দশাতেই বন্দি থাকবে— তাদের প্রতি আমার অনুকম্পা ছাড়া আর কোনও অনুভূতি নেই কারণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে এদের এতটাই অধঃপতন হয়েছে— দীর্ঘদিন পরাধীন থাকার ফলে পরাধীনতার অন্ধকার দিনগুলি শেষ হয়ে এখন যে নতুন সূর্যোদয়ের সময় এসেছে সেই বিষয়ে তারা এখনও অন্ধ।

এমনকী দাসত্বের এই বিষাক্ত জীবাণু কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনেক উচ্চশিক্ষিত ও কৃষ্টিসম্পন্ন ভারতীয়দেরও এমনভাবে সংক্রামিত করেছে যে তারা ভুলে গেছে যে কোনও সাম্রাজ্যেরই বয়স বাড়ে, ক্ষয় হতে থাকে এবং এক সময়ে তা বিলুপ্ত হয়। ঠিক মানুষের মতোই। একবার যখন বয়সের ভারে মানুষ অবনমিত হয়, জরা তাদের মস্তিষ্কের চিন্তাশক্তিতে ঘুণ ধরায়, তখন আর তাকে পুনর্জীবন দেওয়া যায় না। অস্ত্রোপচার করে বা হাতে লাঠি ধরিয়ে দিয়ে জরাগ্রস্ত মানুষকে যৌবন ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। আপাতত আমেরিকান ক্রাচের সাহায্যে প্রবীণ উইনস্টন চার্চিল ও তাঁর জরাগ্রস্ত সাম্রাজ্য কোনওক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে যে সাম্রাজ্য হঙকঙ থেকে শুরু করে ছিন্দউইন নদী পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেই মৃতপ্রায় সাম্রাজ্যের দেহে আর প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব হবে না, এমনকী কোনও অলৌকিক হস্তক্ষেপেও তা সম্ভব নয়।

বিশ্বের এই অঞ্চলের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে দুটি প্রশ্ন আছে যার উত্তর আমাদের পেতে হবে। প্রথমত পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী যেভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে, আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর শক্তি ও রণসম্ভারের সাহায্যে সেই বিপর্যয় থেকে আবার উঠে দাঁড়ানো সম্ভব হবে কি? এবং দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতে ভারতের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে? আমেরিকার সাহায্যে ব্রিটেন কি ভারতবর্ষে তার সাম্রাজ্য অব্যাহত রাখতে পারবে।

আমি স্বীকার করব যে প্রথম প্রশ্নের বিষয়ে আমার উদ্বেগ ছিল, যতক্ষণ না বিশ্বের কাছে ঘোষণা করা হল যে প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে আলোচনার পরে প্রেসিডেন্ট রুজ়ভেল্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠী প্রথমে প্রধানত ইউরোপীয় রণক্ষেত্রগুলিতে তাদের যুদ্ধের বিস্তার সীমাবদ্ধ রাখবে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠী যদি বিপরীত সিদ্ধান্ত নিত এবং আগে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার নীতি অনুসরণ করত তা হলে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিন্তিত হতাম। ফ্রান্স ও ইতালিতে সৈন্য সমাবেশ না করে যদি তারা তাদের পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধচালনা করত তা হলে জাপানের

পক্ষে সেই আক্রমণ প্রতিহত করা কঠিন হত। উপরন্তু সেইক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট রুজ়ভেল্ট—তাঁর ধূর্ত প্রচারকার্যের দ্বারা সমগ্র আমেরিকাকে জাপানের বিরুদ্ধে এমনভাবে উদ্দীপিত করতে সক্ষম হতেন যে তাঁর পক্ষে এই যুদ্ধকে একটা ধর্মযুদ্ধে পরিণত করার সুযোগ হত। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে আমেরিকা জাপানকে তাদের সর্বাগ্রগণ্য শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে থাকে এবং তা ছাড়াও বর্ণান্ধতার কারণে তারা জাপান ও অন্য এশীয় জাতিগুলির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকে। সুতরাং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আমেরিকাতে রুজ়ভেল্টের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করত ও তিনি আমেরিকানদের যুদ্ধের উদ্দীপনা একেবারে তুঙ্গে তুলে দিতে পারতেন। কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক তিনি সেই কাজ করলেন না। এবং করলেন না বলেই বলা যেতে পারে ভাগ্য যে জাপান, এশিয়া ও ভারতের প্রতি প্রসন্ন এটা তারই ইঙ্গিত।

চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির ভাগ্যে যেন তা ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে গেছে এবং সেই কারণেই প্রেসিডেন্ট রুজ়ভেল্ট 'আগে ইউরোপ' নীতি অবলম্বন করে ইউরোপের সমরাঙ্গনের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ভুল সিদ্ধান্তটি নিয়েছেন। ইউরোপের যুদ্ধ এই মুহূর্তে বিবিধ কারণে আমেরিকানদের কাছে মোটেই জনপ্রিয় নয়, যে কারণগুলি এখনই আলোচনা করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তার ফলশ্রুতি হল আমেরিকানদের ইউরোপীয় যুদ্ধের সমর্থনে কিছুতেই ততটা উৎসাহিত করা যাবে না যাতে তারা লড়াইয়ে জেতবার জন্য সর্বস্ব পণ করবে। বর্তমান যুদ্ধের মতো বিশাল রণাঙ্গনে জয়লাভ করতে হলে যে 'হয় জিতব, না হলে জীবন দেব' মনোভাবের নিতান্তই প্রয়োজন যা জাপানের আছে এবং মূলত সেই কারণেই চূড়ান্ত যুদ্ধে তাদের জয় অনিবার্য।

ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে বলে চলেছে প্রথমে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হলে তবেই তারা পূর্ব এশিয়া ও জাপানের যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল চুঙকিঙয়ের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধের সপ্তম বার্ষিকী উপলক্ষে মার্শাল চিয়াঙ কাই শেকের কাছে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধ কীভাবে শেষ হবে এবং কারা শেষ করবে সেটাই আমাদের বিচার্য বিষয়। আমাকে যদি ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞাসা করা হয় তা হলে আমি বলব, এই 'আগে ইউরোপ'-এর নীতি ইঙ্গ-মার্কিন সেনাদের শক্তি নিঃশেষ করে দেবে ও তারা কোনওদিনই পূর্ব এশিয়ায় জাপানকে পরাস্ত করতে পারবে না। আবারও একবার ইতিহাস প্রমাণ করে দেবে যে একই সঙ্গে দুটি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরু করা আত্মহত্যারই সামিল।

শত্রুপক্ষের প্রচার অনুসারে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠীর জয় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে আছে আমেরিকার রণসম্ভার উৎপাদনের তথাকথিত বিপুল ক্ষমতার উপরে। কিন্তু আমেরিকার অস্ত্র উৎপাদনের ক্ষমতার বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে তারও একটা সীমা আছে। আমেরিকার উৎপাদন ক্ষমতা ইতিমধ্যেই সেই সীমায় পৌঁছেছে, এবং ভবিষ্যতে সেই ক্ষমতা বাড়বে না, বরং হ্রাস পাবে। অন্যদিকে জাপানের কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে, তারা যে প্রস্তুতি নিয়েছে ও যে ধরনের ব্যবস্থা তারা অবলম্বন করেছে, তাতে ভবিষ্যতে তাদের অস্ত্র উৎপাদন ক্ষমতা যে বৃদ্ধি পাবে সেটা সুনিশ্চিতভাবে আশা করা যায়। যদি কেউ এ কথা বিশ্বাস না করে তা হলে ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা দেখার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হবে।

এবং তারপরেও রয়েছে আমেরিকানদের মনোবলের প্রশ্ন। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে এই মুহূর্তে তাদের মনোবল ব্রিটিশ সেনাদের তুলনায় অনেকই বেশি। কিন্তু কতদিন

তা এই উচ্চতায় ধরে রাখা সম্ভব হবে? যদি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট 'আগে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল'-এর নীতি অবলম্বন করতেন তা হলে বর্তমান যুদ্ধকে তিনি আমেরিকার জনগণের জনপ্রিয় ও জাতীয় যুদ্ধে পরিণত করতে পারতেন এবং তখন সেই ক্ষেত্রে আমেরিকানদের মনোবল আরও অনেক দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চে ধরে রাখা সম্ভব হতে পারত— কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরাজয় ও ক্ষতি সত্ত্বেও। ইউরোপের কোনও যুদ্ধে আমেরিকানদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা কখনই তুঙ্গে রাখা সম্ভব নয় সে কথা যেমন সত্য— তেমনই আরও একটা দিক আছে, ব্রিটেন বা আমেরিকা কোনও দেশই তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়ছে না যেটা জাপান ও জার্মানির ক্ষেত্রে সত্য। ব্রিটেন বা আমেরিকা লড়াই করছে বিশ্বের দেশগুলির উপরে প্রভুত্ব করবার জন্য— ব্রিটেন লড়ছে ভবিষ্যতে যাতে সেই প্রভুত্ব বজায় রাখতে পারে ও আমেরিকা লড়ছে যাতে তারা ভবিষ্যতে প্রভুত্ব করতে পারে। তার ফলে আমেরিকানদের পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মানসিকতা বজায় রাখা অসম্ভব। কেবলমাত্র সরঞ্জামের প্রাচুর্য যদি যুদ্ধজয়ের নিশ্চিত উপায় হত তা হলে এই যুদ্ধে ফ্রান্সকে পরাস্ত করা জার্মানির পক্ষে কখনওই সম্ভব হত না। সুতরাং আমরা ভবিষ্যতে দেখব, যেই ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে আমেরিকার ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাবে তখনই তাদের শক্তি ও মনোবল গুরুতরভাবে হ্রাস পেতে থাকবে। তারপরে যদি ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী তাদের সর্বশক্তি দিয়েও পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধে যোগ দেয়, এমন ক্ষমতা তাদের থাকবে না যে তারা জাপানকে পরাস্ত করাতে পারবে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠী ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করুক বা না করুক, আমার বিচারে কোনও অবস্থাতেই তাদের সেনাবাহিনী জাপানের কাছে বিপজ্জনক হবে না। এবং ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের জয়ী হবার কতটা সম্ভাবনা আছে সেটা আমি গতকালের আলোচনাতেই বলেছি।

পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ যে অতি নির্মম ও কঠিন হতে চলেছে, জাপান তা ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের আগে সম্ভব-অসম্ভব সব পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে সর্বপ্রকার প্রস্তুতি তারা নিয়েছে। যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে জাপান পূর্ব এশিয়ায় তাদের অবস্থান দৃঢ়তর করতে সমর্থ হয়েছে ও যুদ্ধের সরঞ্জামের উৎপাদন তারা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে পেরেছে। জাপানের জনসাধারণের ও সেনাবাহিনীর মনোবলও সেইসঙ্গে শতগুণ বেড়েছে। সুতরাং আমি মনে করি না ভবিষ্যতে আমেরিকার পক্ষে জাপানকে পরাস্ত করা সম্ভব হবে। আমি ভাল করেই জানি যে সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা কিছু সাফল্য লাভ করেছে এবং কোনও কোনও দ্বীপ তারা অধিকার করতে পেরেছে যা আগে জাপানের অধিকারে বা নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু এই দ্বীপগুলি জাপানের প্রতিরক্ষার বহির্বৃত্তে অবস্থিত। তাদের অন্তর্বৃত্ত বা লৌহবৃত্ত— যদি আমি এই সংজ্ঞাটি ব্যবহার করতে পারি, জাপানের অধিকারেই আছে ও তাই থাকবে। আমেরিকানরা কখনওই এই লৌহ বৃত্তের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। তারা জাপানের বহির্বৃত্তের আশেপাশে হয়তো কিছু কিছু সাফল্য পাবে কিন্তু জাপান তার অন্তর্বৃত্তকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে, এবং অবশেষে আমেরিকার শক্তি ও মনোবল ভেঙে পড়বে। এই যুদ্ধে শুধু তাদের শক্তির পরীক্ষা হবে তাই নয়, এটা স্নায়ুযুদ্ধও বটে, আমি গতকালই সে কথা বলেছি। জাপানের মনোবল যে যুক্তরাষ্ট্রের থেকে অনেকাংশে বেশি, এবং আগামী যুদ্ধের সময় বিবদমান দুই পক্ষের উপরে যে বিপুল মানসিক চাপ পড়বে সেই চাপ যে জাপান যে আমেরিকার থেকে অনেক বেশি সহ্য করতে পারে ও পারবে, আশা করি বিশ্বের কোথাও কেউই সে কথা অস্বীকার করবে না।

আমার সমালোচক যাঁরা আছেন, তাঁরা হয়তো এখানে চুঙকিঙ চিনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে পারেন এবং পূর্ব এশিয়ায় মিত্রশক্তির জয়ে সাহায্য করবার জন্য চুঙকিঙ কী করতে পারে সেই প্রশ্ন করতে পারেন। নিপ্পনের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চুঙকিঙ তাদের অবরোধ অব্যাহত রেখেছে এবং দীর্ঘকালীন অবরোধ চালিয়ে যাওয়ার সামরিক গুরুত্ব কেউ খর্ব করতে চায় না। নিপ্পনের বাস্তববাদী জনসাধারণ ও সেনাবাহিনীও সেই তথ্য অস্বীকার করবে না। কিন্তু চিনের জন্য জাপান যে নতুন নীতি অবলম্বন করেছে এবং চিনদেশের জাতীয় সরকারের সঙ্গে জাপানের সাম্প্রতিকতম চুক্তি অনুসারে যুদ্ধাবস্থার অবসান হলে জাপান যে চিনদেশ থেকে তার সেনাদের সরিয়ে নেবার অঙ্গীকার করেছে তা চুঙকিঙের মনোবলে উল্লেখযোগ্য ফাটল ধরিয়েছে। চিনা জনগণ যা দাবি করছিল এই চুক্তি অনুসারে তার প্রায় সবটাই এখন তাদের করায়ত্ত হয়েছে। তা হলে চুঙকিঙ আর কীসের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চাইবে? পূর্ব এশিয়ায় সকলের মনেই আজ এই প্রশ্ন জেগেছে।

চিনের বিষয়ে জাপানের এই নতুন নীতি অবলম্বনের ফলে চিনদেশের জনসাধারণের এক বিরাট অংশ আজ ভাবতে পারছে যে জাপানের সঙ্গে যেহেতু একটা সম্মানজনক যুদ্ধাবসানের পরিস্থিতিতে পৌঁছানো গেছে তা হলে বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে জাতীয় পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করা সমীচিন হবে। চিনের জাতীয় সরকার যতই জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে মন দিতে পারবে, ততই সমগ্র জাতির মধ্যে শান্তির জন্য একটা আকাঙ্ক্ষা দেখা দেবে। সেই কারণে আজ চুঙকিঙ চিনের নীতিগত অবস্থান ক্রমশই দুর্বল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই দুর্বলতা আরও প্রকট হয়েছে তাদের আভ্যন্তরীণ জটিলতার জন্য যা চুঙকিঙের জন্য বেশ কিছুদিন ধরেই সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

চুঙকিঙের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির আলোচনায় আমি অক্ষশক্তির বা নিপ্পনের কোনও পর্যবেক্ষক বা ভাষ্যকারের বিবৃতির আশ্রয় নিতে চাই না— বরং আমি একজন আমেরিকান লেখকের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেব। শিকাগো ডেইলি নিউজ়-এর সাংবাদিক আর্চিবল্ড স্টিল মাত্র কয়েকদিন আগেই লিখেছেন— 'গত সাত বছর ব্যাপী যুদ্ধের জমে ওঠা বোঝার ভারে পড়ে পরিশ্রান্ত চুঙকিঙ এখন তাদের লড়াইয়ের অষ্টম বছরে পা দিতে চলেছে। সেইসঙ্গে তারা এটাও উপলব্ধি করেছে যে হয়তো এখন তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় সময়ের মুখোমুখি হতে হবে। আর্থিক ও সামরিক দিক থেকে এখন চুঙকিঙের খুবই দুঃসময়। যুদ্ধের বিষয়ে বিচার করলে গত বছর চুঙকিঙের জন্য সব থেকে কঠিন সময় গেছে। মুদ্রাস্ফীতি পৌঁছেছে চরমে। অবরোধ ও অন্যান্য কারণে তাদের সেনাবাহিনী বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও ক্রমান্বয়ে আরও শক্তিক্ষয় হয়ে চলেছে।' দক্ষিণ-পূর্ব চিনে জাপানের বড় ধরনের আক্রমণের ফলে তাদের প্রতিরোধের যেটুকু ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল ধীরে ধীরে তাও নিঃশেষ হয়ে আসছে, সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই সাংবাদিক বলেন, 'যুদ্ধের ক্লান্তি জনসাধারণের মনের মধ্যেও স্পষ্টতই দাগ কেটেছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'চুঙকিঙ ক্লান্ত, বড়ই ক্লান্ত।' চুঙকিঙের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কথা আমেরিকার জানা আছে বলে তারা চুঙকিঙের মনোবল অক্ষত রাখার জন্য সর্বপ্রকার কৌশল অবলম্বন করছে। আমেরিকার প্রতি সমর্থন আছে চুঙকিঙের এমন চিনা গোষ্ঠীর সাহায্যে তারা অবশ্যই সে চেষ্টা করেছে। এ ছাড়া তারা আরও আশা করছিল যে অদূর ভবিষ্যতে বর্মা রোড উন্মুক্ত হবে এবং ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে চুঙকিঙের জন্য সাহায্য পাঠানো সম্ভব হবে। ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনী তাদের প্রতিশ্রুতি অনুসারে বর্মাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত প্রচণ্ড এক

আক্রমণ চালায়— যে আক্রমণকে তারা বর্মাদেশ পুনর্বার অধিকারের প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছিল। সে আক্রমণ কিন্তু শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখা যায়নি এবং চুঙকিঙের উপরে তার প্রভাব কী হয়েছে সেটা বর্ণনা করার থেকে কল্পনা করে নেওয়াই ভাল। আরও একটা চতুর কৌশল ইঙ্গ-মার্কিন করবার চেষ্টা করেছিল। তারা চুঙকিঙের সামনে এই সম্ভাবনা জাগিয়ে রেখেছিল যে যদি জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয় তা হলে চিন এশিয়াতে সর্বপ্রধান ও প্রবলতম শক্তিতে পরিণত হবে, যদিও বাস্তবিক জাপান যদি পরাজিত হয় তা হলে চিন সরাসরি চলে যাবে আমেরিকানদের কর্তৃত্বের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে। তবুও আমেরিকানদের এই কৌশল হয়তো ফলপ্রসূ হত চুঙকিঙে যুদ্ধের পরিস্থিতি যদি এখনকার থেকে ভাল হত। কিন্তু চাঙসা ও অন্য যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে চুঙকিঙ আমেরিকার সাম্প্রতিক পরাজয়ের ফলস্বরূপ সেখানকার পরিস্থিতি এবং তাদের মনোবল এখন যে অবস্থায়, তাতে আমেরিকানদের এই প্রচার কৌশলে আর কোনও কাজ হবে না।

কাজেই সংক্ষেপে বলতে গেলে, চুঙকিঙের পরিস্থিতি এতই সঙ্গীন যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে সাহায্য করার পরিবর্তে তাদের কাছ থেকেই চুঙকিঙের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন, এবং এটা বলাই বাহুল্য যে ভবিষ্যতে পূর্ব এশিয়াতে জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির যুদ্ধে চুঙকিঙের অবদান খুবই সামান্য হবে। পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির যে পর্যালোচনা উপরে করা হল তা থেকে সহজেই যে সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছতে পারি তা হল ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পক্ষে জাপানকে পরাস্ত করা অসম্ভব। অন্তিম যুদ্ধে জাপানের জয় অবশ্যম্ভাবী, ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে জয়পরাজয়ের চূড়ান্ত পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। এবারে আমি ভারতের কথা বলতে চাই এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটিরও উত্তর দিতে চাই যে বর্তমানের এই জটিল ঘটনাবহুল পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে কী করা সম্ভব।

পূর্বের ইতিহাস থেকে আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষে ব্রিটেনের সামরিক কৌশলগত প্রস্তুতি সর্বদাই এই ধারণার উপরে ভিত্তি করে ছিল যে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম দিক থেকেই শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এখন হঠাৎ করেই ভারতের পূর্বসীমান্ত উন্মুক্ত হয়ে গেছে, এ যেন বিধাতার ইঙ্গিত— বিশেষ করে যখন ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ত্রিশ লক্ষ দেশপ্রেমিক প্রবাসী ভারতীয়দের বসবাস।

এই ত্রিশ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়েরা রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বিশ্বের নয়টি বন্ধুভাবাপন্ন দেশ সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি ভারতীয় আজ একই মহান উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে ধর্ম বা অন্য কোনও ভেদাভেদ নেই, বিভেদের যে প্রাচীর ব্রিটিশ সর্বদাই ভারতীয়দের মধ্যে গড়বার চেষ্টা করেছিল। এই প্রবাসী ভারতীয়েরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার উদ্দেশ্যে 'সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি'র শপথ নিয়েছিল— সৈন্যবল, অর্থবল ও রসদ সংগ্রহের সেই শপথ আজ তাদের একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গঠন করতে সাফল্য দিয়েছে এবং সেই সেনাবাহিনী গত মার্চ মাস থেকে ভারতের মাটিতে লড়াই করছে।

আজ শুধু একটাই প্রশ্ন— সেই প্রশ্ন হল এই সেনাবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ কি জাপানের সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে ও ভারতের অভ্যন্তরের দেশপ্রেমিক ভারতীয় জনগণের সমর্থনে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শক্তির কবল থেকে মুক্তি দিতে পারবে? আমার উত্তর হল— 'হ্যাঁ'।

আমি এ কথা বলছি আমার অভিজ্ঞতা থেকে একজন বাস্তববাদী হিসাবে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শক্তি সম্বন্ধে আমি অবহিত। আবার ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয়দের ক্ষমতা

সম্বন্ধেও আমার জানা আছে। আমি ভারত-বর্মা সীমান্তে এবং ভারতের অভ্যন্তরে মণিপুর ও আসাম অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনীর শক্তিমত্তাও দেখেছি। গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যেসব যুদ্ধবন্দি আমাদের দলে যোগ দিয়েছে তাদের সঙ্গেও আমি কথা বলেছি। আমাদের সহকর্মী ও প্রতিনিধি যারা এখন ভারতের অভ্যন্তরে আমাদের হয়ে কাজ করছে তাদের কাছ থেকেও আমি রিপোর্ট পেয়েছি। আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে আমরা বিদেশিদের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে পারব।

কিন্তু সেই লড়াই হবে দীর্ঘ ও নির্মম। তাদের সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে ভারতের মাটিতে ব্রিটেন লড়বে মরীয়া হয়ে। তারা এমনভাবে লড়বে, যেমন লড়াই তারা এই বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আর কোথাও, কখনও লড়েনি। কিন্তু ব্রিটিশ ও তাদের ভাড়া করা সৈন্যরা যা পারবে— বা করবে, আমরা লড়াই করব তার থেকেও বেশি সাহসিকতার সঙ্গে। কারণ আমরা যে লড়াই করছি ন্যায়ের জন্য— সত্যের জন্য এবং আমাদের জন্মগত স্বাধীন জীবনযাপনের অধিকারের জন্য, সেই সচেতনতা আমাদের শক্তি জোগাবে। এখন আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য পূর্ণ মূল্য দিতে প্রস্তুত— এখন যখন আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী আমাদের আছে, পৃথিবীর কোনও শক্তি আমাদের জয় থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। এটাই আমাদের অবিচল প্রতিজ্ঞা এবং ঈশ্বরেরও তাই ইচ্ছা।

জয় হিন্দ

৪৬

ভারতীয় পরিস্থিতি

[১০ জুলাই ১৯৪৪, একটি বেতার ভাষণ][১]

বন্ধুরা ও স্বদেশবাসীরা:

গত কয়েকদিন ধরে আমি ভারতীয় পরিস্থিতি নিয়ে যে আলোচনা করেছি সেই প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আবার বর্ণনা করে আমি আজ উপসংহারে পৌঁছব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলি আপনাদের আরও একবার মনে করিয়ে দেব। আমরা আমাদের লক্ষ্যের অভিমুখে এতদূর এগিয়েছি ও সব শেষে আমাদের অবধারিত জয়ের বিষয়ে আমি এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে এই প্রকাশ্য আলোচনায় আমি কোনও গলদ দেখি না। অনেক সময়েই সব থেকে সফল কৌশলগুলিতে তাই করা হয়ে থাকে অর্থাৎ পরিকল্পনা গোপন না রেখে সবটা খোলাখুলি আলোচনা করে নেওয়া হয়।

ভারতবর্ষে তিন ধরনের মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীতে আছেন তাঁরা, যাঁরা সুদূর স্বপ্নেও কখনও দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে পারেন না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার উচ্চশিক্ষিত ও কৃষ্টিসম্পন্ন। তবে এঁরা মানসিকতায় ঘৃণ্য ও সংখ্যাতেও অতি নগণ্য এবং আমরা অনায়াসে তাঁদের হিসাব থেকে বাদ দিতে পারি। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন যাঁরা, তাঁরা স্বাধীনতা চান এবং মনে মনে ব্রিটিশদের ঘৃণাও করে থাকেন। কিন্তু সাধারণ মানবীয় দুর্বলতার কারণে সক্রিয়ভাবে কখনও কিছু করেন না, যদিও কোনও কোনও সময় তাঁরা আমাদের কিছু পরোক্ষ সাহায্য দিয়ে থাকেন। সাধারণভাবে সব ধরনের সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিজীবীদের মধ্যে এই শ্রেণীর মানুষদের পাওয়া যায়। যখন আমাদের জয় সম্বন্ধে আর কোনও সংশয় থাকবে না তখন তাঁরা এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। আমি এই ধরনের মানুষ দেখেছি ক্রোয়েশিয়া ও স্লোভাকিয়ার মতো নতুন, স্বাধীন দেশগুলিতে, এবং জার্মানির সঙ্গে যোগ দেবার পরে অস্ট্রিয়াতে। এমনকী বর্মাতেও আমি দেখেছি, প্রাক্তন আইসিএস অফিসার, প্রাক্তন হাই কোর্টের বিচারক এবং সব শ্রেণীর অফিসারেরা এসে স্বাধীন বর্মায় গঠিত নতুন শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। ভারতবর্ষেও আমরা আশা করছি যে এই শ্রেণীর মানুষরা আজ়াদ হিন্দের নতুন সরকারকে সমর্থন করবেন। আমরাও তাঁদের গ্রহণ করব, অবশ্যই যদি তাঁদের বিরুদ্ধে এমন কোনও অভিযোগ না থাকে যে তাঁরা ব্রিটিশ আমলে ভিতরে ভিতরে ব্রিটিশ শাসকদেরই দলে ছিলেন। বস্তুত আমি এই মর্মে একটা সরকারি ঘোষণাও করতে পারি যে, যেসব দক্ষ অফিসারেরা এখন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কাজ করছেন তাঁদের সকলকেই আজ়াদ হিন্দ বা স্বাধীন ভারতের নতুন সরকারে যোগ দিতে আহ্বান করা হবে। যদি না অন্তরে তাঁরা ব্রিটিশদের প্রতি সহানুভূতিশীল

---

১. Blood Bath, pp. 52-60

হন এবং ব্রিটিশ শাসকদের অধীনে কাজ করবার সময়ে যদি তাঁরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকেন। আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে সব সদস্য এই স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমাদের বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন বা ভবিষ্যতে যোগ দেবেন, আজ়াদ হিন্দ ফৌজের অন্যান্য সদস্যদের মতোই তাঁদের গণ্য করা হবে। কাজ থেকে অবসর নেবার সময় তাঁদের পেনশন দেওয়া হবে এবং আজ়াদ হিন্দ বাহিনীর কর্মজীবনের সঙ্গে তাঁরা যতদিন ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন, সেই সমগ্র সময়ের উপরেই পেনশনের হিসাব করা হবে।

ভারতের তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন যাঁরা, তাঁরা শুধুমাত্র স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন দেখেন না উপরন্তু সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁরা সক্রিয়ভাবে কিছু করতেও প্রস্তুত। আমার আজকের বক্তব্য মূলত তাঁদেরই উদ্দেশ্যে। স্বাধীনতাপ্রেমী এই ভারতীয়দের সামনে স্বাধীনতা লাভের বিভিন্ন পন্থাগুলি কী? প্রথম পন্থা হল, বিশ্ব যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ উপহার স্বরূপ আমাদের দেশকে স্বাধীনতা দেবে এই বিশ্বাসে অটল থেকে তাদের কাছে প্রার্থনা ও আবেদন করে যাওয়া। এই পন্থায় আমাদের স্বাধীনতা আসবে এমন বিশ্বাস আমার নেই, কোনও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয় আজ আর এই সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন না।

দ্বিতীয় পন্থা হল 'অপেক্ষা করি আর দেখি কী হয়' যেহেতু যুদ্ধে ব্রিটিশদের অবস্থা ক্রমশই সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে, অনেকের বিশ্বাস এই যে একসময় পরিস্থিতি এমনই হবে যে ব্রিটিশ আমাদের স্বাধীনতার দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবে। এদের মতে আমাদের আর কিছুই করার দরকার নেই অপেক্ষা করা ছাড়া, এবং সময় হলেই পাকা ফলটির মতো স্বাধীনতা আমাদের কোলে এসে পড়বে। এই সম্ভাবনাতেও আমি বিশ্বাস করি না। স্বদেশবাসীরা, আমি আপনাদের বহুবার বলেছি যে ব্রিটিশ তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যেমন করেই হোক তারা ভারতকে হাতছাড়া করবে না। এবং অন্যত্র তাদের অবস্থা যতই সঙ্গীন হবে আরও লোভীর মতো তারা ভারতবর্ষকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, এই বিশ্বাসে, যে যদি কোনওভাবে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের হাতে রাখা যায় তা হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও তাদের অধিকারে থাকবে।

তৃতীয় পন্থা হল "সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলনের" পথ, যা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯২১ সাল থেকে অনুসরণ করে আসছে। এই পথে কি আমাদের স্বাধীনতা আসবে? আমার সর্বাত্মক বিশ্বাস যে তা সম্ভব নয়, কারণ গত বিশ বছরের ইতিহাস আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছে। আমি জানি যে ১৯২১ সালে কংগ্রেসের অনেক নেতারই বিশ্বাস ছিল যে "সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য আন্দোলনের" পথে আমাদের স্বরাজ আসবে। সেই ভাবনা বা বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল দুটি ধারণার উপরে এবং পরবর্তীকালে দেখা গেছে এর কোনওটিই সত্য নয়। প্রথম ধারণা ছিল ব্রিটিশ শাসকদের মত ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় ধারণা ছিল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের চাপে ব্রিটিশ নিজের কৃতকর্মের ভুল বুঝতে পারবে। উপলব্ধি করবে যে ভারতবর্ষকে আর জোর করে পদানত করে রাখা যাবে না এবং প্রকৃত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদের মতো আচরণ করবে যেমন তারা করেছে কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে। আমরা এখন বুঝেছি যে ব্রিটিশ সরকারের হৃদয় বলে কোনও বস্তু নেই কাজেই তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবারও কোনও সম্ভাবনা নেই। আমরা আরও বুঝেছি যে শ্বেতাঙ্গদের জন্য ব্রিটিশ যে আচরণবিধি অনুসরণ করে থাকে, তা আমাদের মতো

অশ্বেতাঙ্গদের জন্য প্রযোজ্য নয়। উপরন্তু ব্রিটিশ এও অনুভব করেছে যে ভারতবর্ষ তাদের হাতের বাইরে চলে গেলে পুরো সাম্রাজ্যই ভেঙে পড়বে কারণ এই মূল কাঠামোর উপরে ভিত্তি করেই এই সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে আছে। এমনকী যদি ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনও দেওয়া হয় তা হলেও সেটা এক সময়ে ভারতকে সাম্রাজ্যের বাইরে নিয়ে যাবে। কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলির সঙ্গে ব্রিটিশদের একটা স্বাভাবিক বন্ধন আছে, যা ভারতের সঙ্গে নেই কাজেই একবার স্বায়ত্তশাসন পেলে ভারত অবশ্যই চেষ্টা করবে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য। এই প্রসঙ্গে আয়ারল্যান্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাস ব্রিটিশ জাতির মানসিকতা ও প্রবণতার উপরে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে। স্বদেশে অনেক ভারতীয় যেটা এখনও উপলব্ধি করেননি। ১৯২১ সালে, বিভিন্ন চিন্তাধারার অনুসারী সব রাজনীতিবিদ যখন ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন তখন তাঁরা ভেবেছিলেন যে চিরকালের মতো সমস্যার পূর্ণ সমাধান হল। কিন্তু ১৯৩২ সালে যখন প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরা ক্ষমতায় এলেন, তখন আয়ারল্যান্ডের সমস্যা নতুন করে দেখা দিল, এবং একটা প্রজাতান্ত্রিক দেশের জন্য পুনর্বার দাবি উঠল। প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য, বা তাঁর উপরে শাসকের অধিকার সাব্যস্ত করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছে। স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী আইরিশ সরকারের ক্ষমতা ও রসদ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরা এখনও পর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন এবং ১৯১৬ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত যখন তাঁর পরিচয় ছিল কেবল একজন বিদ্রোহী বলে সেই সময়ের তুলনায় এখনকার এই লড়াই অনেক বেশি কার্যকরী। ব্রিটিশদের মধ্যে এখন এই বিতর্ক চলছে যে ভারতবর্ষ ঠিক আয়ারল্যান্ডের পথেই যাবে, এবং এখন ভারতীয়দের যে বিশেষ সুবিধাই দেওয়া হোক না কেন, ভবিষ্যতে সেই সুবিধাগুলিকে ব্যবহার করে তারা তাদের দাবি আরও সোচ্চার করতে পারবে, আরও কার্যকরীভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চালাতে পারবে। সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দেওয়াই ব্রিটিশের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে, যদি তারা সেটা করতে পারে। এখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন দ্বারা কার্যত ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো বা তাদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা, কোনওটাই সম্ভব নয় কারণ সত্যাগ্রহ দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা আনা যেত যদি ব্রিটিশদের সঙ্গে একটা সম্মানজনক বোঝাপড়ার সুযোগ থাকত। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেরা যে নগ্ন নৃশংসতা দিয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে দমন করতে চেয়েছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে সেই বোঝাপড়ার কোনও সুযোগ তারা দেবে না। তার ফলে, যারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা পাবার অভিলাষী— তাদের জন্য চিরাচরিত ঐতিহাসিক পদ্ধতি ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। আমরা এখন চতুর্থ এবং চূড়ান্ত পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছি। যা হল স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম।

ভারতীয় জনসাধারণের বৃহদংশ বিশেষত ভারতের যুবশক্তি এই বিষয়ে অবহিত। সেই কারণেই গত চল্লিশ বছর ধরে সারা দেশ জুড়ে গোপনে গোপনে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের পথে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে, বোমা ও বিস্ফোরক প্রস্তুত করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমে, এবং সত্যাগ্রহের সাহায্য নিয়ে, অথবা সেই সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনতা অর্জনের সম্ভাবনা কতটা? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে অতীতের ইতিহাসের পাতা থেকে। নির্মম শক্তি প্রয়োগের উপরেই যে বিদেশি সরকারের ভিত্তি এবং প্রয়োজনে নির্মম অস্ত্র ব্যবহার করতে যারা বদ্ধপরিকর, অসংগঠিত বিপ্লবীদের দ্বারা অস্ত্রের সীমিত ব্যবহারের দ্বারা তাদের পরাস্ত করা সম্ভব নয়। স্বাধীনতার

যুদ্ধে জয়ী হতে হলে শুধুমাত্র অস্ত্রের ব্যবহারই যথেষ্ট নয়। সে জন্য প্রয়োজন আধুনিক যুদ্ধের সরঞ্জামে সজ্জিত সুসংবদ্ধ আধুনিক সৈন্যবাহিনী।

যদি ভারতবর্ষের মধ্যে আধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হত ও সেই বাহিনীর জন্য দেশের বাহির থেকে অস্ত্র আমদানি করা যেত তা হলে আমাদের অন্য কোনও সাহায্যের প্রয়োজন থাকত না এবং সেটাই হত ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু যাঁরাই ভারতবর্ষের পরিস্থিতির কথা জানেন এবং এও জানেন কীভাবে ১৮৫৭ সালের পর থেকে ভারতীয় জনসাধারণের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সকলেই একমত হবেন যে দেশের ভিতরে বিপ্লবী সেনাদল গড়ে তোলা বা সেই সেনাদলের জন্য দেশের ভিতরেই অস্ত্র জোগাড় করা একেবারেই অসম্ভব কাজ ছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমাদের সব আশা ছেড়ে দিতে হবে। প্রতিটি রোগেরই প্রতিকার আছে— তা সে যতই দুরারোগ্য হোক না কেন— তেমনই সব সমস্যারই সমাধান আছে, যদি আমরা সেই সমাধান খুঁজে বার করতে পারি। এই ক্ষেত্রে সমাধান হল, দেশের বাইরে সেনাবাহিনী গঠন করা। প্রয়োজনীয় অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম সেখান থেকেই জোগাড় করা এবং তারপরে স্বদেশে প্রবেশ করা। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা ঠিক সেই কাজটাই এখন করছেন।

পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা যা করছেন পৃথিবীর ইতিহাসে অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গত বিশ্বযুদ্ধের সময় আইরিশ শিন ফেইন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অর্থ ও অস্ত্র দুই ধরনের সাহায্যই পেয়েছিল, শুধু তাই নয় তারা জার্মানির কাছ থেকে ও অস্ত্র সাহায্য পেয়েছিল। ১৮৫৯ সালে ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামে তৃতীয় নেপোলিয়নের ফরাসি সেনাবাহিনীকে ইতালীয়রা ডেকেছিল অস্ট্রিয়ার হাত থেকে ইতালিকে মুক্ত করার জন্য তাদের সাহায্য করতে। তুরস্কের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য বলকান অঞ্চলের বাসিন্দাদের সংগ্রামে বুলগেরিয়া রাশিয়ান সেনাবাহিনীর সহায়তা পেয়েছিল। বস্তুত, বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসে আমি এমন একটা দৃষ্টান্তও পাইনি যেখানে স্বাধীনতা করায়ত্ত হয়েছে বিদেশি শক্তির কাছ থেকে একেবারেই কোনও সাহায্য না নিয়ে এবং এই কথা আমি বহুবার বলেছি।

আমি এর আগে বলেছি যে, অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কখনওই পাওয়া যাবে না। যদি কোনওভাবে এই অসম্ভব অলৌকিক ঘটনা ঘটত এবং কেবলমাত্র 'সত্যাগ্রহের' দ্বারা আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতাম তা হলে আমাদের থেকে বেশি আনন্দিত আর কেউ হত না। পূর্ব এশিয়াতে আমাদের এখন যে বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করতে হয়েছে তার কোনওই প্রয়োজন তা হলে থাকত না।

এই প্রসঙ্গে আমি বলব যে কোনও ব্যক্তি যিনি আন্তরিকভাবে দেশকে স্বাধীন করতে চান ও এতদিন অহিংসা আন্দোলনের মাধ্যমে তা পাবার চেষ্টা করে এসেছেন— তাঁদের সকলকেই এখন সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন দিতে হবে, কারণ অন্য সকল পন্থাই ব্যর্থ হয়েছে। আমি জানি আমাদের যুবসম্প্রদায় তাই করছে এবং ভবিষ্যতেও তাই করবে। কিন্তু আমাদের প্রবীণ নেতারা কী করবেন? তাঁদেরও সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন দেওয়া উচিত হবে। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করছি যে একেবারেই নিরুপায় অবস্থার সম্মুখীন হওয়াতে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতৃবৃন্দের এক অংশ এমন কিছু নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা কিনা মধ্যপন্থীরা এক সময় অনুসরণ করেছিলেন ও যা ইতিমধ্যেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। এটা যথার্থই একটা দুঃখের বিষয়।

এবার আমি সংক্ষেপে আমাদের কর্মপদ্ধতির কৌশলগুলি আপনাদের কাছে পুনর্বার উল্লেখ করব। আমরা জানি যে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সেনাবাহিনী দেশের বাইরে থেকে আসা কোনও আক্রমণের সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত দেশের ভিতরকার বিপ্লবী কার্যকলাপকে দমন করতে পারবে। সেইজন্যই আজ়াদ হিন্দ ফৌজকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের 'দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের' সৃষ্টি করতে হয়েছে। যখন আমরা ভারতবর্ষের আরও গভীরে প্রবেশ করতে পারব, এবং ভারতীয় জনগণ যখন স্বচক্ষে দেখবে যে ব্রিটিশ ফৌজ পিছু হঠতে বাধ্য হচ্ছে। তখন তাদেরও মনের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মাবে যে ব্রিচিশ সাম্রাজ্যের পতন আসন্ন। এবং তখন তারা তাদের জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে আসবে, দেশকে পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত করতে আমাদের অগ্রগামী সেনাদের সঙ্গে হাত মেলাবে। আমাদের এই যৌথ বাহিনী তখন ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করতে পারবে।

যে কোনও রাজনৈতিক বা সামরিক কৌশলকে কাজে পরিণত করতে হলে— আমাদের সর্বদাই জনসাধারণের মানসিক প্রবণতা কী সেটা বুঝতে হবে— যে কোনও সংগ্রামের এটা হল প্রাথমিক প্রয়োজন। পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা তাদের নিজেদের চোখের সামনে ও মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে হংকং থেকে চিন্দউইন নদী পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখেছে। সেই কারণেই ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে পরাজিত করে সেই শাসনকে উচ্ছেদ করার বিষয়ে তারা এতটাই আত্মবিশ্বাসী। ভারতের অভ্যন্তরে আমাদের স্বদেশবাসীদের সেই অভিজ্ঞতা হয়নি। সেইজন্য তাদের মনের মধ্যে আশঙ্কা আছে যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বন্ধন এখনও অত্যন্ত দৃঢ় ও সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। ভারতের মধ্যে বিপ্লবের সূচনা করতে হলে প্রথমত ভারতবাসীর মন থেকে সেই ভ্রান্ত ধারণাকে মুছে ফেলতে হবে। ব্রিটিশদের ক্ষমতা সম্বন্ধে অতিরিক্ত সম্ভ্রমশীল ভারতীয়দের ভ্রান্ত ধারণাকে সরিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে হলে আজ়াদ হিন্দ ফৌজকে লড়তে হবে ও জয় অর্জন করতে হবে রক্তের বিনিময়ে। একবার যদি ব্রিটিশ শাসকদের পিছু হঠতে বাধ্য করা যায়, যেমন মালয় ও বর্মাদেশে ঘটেছে তা হলে আমি বলব যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ তাদের প্রথম ও কঠিনতম কাজটি করতে পেরেছে।

আজ়াদ হিন্দ ফৌজের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা বিবেচনা করলে, আপনারা মনে করতে পারবেন যে এই সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম ধ্বংসস্তূপের উপরে। সিঙ্গাপুরের একদা অভেদ্য প্রতিরক্ষার দুর্গে ব্রিটিশদের পরাস্ত করে। অর্থাৎ ভাগ্য যেন ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যুর পরোয়ানা ঘোষণা করেছে এবং সেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার জন্যই আজ়াদ হিন্দ ফৌজের জন্ম এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করেই আজ়াদ হিন্দ ফৌজ গঠন।

এখন প্রশ্ন হল আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কেন জাপানের সাহায্য প্রয়োজন হবে। পঞ্চাশ হাজার প্রশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্রিটিশ সেনার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য আয়ারল্যান্ডে শিন ফেইনের অধীনে কেবলমাত্র পাঁচ হাজার অনিয়মিত সৈনিক ছিল। ইতালিতে গ্যারিবল্ডি মাত্র এক হাজার স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে প্রথম যুদ্ধে নেমেছিলেন। আমাদের তা হলে কীসের জন্য জাপানের সাহায্যের প্রয়োজন হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত সহজ। যদি বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগের ভারতের ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হত তা হলে বাইরের কোনও দেশের কাছে আমাদের কোনও সাহায্য নিতে হত না। কিন্তু এই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে ব্রিটিশ সরকার আমাদের

দেশে এক সুবিশাল সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে। উপরন্তু সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ইংল্যান্ড থেকে, আমেরিকা থেকে, আফ্রিকা থেকে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ অন্যান্য দেশগুলি থেকে এবং নেপাল থেকে তারা অতিরিক্ত সেনা অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম আমদানি করেছে। একদা শক্তিশালী ব্রিটিশ এখন সারা বিশ্বের কাছে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে ঘুরছে। সেই কারণে আমাদেরও বাধ্য হয়ে জাপানের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করতে হয়েছে।

ভারতের ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে যদি যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে ফিরিয়ে নেওয়া যেত তা হলে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আমরা জাপানের সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়াই ব্রিটিশ শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে পারতাম। এবং যদি ব্রিটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো' দাবি স্বীকার করে নেয় ও ভারত ছাড়ে, তা হলে আবারও আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, সেই ক্ষেত্রে একটি জাপানি সেনাও ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে পদার্পণ করবে না ও যারা ইতিমধ্যেই ভারতের অভ্যন্তরে রয়েছে তারা সানন্দে তখনই আমাদের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যাবে।

আমাদের যুদ্ধকৌশলের সারাংশ আপনাদের বলেছি। এবারে, এই যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে জয় যে আমাদের করায়ত্ত হবেই সেই বিষয়ে কেন আমি এতটা আত্মবিশ্বাসী, তার কারণ আমি স্বদেশবাসীর কাছে ব্যাখ্যা করব।

প্রথমত, ইতিহাসের নিয়মানুসারে এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তিম সময় আসন্ন হয়েছে। আমেরিকার সাহায্য বা সেই ধরনের কোনও কৃত্রিম প্রাণদায়ী উদ্দীপক দিয়ে সেই সাম্রাজ্যকে আর তাকে তার যৌবনের সপ্রাণ দীপ্তি ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। কিন্তু তেমনই তার মৃত্যুও অকস্মাৎ ঘটবে না। মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে তখন জীবনের সঙ্গে মরণের লড়াই চলে, আত্মসমর্পণের আগে সে লড়াই কখনও কখনও তীব্র আকার ধারণ করে। সেই কারণেই ব্রিটিশরা এখনও তাদের লড়াই অব্যাহত রেখেছে এবং পতন হবার আগে তারা আরও সতেজে লড়বে।

দ্বিতীয়ত, আমি এও অনুভব করছি যে ভারতের জনগণ এখন যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে এবং তাদের দেশ পরিচালনার ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নেবার জন্য তারা যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। এই প্রশিক্ষণের জন্য তারা যথেষ্ট সময় পেয়েছে।

তৃতীয়ত, আমি দেখেছি যে দেশে একটা ব্যাপক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছে, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেশের জনগণ এখন প্রয়োজন হলে কষ্ট সহ্য করতে ও ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। উপরন্তু তাদের রাজনৈতিক চেতনা এখন যথেষ্ট পরিণত ও সংযত।

চতুর্থ কারণ, আমাদের এতদিন যে অভাব ছিল— দেশ স্বাধীন করবার জন্য কোনও সেনাবাহিনী ছিল না। এখন সেই অভাব দূর হয়েছে ও একটি মুক্তিযোদ্ধার বাহিনী গঠিত হয়েছে।

পঞ্চম কারণ, দেশের বাহির থেকে আমরা সামরিক সাহায্য পাচ্ছি— ভারতকে স্বাধীন করতে হলে যা একান্তই আবশ্যক। দেশের পূর্ব সীমান্ত উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় এবং পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সেটা এখন সম্ভব হয়েছে।

ষষ্ঠ কারণ, ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় ব্রিটেনের পূর্বের প্রস্তুতি একেবারে নিষ্ফল হয়ে গেছে, তার জন্য যুদ্ধ পরিস্থিতির অকস্মাৎ একটা দিক পরিবর্তনকে ধন্যবাদ জানাতে হয়। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বিচারে পূর্ব দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করা আমাদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক এবং ব্রিটিশদের জন্য অসুবিধার কারণ হয়েছে।

সপ্তম কারণ, ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পূর্ব এশিয়াতে বেশ শক্তিশালী একটা ঘাঁটি তৈরি করতে আমরা সক্ষম হয়েছি। পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়রা 'সর্বাত্মক প্রস্তুতি'-র মাধ্যমে সৈন্য, অর্থ ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করে এক দুর্ধর্ষ বাহিনী গড়ে তুলেছেন। ভারতের অভ্যন্তরের যুদ্ধে এই বাহিনী সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে, যতদিন আমাদের সেই সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

অষ্টম কারণ, এ ছাড়াও সঙ্কটকালে আধুনিক ও প্রথম শ্রেণীর শক্তি জাপান আমাদের সহায়তা করবে— বিশেষত যদি ভারতে মিত্র শক্তির সম্মিলিত বাহিনীর সামরিক ক্ষমতার মোকাবিলা করা আমাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।

নবম কারণ, বর্মাদেশ থেকে যখন আমরা ভারতের ভিতরে অগ্রসর হচ্ছি তখন চুঙকিঙের পক্ষে পিছন থেকে আমাদের আক্রমণ করার আশঙ্কা থাকবে না।

দশম কারণ, আমাদের নিজস্ব সরকার আমাদের পরিচালনা করছে, এই সরকার অন্য নয়টি বন্ধুভাবাপন্ন দেশের স্বীকৃতি ও তাদের সমর্থন পেয়েছে।

একাদশ কারণ, যদিও সাধারণভাবে যুদ্ধের পরিস্থিতি আমাদের অনুকূলে আছে, কিন্তু ইউরোপে যা ঘটছে তা থেকে আমাদের এই যুদ্ধ স্বতন্ত্র এবং ভবিষ্যতে ইউরোপে যাই ঘটুক না কেন আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

সব শেষের কারণটি হল, শত্রুপক্ষের তুলনায় আমাদের আপেক্ষিক শক্তির বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা আমাদের আছে।

সর্বোপরি, যে সচেতনতা আমাদের আরও শক্তি জুগিয়েছে এবং যে বিশ্বাস ও সচেতনতা বিপক্ষের নেই তা হল, আমরা লড়াই করছি ন্যায়, সত্য, আমাদের জন্মগত অধিকার ও মুক্তির জন্য। শেষদিন পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার যে সঙ্কল্প আমরা নিয়েছি সেই সিদ্ধান্তে আমরা অবিচল থাকব। আমাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা জিতে নেব, এর পূর্ণ মূল্য দিতে এখন আমরা প্রস্তুত।

আজকের বক্তব্য শেষ করবার আগে, এখন ভারত-বর্মা সীমান্ত ও ভারতের অভ্যন্তরে যে লড়াই চলছে সেই বিষয়ে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। এই যুদ্ধের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হল এই যে ব্রিটিশদের যদি পুনর্বার বর্মাদেশে অধিকার প্রতিষ্ঠার কোনও পরিকল্পনা থেকে থাকে, তা হলে অবশেষে এই যুদ্ধ সেই পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে বানচাল করে দিয়েছে। তাদের হতাশা গোপন করার জন্য এখন তারা বলছে যে আমরা এখনও দিল্লি পৌঁছতে পারিনি এবং কবে দিল্লি পৌঁছব সেই বিষয়ে তারা নানারকম কাল্পনিক তারিখ দিচ্ছে।

বন্ধুরা! কেবলমাত্র বুদ্ধিহীন মানুষই শত্রুর শক্তিকে অবহেলা করে থাকে। আরাকানে, কালাদান ও হাকা অঞ্চলে, টিড্ডিম এলাকায় এবং মণিপুর ও আসামে যুদ্ধের সময়ে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ধরনের সেনা দিয়ে আমাদের শত্রুবাহিনী গঠিত। আমরা যেটা আগেই অনুমান করেছিলাম, তাদের দৈনিক খাদ্যের বরাদ্দ ও অস্ত্রশস্ত্র আমাদের থেকে উচ্চমানের, কারণ তারা তো বহুদিন ধরেই ভারতবর্ষে লুঠতরাজ চালাচ্ছে যাতে আমাদের বিরুদ্ধে দরকার হলে লড়তে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সর্বত্রই তাদের পরাস্ত করতে পেরেছি। পৃথিবীর সর্বত্রই বিপ্লবী সেনাদের আমাদের মতো পরিস্থিতিতেই লড়তে হয় এবং সর্বত্রই প্রায় শেষের জয় তাদেরই করায়ত্ত হয়। তাদের শক্তি বিয়ার বা রাম বা টিনের পর্ক, বিফ থেকে আসে না, তাদের শক্তি আসে বিশ্বাস ও ত্যাগের থেকে— বীরত্ব ও স্থির হয়ে বিপদের মুখোমুখি

হবার মনোবল থেকে।

আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এমনভাবে যাতে তারা চূড়ান্ত অসুবিধা ও কষ্টকর পরিস্থিতিতেও লড়াই করতে পারে, যা ভারতের ব্রিটিশ সেনারা পারবে না। আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনারা, ৩৮.৮ কোটি ভারতবাসীর মুক্তির জন্য লড়াই করছে ও তারা কখনওই স্বদেশবাসীর বিশ্বাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে না।

মণিপুর ও উত্তরপূর্ব আসামের ভৌগোলিক অবস্থান এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে ব্রিটিশ সেখানে আপ্রাণ চেষ্টা করবে সেই সীমান্ত রক্ষা করার, সেটাই স্বাভাবিক। বিবদমান দুই পক্ষেরই জানা আছে যে মণিপুরকে যদি ব্রিটিশ অধিকার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যায় তা হলে ব্রিটিশ বাহিনীকে একটা বিশাল অঞ্চল জুড়ে পিছু হটে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের অফিসারেরা চেষ্টা করছে ভারতের অভ্যন্তরে লড়াইয়ের সময় ও অভিজ্ঞতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে। সংগ্রাম যতই দীর্ঘ ও কঠিন হবে আমাদের তাতে তত বেশি উপকার হবে, কারণ আমাদের নতুন বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী ও তাদের অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য এইটাই একমাত্র পন্থা। এখন শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাই নয়, আমাদের সেনাদলকে, তাদের অফিসার ও জেনারেলদের এমনভাবে তৈরি হতে হবে যাতে তারা চিরকালের জন্য ভারতের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। সুতরাং মণিপুর ও আসামে এখন যেভাবে যুদ্ধ চলছে তা আমাদেরই উপকার করবে।

ভারতের অভ্যন্তরে এখন যে যুদ্ধ চলছে তা জাপানের সঙ্গে ব্রিটিশ ও আমেরিকান বাহিনীর যুদ্ধ নয়, এ হল স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতবর্ষের নিজস্ব লড়াই। সেই কারণেই আমাদের ধৈর্য ও মনোবলের কোনও অভাব নেই। মণিপুর থেকে দিল্লি অনেক দূরের পথ। সেইজন্য রাজধানীতে আমাদের তেরঙা পতাকা উত্তোলনের আগে আমাদের হয়তো দুই বছর ধরে লড়তে হবে। কারণ আমরা জানি লড়াই যত দীর্ঘ ও যত কঠিন হোক না কেন, এই যুদ্ধের শেষ ফলাফলে আমাদেরই জয় হবে। ইতিমধ্যে আমাদের শত্রুপক্ষ যারা ১৯৪২ সালে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তুতি নিয়েছিল, তারা আরও কয়েকদিন অতিরিক্ত সময় পাবে তাদের ধ্বংস ও লুঠতরাজ চালিয়ে যাবার জন্য, যতদিন না নতুন দিল্লির ভাইসরয়ের প্রাসাদ থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তিম অবস্থার শেষ ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়।

জয় হিন্দ

৪৭

মহান দেশপ্রেমিক ও নেতা

[সম্রাট বাহাদুর শাহের সমাধিস্থলে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে দেওয়া ভাষণ, ১১ জুলাই ১৯৪৪][১]

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে, এখানে সম্রাট বাহাদুর শাহের সমাধিস্থলে আমরা একটি আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে মিলিত হয়েছিলাম। আমাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম— ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় বাহাদুর শাহ ছিলেন আমাদের নেতা। পরাধীনতার বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভারতবর্ষের সংগ্রামে, ও আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনা যাঁরা সেই দিন এখানে উপস্থিত ছিলেন ও কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের জন্যও গত বছরের সেই অনুষ্ঠান ছিল একটা বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা। আমি সেই অনুষ্ঠানকে ঐতিহাসিক বলছি এই কারণে, যে ১৮৫৭ সালের পর সেই প্রথম ভারতের প্রথম বিপ্লবী সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের আত্মার সম্মানে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়েছিল ভারতের নতুন বিপ্লবী সেনাবাহিনী। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের অনুষ্ঠানে আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম, সকলে সেই দিন সম্রাট বাহাদুর শাহের আরব্ধ কাজ অব্যাহত রাখার ও ব্রিটিশ কবল থেকে ভারতভূমিকে মুক্ত করার পবিত্র শপথ গ্রহণ করেছিলাম। সেই শপথ অংশত রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে সে কথা জানাতে পেরে আজ আমি অত্যন্ত আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি। যে সেনারা সেদিন এখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই আজ রণক্ষেত্রে, আজ়াদ হিন্দ ফৌজের বাহিনী এখন ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে আমাদের মাতৃভূমির মাটিতে লড়ছে।

একটা আশ্চর্য ঘটনাচক্রে— হয়তো ভাগ্যের হস্তক্ষেপেও বলা যেতে পারে— এই বছর, সম্রাট বাহাদুর শাহের মহাপ্রয়াণের বার্ষিকী নেতাজি সপ্তাহের সঙ্গে একই সময়ে উদযাপিত হচ্ছে— যে সপ্তাহে সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে ভারতীয়রা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যাবার শপথ নিচ্ছেন আবার নতুন করে, যতদিন না ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। যে স্থানে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বাধিনায়কের দেহাস্থি বিশ্রাম পেয়েছে ঠিক সেই স্থানেই ভারতের শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলকেন্দ্র স্থাপিত হল, এর মধ্যেও ভাগ্যের আনুকূল্যের ইঙ্গিত আছে। এই পুণ্য তীর্থ— যা এখন আমাদের মূলকেন্দ্র, সেই স্থান থেকেই আমাদের সেনাবাহিনী ভারতের দিকে যাত্রা করছে। সেই কারণেই আজ আমরা এখানে আবার সমবেত হয়েছি, আজ়াদ হিন্দ ফৌজের কুচকাওয়াজের মাধ্যমে আমরা সেই মহান দেশপ্রেমিক ও নেতার আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার জন্য— গত বছরে গ্রহণ করা শপথ অংশত রক্ষা করতে পারায় আমাদের সার্থকতার আনন্দ ঘোষণা করবার জন্য— এবং যতদিন না

---

১. Blood Bath, pp. 61-65. হিন্দুস্থানি থেকে অনূদিত।

ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের অবাঞ্ছিত অধিকার থেকে মুক্ত করা যায় ততদিন পর্যন্ত কোমর বেঁধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার শপথ নেবার জন্য।

১৮৫৭ সালের ঘটনা সম্বন্ধে আজ আমার পক্ষ থেকে কয়েকটি কথা বলা উচিত হবে বলে আমি মনে করি। ১৮৫৭ সালের যুদ্ধের বিষয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা মিথ্যা কাহিনী প্রচার করেছে যে সেই যুদ্ধ ছিল ব্রিটিশদের জন্য কর্মরত সেনাদের বিদ্রোহ। প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল একটা জাতীয় বিপ্লব, যেখানে ভারতীয় সৈন্য ও ভারতীয় জনগণ দুই পক্ষই যোগ দিয়েছিল। দেশব্যাপী এই সংগ্রামে বহু ভারতীয় রাজারাও অংশগ্রহণ করেছিলেন, যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে কেউ কেউ যোগ দেননি। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আমরা একের পরে এক যুদ্ধে জিতেছিলাম কিন্তু শেষের দিকে আমাদের পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়েছিল প্রবল প্রতিপক্ষের কাছে। বিপ্লবের ইতিহাসে সেটা কোনও নতুন কথা নয়। বিশ্বের ইতিহাসে আপনারা দেখবেন বিপ্লবের প্রথম সংগ্রামেই সাফল্য এসেছে সেই উদাহরণ বিরল। 'স্বাধীনতার সংগ্রাম একবার শুরু করতে পারলে সর্বক্ষেত্রেই তা উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে পুত্রের হাতে এসে পড়ে।' বিপ্লব প্রথমে ব্যর্থ হলেও সব সময়েই তার থেকে উত্তরসূরীরা শিক্ষা নিতে পারে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেই শিক্ষা তাদের আরও প্রস্তুত হবার, আরও কার্যকরীভাবে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার সুযোগ দেয়। ১৮৫৭ সালের আমাদের ব্যর্থ বিদ্রোহ থেকে আমরা শিখেছি এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এই বর্তমান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি— এটা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শেষ সংগ্রাম।

যদি কেউ ভাবে যে ১৮৭৫ সালে ভারতবাসী একদিন ভোরবেলায় উঠে হঠাৎ করেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল, তা হলে সেটা ভুল হবে। হঠাৎ করে পরিকল্পনাহীন ভাবে কখনও কোনও বিপ্লব আনা যায় না। ১৮৫৭ সালে আমাদের নেতারা সেই যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তবে পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছিল যে সেই প্রস্তুতি যথেষ্ট ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, সেই পবিত্র যুদ্ধের একজন উল্লেখযোগ্য নেতা নানাসাহেব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেছিলেন বিদেশি সাহায্য ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে। দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই প্রচেষ্টা তাঁর সফল হয়নি এবং ১৮৫৭ সালে যখন বিদ্রোহের সূচনা হল তখন ব্রিটেনের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় ব্রিটিশ তাদের সম্পূর্ণ শক্তি ও রসদ ভারতীয় জনগণের সেই বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করতে পারল। দেশের অভ্যন্তরে, ভারতীয় সেনাদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রচার চলেছিল অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যাতে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই দেশের বিভিন্ন স্থানে একই সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হতে পারে। একের পর এক যুদ্ধে ভারতীয়রা জয়ী হয়েছিল। উত্তর ভারতের বড় শহরগুলি ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করা গিয়েছিল ও বিজয়ী বিপ্লবী সেনারা ভারতীয় শহরগুলি অধিকার করে নিয়েছিল। সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ের শেষে প্রায় সর্বত্রই বিপ্লবী সেনারা জয়ী হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন শত্রুপক্ষের প্রতি আক্রমণ শুরু হল তখন আমাদের সেনা আর তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না। তখনই উপলব্ধি করা গেল যে বিপ্লবীদের পরিচালনার কাজে দু'টি অভাব আছে, এক হল সারা ভারত জুড়ে একটা সামগ্রিক রণকৌশল ও অন্যটি হল একজন প্রকৃত কর্মবীর নেতা যিনি সেই রণকৌশলকে কাজে পরিণত করবার ক্ষমতা রাখেন। উপরন্তু, ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে রাজারা এই সংগ্রামে যোগ দিলেন না, তাঁরা উদাসীন দর্শকের ভূমিকা নিলেন। এই প্রসঙ্গে বাহাদুর শাহ জয়পুর, যোধপুর, বিকানির, আলওয়ার ইত্যাদি রাজ্যের রাজাদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন:

'আমার একান্ত ইচ্ছা যে ব্রিটিশদের যেন হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়িত করতে পারা যায়, যে কোনও মূল্যে ও যে কোনও প্রকারে। আমার একান্ত ইচ্ছে যে সমগ্র হিন্দুস্থানকে যাতে স্বাধীন করা যায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে ও যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা কখনওই সাফল্য পাবে না যতক্ষণ না আমরা এমন একজন মানুষকে পাব যিনি এই সমগ্র যুদ্ধের ভার বহন করতে ও পরিচালনা করতে পারবেন, যিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন শক্তিগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করে, নিজে এগিয়ে এসে সেই সংগঠিত জনসমাজকে নেতৃত্ব দিতে পারবেন। ব্রিটিশ কবলমুক্ত হবার পরে ভারতের শাসনভার পুনর্বার হাতে নেবার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই, আমার নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমি এই কাজে ব্রতী হইনি। আপনারা সব রাজারা যদি আজ আপনাদের অসি কোষমুক্ত করে শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন তা হলে আমি সানন্দে আমার সিংহাসন ত্যাগ করে সম্রাটের সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বভার, আপনাদেরই নির্বাচিত একটা সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীর হাতে সমর্পণ করতে প্রস্তুত, যাঁরা এই দায়িত্বভার নিতে সক্ষম।'

বাহাদুর শাহের নিজের হাতে লেখা এই চিঠিতে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের যে নিদর্শন দেখা গেছে তাতে প্রতিটি স্বাধীনতাকামী ভারতীয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করবেন। বৃদ্ধ ও দুর্বল বাহাদুর শাহ জানতেন যে স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই তিনি ছয় জন সদস্যবিশিষ্ট এক কমিটি গঠন করেছিলেন— তার মধ্যে ছিলেন তিনজন সেনানায়ক ও তিন জন অসামরিক সদস্য— যাঁরা সমগ্র যুদ্ধ পরিচলনার দায়িত্বভার নিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল— হয়তো ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের যথার্থ সময় তখনও আসেনি।

বিপ্লবের যে চেতনা ও আদর্শ এই বৃদ্ধ নেতাকে অনুপ্রাণিত করেছিল তার আরও একটি নিদর্শন আছে। যুক্ত প্রদেশের বেরিলীর দেওয়ালে বাহাদুর শাহের যে ঘোষণাপত্রটি ঝোলানো হয়েছিল তাতে তিনি বলেছিলেন:

'আমাদের সেনাবাহিনীতে ক্ষুদ্র ও বৃহতের পার্থক্য ভুলে গিয়ে সকলকে সমান মর্যাদা দেওয়ার নীতি আমরা অনুসরণ করব, কারণ এই পুণ্য সংগ্রামে যাঁরা অস্ত্রধারণ করেছেন তাঁরা সকলেই সমান গৌরবের অধিকারী। তাঁরা সকলেই একে ওপরের ভাই, তাঁদের মধ্যে কোনও শ্রেণীভেদ নেই। সুতরাং আমি আবার সকল ভারতীয় ভাইদের আজ আহ্বান করছি, আসুন এই মহান যুদ্ধে যোগ দিন ও আপনাদের সর্বোত্তম কর্তব্যে ব্রতী হন।'

আমি আজ আপনাদের কাছে এই ঘটনাগুলি পুনরাবৃত্তি করছি যাতে আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বহুকাল আগে, ১৮৫৭ সালেই। বর্তমানের এই শেষ স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের সামনে আছে সেই প্রথম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, ও ব্যর্থ বিদ্রোহ থেকে পাওয়া শিক্ষা। এবার আমাদের পক্ষে আছে ভাগ্যের সহায়তা। আমাদের শত্রুপক্ষ বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনমরণ সংগ্রামে জড়িত আছে। স্বদেশে ভারতীয় জনগণ তাদের কর্তব্য সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন। আজ়াদ হিন্দ ফৌজ আজ এক অজেয় বাহিনী, যার সকল সদস্য স্বদেশকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করবার এক লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ। যতদিন না জয় আমাদের করায়ত্ত হয়, ততদিন এই যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য দীর্ঘকালীন রণকৌশল আমাদের স্থির করা আছে। আমাদের মূল ঘাঁটি আমরা উপযুক্তভাবে গড়ে তুলেছি, এবং সর্বশেষে বাহাদুর শাহের স্মৃতি ও উদাহরণ আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে অনুরূপ শৌর্য্য ও বীরত্ব প্রকাশে। চূড়ান্ত যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী যে আমাদেরই উপরে

প্রসন্ন হবেন সেই বিষয়ে কি কোনও সন্দেহ থাকতে পারে?

আমি ১৮৫৭ সালের ঘটনাবলী যখন পর্যালোচনা করি এবং বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পরে ভারতবাসীর উপরে ব্রিটিশ যে নির্মম অত্যাচার করেছিল, সেই কথা যখন চিন্তা করি তখন আমার রক্ত ফুটতে থাকে। আমরা যদি মানুষ হই, তা হলে ১৮৫৭ সাল ও তার পরবর্তী কালে ব্রিটিশদের হাতে সেই বীর যোদ্ধাদের যে ভয়াবহ অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল, সেই অপমান ও অত্যাচারের প্রতিশোধ আমরা নিশ্চয়ই নেব। ভারতবর্ষ আজ প্রতিশোধ চায়। যে ব্রিটিশ স্বাধীনতাকামী নিরপরাধ ভারতীয়দের রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং শুধু যুদ্ধের সময় নয়— যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরেও তাদের উপরে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল, ব্রিটিশদের সেই অপরাধের শাস্তি পেতেই হবে। আমরা, ভারতীয়রা শত্রুদের যথেষ্ট ঘৃণা করতে জানি না। আপনাদের স্বদেশবাসীকে যদি অতিমানবিক সাহসিকতার পরিচয় দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হয় তা হলে অবশ্যই তাদের উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিতে হবে— শুধু স্বদেশকে ভালবাসার শিক্ষা নয়— সেই সঙ্গে তাদের শত্রুদের ঘৃণা করার শিক্ষাও।

অতএব, আজ আমি রক্ত চাই। শুধুমাত্র শত্রুর রক্তের বিনিময়েই অতীতের অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই রক্ত নেবার জন্য আমাদের রক্ত দিতেও প্রস্তুত থাকতে হবে। ফলস্বরূপ, আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা হল রক্ত দেওয়া। আমাদের বীর যোদ্ধাদের রক্তে অতীতের পাপ ধুয়ে যাবে। আমাদের বীর যোদ্ধাদের রক্তই হবে আমাদের স্বাধীনতার মূল্য। আমাদের বীর যোদ্ধাদের রক্ত— তাদের শৌর্য্য ও সাহসিকতাই— ভারতীয়দের সুযোগ দেবে নৃশংস ব্রিটিশ শাসকদের উপরে প্রতিশোধ নেবার।

পরাস্ত হবার পরে, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বাহাদুর শাহ বলেছিলেন,

গাজিয়োঁ মেঁ বু রহেগি জব তলাক ইমান কী
তখ্‌ত লন্ডন তক চলেগি, তেঘ হিন্দোস্তান কী

'যতক্ষণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্তরে বিশ্বাস আছে, ভারতবর্ষের তরবারি ততদিন লন্ডনের বক্ষ বিদীর্ণ করতে পারবে।' তিনি অভ্রান্ত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটেনের বক্ষ বিদীর্ণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে।

জয় হিন্দ

৪৮

শত্রুপক্ষের প্রচার কৌশল পরিবর্তিত হচ্ছে

[১২ জুলাই ১৯৪৪, একটি বেতার ভাষণ][১]

বন্ধু ও স্বদেশবাসীরা,

গত কয়েক দিন ধরে পূর্ব এশিয়াতে আমাদের কাজের কথা আপনাদের কাছে আমি বিস্তারিত জানিয়েছি; সেই সঙ্গে আরও বলেছি গত এক বছরে আমাদের কী অগ্রগতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের কাজের পরিকল্পনা কী। যে বিরাট আকারের জাতীয় বিপ্লবের কথা আমি বলছি, তার জন্য কৌশল গোপন রাখার কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই, এমনকী আমাদের কাজের পরিকল্পনার কথাও আমরা প্রকাশ্যে আলোচনা করতে পারি। সমগ্র ভারতের জনগণকে আমাদের স্বপক্ষে আনতে পারার উপরেই নির্ভর করবে আমাদের সংগ্রামের সাফল্য। কাজেই তাদের সঙ্গে প্রতারণা করার চেষ্টা আত্মহত্যারই সামিল বলে আমি মনে করি। স্বদেশবাসীদের সমর্থন আমরা পাব শুধুমাত্র অবান্তর-আড়ম্বরবিহীন, অকপট আলোচনার মাধ্যমে। আমরা লড়াই করছি ন্যায় ও সত্যের জন্য, স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করবার অধিকার যা আমাদের জন্মগত, সেইটুকু পাবার জন্য। এমনকী আমাদের শত্রু পক্ষেরও সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকার কথা নয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষই— আমি জানি— অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমাদের সমর্থন করবেন। একমাত্র যে প্রশ্ন তাঁদের উদ্বিগ্ন করছে তা হল, আমাদের প্রচেষ্টা কি ফলবতী হবে? যেদিন তাঁদের সেই উদ্বেগ আমরা দূর করতে পারব, আমাদের সাফল্য সম্বন্ধে তাঁরা যেদিন নিশ্চিত হতে পারবেন, সেই দিন তাঁরা এগিয়ে এসে সোৎসাহে আনাদের সঙ্গে হাত মেলাবেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বিদেশিদের পদানত থাকার অভ্যাস মানুষের আত্মবিশ্বাস কেড়ে নেয়, তাই এগিয়ে আসবার আগে, যতক্ষণ এই সংগ্রামের ফলাফলের বিষয়ে তাঁদের সন্দেহের অবকাশ থাকবে, ততক্ষণ তাঁরা নিজের জানপ্রাণ বাঁচাবার জন্য সতর্ক থাকবেন।

আমাদের শত্রুপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যপদ্ধতি আমাদের থেকে ভিন্ন। আমাদের দেশের উপরে, আমাদের জনগণের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া এই বিদেশি শাসন— নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের দেশের ধনসম্পদ অপহরণ— এর স্বপক্ষে তাদের নীতিগত কোনও যুক্তি নেই। সুতরাং তারা যে অস্ত্র ব্যবহার করছে তা হল— আত্মপ্রচার, প্রতারণা, সত্যগোপন, এবং তদুপরি নির্মম অত্যাচার। আমার জানা আছে যে সাম্রাজ্যবাদী এই শক্তি যে কোনও ভাবে ভারতবর্ষের উপরে তাদের অন্যায় অধিকার অব্যাহত রাখার চেষ্টা করবে এবং তা আমাকে একেবারেই আশ্চর্য করে না। যা আমাকে আশ্চর্য করছে ও

---

১. Blood Bath, pp. 66-67. হিন্দুস্থানি থেকে অনূদিত।

বেদনা দিচ্ছে, তা হল যে হীন কাজগুলি ব্রিটিশদের নিজেদের করবার কথা ছিল। ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কর্মরত আমাদের কিছু দেশবাসীই সেই কাজগুলি করে দিচ্ছে। কেন তারা মাসিক কয়েক শত টাকা বেতনের বিনিময়ে নিজেদের ব্যক্তি সত্তাকে এমন হীনভাবে বেচে দেবে? গত যুদ্ধের সময়কার ব্রিটিশ প্রচারের কার্যপদ্ধতি ইংরেজরা নিজেরাই সাদা-কালোয় নথিবদ্ধ করে রেখেছিল। পোসেনবির লেখা 'Secrets of Crewe House' বা 'Wartime Falsehood' ইত্যাদি বইগুলি পড়লে যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবেন যে ব্রিটিশ প্রচার মাধ্যমের পক্ষে কী ধরনের মিথ্যা প্রচার করা সম্ভব। ব্রিগেডিয়ার চ্যারেরিস নামক একজন ইংরেজ জেনারেল গত যুদ্ধের সময় প্রচার করতে শুরু করলেন যে জার্মানরা মৃত সৈন্যদের শরীর থেকে চর্বি বার করে নিচ্ছে। তাঁর ভালভাবেই জানা ছিল যে এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা প্রচার এবং যুদ্ধ শেষ হবার পরে স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেছিলেন তাঁর প্রচার যে এমনভাবে মানুষের মনে বিশ্বাসের শিকড় বিস্তার করতে পারবে সেটা তাঁর আশার অতীত ছিল। কিন্তু সরলমতি সাধারণ মানুষ ভাবেনি যে একজন ব্রিটিশ সেনাপতি মিথ্যাচরণ করতে পারেন, কাজেই তাঁর ফন্দি বেশ ভাল মতোই কাজে লেগেছিল। কিন্তু সেই দিন আর নেই। বিশ্বের জনগণকে আর তত সহজে প্রতারণা করা যায় না। এবং সেজন্য রেডিয়ো আবিষ্কারকে ধন্যবাদ দিতে হয়, যার মাধ্যমে বিবদমান দুই পক্ষের প্রচারই এখন পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে। সেই কারণেই এই যুদ্ধে, ব্রিটিশ প্রচার আর তেমন কার্যকরী হচ্ছে না। কিন্তু চিতা বাঘ তাদের দেহের ছাপ পালটাতে পারে না, মিথ্যাবাদীরাও মিথ্যা না বলে থাকতে পারে না, যদিও তারা জানে যে কেউ আর তাদের কথায় বিশ্বাস করছে না। তারা তবুও আশা করতে থাকে যে পৃথিবীতে আরও কিছু বুদ্ধিহীন মানুষ আছে যারা হয়তো আবারও প্রতারিত হবে। সুতরাং যখন দেখছি ব্রিটিশ এখনও তাদের মিথ্যা ভাঁওতা চালিয়ে যাচ্ছে তখন আমি অবাক হচ্ছি না। কিন্তু যখন দেখছি তাদের বেতনভুক গোলামেরা শাসকদের ঘৃণ্য কাজগুলি করে দিচ্ছে সেটা বড় বেদনাদায়ক। ভারতের অর্থনৈতিক দৈন্যদশার কথা আমি জানি এবং এও জানি ভারতীয়রা অনেকে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। কিন্তু শিক্ষিত মানুষেরা— শুধু পুরুষরাই নন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে মহিলারাও আছেন— তাঁরা এত স্বল্পমূল্যে কেন নিজেদের বিক্রি করে দিচ্ছেন, তার কোনও কারণ আমি খুঁজে পাই না। এমনকী, এও দেখছি যে উচ্চশিক্ষিত মানুষ— বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক— ভারত-বিরোধী রেডিয়োর প্রচারকেন্দ্র থেকে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে।

যা বলছি তার উদাহরণস্বরূপ আমি শত্রুর মিথ্যা প্রচারের একটা ঘটনা আপনাদের বলব। অ্যান্টি-ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে একাধিকবার বলা হয়েছে যে দেশে আমি এতই ধিক্কৃত যে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে আমাকে বিতাড়িত করা হয়েছে ও দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে, মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহরুর বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি যে যথেষ্ট সংখ্যায় ভোট পেয়ে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের পদে পুনর্বার নির্বাচিত হয়েছিলাম, একথা ভারতে কার অজানা? আমি যদি পুরাতন ওয়ার্কিং কমিটিকে পুনর্নিয়োগ করতে রাজি হতাম তা হলে মহাত্মা গান্ধীর সমর্থনে আমি স্বচ্ছন্দে আরও এক বছর প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করতে পারতাম, সে কথাই বা ভারতে কার জানা নেই? পুনর্বার নির্বাচিত হবার ফলশ্রুতি স্বরূপ আমার ইচ্ছা ছিল, ও আমি দাবিও করেছিলাম যে আমার ওয়ার্কিং কমিটি আমিই বেছে নেব যাতে মহাত্মাজি রাজি ছিলেন না। এটাই যে মহাত্মা গান্ধী ও আমার মধ্যে মতবিরোধের কারণ সে কথা ভারতে কার অজানা? ভারতে এ কথা কার জানা নেই যে

আমার জন্য সহজতম কাজ ছিল গৃহবন্দি হয়ে থাকা, এমনকী কয়েদখানাতেও 'সিকিউরিটি প্রিজ়নার' হিসাবে থাকা। ভারতে এ কথা কার জানা নেই যে ব্রিটিশের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে দেশ ছেড়ে যাওয়াটাই আমার পক্ষে সব থেকে কঠিন ও বিপজ্জনক ছিল? অ্যান্টি-ইন্ডিয়া রেডিয়োর কি এই কথা জানা আছে, না নেই, যে আমাকে আটকাতে পারেনি বলে বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসারের চাকরি হারাতে হয়েছে? অ্যান্টি-ইন্ডিয়া রেডিয়োর কি এই কথা জানা আছে, না নেই, যে আমার পিছনে সিক্রেট এজেন্ট লাগানো হয়েছিল আমাকে খুন করবার জন্য, যদি আমাকে ধরতে না পারা যায়?

শত্রুপক্ষ অন্য ধরনের প্রচারও করছে, হয়তো এতটাই হীন নয়, তবু সেগুলিও সমান ভাবেই মিথ্যা। একটা উদাহরণ দিই, যখন ১৯৪৩ সালে আমি যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ঘুরে টোকিওতে এসে পৌঁছলাম, সেই ঘটনা ব্রিটিশদের পক্ষে বড়ই অপমানজনক হয়ে দাঁড়াল, যেন তাদের গালে কেউ একটা চড় কষিয়েছে। সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুখরক্ষা করবার জন্য অ্যান্টি-ইন্ডিয়া রেডিয়োকে প্রচারে বাধ্য করা হল— একবার নয়, একাধিক বার— যে জার্মান সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হবার ফলে আমাকে নিতান্ত বাধ্য হয়ে ইউরোপ ছাড়তে হয়েছে। এই মিথ্যা প্রচারের উপযুক্ত জবাব পাওয়া গেল যখন পূর্ব এশিয়াতে আমাদের আপৎকালীন সরকার গঠনের পর জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন এল এবং সরকারি বিবৃতিতে আমাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানো হল। সম্প্রতি, আজ়াদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতি রোধ করার ও বর্মাদেশ পুনর্বার অধিকার করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পরে লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের লজ্জা ঢাকতে অ্যান্টি-ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত গল্প প্রচারিত হচ্ছে এই মর্মে যে আমার সঙ্গে জাপান সরকারের মতভেদ দেখা দিয়েছে। আমাদের সৈন্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে অথচ ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে আশানুরূপ সমর্থন পাওয়া যায়নি ও গণবিদ্রোহের কোনও সম্ভাবনা এখনও দেখা যায়নি, এই কারণে জাপান সরকার আমার উপর বীতশ্রদ্ধ। ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া আমার বেতার সম্প্রচার যাঁরা শুনেছেন তাঁরা সকলেই জানেন যে আমি রেডিয়ো মারফত ভারতবাসীকে বারবার অনুরোধ করেছি যে আমাদের কাছ থেকে সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত যেন কোনও প্রকার গণবিদ্রোহ, এমনকী বড় আকারের অন্তর্ঘাতের ঘটনাও যেন না ঘটে। অতি বড় নির্বোধও বুঝবে যে আমাদের সৈন্য দেশের গভীরে প্রবেশ করার আগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এই ধরনের কোনও গণবিদ্রোহ বা অন্তর্ঘাতের ঘটনা আত্মহত্যার সামিল, কারণ সেই ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের কাছে সাহায্য পৌঁছানোর জন্য কোনও ব্যবস্থা থাকবে না। আমি আবারও বলব যে অপপ্রচারের এই কৌশল আমাকে একেবারেই অবাক করে না। যারা স্বচ্ছন্দে আমাকে খুন করবার জন্য প্রস্তুত ছিল, তারা যে এই প্রচার কৌশল অবলম্বন করবে তাতে আশ্চর্য হবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু যা আমাকে অবাক করে ও লজ্জায় আমার মাথা নত করে দেয়, তা হল এতজন ভারতবাসী আছে যারা সামান্য অর্থের বিনিময়ে নিজেদের বেচে দিতে ও শত্রুদের হয়ে হীন কাজগুলি করে দিতে প্রস্তুত। ব্রিটিশ সরকার মনের সাধ মিটিয়ে আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছে— আমাকে দেশদ্রোহী, শত্রুর হাতের পুতুল এবং আরও কত কী বলছে— সেটাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু কেন তারা আমাদের মধ্য থেকেই মীর জাফর আর উমিচাঁদদের খুঁজে বার করতে পারবে যারা তাদের হয়ে মিথ্যা প্রচার চালাবার কাজটা করে দেবে? ভারতবর্ষে এমন মানুষ কি একজনও আছে যে বিশ্বাস করবে যে আমার পক্ষে জাপান বা অন্য কোনও বিদেশি শক্তির কাছে নিজের দেশকে বিক্রি করে দেওয়া সম্ভব।

আরও একটা হীন কাজ এই বেতনভুক ভারতীয়রা ব্রিটিশদের জন্য করছে, তারা মিথ্যা প্রচার করছে যে জাপানিরা বিশেষত ভারতীয়দের উপরে নির্মম অত্যাচার করেছে। পূর্ব এশিয়ার কোনও এলাকাতে যদি জাপানিরা আমার স্বদেশবাসীর উপর অত্যাচার করত তা হলে কি আমি এবং পূর্ব এশিয়ার অন্য ভারতীয়েরা জাপানিদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করতে পারতাম বা তাদের সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশাপাশি লড়াই করতে পারতাম— কোনও ভারতীয় কি সত্যই এ কথা বিশ্বাস করতে পারে? যেখানে জাপান ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সাধ্যের অতিরিক্ত সাহায্য করেছে, স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারকে তারা সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, সে ক্ষেত্রে আমার স্বদেশবাসী আর কিছু না করুক, অন্তত পক্ষে জাপানিরা ভারতীয় জনগণের উপরে অবর্ণনীয় অত্যাচার করছে এই মর্মে মিথ্যা প্রচার না করে তাদের মুখ বন্ধ রাখুক। যারা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশদের হাতে অত্যাচার বরদাস্ত করেনি, তারা কোনও মতেই বিশ্বের কোনও বিদেশি শক্তির হাতে অত্যাচারিত হওয়ার অবস্থাকে মেনে নেবে না। অত্যাচারের অপপ্রচার হচ্ছে ব্রিটিশ প্রচারবিদদের একটা পরিচিত কৌশল। এখন তারা আবার সব ভারতীয় ধর্ম— বিশেষ করে ইসলামের বিশেষ প্রবক্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতদিন জার্মানি ও সোভিয়েতের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ছিল এবং সোভিয়েতের কাছ থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের সাহায্য পাবার সম্ভাবনা ছিল ততদিন ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র— বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতে— বলে বেড়িয়েছে যে বলশেভিকরা নাস্তিক, ধর্মাচরণের বিরোধী। বিপদের সম্ভাবনা যেই উত্তর-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে স্থান্তারিত হল, তখন আমাদের শত্রুরা বলতে লাগল, জাপানিরা নাস্তিক, ধর্মাচরণের বিরোধী এবং তারা বিশেষভাবে ইসলামের বিরোধী। ভারতের মধ্যে মৌলবী ও পণ্ডিতদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন সেনাবাসে পাঠানো হতে লাগল যেন তারা পূর্ব এশিয়ায় নবাগত, এবং যারা ভারতীয় সেনাদের এই মর্মে উপদেশ দিতে থাকল। আমাদের তরফ থেকে ভারতে পাঠানো ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন যারা ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়েছিল, তাদের জাপান বিরোধী প্রচার চালাতে বাধ্য করা হয়, যে পূর্ব এশিয়ায় জাপানিরা বিশেষত মুসলমানদের উপরে বৈষম্যমূলক আচরণ ও উৎপীড়ন করছে। আমরা তার জবাবে এই কথাই বলব যে পূর্ব এশিয়ায় মুসলমানেরা হিন্দু, শিখ ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে একই লক্ষ্যের অভিমুখে, মাতৃভূমির মুক্তির উদ্দেশ্যে, তার থেকে আরও স্পষ্ট জবাব দিতে হলে এই কথাই বলতে হয় যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের বাহিনীতে বিপুল সংখ্যক মুসলমান আছেন এবং সেনাবাহিনীর উচ্চতর অফিসারের পদগুলিতে আনুপাতিক হিসাবে মুসলমানদের সংখ্যা আরও বেশি। ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর এই মুসলমান অফিসারেরা কোনও তুচ্ছ মানুষ নন। তাঁরা এসেছেন ভারতবর্ষের খানদানি পরিবার থেকে, দেরাদুনের মিলিটারি অ্যাকাডেমি বা সমমানের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিক্ষণ পাওয়া এই অফিসারেরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেও ব্যাপক ভাবে পরিচিত।

বেতনভুক গোলাম, ব্রিটিশদের কাছ থেকে মুষ্টিভিক্ষার বিনিময়ে যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে তাদের বোঝাবার জন্য, বা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে পারে এই আশায় যে আমি এই কথাগুলি বলছি তা নয়। আমি শুধুমাত্র তাদের এই কথা বলতে চাইছি যে আমরা জানি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই মিথ্যা প্রচার করছে। আমি জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করছি ও সেই ধরনের কাজে মিথ্যার প্রতিবাদ না করা অন্যায়। আমরা জানি সবশেষে সত্যেরই জয় অনিবার্য, তবু সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরও সক্রিয়ভাবে লড়াই করে

যেতে হবে। এই আধুনিক যুগে লড়াই কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, প্রচার মাধ্যমেও চলছে। যদি সাধারণ জনসমাজের কথা চিন্তা করি, আমি জানি শত্রুপক্ষের অপপ্রচার তাদের একেবারেই কোনওভাবেই প্রভাবিত করতে পারবে না। সেই কারণেই কলকাতা রেডিয়ো থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে বারে বারে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে, ভারতে আমাদের সহকর্মী ও এজেন্টদের কথায় যেন একেবারে কর্ণপাত না করা হয়। ভারত-বর্মা সীমান্তে ও ভারতের অভ্যন্তরে আমরা গত কয়েক মাসে যে নথিপত্র উদ্ধার করেছি তা আমাদের আগে পাওয়া সংবাদকেই সমর্থন করে। আমরা বুঝতে পারছি যে ভারতের অভ্যন্তরে আমরা যে কাজ করছি তাতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে এবং আমাদের সহকর্মী ও এজেন্টদের কাজে বাধা দেবার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কিছু নতুন ও কঠিন আইন জারি করতে বাধ্য হয়েছে।

আজকের দিনে ভারতীয় জনগণের মনের মধ্যে প্রধান যে বিষয়টি তাদের নাড়া দিচ্ছে, সেটা হল স্বাধীনতার জন্য ভারতের দাবি। আমি, আমার সহকর্মী ও আমার সহযোদ্ধারা সকলে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়ী হবার একটা পরিকল্পনা করেছি— একটা সুদৃঢ় পরিকল্পনা। বিকল্প কোনও পরিকল্পনা আমাদের সামনে পেশ না করা পর্যন্ত আমরা এই পরিকল্পনা মতোই কাজ করে যাব, তা সে ভাল অথবা মন্দ যাই হোক না কেন। একমাত্র বিকল্প যে পথটি আমাদের সামনে ছিল তা হল, মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। যদি সেই পথটিতে কাজ হয়, তা হলে আমাদের পরিকল্পনা ও আমাদের কাজের আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না। অপরপক্ষে যদি সেই পথটিতে কোনও ফললাভ না হয়— বাস্তবে সেটা ঘটনাই ঘটেছে— তা হলে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সব সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকবে আমাদের পরিকল্পনার সার্থর রূপায়নের উপরে। মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত পরিকল্পনা যদি সফল হত, সেই পথে যদি আমাদের স্বাধীনতা আসত তা হলে আমাদের থেকে বেশি আনন্দিত আর কেউ হত না, কারণ সেটা ছিল স্বাধীনতা লাভের জন্য স্বল্পতম দৈর্ঘ্যের পথ। কিন্তু সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায়, স্বদেশে ও প্রবাসে স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই, আমাদের প্রস্তাবিত বিকল্প পথ ছাড়া। যদি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রকৃতই আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে চায় তা হলে তাদের মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের সঙ্গে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ভিত্তিতে আপোষ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

আমাদের শত্রুপক্ষ ভাবছে যে, আমাকে স্বপ্নবিলাসী আখ্যা দিয়ে তারা আমাকে অপমান করবে। কিন্তু আমি যে নিজেই স্বীকার করে নিচ্ছি, আমি একজন স্বপ্নবিলাসী। আমি আমার শত্রুদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে আমি স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখি এবং আমি একা নই, আমার মতো আরও অনেকেই সেই স্বপ্ন দেখে। এই পৃথিবীতে যে যেখানে কোনও বড় সাফল্যের মুখ দেখেছে, তারা সকলেই এক সময়ে স্বপ্নবিলাসী ছিল। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মতো বাস্তববাদী সৈনিকও স্বপ্ন দেখতেন, তিনি ছিলেন বিশ্বের সেরা স্বপ্নবিলাসী। যদি স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমি না দেখতাম, তা হলে আমি পরাধীনতার, দাসত্বের এই শৃঙ্খলকেই আমার চিরন্তন ভাগ্য বলে মেনে নিতাম। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ যে স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন সে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে কিনা। আমার দিক থেকে বিচার করতে গেলে, আজ পর্যন্ত যা করব বলে আমি কথা দিয়েছি, তা সর্বাংশে আমি পূরণ করতে পেরেছি। আঠারো মাস আগে আমি ঘোষণা করেছিলাম যে আমি যখন ব্রিটিশ কারাগার থেকে পালিয়ে ভারত ছেড়েছিলাম পৃথিবীর কোনও শক্তি আমাকে আটকাতে পারেনি; যখন আমার সময় আসবে

আমি আবার ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করব, তখনও পৃথিবীর কোনও শক্তি আমাকে আটকাতে পারবে না। সেই ঘোষণার পরে লন্ডনের ব্লাফ অ্যান্ড ব্লাস্টার করপোরেশন ও অ্যান্টি-ইন্ডিয়া রেডিয়ো আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে ছাড়েনি। কিন্তু এখন আর তারা সেই বিষয়ে আলোচনা করে না কারণ সরকারিভাবে তারা স্বীকার করুক বা না করুক, সারা বিশ্বের মানুষ জানে আজ আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনারা ভারতের মাটিতে লড়ছে। তারা এখন অবশ্যই সমালোচনা করবে যে আমরা এখনও দিল্লি পৌঁছতে পারিনি। মণিপুর থেকে ভারতের রাজধানীর দূরত্ব আমার নির্ভুলভাবে জানা আছে এবং আগামী দুই বছর আমি সেই পথ অতিক্রমের জন্য, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ধরে রেখেছি। ভাগ্য সহায় হলে তার আগেই হয়তো যুদ্ধ শেষ হবে— কিন্তু আমরা অন্তত পক্ষে দুই বছর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি, যখন ভাইসরয়ের প্রাসাদে আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারব। গত এক বছর ধরে আমি বলছি, সীমান্ত অতিক্রম করা ছিল আমাদের জন্য সব থেকে সহজ কাজ। আসল লড়াই শুরু হবে যখন আমরা দেশের ভিতরে প্রবেশ করব। ভারতের মুক্তির জন্য এই যে যুদ্ধ, তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেবারও যুদ্ধ বটে। তার ফলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে ব্রিটিশ এই যুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করবে, অন্তত একবারের জন্য হলেও, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মৃত্যুর পরোয়ানাতে স্বাক্ষর পড়ে গেছে, এখন শুধু সেই দণ্ড দানের জন্য অপেক্ষা।

সমস্যার সম্মুখীন হলেই দেখা গেছে ব্রিটিশ প্রচার মাধ্যম তাদের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ করাবার প্রয়াস নিয়েছে। নিজেদের পরাজয়ের কথা আড়াল করবার জন্য তারা বড় গলায় অন্য সীমান্তগুলিতে আমেরিকানদের বা রাশিয়ানদের সাফল্য সম্বন্ধে বলতে শুরু করে। সেটা না করতে পারলে জনগণের মনোযোগ অন্যত্র নিবদ্ধ করবার জন্য তারা চিত্তাকর্ষক কোনও গল্প ফেঁদে বসে। সেই কারণেই যখন ভারতের পূর্ব সীমান্তে ব্রিটিশদের পরিস্থিতি প্রতিকূল তখন তারা অ্যান্টি-ইন্ডিয়া রেডিয়ো মারফত এক কাহিনী প্রচার করতে শুরু করেছে। আমাদের প্রেরিত ১২ জন পুরুষ নাকি শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং তাদের মধ্যে ছয় জন দিল্লির রেডিয়ো থেকে জাপান বিরোধী কিছু বিবৃতি দিয়েছে। এই ঘটনার মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে এই ১২ জনকে আমরা ভারতে পাঠাইনি, তারা জাপানিদের জন্য কাজ করছিল ও জাপানিরাই তাদের পাঠিয়েছিল। আমাদের কাজে যাদের আমরা ভারতে পাঠিয়েছিলাম, তারা যে ধরা পড়েছে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু একটা বড় সংগ্রামে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে বাধ্য। শত্রুপক্ষের ঘাঁটিগুলিতে আমাদের যে সব বন্ধুরা কাজ করছে তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা তাদের মালিকদের এই ঘটনার প্রচারে রাজি করাতে পেরেছে বলে। দিল্লির এই বেতার বিবৃতি থেকে ভারতীয় জনগণ নিশ্চয় এ কথা উপলব্ধি করছেন যে আমরা যদি সুদূর বালুচিস্তান পর্যন্ত আমাদের লোককে পাঠাতে পেরে থাকি তা হলে ভারতের এমন কোনও অঞ্চল নেই যা আমাদের নাগালের বাইরে। এটা খুবই চিত্তাকর্ষক যে, যে ছয় জন অ্যান্টি-ইন্ডিয়া রেডিয়োতে কথা বলেছে তারা বস্তুত একই জাপান বিরোধী কথা তোতাপাখির মতো আবৃত্তি করে গেছে। এবং আরও চিত্তাকর্ষক হল যে এই বেতার সম্প্রচারের পর থেকে শত্রুপক্ষের প্রচারযন্ত্র এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চুপ— ঠিক যেমন ঘটেছিল রুডল্ফ হেস্-এর ক্ষেত্রে। ১৯৪১ সালে হেস্ যখন জার্মানি থেকে ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন, তখন বিবিসি খুব চড়া গলায়, উৎসাহ ভরে এই কথা প্রচার করে। কিন্তু তার পরেই তারা উপলব্ধি করে যে সময় বিশেষে চুপ করে থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। সম্প্রতি

আজ়াদ হিন্দ ফৌজ থেকে পালিয়ে যাওয়া সেনাদের কথা প্রচার করতে শুরু করার পরেই আবার শত্রুপক্ষকে চুপ করে যেতে হয়েছে। সত্য মিথ্যা যাচাই না করে অতিরিক্ত তৎপরতার সঙ্গে প্রচার করবার নীতিতে গলদ আছে। কাজেই আমি আবারও একবার অ্যান্টি-ইন্ডিয়া রেডিয়োকে স্মরণ করিয়ে দেব যে 'সব ভাল যার শেষ ভাল'। সব শেষে যে হাসে তার মুখেই হাসি থেকে যায়।

অধুনা ব্রিটিশ জেনারেল মন্টগোমারির প্রশংসায় অ্যান্টি-ইন্ডিয়া রেডিয়ো একেবারে পঞ্চমুখ। তারা যে চির-পশ্চাদপসারী ফিল্ড মার্শাল লর্ড ওয়াভেল বা জেনারেল অচিনলেক অথবা উভচর অ্যাডমিরাল লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের প্রশস্তি গাইছে না, তাতেই আমি খুশি। তবে আমি আমাদের শত্রুপক্ষকে মনে করিয়ে দেব যে এই যুদ্ধে কোনও লড়াইতেই ব্রিটিশ তাদের একার ক্ষমতায় জয়ী হতে পারেনি। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হল ইরিত্রিয়া ও আবিসিনিয়া যেখানে তারা শুধু ইতালীয়দের সঙ্গে লড়াই করছিল। জেনারেল মন্টগোমারি যত সাফল্যই লাভ করে থাকুন না কেন, তার প্রায় সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমেরিকার হস্তক্ষেপ ও আমেরিকানদের সমর্থনকেই দিতে হবে। তা না হলে আমেরিকানরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার আগেই ব্রিটিশরা জয় করায়ত্ত করতে পারত।

দীর্ঘদিন ধরে শত্রুদের প্রচারবিদরা বলে আসছে যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ হল এক ভাড়াটে সেনাদল যাদের বাধ্য করা হয়েছে জাপানের হয়ে লড়তে। কিন্তু অবশেষে তারা বুঝেছে যে এই কৌশল আর কাজ করছে না। কারণ স্বাভাবিক ভাবে সকলেই প্রশ্ন করছে যে ভাড়াটে সেনারা কোথা থেকে এত সাহস আর এত সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পায়? সুতরাং এখন সেই কৌশল পালটাতে হয়েছে এবং এখন বিশ্ব জনগণকে বলা হচ্ছে যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ হল একটা ভিক্ষুকদের সেনাদল, তাদের না ভাল অস্ত্রশস্ত্র, তারা না পায় ভাল করে খেতে। আমি ভাবছি যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের বিরুদ্ধে শত্রুদের আরও কিছু বলবার আছে কিনা। আমরা তো কখনই দাবি করিনি যে আমাদের সেনাদল ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সেনাদের মতো অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। ব্রিটিশদের পক্ষে তাদের বাহিনীকে খাদ্য ও অস্ত্র যোগানো অত্যন্ত সহজ কাজ কারণ তারা ভারতবর্ষ থেকে লুঠ করছে। কিন্তু আমি আমার শত্রুদের শুধু এই কথাটাই বলব যে কোনও বিপ্লবী সেনাদলকে কী অপরিসীম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে লড়াই করতে হয় সে কথা আমাদের সেনাদের আগে থেকেই জানা আছে। ব্রিটিশ সেনারা লড়ছে রাম আর বিয়ার, টিনের পর্ক ও বিফের জোরে। সারা পৃথিবীতে যেখানে যত বিপ্লবী সেনাদল আছে— আয়ারল্যান্ড বা ইতালি বা রাশিয়া— সর্বত্রই তারা এই প্রতিকূল অবস্থাতেই যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এবং সর্বত্রই শেষ যুদ্ধে তাদেরই জয় হয়, যেমন আমাদেরও হবে। কিন্তু সেই স্বাধীনতা আমাদের রক্তের বিনিময়ে জিতে নিতে হবে।

ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র এখন বলছে যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ মণিপুরে এলেও সেই ফৌজ কোনও দিন দিল্লি পৌঁছতে পারবে না। আমরা কবে দিল্লি পৌঁছব, তার কোনও দিনক্ষণ তো আমরা ঠিক করিনি। কোনও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই তা করবে না। এ হল অ্যান্টি-ইন্ডিয়া রেডিয়ো যারা আমাদের দিল্লি পৌঁছবার কাল্পনিক দিনক্ষণ ঠিক করেছে এবং তারা আমাদের সমালোচনা করছে যে আমরা আমাদের নির্ধারিত সময়ে পৌঁছতে পারিনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতো বিশাল সাম্রাজ্য, এত শক্তিশালী সব সঙ্গীসাথী নিয়ে তারা তো আজ প্রায় পাঁচ বছর ধরে লড়াই করছে। কিন্তু তারা কোথায় কী করতে পেরেছে? আমরা আমাদের স্বল্প যা সামর্থ্য তারই ভরসায় যদি বলে থাকি যে অন্তত দুই বছর লাগবে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে, তা হলে

আমরা কি বেশি বলছি? অ্যান্টি-ইন্ডিয়া রেডিয়ো আগে ১৯৪৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করুক, তারপরে তারা আমাদের সমালোচনা করবে যদি আমরা নির্ধারিত সময়ে আমাদের আরব্ধ কাজ শেষ করতে না পেরে থাকি।

আমার মতে শত্রুপক্ষের প্রচারের মূল অভিসন্ধি হল দু'টি। প্রথম হল, যুদ্ধে ব্রিটিশের জয় অনিবার্য এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করা এবং দ্বিতীয় হল দেশের মধ্যে জাপান-বিরোধী আবহ গড়ে তোলা। প্রথম লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আমাদের শত্রুরা ক্রমাগতই যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ের পুনর্গঠনের কথা বলে চলেছে, যেন জয় তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। পৃথিবীতে যেখানেই মিত্রশক্তি কোনও সাফল্য পাচ্ছে, তারা সেটা চতুর্গুণ বাড়িয়ে বলছে। কিন্তু আমরা সেই 'সাফল্যের' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কী দেখছি? যেমন উদাহরণস্বরূপ, ইতালিতে মিত্রশক্তি কি সাফল্য পেয়েছে? সেখানে তাদের আরও সৈন্য পাঠাতে হয়েছে, আরও যুদ্ধসরঞ্জাম, এরোপ্লেন এবং আরও যুদ্ধজাহাজ। বর্তমানে যুদ্ধের যা পরিস্থিতি, কবে সেখানকার যুদ্ধ শেষ হবে কেউ জানে না? এবং কবেই বা মিত্রবাহিনী ব্রেনার অতিক্রম করে জার্মানিতে ঢুকবে? ফ্রান্সে যেখানে জার্মানরা এখনও পুরো দমে প্রতি আক্রমণ শুরু করেনি, সেখানেও মিত্রশক্তি সাত সপ্তাহে কী সাফল্য পেয়েছে? যে পরিমাণে ক্ষতি তাদের স্বীকার করতে হয়েছে সেই অনুপাতে তারা কী অর্জন করতে পেরেছে? ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে, ফ্রান্স ও ইতালিতে মিত্রশক্তি যত গভীরভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে, আমাদের ততই সুবিধা হবে। তারা যে সাফল্যটুকু অর্জন করছে বা হয়তো ভবিষ্যতে করবে তাতে তাদের শক্তি আরও খর্ব হবে। এবং হয়তো শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স থেকে মিত্রশক্তিকে পিছু হঠে আসতে হবে ও ইতালিতেও তারা আর অগ্রসর হতে পারবে না, সেই সম্ভাবনা এখনও আছে। বারে বারে যে বলা হচ্ছে যে তারা প্রথমে ইউরোপে যুদ্ধের শেষ দেখতে চায় ও তার পরে তারা পূর্ব এশিয়াতে মনোযোগ দেবে জাপানের মোকাবিলা করবার জন্য, এগুলি একেবারেই গালগল্প। আমি এর আগে এক বক্তৃতায় বলেছি যে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী কখনওই ইউরোপের যুদ্ধে জিততে পারবে না। আমি আরও বলতে চাই যে যদিওবা তারা কোনও ক্রমে ইউরোপের যুদ্ধে জয়ী হত, কিন্তু তার পরে তাদের পূর্ব এশিয়াতে জাপানের মুখোমুখি হবার মতো আর কোনও শক্তি অবশিষ্ট থাকত না। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে যুদ্ধের সরঞ্জাম উৎপাদন ক্ষমতার একটা সীমা আছে, ঠিক তেমনই মানুষের শক্তিও অসীম নয়। সুতরাং এখন বাইরে থেকে যাই মনে হোক না কেন, ভিতরে ভিতরে মিত্রশক্তির পরিস্থিতি বাস্তবিক খুবই সঙ্গীন।

মণিপুর নিয়ে আলোচনার সময় আরও একটা বিষয় আমি উল্লেখ করতে ভুলে গিয়েছি। মণিপুরের বেচারি মহারাজার ভাগ্যে কী ঘটল? কংগ্রেসের সমর্থনকারী রাজপুত্ররাই বা কোথায় গেল? মহারাজা ও তাঁর পরিবার এখন কোথায়, তাঁরা কী অবস্থায় আছেন? এতজন রাজা ও নবাব যখন সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সৈন্য সংগ্রহ করছেন সেখানে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে মণিপুরের মহারাজার কাছ থেকে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি কেন? আমি জানি তার কারণ কী। তার কারণ হল মহারাজা ও তাঁর প্রজারা কেউই ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। অতি সম্প্রতি কালেও মণিপুর ও নাগা পাহাড়— যা কোহিমা অঞ্চল নামে পরিচিত— সেখানকার অধিবাসীরা ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেছে, এমনকী তাদের বিরুদ্ধে লড়াইও করেছে। সেই কারণেই তারা আমাদের সেনাদের সঙ্গে এতটা সহযোগিতা করছে ও তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করছে।

বন্ধু ও স্বদেশবাসীরা! গত আড়াই বছর ধরে আপনারা অবিরাম জাপান-বিরোধী প্রচার

শুনে আসছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, একটা প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। জাপান ছাড়া এশিয়াতে আর অন্য কোনও দেশ কি আছে যারা আমাদের শত্রু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছে এবং ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের উদ্দেশ্যে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে? চিন, রাশিয়া ও সারা বিশ্বের বহু দেশের জন্য সহানুভূতি থাকা খুব ভাল, কিন্তু সব থেকে আগে আমাদের নিজেদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। আমাদের নিজেদের কী ভাবে স্বাধীন করতে পারি সেই কথা সব থেকে আগে ভাবতে হবে। জগতের সব থেকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আমাদের এই লড়াই, যেখানে বিশ্বের আরও মহা শক্তিশালী সব দেশগুলি তাদেরই সাহায্য করছে। আসুন আজ আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, 'আজকের জগতে কে কোথায় আছে যারা আমাদের সাহায্য করবে?' বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে দেখতে গেলে জাপান ছাড়া আর কোনও দেশ নেই যারা আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে ব্যবহারিক সাহায্য দেবে। আমরা ১৯৩০ সালের জাপানের কথা বলছি না— আমরা আজকের জাপানের কথা বলছি— যে জাপান আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের শক্তিক্ষয় করতে সমর্থ হয়েছে ও তার ফলে তারা আমাদের কাজ সহজ করে দিয়েছে— যে জাপান স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাদের সহযোগিতার আশ্বাস যে অকৃত্রিম ও বিশ্বাসযোগ্য তার পরিচয় তারা দিয়েছে। আজকের জাপানকে আমরা যেভাবে চিনেছি ও সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে তাদের নতুন বিদেশনীতির যে প্রয়োগ আমরা দেখছি তাতে এই অঞ্চলের ত্রিশ লক্ষ ভারতীয়দের মনে জাপানের আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। সেই কারণেই আমরা আজ তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে সামিল হয়েছি, এবং সেই লড়াই আমরা চালিয়ে যাব যতদিন না আমরা আমাদের শত্রুদের বিনাশ করতে পারি, এই বিষয়ে আমরা সংকল্পবদ্ধ। ভারতের অভ্যন্তরে আজ যে যুদ্ধ চলছে তা আর জাপানের যুদ্ধ নয়। এ হল ভারতবর্ষের নিজস্ব যুদ্ধ— দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার যুদ্ধ। আমরা, পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা যদি আমাদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সততার সঙ্গে লড়াই করতে পারি— আমার বিশ্বাস আমরা তাই করছি— তা হলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। কোনও সংগ্রাম যদি ন্যায়সংগত হয়, এবং সংগ্রামীরা যদি স্বার্থশূন্য ও সৎ হয়— যা আমাদের ক্ষেত্রে সত্য— তা হলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একদিন আমাদের কাছে নতিস্বীকার করবে। আমরা সংকল্প নিয়েছি এই যুদ্ধ আমরা চালিয়ে যাব যতদিন না জয় আমাদের করায়ত্ত হয়। আসুন, আমাদের সাহায্য করুন, কর্তব্যের এই কঠিন পথ অতিক্রম যাতে আমাদের পক্ষে সহজ হয়।

জয় হিন্দ

৪৯

সম্মুখ-সমরে আমাদের প্রথম পরীক্ষা

[সংবাদ প্রতিবেদন, ২১ আগস্ট ১৯৪৪][১]

ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের প্রধান কর্মী, বিভাগীয় প্রধান, মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের কাছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বলেন: আমরা আমাদের লড়াই শুরু করেছি অনেক দেরিতে। বর্ষা এসে যাওয়ায় আমাদের অসুবিধা হয়েছে। যে পথ ধরে আমাদের এগোবার কথা, সেই পথ জলে ডুবে গিয়েছিল। জলপথে আমাদের যেতে হয়েছে স্রোতের বিপরীত দিকে। অপরপক্ষে আমাদের শত্রুরা এগিয়েছে অতি উত্তম পথ ধরে। আমাদের একমাত্র সুযোগ ছিল যদি বর্ষা আসার আগে ইম্ফল দখল করে নেওয়া যেত; এবং আকাশপথে যদি আমরা আরও কিছু সাহায্য পেতাম। এছাড়াও ইম্ফলে তাদের বাহিনীর উপর বিশেষ আদেশ ছিল, শেষ সেনার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারা জমি ছাড়বে না। আমরা যদি জানুয়ারি মাসে আমাদের আক্রমণ শুরু করতে পারতাম তা হলে আমরা সাফল্য পেতাম। বর্ষা নামার আগে প্রতিটি এলাকায় আমরা হয় প্রতিপক্ষকে ঠেকিয়ে রাখতে, নয় পরাস্ত করতে পেরেছিলাম। আরাকান এলাকায় আমরা শত্রুর অগ্রগতিকে ঠেকাতে পেরেছিলাম। কালাদান এলাকায় আমরা শত্রুপক্ষকে নির্মূল করে অগ্রসর হয়েছিলাম। টিড্ডিমে আমরা এগিয়েছিলাম। পালেল ও কোহিমাতেও আমরা এগিয়েছিলাম। হাকা এলাকাতেও আমরা তাদের এগোতে দিইনি। এবং এই সবই আমরা করতে পেরেছিলাম যদিও সৈন্য সংখ্যা, যুদ্ধের সরঞ্জাম ও খাদ্যের সরবরাহ সব দিক থেকেই শত্রুপক্ষ আমাদের থেকে অধিকতক শক্তিশালী ছিল।

বর্ষা নামার ফলে আমাদের ইম্ফল আক্রমণের দিন পিছিয়ে দিতে হল। শত্রুপক্ষ ততদিনে তাদের অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ডিভিশনগুলিকে এগিয়ে আনতে পেরেছে, যে কারণে তারা কোহিমা-ইম্ফল রোড পুনর্দখল করে নিতে পারল। তখন আমাদের সামনে প্রশ্ন ছিল যে, আমরা কোন জায়গাতে আমাদের বাহিনীকে অবস্থান করাব। দু'টি পথ আমাদের সামনে খোলা ছিল: এক, হয় আমরা বিশেনপুর-পালেল লাইন বরাবর অবস্থান করব ও শত্রুকে আর অগ্রসর হতে দেব না। অথবা আমরা পিছিয়ে গিয়ে আরও সুবিধাজনক কোনও জায়গায় আমাদের ঘাঁটি গাড়ব।

আমরা এই সমরাভিযান থেকে কী শিখলাম? সম্মুখ সমরে এটা আমাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। প্রাক্তন অসামরিক ব্যক্তিদের দিয়ে গড়া বাহিনী, গোলা বারুদ নিঃশেষ হবার পর যাদের উপর পশ্চাদপসরণের আদেশ ছিল, তারা পিছিয়ে না গিয়ে বেয়নেট উঁচিয়ে শত্রুকে মুখোমুখি আক্রমণ করল। এবং তারা সে লড়াইয়ে জিতল।

---

১. Testament of Subhas Bose, pp. 234-235.

আমাদের সৈন্যদের আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে। আমরা জেনেছি যে শত্রুপক্ষে যে সব ভারতীয় লড়াই করছে তারা আমাদের দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক। আমাদের এখন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা আমাদের দলে যোগ দিতে পারে। আমরা শত্রুর কৌশল বুঝতে পেরেছি। শত্রুপক্ষের কাগজপত্র আমাদের হাতে এসেছে। আমাদের সেনাধিনায়করা অমূল্য অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। এই লড়াই শুরু হবার আগে আমাদের সেনাদের উপরে জাপানিদের কোনও আস্থা ছিল না ও তারা ছোট ছোট দলে আমাদের সেনাদের বিচ্ছিন্ন করে জাপানি দলের সঙ্গে জুড়ে দিতে চেয়েছিল। আমি চেয়েছিলাম একটা সমগ্র রণক্ষেত্র যেখানে শুধু আমাদের ছেলেরাই লড়বে, এবং শেষ পর্যন্ত তাতে জাপানিরা সম্মত হয়। আমাদের এই ডিভিশনের সর্বাধিনায়ক ও অন্যান্য অফিসারেরা সকলেই এই যুদ্ধ থেকে বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। যে জায়গাগুলিতে আমাদের ঘাটতি আছে, সেই বিষয়েও আমরা এখন অবহিত। এই পার্বত্য এলাকায় যানবাহন ও রসদের যোগান যথেষ্ট কার্যকরী ছিল না। যুদ্ধের প্রথম সারিতে যোগাযোগের ও প্রচারের অভাব ছিল। যদিও আমরা এর জন্য লোক নিয়োগ করেছিলাম কিন্তু যানবাহনের অভাবে তাদের ব্যবহার করা যায়নি। এখন থেকে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রতিটি দলের সঙ্গে প্রচারের একটি দলও থাকবে। আমরা লাউড স্পিকার চেয়েছিলাম যা জাপানিরা আমাদের দিতে পারেনি। এখন আমরা নিজেরাই লাউড স্পিকার তৈরি করে নিচ্ছি।

—রেঙ্গুন রেডিয়ো, ২১ আগস্ট ১৯৪৪

৫০

গান্ধী-জিন্না আলোচনা সভার বিষয়ে

[বর্মাদেশের কোনও অজ্ঞাত স্থান থেকে বেতার সম্প্রচার, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪][১]

বন্ধু ও স্বদেশবাসীরা,

আজ আমি ভারতবর্ষের পরিস্থিতি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে এখন বোম্বাইতে গান্ধীজি ও মিস্টার জিন্না হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছেন এবং গান্ধীজি লীগের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে প্রস্তুত, এমনকী যদি তার জন্য লীগের পাকিস্তান সৃষ্টির দাবি মেনে নিতে হয় তাহলেও। লীগের সঙ্গে আপোষ করবার জন্য গান্ধীজির এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমরা প্রবাসী ভারতীয়রা কী ভাবছি তা জানাবার জন্য আপনারা সকলেই অত্যন্ত উৎসুক, আমি তা জানি। একবার লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেলে, স্পষ্টতই, গান্ধীজি ও অন্য কংগ্রেস নেতারা ব্রিটেনের সঙ্গেও সন্ধি প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবেন। এই ঘটনা এড়াতে হলে আমাদের এখনই, এই মুহূর্তে, এর প্রতিবাদ করতে হবে। আমরা পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা লড়াই করছি স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের জন্য। আমরা মাতৃভূমিকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করবার শপথ নিয়েছি, এবং অবশেষে আমরা যে জয়ী হবই সেই বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আমাদের সংগ্রাম, সে যত দীর্ঘ ও কঠোর হোক না কেন, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে সত্য ও ন্যায়ের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য আমাদের এই সংগ্রাম সফল হবে। সেই কারণে আমি কোনও দিনও ব্রিটেনের সঙ্গে কোনও আপোষ করতে রাজি নই। ব্রিটিশদের সঙ্গে আপোষ করবার চিন্তাই আমার কাছে অত্যন্ত অরুচিকর; আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এর অর্থ হল আমাদের দাসত্বদশা থেকে আমরা কোনও দিন মুক্তি পাব না। বন্ধুরা, আমরা এক ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি; সুতরাং আমাদের মাতৃভূমিকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করার সকল চেষ্টা আমরা বিরোধিতা করব। আয়ারল্যান্ড ও প্যালেস্টাইন আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছে। আমরা উপলব্ধি করেছি যে দেশ ভাগ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব দিক থেকে ভারতবর্ষের বিপর্যয় ডেকে আনবে। আজকের এই এত শক্তিশালী আমেরিকা তাদের উন্নতির শিখরে উঠতে পারত না, যদি তাদের দেশের 'পাকিস্তানপন্থীরা' তাদের নিজের মতানুযায়ী কাজ করতে পারত। বিদেশি শক্তির নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারলে আমাদের দেশের সংখ্যালঘুদের সমস্যা আমরা অতি সহজেই সমাধান করতে পারব। সোভিয়েত ইউনিয়নের উদাহরণ আমাদের অনুসরণ করা উচিত হবে। সেই দেশে বিভিন্ন জাতির সংখ্যা ভারতবর্ষের থেকে বেশি, কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছে। কেন? কারণ তারা

---

১. Testament of Subhas Bose, pp. 76-78.

স্বাধীন এবং তাদের কোনও বিদেশি শাসকের কাছে মাথা নত করে থাকতে হচ্ছে না।

ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিস্টার জিন্নার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আছে। আমার পার্টি ও আমার সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এবং অতীতে লীগের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতাও ছিল। লীগের সঙ্গে বা তার খ্যাতনামা নেতার সঙ্গে আমার কোনও বিরোধিতা নেই। কিন্তু আমার মাতৃভূমিকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করার পাকিস্তানি প্রস্তাবের আমি তীব্র বিরোধিতা করি।

বর্তমানের এই যুদ্ধে প্রথম তিন বছরে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি একের পর এক রণক্ষেত্রে পরাস্ত হয়েছে। কিন্তু তারা কোনও অবস্থাতেই পরাজয় স্বীকার করা বা আত্মসমর্পণ করার কথা চিন্তাও করেনি। তারা এই আশা নিয়ে লড়াই করেছে যে কোনও না কোনও সময়ে ভাগ্য তাদের প্রতি প্রসন্ন হবে, এবং সেই আশা তাদের অযৌক্তিক ছিল না। তারা অনেক ক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা তাদের যুদ্ধের গতি শ্লথ করবে। ঠিক তেমনই আমাদের মিত্ররাও আত্মসমর্পণ করবে না বা তাদের যুদ্ধজয়ের প্রচেষ্টাতে ক্ষান্ত দেবে না। আমার ধারণা ভারতবর্ষে কেউ কেউ সেই সম্ভাবনার কথা ভাবতে শুরু করেছে। ভারতবর্ষে ও সারা বিশ্বে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি যে অবিরাম প্রচার চালিয়েছে তাতেই এরা বিভ্রান্ত হয়েছে। তবুও আমার বিশ্বাস যে আমার দেশবাসী মিত্রশক্তির এই মিথ্যা প্রচারে ভুলবে না। এমনকী কোনও কোনও কংগ্রেস সদস্যও যে এই প্রচার বিশ্বাস করছে দেখে আমি সত্যই দুঃখিত। এই নির্বোধেরা ভাবছে যে মিত্রশক্তি নিশ্চিতভাবে জয়ের দিকে এগোচ্ছে এবং সেই কারণেই তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একটা আপোষের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়েছে।

আমরা যদি মুহূর্তের জন্য থেমে চিন্তা করি তা হলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে চূড়ান্ত পর্যায়ে অক্ষশক্তিরই জয় হবে। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা প্রতীচ্যে হবে না, তা হবে প্রাচ্যে। গত ছয় মাসে আমাদের যুদ্ধে শত্রুপক্ষের শক্তি সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা হয়েছে। সেই ছয় মাসে, তাদের প্রবল লড়াই সত্ত্বেও তারা অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়েছে এবং আমাদের বাহিনী তাদের কালাদান, হাকা, টিড্ডিম, বিশেনপুর, পালাম ও কোহিমা এলাকা থেকে হটিয়ে দিতে পেরেছে। এটা সত্য যে এখনকার মতো যুদ্ধে একটা বিরতি চলছে, কিন্তু তার প্রধান কারণ হল বর্ষা নেমেছে এবং আমাদের বাধ্য হয়ে পিছু হটে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমরা শত্রুপক্ষকে একাধিক বার পরাস্ত করতে পেরেছি, সেই হেতু আবারও আমরা তা করতে পারব সেই বিশ্বাস আমাদের আছে। মাতৃভূমি স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত আমরা লড়াই চালিয়ে যাব। আমরা জানি, সেই লড়াই হবে দীর্ঘ ও নির্মম, এবং হয়তো দুই বছর বা তারও বেশি সময় লাগবে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী পাঁচ বছর ধরে প্রচণ্ড লড়াইয়ের পরেই মাত্র স্বল্প কয়েকটি রণক্ষেত্রে জয়ের স্বাদ পেয়েছিল। আমাদের সাফল্য আসতে হয়তো দেরি হবে, কিন্তু আমাদের মনোবল হারালে চলবে না। যেহেতু ব্রিটিশ এখন জিততে শুরু করেছে, সেই কারণে আমাদের পক্ষে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা আর সম্ভব হবে না, এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে আমরা ব্রিটিশের সঙ্গে এখন আপোষ করতে যাব না। লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে চুক্তি হবে ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ করার প্রথম পদক্ষেপ। যদি এটা ঘটে তা হলে ভারতবর্ষ কোনও দিন দাসত্বদশা থেকে মুক্তি পাবে না। যতদিন লীগ ও কংগ্রেস স্বতন্ত্র থাকবে ততদিন ব্রিটেনের সঙ্গে কোনও আপোষ সম্ভব নয়। সেই কারণেই কংগ্রেস সদস্য যারা ব্রিটেনের সঙ্গে আপোষ করতে চাইছে, তারা পাকিস্তান নামক তেতো বড়িটা গিলবে বলে ঠিক করেছে। আমি

কংগ্রেস ও মুসলির লীগ উভয় দলের নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে পাকিস্তানের বিষয়ে দুই দলের মধ্যে ঐকমত্য হলেও ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবে না। সংখ্যালঘু ও রাজাদের তারা সুরক্ষা দেবে ইতিমধ্যেই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে সেটা প্রমাণ হয়ে গেছে। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেলেই ব্রিটেন ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হবে এ কথা যারা ভাবছে তারা নিজেদেরই প্রতারণা করছে। এবং এ সব সত্ত্বেও লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তাই বা কী সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে পাকিস্তানের দাবি মেনে নিলেও আমাদের সমস্যা থেকেই যাবে। আমরা যে ভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, মুসলিম লীগ কখনওই তা করবে না। তারা শুধুমাত্র ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যে বিভক্ত করতে চায়। চারটি মুসলিম রাজ্যের সৃষ্টি হবে। যা ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবাধীনেই থেকে যাবে। সুতরাং বর্তমানের একটি দাস-রাজ্য ভারতবর্ষের পরিবর্তে আমরা চারটি স্বতন্ত্র মুসলিম দাস-রাজ্য পাব যারা ব্রিটেনের সর্বপ্রকার দুষ্কর্মে তালে তাল দিয়ে চলবে। ভারতবর্ষের বিষয়ে ব্রিটিশ যা করতে চায় কংগ্রেস-লীগ চুক্তি যদি তার পরিপন্থী হয় তা হলে ব্রিটিশ সেই চুক্তিকে অগ্রাহ্য করে তাদের নিজস্ব মত অনুসারে চলবে। তারা কোনও দিন ভারতের উপরে তাদের দখল ছাড়বে না। আমি ভারতের হাজার হাজার মুসলমান তরুণকে আজ প্রশ্ন করতে চাই, 'মাতৃভূমিকে খণ্ডবিখণ্ড করার কাজে তোমরা কি তোমাদের হাত মেলাতে চাও? বিভক্ত ভারতবর্ষে তোমাদের পরিস্থিতি কী হবে, ভেবে দেখেছ?' সুতরাং বন্ধুগণ, আপনাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আপনারা যদি স্বাধীনতা চান তা হলে তার জন্য আপনাদের অবশ্যই লড়াই করতে হবে এবং ব্রিটিশকে এই দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। ব্রিটেনের সঙ্গে কোনও আপোষ নয়। আমাদের পবিত্র মাতৃভূমিকে আমরা খণ্ডবিখণ্ড হতে দেব না।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! আজ়াদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

৫১

ইস্পাত ও দেহবর্মের চেয়ে শক্তিশালী হল মানুষের মনোবল ও সাহসিকতা

['সেনা দিবস' উপলক্ষে বেতারভাষণ, ১৮ অক্টোবর ১৯৪৪][১]

ভারতের বোন ও ভাইয়েরা! ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর, সায়োনানে (সিঙ্গাপুরে) স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের পদানত হবার পর থেকে এই প্রথম স্বাধীন ভারতের সরকার গঠিত হল এবং তাকে সরকারিভাবে স্বীকৃতিও দেওয়া হল নয়টি বন্ধুবাভাপন্ন শক্তির কাছে থেকে— যার পুরোভাগে ছিল জাপান ও জার্মানি। এখন সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে সেই আপৎকালীন সরকার গঠনের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আজ ১৮ অক্টোবর থেকে শুরু করে পুরো এক সপ্তাহ ধরে এই বার্ষিকী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে ও সেই পরিকল্পনা অনুসারে আজ ১৮ অক্টোবর 'আর্মি ডে' বা সেনা দিবস রূপে উদ্‌যাপিত হল। এখানে বর্মাদেশে যেখানে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনারা রয়েছে, সর্বত্রই আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ হয়েছে ও সেখানে আবার সেই পবিত্র শপথের পুনরাবৃত্তি করেছি যে পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, সব সমস্যা ও কঠিন পরিশ্রম সত্ত্বেও আজ়াদ হিন্দ ফৌজ তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে— যতদিন না ভারতবর্ষ বিদেশি শাসকের কবল থেকে মুক্তি পায়। যে বীর সেনারা ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিটি কুচকাওয়াজের শেষে নীরবতা পালনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হল। আমার এমন একটি আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল, যেখানে বিরাট সংখ্যক সৈন্য উপস্থিত ছিলেন, এর পরের দফায় যাঁরা ভারতে রওনা দেবেন যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য। সেই সভাতে উপস্থিত অফিসার ও সেনাদের উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানিতে আমি যে ভাষণ দিয়েছিলাম তারই ইংরাজি সংক্ষিপ্তসার এখন আপনাদের কাছে পেশ করব।

আজ়াদ হিন্দ ফৌজের কমরেডরা! আজ়াদ হিন্দ সরকারের আপৎকালীন সরকার গঠনের পরে একটা বছর কেটে গেছে— ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের হাতে আমাদের পরাজয়ের পরে এই প্রথম স্বাধীন ভারতের সরকার গঠিত হয়েছে, যে সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছে। আপনারা জানেন, স্বাধীন ভারতের এই আপৎকালীন সরকার হল একটি বিপ্লবী সরকার যার একমাত্র লক্ষ্য হল লড়াই করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা। এই সরকার যে একটা বাস্তব অস্তিত্ব ও গুরুত্ব পেয়েছে তার কারণ হল এর অধীনে রয়েছে ভারতের মুক্তিবাহিনী। আপনারা সকলেই সেই মহান ঐতিহাসিক বাহিনীর সৈনিক। এবং আমাদের

---

১. ভাষণের রেকর্ড থেকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকার দ্বারা করা অনুলিপি, INA Papers File 63/INA (ভারতবর্ষের জাতীয় মহাফেজখানা), পৃ. ৫৮-৬৪।

মতো পরাধীন জাতির পক্ষে মুক্তিবাহিনীর সৈনিক হবার থেকে বেশি সম্মানজনক আর কিছু নেই। আমার নিজের দিক থেকে, আমি গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে শুধু এই কথাই বলতে পারি যে সৌভাগ্যক্রমে আমি যে সম্মান আমার স্বদেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছি তার থেকে বড় সম্মান কোনও ভারতীয় কখনও আশা করতে পারে না। কিন্তু আমাদের গৌরবময় সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক হিসাবে আমি যে গর্ব অনুভব করে থাকি, তার কাছে সেই বিরল সম্মানও ম্লান হয়ে যায়। আরও অন্য সকলের মতোই একদিন আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু আমরা আমাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে চাই। আর আমরা জানি যে সেই মৃত্যুর পর স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর সংগ্রামের ইতিহাসে আমাদের নাম লেখা থাকবে চিরদিনের মতো।

কমরেডরা! আজ থেকে পনেরো মাস আগে, সিঙ্গাপুরে আমি প্রথম এসেছিলাম আপনাদের সম্মুখে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেই কবরখানায় দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের একটি নতুন স্লোগান দিয়েছিলাম 'চলো দিল্লি'। আজ সেই স্লোগান আপনাদের রণহুঙ্কারে পরিণত হয়েছে, যা শুধু আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সেনানীকে অনুপ্রাণিত করছে তাই নয়, তা এখন সারা বিশ্বের ভারতীয়রা যে যেখানে আছেন, তাঁদের উদ্দীপিত করছে। এই রণহুঙ্কার তাঁদের কণ্ঠে নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানী মালয় থেকে বর্মা, বর্মা থেকে ভারত প্রবেশ করেছে এবং যতদিন না তাঁরা ভারতের রাজধানীতে পৌঁছতে পারেন সেই হুঙ্কার তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকবে।

আমি নিশ্চিত জানি যে আপনাদের সকলের মনে আছে সেই দিনের কথা যে দিন আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রণী বাহিনী মালয় ছাড়ল, আগামী দিনগুলিতে তাদের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে সেই বিষয়ে আমি সকলকে হুঁশিয়ারি করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বঞ্চনা, মৃত্যুকে সঙ্গে নিয়ে তাদের লড়তে হবে। কিন্তু আমি আরও বলেছিলাম যে সেই কঠোর ক্লেশ ও আত্মদানের শেষে অপেক্ষা করছে স্বাধীন দেশের প্রতিশ্রুতি। রণক্ষেত্রে ও ভারতের অভ্যন্তরে সাম্প্রতিক সামরিক কার্যকলাপের অভিজ্ঞতায় জানা গেছে আমার কথাগুলি ছিল নির্মম সত্য। আমাদের বীর যোদ্ধাদের— যাদের মধ্যে অনেকেই জীবিত নেই— বাস্তবিক ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বঞ্চনা, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে এগোতে হয়েছে। কিন্তু তাদের মনোবল আজ আরওই অদম্য, এবং তাদের সংকল্প আরও সুদৃঢ়। আমি আমাদের সম্মুখবাহিনীর তদারক করে সদ্যই ফিরেছি। আহত, অসুস্থ, শয্যাশায়ী সেনাদের সঙ্গে আমি দেখা করেছি ও কথা বলেছি, তাদের প্রশ্ন করেছি। সুস্থ হয়ে আবারও একবার শত্রুর মুখোমুখি হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনও ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা নেই এবং তা তারা করতে চায় যত শীঘ্র সম্ভব।

কমরেডরা! আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রণী সেনা যারা সাম্প্রতিক যুদ্ধ লড়াই করেছে, তারা পরবর্তী দলগুলি ও স্বাধীন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সেনাবাহিনীর জন্যও এক অতি উজ্জ্বল ও শাশ্বত ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রথম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, তাদের অগ্নিপরীক্ষা এই অগ্রণী বাহিনীর মাধ্যমেই হয়েছে এবং সেই পরীক্ষায় ফৌজ সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমাদের সাহসী কমরেডদের বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও সাফল্যকে ধন্যবাদ জানাতে হয়, যাদের জন্য আজ সারা পৃথিবীর মানুষ জানে— বিশেষ করে আমাদের শত্রুরা জানে— যে আজাদ হিন্দ ফৌজ লড়বে যতদিন না জয় আমাদের করায়ত্ত হয়।

অতীতে আমি বার বার আপনাদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে আমাদের শত্রুরা সংখ্যা এবং সমরসজ্জা দুই দিক দিয়েই আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছে। কিন্তু আমি এও

বলেছিলাম যে শেষ লড়াইয়ে আমাদেরই জয় হবে কারণ আমাদের যুদ্ধ ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য যা আমাদের সংকল্পকে দৃঢ় করেছে। আমাদের এই বর্তমান সংগ্রাম প্রমাণ করে দিয়েছে যে ইস্পাত ও দেহবর্মের থেকে মানুষের মনোবল ও সাহসিকতা আরও বেশি শক্তিশালী। বহু ধরনের সমস্যা ও এত কষ্ট সত্ত্বেও, দক্ষিণে আকিয়াব থেকে উত্তরে কোহিমা পর্যন্ত প্রতিটি রণক্ষেত্রে আমরা শত্রুদের পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে হয় শত্রুদের অগ্রগতি রোধ করা গেছে নয়তো তাদের অনেকটা পিছিয়ে যেতে হয়েছে। কোনও একটা যুদ্ধেও শত্রুরা এক ইঞ্চিও এগোতে পারেনি। পরে যখন কৌশলগত কারণে আমরা সৈন্যদের পিছিয়ে আনব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম ও তাদের পিছিয়ে আনাও হল, তখনই কেবল শত্রুরা এগোতে পারল। শত্রুপক্ষের প্রচারযন্ত্র এখন চড়া গলায় এটাকে একটা বিপুল জয় বলে দাবি করে চলেছে— কিন্তু আমরা জানি বাস্তবে কী ঘটেছে।

কমরেডরা! বিপুল সংখ্যক সৈন্য ও রণসম্ভারের প্রাচুর্য সত্ত্বেও এতগুলি রণক্ষেত্রে শত্রুদের পরাস্ত করার পরে, আমাদের নিজেদের শক্তির উপরে আস্থা এখন শতগুণ বেশি এবং শেষ সমরে আমাদের জয় যে অনিবার্য সেই বিষয়েও আমরা এখন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। শত্রুদের এতগুলি যুদ্ধে পরাজিত করার পরে আজ আমরা বিশ্বাস করি, যখন আমরা আবার আক্রমণ শুরু করব, তখন আমরা আবার তাদের পরাস্ত করতে পারব। পরবর্তী পর্যায়ে আক্রমণের জন্য আমরা এখন প্রস্তুতি নিচ্ছি, আপনারা সকলেই জানেন। সাম্প্রতিক যুদ্ধে আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, পরবর্তী পর্যায়ে আক্রমণের প্রস্তুতিতে আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করছি আমাদের এখনও যে ভুলত্রুটিগুলি আছে তা সংশোধন করে নিতে। এর পরে যখন আবার আক্রমণ শুরু হবে তখন আমরা সামনে অগ্রসর হতে থাকব, যতদিন না শত্রুর 'ম্যাজিনো লাইন' ভেদ করে আমরা এগিয়ে যেতে পারি, এবং শত্রুপক্ষের সৈন্যেরা পশ্চাদ্ধাবন শুরু করে।

আমি আপনাদের বারে বারে বলেছি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য এই কঠোর, ক্লেশদায়ক যুদ্ধ চলবে দীর্ঘদিন ধরে। ভারতবর্ষ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন মনুষ্যজাতির এক-পঞ্চমাংশ স্বাধীনতা পাবে। এই সুবিশাল কাজে সিদ্ধিলাভের জন্য আমাদের উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে— সেই মূল্য দিতে হবে আমাদের নিজেদের রক্ত দিয়ে। আমরা শপথ নিয়েছি আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় আমরা স্বাধীনতা লাভে সফল হব— ক্লেশ বা আত্মত্যাগের ভয়ে সেই সাফল্যের পথ থেকে আমরা বিচ্যুত হব না। আমাদের দেশকে স্বাধীন করবার জন্য দেয় মূল্য যতই বড় হবে, আমাদের সঙ্কল্পও ততই দৃঢ় হবে। আপনারা হয়তো ভাবছেন কী কারণে আমাদের স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ কেন কঠোর ও ক্লেশদায়ক হবে, কেনই বা তা দীর্ঘদীন ধরে চলবে? কিন্তু আপনারা যদি চিন্তা করে দেখেন, তার কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭— ব্রিটিশদের পুরো একশো বছর লেগেছিল— ভারতবর্ষ জয় করে, ভারতীয়দের পদানত করতে। আজ যদি আমরা ব্রিটিশ শাসনের বন্ধনমুক্ত করে বেরিয়ে আসতে চাই তা হলে দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রাম ছাড়া আমাদের অন্য কোনও পথ নেই। আমরা জানি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের মূল্য কতখানি। আমরা এও জানি যে ব্রিটিশ যখন ভারতবর্ষের অধিকার হারাবে তখন তাদের সাম্রাজ্যও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং ভারতবর্ষকে অধীনস্থ রাখার ও তাদের সাম্রাজ্যকে অটুট রাখার জন্য ব্রিটিশরা যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে সেটাই স্বাভাবিক। মণিপুর ও আরাকানের পাহাড়ে ও জঙ্গলে তারা যে ভাবে লড়াই করেছে ও যতটা ক্ষতি স্বীকার করেছে, সেটাই ছিল তার কারণ। ভারতের পূর্ব

সীমান্ত তখন ব্রিটিশদের জন্য 'ম্যাজিনো লাইনে' পরিণত হয়ছে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ এখন দিল্লির উপকণ্ঠে পানিপথে নির্ধারিত হবে না, তা নির্ধারিত হবে যে পাহাড়, জঙ্গলে— আমরা সম্প্রতি যেখানে লড়াই করছিলাম সেইখানে। ব্রিটিশরা জানে, যেমন আমিও জানি, এই ম্যাজিনো লাইন ভেঙে আমরা যেদিন এগোতে পারব, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য সেদিন অস্তমিত হবে। যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল সম্পর্কে আজ ভারতে আমার স্বদেশবাসীর মনে সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু যেদিন আমাদের বিজয়ী সেনাদল আসাম ও বাংলার সমতলে প্রবেশ করবে, সেই দিন ৩৮.৮ কোটি ভারতবাসী নিঃসংশয়ে জানবে ভারতবর্ষে ব্রিটিশের দিন ফুরিয়ে এসেছে। ভারতের অভ্যন্তরে সেই দিন এক মহান বিপ্লবের সূচনা হবে। ব্রিটিশের অধীনে যে ভারতীয়রা তাদেরই হয়ে যুদ্ধ করছে সেদিন তারা ব্রিটিশের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করে ভারতের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দেবে। অধিকন্তু পূর্ব সীমান্তের ম্যাজিনো লাইন থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করতে পারলে তারা আবার একটি প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা পিছিয়ে বাংলার পশ্চিম সীমানা পেরিয়ে বিহার ও উড়িষ্যায় প্রবেশ করতে পারছে। ইম্ফল থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত আজ়াদ হিন্দ ফৌজ সরাসরি এগিয়ে আসতে পারবে। এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে শত্রুপক্ষের প্রতিরক্ষার নতুন প্রাচীর ভেদ করতে পারলে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ আবার বিনা বাধায় অগ্রসর হতে পারবে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত। এই সব কারণ বিবেচনা করে দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে যখন আপনারা আরাকানে, মণিপুরের বা আসামে লড়াই করছেন আপনারা এই যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফলের মীমাংসার জন্য লড়ছেন। তার ফলে এই অঞ্চলগুলিতেই লড়াই হবে তীব্রতম। সুতরাং, আমরা যে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টাতেই ইম্ফলের দখল নিতে পারিনি, তাতে হতোদ্যম হবার কোনও কারণ নেই। ইম্ফলের দখল নেবার জন্য যদি একবারের বদলে আমাদের দশবার আক্রমণ করতে হয়, তা হলেও আমাদের তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ইম্ফল ও চট্টগ্রামে প্রবেশপথ রুদ্ধ করে আছে যে পাহাড় ও জঙ্গল, সেইখানে এবার পানিপথের যুদ্ধ লড়তে হবে ও তারপরেই দিল্লির দখল নেওয়া সম্ভব হবে।

কমরেডরা! আমি আবারও আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে এই যুদ্ধে— সাম্প্রতিককালে বিশ্বের আরও অনেক যুদ্ধের মতোই— লড়াই হচ্ছে একদিকে মানুষের মনোবল ও সাহসিকতা এবং অন্যদিকে ইস্পাত ও দেহবর্মের সঙ্গে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি তাদের অস্ত্রশস্ত্রের জোরে এই যুদ্ধে জেতার আশা করছে। কিন্তু আমাদের ইচ্ছাশক্তির জোরে আমরা এই যুদ্ধে জিতব সেই বিশ্বাস আমাদের আছে, কারণ আমরা ন্যায়ের জন্য লড়াই করছি। এই কথা সর্বদা যেন আপনাদের মনের মধ্যে থাকে, যে পক্ষের মনোবল অনমনীয় ও যাদের সহ্যশক্তি অপরিমেয়, যে কোনও যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় তাদেরই করায়ত্ত হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও কোনও বিপ্লবী গোষ্ঠী সংখ্যা ও অস্ত্রসজ্জায় প্রতিপক্ষের থেকে শক্তিশালী ছিল না। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা বিদেশি শাসনের কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পেরেছিল। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তাই ঘটতে চলেছে। ১৮৫৭ সালের যুদ্ধে আমাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল কারণ মনোবল ও ইচ্ছাশক্তি আমাদের যথেষ্ট ছিল না। ১৮৫৭ সালের সেই মহান যুদ্ধে প্রথমে ব্রিটিশরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তারা আশা ছাড়েনি। সমস্ত শক্তি সংহত করে তারা পুনর্বার আঘাত হেনেছিল। এই দ্বিতীয় দফার আক্রমণে যখন তারা সাফল্য পেতে শুরু করল তখন আমাদের সেনারা হতোদ্যম হয়ে পড়ল। এবং সেই কারণেই তারা তাদের স্বাধীনতাও হারাল। এবং যখন তারা তাদের

স্বাধীনতা হারাল তখন তারা বিনা বাক্যে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করল। এটাই হল ভারতবর্ষের লজ্জাজনক ও দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা।

গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে আমাদের যে কমরেডরা যুদ্ধ যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের কর্তব্য করেছেন ও চমৎকার একটা উদাহরণ আমাদের সামনে রেখেছেন। এখন আপনাদের সময় এসেছে তাঁদের অনুসরণ করার জন্য। পরবর্তী আক্রমণের জন্য যাঁদের বাছাই করে রাখা হয়েছে আপনারা আছেন তাঁদের মধ্যে। আপনাদের কর্তব্য দুই প্রকার— এক হল আপনাদের অগ্রণী দলের ঐতিহ্য বজায় রাখা, ও দুই হল তাকে আরও উন্নত করা। আপনারা যে এই দ্বিবিধ কাজে সফল হবেন সেই বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হবার আদেশ আসার আগে আপনাদের আমি আবারও একবার এই আশ্বাস দিতে চাই যে আপনাদের পিছনে সমগ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের শক্তি সংহত করা হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয়ের সম্মিলিত ইচ্ছা ও সংকল্প আপনাদের জন্য কাজ করছে, যাঁরা সামগ্রিক প্রস্তুতির শপথ নিয়েছেন এবং আপনাদের সৈন্য, অর্থ ও রসদের জোগান দিয়ে যাবেন এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আপনাদের সম্মুখে অপেক্ষা করে আছে ৩৮.৮ কোটি স্বদেশবাসীর সহযোগিতার আশ্বাস।

ভারতের বিপ্লবী সেনাদলের সৈনিকেরা! এখন আপনাদের নিজস্ব সরকার গঠিত হয়েছে। আপনারা নিজস্ব সেনাবাহিনী ও নিজস্ব সেনাধিনায়ক পেয়েছেন। আপনাদের অগ্রণী সেনারা তাঁদের প্রথম সমরাভিযানের অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয়রা আপনাদের সৈন্য, অর্থ ও রসদের জোগান দিয়ে যাবেন এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনাদের আরও আছে স্বদেশে ৩৮.৮ কোটি স্বদেশবাসীর সহযোগিতার আশ্বাস। সাহসী ও অপরাজেয় নিপ্পনের জনগণের ও আরও ৮টি বন্ধু রাষ্ট্রের আন্তরিক সমর্থন রয়েছে আপনাদের জন্য। এখন আপনাদের শুধু নিজেদের কর্তব্যটুকু পালন করতে হবে, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে হবে ও সেই স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে। আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার গঠিত হবার প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সংগ্রামেরও একটা নতুন পর্যায়ে— তৃতীয় পর্যায়ে আমরা প্রবেশ করতে চলেছি। যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে অক্ষশক্তি একের পর এক প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা শত্রুদের রুখে দাঁড়াতে দেখেছি। এই তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা ও আমাদের সহযোদ্ধারা আবার আক্রমণ শুরু করব।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, তাইওয়ান বা ফরমোসার উপকূলে শত্রুপক্ষের নৌসেনাদের বিরুদ্ধে জাপানি নৌবাহিনীর চমকপ্রদ জয় দিয়ে যুদ্ধের এই নতুন পর্যায়ের শুরু। আমাদের সামনে সমস্যা আসবে, হয়তো আমাদের সামগ্রিকভাবে পিছু হটে আসতে হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে এই নতুন পর্যায়ে আমরা লড়াই করতে চলেছি তা আমরা অব্যাহত রাখতে পারব যতদিন না জয় আমাদের করায়ত্ত হয়।

যুদ্ধের এই নতুন পর্যায়ে আমাদের যে নতুন স্লোগান আজ আমি আপনাদের দেব, তা হল 'রক্ত, রক্ত, আরও রক্ত'। শুধুমাত্র আমাদের প্রাণের বিনিময়েই আমরা আমাদের স্বাধীনতা লাভ করতে পারব। শুধুমাত্র রক্তের মাধ্যমেই আমরা আমাদের স্বাধীনতার মূল্য দিতে পারব। যখন নিজে রক্ত দেব তখনই কেবল আমরা শত্রুর রক্ত নিতে পারব। সাম্প্রতিক যুদ্ধে বহু হতাহত হয়েছে। কিন্তু শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে আমাদের থেকে পাঁচ গুণ বেশি। এর পরের পর্যায়ে হয়তো এর থেকেই বেশি সেনা হতাহত হবে। কিন্তু তাতে কিছু

যায় আসে না। ভবিষ্যতে যদি আমাদের আরও ক্ষতি হয় তা হলে শত্রুর ক্ষতি আরও বেশি হবে।

দিল্লির পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়। দিল্লির পথ কেবল ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত জঙ্গল ও বুলেটে ক্ষতবিক্ষত পাহাড়ের মধ্য দিয়েই নয়। দিল্লির পথ হল স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে যাত্রার পথ— এবং আমি আমার মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি সেই পথ রক্তে রাঙা, আমাদের রক্ত ও শত্রুর রক্ত। সেই রক্তাক্ত পথ দিয়েই আমাদের যাত্রা হবে— জয়ের অভিমুখে, মুক্তির অভিমুখে এবং দিল্লির অভিমুখে।

৫২

আমাদের প্রথম বার্ষিকী

[আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার গঠনের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে বেতারভাষণ, ২১ অক্টোবর ১৯৪৪][১]

বোন ও ভাইয়েরা! বর্মাদেশের কোনও এক স্থানে, আপৎকালীন সরকার গঠনের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় হিন্দুস্থানিতে আমি যে ভাষণ দিয়েছিলাম তারই ইংরাজি সংক্ষিপ্তসার এখন আপনাদের এখন আপনাদের কাছে পেশ করব।

সায়োনানে (বা সিঙ্গাপুরে) স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার গঠিত হবার পর ঠিক এক বছর কেটে গেছে। দ্বিতীয় বছরের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে এখন আমাদের কর্তব্য হল বিগত বছরে আমাদের সাফল্য ও যদি কোনও ব্যর্থতা ঘটে থাকে তার মূল্যায়ন করা। আমাদের আরও করণীয় হল ভবিষ্যতে আমাদের সামনে যে কাজগুলি রয়েছে সেই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা। কিন্তু অতীতের পর্যালোচনা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় মগ্ন হবার আগে আমি এই মুহূর্তে বিশ্বের সর্বত্র যে সংগ্রাম চলছে সেই বিষয়ে দুই-একটি কথা বলতে চাই। সমগ্র পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সমস্যাগুলি তা হলে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে।

আমার বিশ্বাস পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা যত যুদ্ধ দেখেছি, বর্তমান যুদ্ধ হল তার মধ্যে বৃহত্তম। এ এমন যুদ্ধ নয় যা শুধুমাত্র একটি মহাদেশ যেমন ইউরোপ, বা এশিয়া, বা আফ্রিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আজকের এই যুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীর রাজনৈতিক বনিয়াদে কাঁপ ধরিয়েছে। পৃথিবীতে যতদিন শান্তি ছিল ও স্থিতাবস্থা বজায় ছিল, ততদিন বৃহত্তর শক্তিগুলির পক্ষে যে দেশগুলি তারা একদা জয় করে নিয়েছিল, সেই দেশগুলিতে শোষণ ও শাসন অব্যাহত রাখা সহজ ছিল।এখন যেহেতু সেই স্থিতাবস্থা হারিয়ে গেছে, পৃথিবীর সুবিশাল শক্তিগুলি এখন পরস্পরের বিরুদ্ধে এক প্রাণঘাতী যুদ্ধে ব্যাপৃত, সেই কারণে বিশ্বের পরাধীন দেশগুলির সামনে আজ এক অভূতপূর্ব সুযোগ এসেছে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙবার, যে শৃঙ্খল তাদের বহু যুগ ধরে বেঁধে রেখেছে। ভাগ্য ও ইতিহাসের দাক্ষিণ্যে পাওয়া এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার যদি পরাধীন জাতিগুলি করতে না পারে তা হলে ভবিষ্যতে তাদের কাজ যে আরও অনেকাংশে কঠিন হবে তাই নয়, তাদের মুক্তি পাবার আশা আরও বহুদিন— হয়তো আরও এক শতাব্দী পিছিয়ে যাবে।

শুধু যদি ইউরোপের কথা আমরা চিন্তা করি তা হলে দেখা যাবে বর্তমান যুদ্ধ মূলত

---

১. ভাষণের রেকর্ড থেকে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকার দ্বারা করা অনুলিপি, INA Papers File 63/INA (ভারতবর্ষের জাতীয় মহাফেজখানা), pp. 65-74

জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে শক্তির সংঘর্ষ। এখানে ফ্রান্সের ভূমিকা অতি নগণ্য। ব্রিটেনের ভূমিকাও এখন তুলনামূলক ভাবে গুরুত্বহীন। জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে এই সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে তাদের প্রভাব যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাই করুক না কেন, তাতে ইউরোপে বর্তমান যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির বিশেষ কোনও পার্থক্য ঘটবে না।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ও পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে। সেখানেও ব্রিটেনের ভূমিকা তুলনামূলক ভাবে নগণ্য এবং তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল যাতে বৃহত্তর শক্তির সাহায্য নিয়ে তারা তাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করতে পারে বা যে অঞ্চলগুলি হারিয়েছে তা পুনরুদ্ধার করতে পারে।

জাপান ও জার্মানির কথা বিবেচনা করলে, সন্দেহের কোনও অবকাশই থাকবে না যে সেই দেশ দু'টির জনগণ মনে করে যে তাদের সঙ্গে বৃহত্তর শক্তিগুলি অন্যায় ও অন্যায্য আচরণ করেছে। যা তারা তাদের ন্যায্য অধিকার বলে মনে করে, সেই অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য তারা লড়ছে। জাপান চায় পূর্ব এশিয়াতে নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে, সে কথা তারা দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছে। ঠিক একই ভাবে জার্মানিও ইউরোপে নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সোভিয়েত রাশিয়ার কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে তাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন নয়। এবং ব্রিটেন সম্বন্ধে আমরা যা বলতে পারি তা হল তাদের সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হতে চলেছে, এবং তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেই পতন রোধ করার, যতটুকু তারা পারে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা দৌড় প্রতিযোগিতার সঙ্গে এই যুদ্ধকে তুলনা করলে আমরা বলতে পারি যে ব্রিটেনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়, তাদের সম্বন্ধে আমি বলব— 'তারাও এই দৌড়ে যোগ দিয়েছিল।' কিন্তু এই বিশাল সমরাঙ্গনে একটি মাত্র দেশই আছে যাদের স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমাহীন। সে দেশ হল আমেরিকা। সুতরাং আমার বিচারে আজ বিশ্বের সব থেকে বিপজ্জনক শত্রু হল আমেরিকা। এবং কোনওক্রমে যদি আমেরিকা এই যুদ্ধে জয়ী হয় তা হলে তারা বিশ্বে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করবে। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার ডলার-ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদের প্রবক্তারা 'আমেরিকান শতাব্দী'-র কথা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করছে এবং পরবর্তী দশ দশক ধরে বিশ্বের উপরে প্রভুত্ব করবার বাসনা তারা গোপন রাখার কোনও চেষ্টাও করেনি।

এমন একটা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে এটাই স্বাভাবিক যে জয় ও পরাজয় বিভিন্ন পর্যায়ে আসবে বিভিন্নভাবে, তাতে উত্থান ও পতন দুই থাকবে; কোনও দেশ কখনও জিতবে, কখনও বা তারা হারবে। প্রথম পর্যায়ে, অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি সমগ্র বিশ্বের রণক্ষেত্রের সর্বত্র একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তারপর এল দ্বিতীয় পর্যায় যখন অক্ষশক্তির বিপক্ষদল প্রতিআক্রমণ শুরু করল। বর্তমানে আমরা এই দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ এবং তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ের শুরুর সন্ধিক্ষণে। তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে যুদ্ধের হাওয়া আবার অক্ষশক্তির অনুকূলে বইবে। এবং অবশেষে জয়পরাজয়ের মধ্য দিয়ে যখন এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে, তারা আবার বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। এই তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য জাপান তার তীব্র প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছে, তাদের যাবতীয় ধনসম্পদ দিয়ে রসদ সংগ্রহের মাধ্যমে। তাইওয়ান (ফরমোসা)-র উপকূলে আমেরিকান নৌবাহিনীর উপরে আঘাত হেনে সম্প্রতি জাপানের নৌসেনা যে চমকপ্রদ জয় করায়ত্ত করেছে তাতে বহুব্যবহৃত ইংরাজি প্রবাদটি মনে আসে 'ভবিষ্যতের ঘটনাবলী বর্তমানে তাদের ছায়া ফেলে।' ইউরোপে তৃতীয় ও

চূড়ান্ত পর্যায়কে আহ্বান জানানো হয়েছে যে ঘটনাবলীর মাধ্যমে তাকে জার্মানির জনগণের গণঅভ্যুত্থান বলা যেতে পারে।

এই যুদ্ধে অক্ষশক্তির বিরোধী পক্ষ অধিকতর ধনসম্পদের অধিকারী হওয়াতে তাদের রণসম্ভার নির্মাণের ক্ষমতা বেশি এবং স্বভাবতই তারা একটা সুবিশাল অস্ত্রনির্মাণ-শিল্পের উপরে নির্ভরশীল। তাদের লক্ষ্য হল ইস্পাত ও দেহবর্মের ভারেই প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা। অক্ষশক্তির বিরোধী পক্ষের ভালমতোই জানা আছে যে তাদের যুদ্ধশিবিরে ঐক্যের অভাব আছে এবং তাদের নৈতিক ও মানসিক শক্তি তুলনামূলক বিচারে অক্ষশক্তির তুলনায় কম। অর্থাৎ রণসম্ভারের প্রাচুর্য থাকায় সে ক্ষতি তারা সামলে নিতে পারে, কিন্তু জনশক্তির ক্ষেত্রে তারা সম-পরিমাণ ক্ষতি সামলাতে পারবে না। রণসম্ভারের এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও যুদ্ধের পরিস্থিতি কিন্তু বিরোধী পক্ষের অনুকূলে নেই। সেই কারণে নৈতিক ও মানসিক শক্তির ভাণ্ডার ফুরিয়ে আসার আগেই তারা যুদ্ধের শেষ দেখতে চায়। আমরা যদি তাদের এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করি তা হলে সহজেই বুঝতে পারব কেন বিরোধী পক্ষ যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধের সমাপ্তি চায়। যদি তাদের সেনাবাহিনী উপলব্ধি করে যে তারা একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে তা হলে তাদের মনোবল ভেঙে যাবে, সেটা বিরোধীপক্ষের ভালমতোই জানা আছে। অতি সম্প্রতিকালেও ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি প্রচার করেছে যে ১৯৪৪ সাল শেষ হবার আগে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এখন যখন সারা বিশ্ব উপলব্ধি করছে যে সেটা একটা অসম্ভব ঘটনা, তারা ইউরোপের যুদ্ধ সমাপ্তির দিন ১৯৪৫ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত প্রলম্বিত করেছে। একই সঙ্গে তারা যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ের পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোচনা অব্যাহত রেখেছে— চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের জয় যে অবশ্যম্ভাবী এমন একটা ধারণা তারা জগতের জনগণের মধ্যে বদ্ধমূল করে দিতে চায়। প্রচারের আরও একটা কৌশল যা আমাদের শত্রুপক্ষ অবলম্বন করেছে তা হল, ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি তাদের জনগণকে ক্রমাগতই আশ্বাস দিচ্ছে ইউরোপে জার্মানিকে পর্যুদস্ত করতে পারলেই তাদের সমস্ত শক্তি তারা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত করবে। এটা মিথ্যা আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। ইউরোপ সম্বন্ধে কারুর যদি কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকে তা হলে তারা আমার সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হবে যে যদি কোনওভাবে জার্মানিকে পরাস্ত করা যায়— যদিও সেটা একটা সম্ভাব্য ঘটনা নয়— তবুও তেমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ইউরোপে যে পট-পরিবর্তন হবে তা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে তেমনই চিন্তিত ও ব্যস্ত রাখবে, ঠিক এখন তারা যেমন রয়েছে। সুতরাং প্রচারের এই অপকৌশল দুনিয়ার কিছু সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করলেও যারা তাদের সঙ্গে এই জীবন-মরণ সংগ্রামে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ছে তাদের উপরে কোনও রেখাপাতই করছে না।

আমাদের শত্রুপক্ষ যাই আশা করুক না কেন,এই যুদ্ধ অতীতের আরও অনেক যুদ্ধের মতোই আবারও প্রমাণ করে দেবে যে অস্ত্রশস্ত্র, সমরসজ্জার থেকে বেশি শক্তিশালী হল সেনাদের মনোবল। এই যুদ্ধের শেষে আবারও একবার আমরা দেখব মানসিক শক্তি ও জেতবার অদম্য সাহস যে পক্ষের আছে জয় তাদেরই করায়ত্ত হবে। আগামী যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী ও যতই কঠোর, ক্লেশদায়ক হোক না কেন তার মাত্র একটাই সম্ভাব্য পরিণতি হতে পারে— তা হল আমাদের শত্রুদের পরাজয়।

বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতের স্বাধীনতার জন্য এই দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রামের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা কঠিন হবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অর্থ হল মানবজাতির এক পঞ্চমাংশের দাসত্বদশা থেকে মুক্তি লাভ। এই সুমহান আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ

করবার জন্য আমাদের উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে। অর্থের বিনিময়ে সেই স্বাধীনতার মূল্য দেওয়া যায় না— তার মূল্য দেওয়া যায় শুধুমাত্র রক্তের বিনিময়ে।

অন্য সকল সাম্রাজ্যের যেমন একদিন পতন ঘটেছে, তেমনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও এখন একটা অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে চলেছে অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের দিকে যেদিন তার আর কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তারা তাদের অধিকার হস্তান্তর করবে না। অধিকন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে ১৭৫৭-১৮৫৭ পর্যন্ত পুরো একশো বছর ব্রিটিশের লেগেছিল ভারতবর্ষকে অধিকার করে নিতে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরও কিছু সময় লাগবে তাদের হাত থেকে আমাদের দেশকে উদ্ধার করতে। একদিকে আমাদের দেশের মাটির গভীরে ব্রিটিশ অধিকারের শিকড় বিস্তৃত রয়েছে ও একটা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী তাদের আজ্ঞাধীন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সমরাস্ত্র তাদের হাতে, অন্যদিকে আমরা অস্ত্রহীন। পরস্পরের ক্ষমতার এই যে বৈষম্য, তা অতিক্রম করে শত্রুকে পরাভূত করতে স্বভাবতই কিছু সময় লাগবে। এবং ডানকার্ক থেকে বা মালয় থেকে বা বর্মাদেশ থেকে ব্রিটিশ যত সহজে পশ্চাদপসরণ করেছে তত সহজে কিন্তু তারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করবে না কারণ ভারতবর্ষ তাদের কাছে এক অতি মহার্ঘ্য ভূখণ্ড। মালয় ও বর্মা ছাড়াও তাদের সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব থাকবে,কিন্তু ভারতবর্ষ হাতছাড়া হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর বুক থেকে লোপ পাবে। সুতরাং ভারতের মাটিতে ব্রিটিশ ততটাই দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলবে, যতটা তারা করত যদি তাদের ইংল্যান্ডের মাটিতে লড়তে হত। কাজেই ব্রিটিশকে ভারত থেকে বিতাড়িত করতে হলে আমাদেরও আরও কঠিন লড়াই লড়তে হবে এবং তার জন্য আমাদের অবশ্যই আরও সময় দিতে হবে। সময়ের কথা বিচার করতে হলে আমি এখানে আরও একটা কথা যোগ করব। ব্রিটেনের মতো শক্তিশালী সাম্রাজ্য দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে লড়াই করে যেটুকু সাফল্য পেয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সংগ্রামে সাফল্যলাভ করতে হলে যদি দুই বা এক বছর লড়াই চালিয়ে যেতে হয় তা হলে মনে হয় না কেউ আমাদের দোষ দিতে পারবে, বিশেষত যখন আমাদের শত্রুপক্ষ সারা পৃথিবী থেকে তাদের রসদ সংগ্রহ করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি আবারও বলব যে আমাদের বা আমাদের সহযোদ্ধাদের জন্য দীর্ঘকাল ধরে লড়াই চালিয়ে যাওয়া সমস্যা নয়, আমাদের শত্রুপক্ষের কাছেই সেটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। দীর্ঘ লড়াইয়ের অর্থ হল শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা গুরুতরভাবে হ্রাস পাবে, যা পূরণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে। অপরপক্ষে আমাদের দুর্বলতা হল যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্র ও রণসম্ভার না থাকা, সৈন্যসংখ্যায় নয়। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে দীর্ঘকালীন লড়াইয়ে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করব, বিশেষত সামরিক ক্ষেত্রে, তা ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হবে। আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে এক অতুলনীয় একতা গড়ে তোলা সম্ভব হবে যা ৩৮.৮ কোটি স্বদেশবাসীর কাছে এক অনুপ্রেরণাদায়ী উদাহরণ হবে, যখন আমরা দেশের ভিতরে প্রবেশ করব।

আমাদের সংগ্রামের প্রকৃতি সম্পর্কে এ পর্যন্ত সাধারণভাবে আলোচনা করেছি। চূড়ান্ত লড়াই কোথায় হবে এবার এই প্রশ্নের উত্তর দেব। ইতিহাসের সব গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বিষয়ে চিন্তা করলে আমরা দেখব যে প্রতিটি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত লড়াই যা দিয়ে সমগ্র সংগ্রামের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে, সেই লড়াই ঘটেছে একটা বিশেষ রণক্ষেত্রে। আমাদের নিজেদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে অধিকাংশ লড়াই হয়েছে দিল্লির কাছে পানিপথে।

এবারে কিন্তু পানিপথের যুদ্ধ হবে ভারতের পূর্ব সীমান্তে। ব্রিটিশ এই সীমানা বরাবর তাদের প্রতিরক্ষার ব্যূহ গড়ে তুলেছে, যেন এখানে তারা ভারতের 'ম্যাজিনো লাইন' নির্মাণ করেছে। তারা জানে যে তাদের প্রতিরক্ষার এই ব্যূহ যদি তারা অক্ষত না রাখতে পারে তা হলে তাদের পক্ষে ভারতের অধিকার রাখা সম্ভব হবে না। চট্টগ্রাম থেকে ইম্ফল ও কোহিমা পর্যন্ত এই ম্যাজিনো লাইনের প্রতিরোধ যদি একবার ভেঙে যায় এবং আমাদের বিজয়ী সেনাদল যদি একবার বাংলা-আসামের সমতলে প্রবেশ করতে পারে তা হলে দুটি ঘটনা ঘটবে। ভারতীয় জনগণ তাদের নিজের চোখে দেখতে পাবে ব্রিটিশ সেনারা পিছু হটছে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর শক্তি যে অপরাজেয় এই ধারণা তাদের ভেঙে যাবে এবং ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অনিবার্যভাবে ঘটতে চলেছে তা ভারতের জনসাধারণ উপলব্ধি করবে। তাদের হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস তারা ফিরে পাবে ও অভিশপ্ত পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য তখন তারা বিদ্রোহ করবে। সমগ্র ভারতের জনগণ একযোগে যদি বিদ্রোহ করে, তা হলে ব্রিটিশের সামনে তখন শুধুমাত্র একটা পথ খোলা থাকবে— তা হল প্রাণ বাঁচানোর জন্য পলায়ন করা।

যদি ভারতবর্ষে ব্রিটিশের ম্যাজিনো লাইন ভেঙে যায় তা হলে আরও একটা ঘটনা নিশ্চিতভাবে ঘটবে, তা হল বাংলাদেশ অতিক্রম করে বিহার ও উড়িষ্যাতে পৌঁছবার আগে ব্রিটিশের পক্ষে আর একটা নতুন প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। তারা হয়তো ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে একটা অস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে কিন্তু সেই প্রতিরোধ ভেঙে অগ্রসর হওয়া কঠিন হবে না। ইম্ফল থেকে ব্রহ্মপুত্র এবং তারপরে ব্রহ্মপুত্র থেকে কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত দুটি দীর্ঘ পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে।

উপরে আমি যা আলোচনা করেছি, তা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার আশা থাকবে ততদিন, যতদিন তারা চট্টগ্রাম ও ইম্ফলে প্রবেশ করবার পথে যে পাহাড় ও জঙ্গল পথরোধ করে আছে সেই স্থান তাদের অধিকারে রাখতে পারবে।

ইম্ফল ও চট্টগ্রামের যুদ্ধ যে কোনও একটা স্থানীয় এলাকা দখলের লড়াই নয়। বস্তুত এ হল ভারত জয় করে নেবার যুদ্ধ। এবং গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমরা যেখানে লড়াই করছি এবার সেইখানেই পানিপথের লড়াই হবে। ব্রিটিশ সেটা জানে। সেই জন্যই তারা ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত জঙ্গল ও পাহাড়ের লড়াইয়ে জেতবার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

আমরা যখন ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেছি যে আমাদের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে ভারতের পূর্ব সীমান্তের পাহাড় জঙ্গলে, তখন ব্রিটিশ সেনা যে সেই রণক্ষেত্রে এত পরাক্রমে লড়াই করবে তাতে আমাদের আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। ইম্ফলে যখন ব্রিটিশ সেনাধিনায়ক পরাস্ত হয়ে পিছু হটে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তখনও ব্রিটিশ হাই-কমান্ড থেকে নির্দেশ এসেছে, যতক্ষণ শেষ সেনা বেঁচে আছে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য। ইম্ফলের এই বিশেষ রণক্ষেত্রটির যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সেটা তারা উপলব্ধি করেছিল এবং তারা আরও আশা করছিল যে ইম্ফলের বিপর্যস্ত ব্রিটিশ বাহিনী যদি আরও কিছুদিন তাদের ঘাঁটি আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তা হলে 'জেনারেল বর্ষা' এসে তাদের সাহায্য করবে। ইম্ফল ও চট্টগ্রামের যুদ্ধ হবে ভারতের স্বাধীনতা লাভের চূড়ান্ত যুদ্ধ, ১৮৫৬ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ার যুদ্ধে সেদানের যুদ্ধের পরিস্থিতি যেমন ছিল।

গত ১২ মাসে আমাদের আপৎকালীন সরকার কোনও কোনও কাজে সফল হয়েছে এবং আমাদের সামনে আরও কী কী কাজ রয়েছে এবার আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। এই এক বছরে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার তাদের প্রথম কাজ, অর্থাৎ ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা সংগঠিত সেনাদলকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবার কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছে— শুধুমাত্র রণক্ষেত্রেই নয়, ভারতের অভ্যন্তরেও। ভারতীয় বিপ্লবীদের এই সংগ্রামশীল নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন ছিল, আপৎকালীন সরকার সেটা তাদের দিতে পেরেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজ বাস্তবে লড়াই করবে কিনা, করতে পারবে কিনা এবং সাহসের সঙ্গে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারবে কি না, সাম্প্রতিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সেই সব সন্দেহের অবসান করে দিয়েছে। এমনকী আমাদের সব থেকে বড় শত্রুও এ কথা বলতে পারবে না যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ প্রচারের একটা চাতুরি ছাড়া আর কিছু নয়। যুদ্ধে তাদের আমরা এমন পর্যুদস্ত করেছি যে তার পরে তারা আর অন্য কোনও সমালোচনা করতে না পেরে এখন বলছে যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের যথেষ্ট খাবার, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র নেই। কিন্তু আমি বহুবারই বলেছি যে যদি বিয়ার আর রাম খেয়ে, টিনের পর্ক ও বিফ খেয়েই যুদ্ধ জেতা যেত তা হলে পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও কোনও বিপ্লব কখনও সাফল্য পেত না। পৃথিবীর ইতিহাসে একটাও এমন উদাহরণ নেই যেখানে বিপ্লবীরা সংখ্যায় বা রসদের জোগানে তাদের প্রতিপক্ষের থেকে শক্তিশালী ছিল। আয়ারল্যান্ডের উদাহরণ যদি দিই, তা হলে দেখা যাবে ৫০০০ জন আইরিশ অসামরিক যোদ্ধার কাছে ৫০,০০০ জন প্রশিক্ষিত ও সুসজ্জিত ব্রিটিশ সেনাকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। পৃথিবীর বিপ্লবীরা সব সময়ে জয়ী হয়েছে তাদের আত্মিক শক্তিতে, তাদের ন্যায়নীতির জোরে এবং হার স্বীকার করবে না এই জেদি মানসিকতা আছে বলে। আমরাও ঠিক সেই ভাবেই জিতব।

দক্ষিণে আকিয়াব থেকে উত্তরে কোহিমা পর্যন্ত দীর্ঘ এলাকা জুড়ে সাম্প্রতিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় আমাদের ও শত্রুপক্ষের তুলনামূলক ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করতে পেরেছি। যতক্ষণ আমরা আক্রমণ অব্যাহত রাখতে পেরেছি শত্রুপক্ষকে হয় তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করতে হয়েছে অথবা বহুদূর পর্যন্ত পিছু হটতে হয়েছে। কোনও একটা রণক্ষেত্রেও তারা এক ইঞ্চি অগ্রসর হতে পারেনি। কিন্তু যখন বর্ষা নামল তখন কৌশলগত কারণে আমরা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং তারা তখন অগ্রসর হতে পারল। এটাকে শত্রুপক্ষের প্রচার বিরাট সাফল্য বলে দাবি করছে কিন্তু আমরা জানি বাস্তবে কী ঘটেছে।

আমরা এতগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের পরাস্ত করতে সমর্থ হয়েছি যে আমাদের শক্তি ও ক্ষমতার উপরে আমাদের বিশ্বাস শতগুণ বেড়ে গেছে এবং স্বভাবতই তা চূড়ান্ত জয় সম্বন্ধেও আমাদের নিশ্চয়তা বাড়িয়েছে। আবার যখন আমরা আক্রমণ শুরু করব তখন আমরা যে শত্রুদের আবারও পরাস্ত করতে পারব যে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত।

সাম্প্রতিক যুদ্ধে আমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তার আলোকে বর্তমানে আমাদের কাজ হল পরের দফায় আক্রমণের জন্য আমাদের প্রস্তুতিকে আরও তীব্র করা। পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয় ইতিমধ্যেই সেই কাজে ব্রতী হয়েছেন— তাঁরা একটি জাতীয় সংগঠনে তাদের প্রচেষ্টাকে সংহত করেছেন— দি ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্ট।

এই ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের দুইটি শাখা আছে— এক হল দেশের অভ্যন্তরে, আরেক হল সম্মুখ সমরে— যেখানে যুদ্ধ চলছে। আভ্যন্তরীণ রণক্ষেত্রের কর্তব্য হল যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য সৈন্যের, অর্থের ও রসদের জোগান দেওয়া, যতদিন যুদ্ধ চলে ততদিন সেই জোগান

যাতে অব্যাহত থাকে। সম্মুখের রণক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যত বেশি হবে, আভ্যন্তরীণ রণক্ষেত্রের উপর দায়িত্ব ততই বাড়বে জোগান অব্যাহত রাখার। গত বছরে সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির মাধ্যমে আমি যে কর্মপন্থা নির্দেশ করেছিলাম, আজ আবার সেই বিষয়ে আমি স্পষ্ট করে ঘোষণা করতে চাই। আভ্যন্তরীণ রণক্ষেত্রের কাছে আমরা যে ত্যাগস্বীকার দাবি করছি, সম্মুখের রণক্ষেত্রের মধ্যে কাজের শ্রেণিবিভাগ থাকতে পারে কিন্তু এই দুই রণক্ষেত্রের কাছে আমাদের একই ত্যাগস্বীকারের দাবি আছে। আধুনিক যুদ্ধ এখন যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে যারা রণক্ষেত্রে লড়াই করছে, তারাই যে শুধু প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে তাই নয়, যারা ঘরে আছে, পথে চলছে, কলকারখানায় কাজ করছে ও ময়দানে কুচকাওয়াজ করছে তারাও প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়ছে তাদের আমরা বারে বারে বলেছি যে সৈনিকের সামনে দু'টি পথ খোলা থাকে— জয় করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া অথবা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়াই করতে করতে প্রাণ দেওয়া, এবং শেষ কথা হল শত্রুকে বিনাশ করা। সম্মুখ রণক্ষেত্রে সেনানীর জন্য তাই আমাদের স্লোগান ছিল রক্ত, রক্ত, রক্ত। আভ্যন্তরীণ রণক্ষেত্রের সেনানীর জন্যও এখন থেকে আমরা একই স্লোগান ব্যবহার করব। আপনারা যারা আভ্যন্তরীণ রণক্ষেত্রে কাজ করছেন আপনাদেরও যে কোনও সময় প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আপনাদেরও সেই একই ত্যাগের আদর্শে দীক্ষা নিতে হবে। তাহলেই কেবলমাত্র আমরা সম্মুখ রণক্ষেত্রের সৈনিকদের অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে শক্তিশালী করতে পারব। শুধু মাত্র সৈনিকদের জন্যই ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হবার অঙ্গীকার চাওয়া হচ্ছে না, আপনারা যারা আভ্যন্তরীণ যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করছেন তাঁদেরও ঠিক সেই একই কঠোর পরিশ্রম, বঞ্চনা এমনকী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তা হলে ৩৮.৮ কোটি মানুষের মুক্তির জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সেনা প্রাণ দেবে, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সেটা তেমন বড় কিছু মূল্য নয়। পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ মানুষকে যদি তাদের সর্বস্ব দিতে হয়ে থাকে যাতে ভারত আবার স্বাধীন হতে পারে তা হলে আমি বলব সেটা তেমন বড়কিছু মূল্য নয়।

(আজকের সন্ধ্যার বক্তৃতার এটাই হল সারাংশ। ভারতবর্ষের শ্রোতাদের জন্য আমি নীচের আবেদনটুকু যোগ করব।)

দেশবাসীরা! আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের দৃঢ় সংকল্প হল আমাদের সহযোগীদের সঙ্গে কাঁধ কাঁধ মিলিয়ে লড়াই অব্যাহত রাখা যতদিন না ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত করা যায়। আপৎকালীন সরকারের জানা আছে যে তারা এক জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে ও তাদের আরও জানা আছে এই লড়াই হবে দীর্ঘ ও কঠোর। কিন্তু যুদ্ধের শেষ ফলাফলও তাদের জানা আছে— ভারতবর্ষের জয় ও স্বাধীনতা। দিল্লির পথ দীর্ঘ ও দুর্গম— পাহাড়, জঙ্গল, প্রশস্ত নদনদী ও গভীর অরণ্য পেরিয়ে সেই পথ এগিয়েছে। কিন্তু সেই পথের শেষে আছে আমাদের স্বাধীনতা। আমরা সেই পথ ধরে অগ্রসর হব, তার জন্য যতদিন লাগে আমরা তাতে পিছপাও নই। আমাদের পথ চলা অব্যাহত থাকবে যতদিন না আমরা দেখতে পাই যে নতুন দিল্লির ভাইসরয়ের প্রাসাদে আমাদের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। দেশবাসীরা! আমরা আসছি।

আমাদের জন্য অপেক্ষা করুন এবং আমাদের সংকেত পেলে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিন।

৫৩

ভারতবর্ষের মৌলিক সমস্যাগুলি

[টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, নভেম্বর ১৯৪৪][১]

আপনাদের মতো বিদ্বজ্জনের একটি বিশিষ্ট সমাবেশে আমি ভারতবর্ষ সম্পর্কে এমন কোনও একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই না যা আপনারা প্রায়ই শুনে থাকেন বা পড়ে থাকেন। আমার মনে হয় সব থেকে ভাল হবে যদি আজ আমি আপনাদের কাছে ভারতবর্ষের আরও মৌলিক যে সমস্যাগুলি আছে সেই বিষয়ে কথা বলি। আমি নিজে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র ছিলাম। সেই কারণে মৌলিক সমস্যার বিষয়ে আলোচনাতেই আমার বিশেষ আগ্রহ। আশা করি আপনারাও এই বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন যে আমি যদি আজ ভারতবর্ষের অতীত এবং বর্তমানের মৌলিক সমস্যাগুলির বিষয়ে কথা বলি সেটাই সব থেকে ভাল হবে।

আমার বিদেশ ভ্রমণের সময় আমি প্রায়ই দেখেছি যে আমার দেশ সম্বন্ধে অনেকে একটা ভ্রান্ত ও কিছুটা অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, ইউরোপের জনসাধারণের মনের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা হল যে সেটা এমন একটা দেশ যেখানে তিনটি জিনিস দেখতে পাওয়া যায়: সাপ, ফকির ও মহারাজা। ব্রিটিশ প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত যারা, তারা মনে করে ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে সকলে সর্বদাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে, এবং সেইজন্যই সে দেশে শান্তি ও আইনের শাসন বজায় রাখার জন্য ব্রিটিশদের কড়া তত্ত্বাবধান দরকার।

ইউরোপে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যাঁরা, অর্থাৎ যাঁদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু জানা আছে, আপনারা যদি তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন তা হলে দেখবেন যে তাঁরা ভারতবর্ষকে তপস্বী ও দার্শনিকদের দেশ হিসাবে দেখেন যেখানে এক সময়ে গভীর দর্শনশাস্ত্রের বহুল চর্চা ছিল কিন্তু এখন সেদেশ মিশর ও ব্যাবিলনের মতোই একটা মৃত সভ্যতা।

এখন আমাদের প্রশ্ন হল ভারতবর্ষের প্রকৃত চেহারা তা হলে কোনটা? আমাদের সভ্যতা যে সুপ্রাচিন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও অন্যান্য প্রাচিন সভ্যতাগুলি থেকে, যেমন মিশর বা ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া বা এমনকী গ্রিসের থেকেও ভারতবর্ষ আলাদা কারণ এই দেশের প্রাচিন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজও সজীব ও প্রবহমাণ। ভারতবর্ষের অস্তিত্ব অতীতে নয়, বর্তমানে। আমাদের, আজকের ভারতীয় চিন্তাধারা এখনও মূলত আমাদের পূর্বপুরুষদের মতো, যাঁরা ২০০০ বা ৩০০০ বছর আগে এদেশে বসবাস করতেন। আমাদের

---

১. নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহালয় থেকে।

অনুভূতি ও আদর্শও তাঁদের মতো। এক কথায় বলতে গেলে সুদূর অতীতের জীবনযাত্রার সঙ্গে বর্তমানের একটা ধারাবাহিকতা আছে, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ধারাবহিকতা যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ও এক অতি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এদেশকে বুঝতে হলে এই মূল কথাটা উপলব্ধি করতে হবে যে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার মৃত্যু হয়নি, প্রাচীন ভারতবর্ষ বর্তমান ভারতবর্ষের মধ্যেই বেঁচে আছে ও ভবিষ্যতে থাকবে।

এই পটভূমিকায়, এই সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রেক্ষাপটে আমরা এক যুগ থেকে অন্য যুগে আমাদের জাতীয় জীবনের বিবর্তন হতে দেখেছি। গত ৩০০০ বছর ধরে বিদেশিরা এসেছে ভারতে নতুন ভাবনাচিন্তা, অনেক সময়ে নতুন সংস্কৃতির পসরা নিয়ে। এইসব নতুন ভাবনাচিন্তা, সংস্কৃতি ও প্রভাব ধীরে ধীরে ভারতের জাতীয় জীবনে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সেই কারণে কয়েক হাজার বছর ধরে আমাদের সেই একই সভ্যতা ও সংস্কৃতি থাকলেও ভারতবর্ষে পরিবর্তন এসেছে ও আমরা সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে পেরেছি। তাই আমাদের প্রাচীন উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য সত্ত্বেও আজকের দিনে আমরা এক আধুনিক পৃথিবীতে বাস করতে পারছি ও এই যুগের জীবনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারছি। যে সব ব্যক্তি সজ্ঞানে বা নিজের অগোচরে ব্রিটিশ প্রচার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের ধারণা হল ব্রিটিশ খুব সহজেই ভারতবর্ষ জয় করে নিতে পেরেছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হবার পরে এই প্রথম ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যসাধন সম্ভব হয়েছে। এই দুটি ধারণাই সম্পূর্ণ অসত্য ও ভিত্তিহীন।

প্রথমত এ কথা সত্য নয় যে ব্রিটিশ খুব সহজেই ভারতবর্ষ জয় করে নিতে পেরেছিল। ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ অধিকারে আনতে ব্রিটিশের ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত দীর্ঘ ১০০ বছর লেগেছিল। দ্বিতীয়ত এটাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা যে ভারতবর্ষ রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ার পরে। আজ থেকে ২,৫০০ বছর আগে বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে প্রথম রাজনৈতিক ঐক্যসাধন হয়েছিল। বস্তুত অশোকের সাম্রাজ্যকালে ভারতবর্ষের আয়তন ছিল আজকের ভারতের চেয়েও বিস্তৃত, আধুনিক ভারতবর্ষ ছাড়াও আফগানিস্তান ও পারস্যের একাংশ ছিল তার অন্তর্ভুক্ত।

সম্রাট অশোকের পরে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। জাতীয় স্তরে এসেছে নানা পরিবর্তন, অবক্ষয়ের পরে এসেছে সমৃদ্ধির যুগ। জাতীয় জীবনের এই উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও কিন্তু আমরা আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে পেরেছি। অশোকের রাজত্বকালের প্রায় হাজার বছর পরে ভারত আবার উন্নতির শীর্ষে পৌঁছয় গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে এবং তার পরে আরও প্রায় নয়শো বছর পরে আবার এক গৌরবময় যুগে মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়। সুতরাং, ব্রিটিশের অধীনতাই আমাদের রাজনৈতিক একতা দিয়েছে—এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সেটা মনে রাখা প্রয়োজন। ঐক্যসাধনের পরিবর্তে, ব্রিটিশ যতদিন থেকে আমাদের উপরে প্রভুত্ব করছে তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছে ভারতবাসীদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি এবং তাদের দুর্বল, নিরস্ত্র ও ক্ষমতাহীন করার জন্য।

আমি এবারে আপনাদের কাছে একটা সমস্যার কথা উল্লেখ করব যা বৈজ্ঞানিকদের কাছে, এবং বিশেষভাবে সমাজবিদ্যার ছাত্রদের কাছে আকর্ষণীয় হবে। প্রশ্নটা হল ভারতবাসীদের স্বাধীন দেশের নাগরিকরূপে বাঁচবার অধিকার আছে কিনা। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কি সেই ক্ষমতা ও প্রাণশক্তি অবশিষ্ট আছে যার দ্বারা তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে বাঁচতে পারে ও দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারে? আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে কোনও জাতি

যখন তাদের প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে তখন তারা সেই সঙ্গে তাদের জাতিগত অস্তিত্ব বজায় রাখার অধিকারও হারায়। এবং প্রাণশক্তি হারাবার পরে যদি তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে না যায়, তবুও মানবসমাজে তাদের সেই অস্তিত্বের কোনও মূল্য বা কার্যকারিতা থাকে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমার যে আকাঙ্ক্ষা ও দাবি এবং আমি যে বিশ্বাস করি স্বাধীন দেশ হিসাবে আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তার একমাত্র কারণ হল আমি জানি আমাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রাণশক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে যা দিয়ে আমরা স্বাধীন দেশের মুক্ত মানুষ হিসাবে বাঁচতে পারব ও স্বদেশকে গড়ে তুলতে পারব।

এখন আমাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রাণশক্তি এখনও অবশিষ্ট আছে কি না আমাদের কাছে যদি সেই প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয় তা হলে আমাকে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রথমত, আমাদের জাতির মধ্যে কোনও সৃষ্টিশীল প্রতিভা আছে কি না ও দ্বিতীয়ত, এই দেশ ও জাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আমরা যুদ্ধ করতে ও প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি কিনা? ভারতবর্ষের জন্য ও ভারতীয়দের জন্য এই দুটি পরীক্ষা আমাদের করতে হবে।

প্রথম প্রশ্নের বিষয়ে, আমরা দেখেছি যে ভারতে ব্রিটিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও, এবং বিদেশি শাসনের যা অবধারিত পরিণতি— অসংখ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও গত একশো বছর ধরে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় রেখেছি যা প্রমাণ করে যে আমাদের এখনও সেই ক্ষমতা আছে।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে যে বিপুল সংখ্যক দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, পরাধীন ভারত যে বিপুল সংখ্যক কবি ও লেখকের জন্ম দিয়েছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বাধা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভারতীয়েরা যে সাফল্য লাভ করেছেন ও শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা যে উচ্চ মানের গবেষণার কাজ করতে সক্ষম হয়েছেন যা পৃথিবীর যে কোনও বিজ্ঞানীর কাজের সঙ্গে তুলনীয়, নিজস্ব প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয়েরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, এবং সব শেষে ক্রীড়াক্ষেত্রেও আমরা যে সাফল্য পেয়েছি— এর সব কিছুই প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলেও আমাদের দেশের প্রাণশক্তি কিছুমাত্র খর্ব হয়নি।

বিদেশি শাসনের অধীনে থাকার সময়ে, এবং সেই শাসনের অবধারিত ফলস্বরূপ সর্বপ্রকার বাধা ও নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও আমরা যদি এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার প্রমাণ দিয়ে থাকি তা হলে যুক্তিসম্মতভাবেই অনুমান করা যেতে পারে যে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হবে এবং ভারতীয় জনগণ যখন উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ পাবেন, তখন তাঁরা তাঁদের বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার এবং সৃষ্টিশীল প্রতিভার আরও অনেক প্রমাণ দিতে পারবেন।

জাতির প্রাণশক্তি আছে কিনা তার প্রথম পরীক্ষা, অর্থাৎ তাদের সৃষ্টিশীলতা বজায় আছে কিনা তার একটা উদাহরণ আমি এইমাত্র দিয়েছি। এবার আমি দ্বিতীয় পরীক্ষাটির বিষয়ে বলব, অর্থাৎ ভারতীয়রা দেশ ও জাতির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যুদ্ধ করতে ও প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে কি না। এই বিষয়ে প্রথমেই আমি যে কথাটি বলতে চাই তা হল, ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমাদের শেষ উল্লেখযোগ্য লড়াইয়ের পর থেকে ভারতীয়রা তাদের সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে, একদিনের জন্যও তারা সেই লড়াইয়ে ক্ষান্ত দেয়নি।

১৮৫৭ সালের যুদ্ধে হার স্বীকার করার পরে দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের পূর্বসূরীদের বুদ্ধিহীনতার জন্য তখনকার নেতারা অস্ত্রশস্ত্র ব্রিটিশদের হাতে সমর্পণ করবার সিদ্ধান্তে রাজি হয়েছিল। এর পর থেকে যতবারই আমরা আমাদের স্বাধীনতা ফিরে পেতে চেয়েছি,

আমাদের নিরস্ত্র অবস্থার জন্য আমরা বিফল হয়েছি। আমাদের পূর্বপুরুষদের বিবেচনার ত্রুটিতে আমাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি সে কথা সত্য কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করতে চেষ্টা করেছি।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমরা যে সব উপায় অবলম্বন করেছি তার বর্ণনা দিয়ে অহেতুক আপনাদের সময় আমি নেব না। আমি শুধু এইটুকু বলব যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপ্লবীরা তাঁদের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করেছেন, ভারতীয়রা সবই প্রয়োগ করে দেখেছেন।

এই শতাব্দীর শুরুতে বিশেষত ১৯০৪ ও ১৯০৫ সালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধজয়ের পরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা নতুন উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং তারপর থেকে, গত ৪০ বছর ধরে আমাদের দেশের বিপ্লবীরা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অন্য দেশের বিপ্লবীদের কলাকৌশলগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন ও সেই পদ্ধতিগুলির মধ্যে যতগুলি সম্ভব ততগুলিই তাঁরা কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন।

তাঁরা গোপনে অস্ত্র ও বোমা তৈরির চেষ্টা করেছেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সেগুলি ব্যবহার করারও চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের একটা নতুন পদ্ধতিও ভারতে চেষ্টা করে দেখা হয়েছে— মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি না যে এই পথে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাব, কিন্তু এই আন্দোলন যে ভারতীয়দের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে, এবং বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সুতরাং আমি বলতে পারি যে বিদেশি শাসনের সব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কোনও জাতি ও দেশ যে একটা নতুন পন্থা আবিষ্কার করতে পারে ও সেই পথ অনুসরণ করে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পারে তাতে আবারও প্রমাণ হয় যে আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির কোনও অভাব নেই। এতে প্রমাণ হয় যে চিরকাল বিদেশি শাসকদের দাসত্ব করার এই ব্যবস্থা ভারতীয়রা মেনে নিতে রাজি নয়, তারা এই অপশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তারা নতুন পন্থা উদ্ভাবনে সচেষ্ট।

একজন বিপ্লবী হিসাবে আমি অন্য দেশের বিপ্লবী আন্দোলনে খুব ভালভাবে বিবেচনা করেছি, এবং কোনও অতিশয়োক্তি না করেও আমি বলতে পারি যে ১৮৫৭ সাল থেকে সর্বপ্রকার বিপ্লবী আন্দোলনের পন্থা আমরা ব্যবহার করে দেখেছি। এই সংগ্রামে বহু ব্যক্তি বহুভাবে তাদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে কাজ করেছে এবং অনেকে তাদের প্রাণ দিয়েছে। এর মধ্যে শুধু মাত্র একটা পথই আমাদের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। তা হল আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত একটা সেনাদল, প্রকৃতপক্ষে একটা আধুনিক জাতীয় সেনাদল গড়ে তোলা।

সাম্প্রতিক কালের আগে সেই কাজ আমাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি কারণ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে, ব্রিটিশ সেনাদল ও ব্রিটিশ পুলিশের চোখের সামনে তা করা কার্যত অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই মহাযুদ্ধ যে মুহূর্তে ভারতবর্ষের বাইরে ভারতের আধুনিক জাতীয় সেনাদল গঠনের এক সুযোগ আমাদের সামনে এনে দিয়েছে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেই সুযোগ পরম আগ্রহে দুই হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেছি। জাপানের সরকার ও সেনাদলের সাহায্যে সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়েছে এবং আমরা এখন আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছি।

সুতরাং আমার বক্তব্য হল ব্রিটিশ সরকার ও তাদের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের এই

বিপ্লবী সংগ্রামে সর্বদাই আমরা আমাদের উদ্যোগ, সৃষ্টিশীল ক্ষমতা এবং প্রাণশক্তির যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছি এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই প্রচণ্ড স্বার্থত্যাগও করেছে। এই অবস্থায় ও এখন এই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়াতে আমরা যে সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছতে পেরেছি তাতে আমরা আশা করতে পারি যে হয়তো এতদিন পরে আমাদের জাতির আশা পূর্ণ হতে চলেছে ও এবার হয়তো আমরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে পারব।

ভারতীয়দের প্রাণশক্তি এবং স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে তাদের জীবনযাপনের অধিকার সম্বন্ধে আমি আলোচনা করেছি। এবার আমি বর্তমান ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব। আপনারা যদি আধুনিক ভারতবর্ষকে বুঝতে চান তা হলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে। প্রথম হল আমাদের দেশের সুপ্রাচীন প্রেক্ষাপট— অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতা, যে বিষয়ে এই যুগের ভারতীয়রা খুবই সচেতন, এবং যে বিষয়ে তারা খুবই গর্বিত বোধ করে থাকে। দ্বিতীয় কথা হল, যেদিন থেকে আমরা ব্রিটিশের হাতে আমাদের স্বাধীনতা হারিয়েছি সেই দিন থেকে আমাদের স্বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলেছে, যাতে আজ পর্যন্ত কোনও বিরতি পড়েনি। তৃতীয়ত ভারতের বাহির থেকে যে প্রভাবগুলি আমাদের উপরে পড়েছে।

আধুনিক ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছে যে তিনটি প্রভাবের সমন্বয়ে— আমাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রভাব, ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের বিরতিহীন সংগ্রাম ও দেশের বাহির থেকে আসা প্রভাব।

ভারতের বাহির থেকে যে প্রভাবগুলি আমাদের উপরে এসেছে, এবং আজকের আধুনিক ভারতবর্ষের মানসিকতার গঠনে কীভাবে সেই প্রভাবগুলি ছাপ ফেলেছে সেই বিষয়ে আমি কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। বহির্বিশ্বের এই প্রভাবগুলির মধ্যে প্রথমে আছে পাশ্চাত্য জগতের চিন্তার ছাপ যা এক কথায় বলতে গেলে সংস্কারমুক্ত উদার চিন্তাধারা, নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও প্রজাতন্ত্রের ধারণা।

অর্থাৎ আমরা অন্যভাবেও বলতে পারি, যে ১৮৫৭ সাল থেকে আধুনিক সংস্কারমুক্ত উদারচেতা রাজনীতি ও প্রজাতন্ত্রের চিন্তাধারা ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীদের বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে।

বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে আরও একটা প্রভাব আমাদের উপরে এসেছে। ১৯০৪-১৯০৫ সালে যুদ্ধে জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ের পর থেকে এশিয়াতে যে একটা নবজাগরণের সূচনা হচ্ছে সেই বিষয়ে ভারতীয়রাও সজাগ হয়েছিলেন। এই নবজাগরণ যে শুধু জাপানের ক্ষেত্রেই হয়েছে তা নয়, জাপানের সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার অন্য দেশগুলিতেও পুনরুজ্জীবন ঘটছিল যা ভারতীয়দের চিন্তাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। গত ৪০ বছর ধরে ভারতের অভ্যন্তরে যা ঘটছে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করা ছাড়াও আমরা এশিয়ার অন্য দেশগুলির ঘটনাবলীর প্রতিও নজর রেখেছি।

পৃথিবীর অন্যত্র যে সব দেশে বিপ্লবী সংগ্রাম চলেছে তাও আমাদের চিন্তায় ছাপ ফেলেছে। ইতালিতে মাজিনি ও গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে 'রিসোরজিমেন্টো' আন্দোলন এবং আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে আইরিশ জনগণের সংগ্রামের ইতিহাস থেকে ভারতীয় বিপ্লবীরা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। আপনারা জানেন গত বিশ্ব মহাযুদ্ধের আগে রাশিয়াতে জারের বিরুদ্ধে 'নিহিলিস্ট' আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেই আন্দোলনের

ইতিহাসও আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে পড়েছি। এবং ভারতবর্ষের আরও কাছে চিনে ডক্টর সান ইয়েত-সেনের নেতৃত্বে যে নবজাগরণ ঘটছে তাও ভারতীয় বিপ্লবীরা গভীর আগ্রহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

সুতরাং ভারতের বাইরে বিপ্লবীরা যে যেখানে যখনই কোনও সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন ভারতীয় বিপ্লবীদের উপরে তাদের প্রভাব পড়েছে। তার পরে গত বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন রাশিয়াতে বিপ্লব শুরু হল যার ফলে সে দেশের এক নতুন সরকার সোভিয়েত সরকার গঠিত হল, তখন থেকে সেই নতুন সরকারের শাসনপদ্ধতিও আমাদের দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করেছে।

সোভিয়েত রাশিয়ার পুনর্গঠনের বিষয়ে— যেভাবে সে দেশের অতি দ্রুত শিল্পায়ন ঘটেছে এবং সোভিয়েত সরকার যেভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পেরেছে সেই বিষয়গুলিতে ভারতের জনগণ যতটা আগ্রহী, কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিষয়ে তাঁরা ততটা আগ্রহী নন। আমাদের দেশের জনগণ বিশেষভাবে গঠনমূলক কাজে সোভিয়েত সরকারের সাফল্য থেকে শিক্ষা নিতে চেষ্টা করেছেন। বস্তুতপক্ষে আমাদের দেশের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কমিউনিজ়ম সম্বন্ধে কোনও ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু রাশিয়া ভ্রমণকালে সোভিয়েত রাশিয়ার শিক্ষাক্ষেত্রের বিশাল পুনরুজ্জীবন তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সাম্প্রতিক কালে ভারতের জনগণের উপরে আরও অন্য কয়েকটি বিদেশি প্রভাব পড়েছে— ইতালি ও জার্মানির নেতৃত্বে এখন ইউরোপে 'ফ্যাসিজ়ম' বা 'ন্যাশনাল সোশ্যালিজ়ম' নামে যে নতুন চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটছে সেই মতবাদের বিকাশও আমাদের দেশের বিপ্লবীরা পর্যবেক্ষণ করছেন।

ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান, চিন, রাশিয়া, জার্মানি ইত্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যে প্রভাবগুলি ভারতে এসে পৌঁছচ্ছে সেই বিষয়ে আমি এইমাত্র আমার বক্তব্য রেখেছি। এবারে আমি যে বিষয়ে আলোচনা করব তা হল ভারতীয় জনগণের উপরে সেই প্রভাবগুলির কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে—বহির্বিশ্ব থেকে আসা এই প্রভাবগুলির মধ্যে কতটা আমরা গ্রহণ করেছি ও কতটা আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রজন্মের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের পূর্বসূরীদের যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে সেই বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমাদের পূর্ব প্রজন্মের ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিরূপে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর নাম করব। তাঁদের চিন্তাধারা ও মতামতের সঙ্গে আমাদের প্রজন্মের চিন্তাধারা ও মতামতের বিশাল পার্থক্য রয়েছে।

আপনারা যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধীর লেখা পড়েন তা হলে আপনারা লক্ষ করবেন যে পাশ্চাত্যের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে তাঁদের নিজেদের মনের মধ্যে সর্বদাই একটা দ্বন্দ্ব ছিল। মহাত্মা গান্ধীর কথা চিন্তা করলে আমরা দেখব যে তিনি এই সমস্যার কোনও সুস্পষ্ট সমাধান আমাদের দেননি। পশ্চিমের চিন্তাধারা তিনি গ্রহণ করবেন কি না সেই বিষয়ে তাঁর মতামত সম্বন্ধে জনগণের মনের মধ্যে একটা সংশয় ছিল। সাধারণভাবে তাঁর মতামত পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার ঘোরতর বিরোধী বলে মনে হলেও বাস্তবে তিনি কিন্তু সব সময়ে নিজের মত অনুসারে কাজ করেননি। এবং তার কারণ হল তাঁর নিজের মনের মধ্যে পাশ্চাত্যের চিন্তাভাবনার প্রতি যে তীব্র বিদ্বেষ ছিল দেশের জনগণের মনোভাবে সেই বিদ্বেষ প্রতিফলিত হয়নি।

হিংসাত্মক শারীরিক বলপ্রয়োগ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মতামত আপনাদের সকলেরই

জানা। তিনি স্বাধীনতালাভের লক্ষ্যে অস্ত্রের ব্যবহার ও শত্রুর রক্তপাতকে সমর্থন করেননি। বিদেশের, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের প্রভাবের বিষয়ে তাঁর সাধারণ যে মনোভাব তার সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আমাদের সমসাময়িক যারা তারা সকলেই মহাত্মা গান্ধীকে আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের নেতারূপে অনুসরণ করেছে কিন্তু সর্ববিষয়ে তাঁর মতামতকে তারা গ্রহণ করতে পারেনি। কাজেই মহাত্মা গান্ধীকে ভারতবর্ষের বর্তমান প্রজন্মের রাজনৈতিক মনোভাবের প্রবক্তা হিসাবে ধরে নেওয়া উচিত হবে না।

বহু দিক দিয়েই মহাত্মা গান্ধী একজন জটিল চরিত্রের মানুষ এবং আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করলে আপনারা তাঁকে আরও ভাল করে বুঝতে পারবেন। গান্ধীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুটি দিক আছে— তিনি একাধারে রাজনৈতিক নেতা, অন্যদিকে তিনি দার্শনিক। আমরা তাঁকে রাজনৈতিক নেতারূপে মান্য করি কিন্তু তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকে আমরা গ্রহণ করিনি।

এখন প্রশ্ন হল যে কীভাবে আমরা এই দুই দিককে স্বতন্ত্র করতে পারি। এবং তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকে যদি আমরা গ্রহণ করতে না পেরে থাকি তা হলে কেন আমরা তাঁকে নেতা হিসাবে অনুসরণ করছি? জীবনদর্শন সম্বন্ধে গান্ধীর নিজস্ব মতামত থাকলেও তিনি একজন বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ এবং সেই কারণেই তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন তিনি জনগণের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেবার পক্ষপাতী নন। তার ফলস্বরূপ আমরা আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁকে নেতা বলে মানি কিন্তু আমাদের নিজস্ব মতবাদকে অনুসরণ করার স্বাধীনতা আছে। তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ আমাদের উপরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করলে আমরা তাঁকে নেতারূপে গ্রহণ করতে পারতাম না। কিন্তু তিনি রাজনৈতিক সংগ্রামকে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার থেকে স্বতন্ত্র রেখেছেন।

আমি পূর্ববর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি ও প্রবক্তা রূপে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর নাম করেছি। এবারে তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারার তুলনামূলক বিচার করে দেখা যাক। কোনও কোনও বিষয়ে তাঁরা একমত, আবার কোনও কোনও বিষয়ে তাঁদের মতভেদ আছে। প্রথমত যে বিষয়ে তাঁরা একমত, তা হল তাঁরা দু'জনেই স্বাধীনতালাভের এই জাতীয় সংগ্রামে অস্ত্রের ব্যবহারের বিরোধী। এক কথায়, সশস্ত্র বিপ্লবের বিষয়ে তাঁরা অভিন্ন মত পোষণ করেন। আমাদের দেশের শিল্পায়ন সম্বন্ধেও তাঁদের মত এক। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী দু'জনেই বৃহৎ শিল্পভিত্তিক আধুনিক সভ্যতার বিরোধী। কিন্তু শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু এক নয়। শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের প্রভাব অনুসরণে রবীন্দ্রনাথের আপত্তি নেই। এই বিষয়ে ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্ণ সহযোগিতা ও আদানপ্রদানে তিনি বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন অন্য দেশগুলির শিল্প, সংস্কৃতি ও তাদের চিন্তাধারার সম্বন্ধে আমাদের বৈরীভাব থাকা উচিত নয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেখানে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতাকে সমর্থন করেন, গান্ধীর মনোভাব কিন্তু সাধারণ ভাবে সর্বপ্রকার বিদেশি প্রভাব অনুসরণের পরিপন্থী। যদিও যে কথাটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটা হল, মহাত্মা গান্ধী কখনওই নিজের মতামতকে সুস্পষ্টভাবে কোথাও ব্যক্ত করেননি। আমি এখানে সাধারণভাবে তাঁর চিন্তাভাবনার কথা উল্লেখ করছি।

আমি আগেই বলেছি যে পূর্ববর্তী প্রজন্মের সঙ্গে আমাদের প্রজন্মের মৌলিক চিন্তাধারার একটা বিশাল পার্থক্য আছে। তার কারণ আমি এখন ব্যাখ্যা করব। আমি এইমাত্র যা বলেছি,

বিদেশের প্রভাব ও শিল্পভিত্তিক সভ্যতা সম্বন্ধে আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত সেই বিষয়ে আমাদের গত প্রজন্মের নেতারা তাঁদের সমগ্র জীবন ধরেই সংশয়ান্বিত ছিলেন এবং তাঁদের কাজে আমরা সেই সংশয়ের প্রতিফলন দেখেছি। কিন্তু আমাদের মধ্যে এই সংশয় নেই। আমাদের মধ্যে এই সংশয় নেই, তার কারণ অতীতের উপর ভিত্তি করে আমরা এক আধুনিক ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে চাই, এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। অস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করতে পারবে সেই মতবাদে আমরা বিশ্বাস করি না। এখন একবার যদি আমরা সেই বিশ্বাস মনের মধ্যে গ্রহণ করে থাকি যে স্বাধীনতা পেতে গেলে আমাদের অস্ত্র হাতে নিতে হবে ও সশস্ত্র যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করতে হবে তা হলে আমাদের এই কথাও স্বীকার করে নিতে হবে যে অস্ত্র নির্মাণের জন্য আমাদের আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে। সুতরাং আধুনিকতার মন্ত্রে আমাদের আস্থা রাখতে হবে। শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের আধুনিক পদ্ধতিতে লড়াই করতে হবে আধুনিক অস্ত্র দিয়ে— কাজেই আমাদের চাই আধুনিক শিল্প। যা ছিল আমাদের পূর্ববর্তী নেতাদের কাছে কঠিনতম বাধা সেটাই আমাদের যাত্রাপথে প্রথম পদক্ষেপ রূপে গণ্য হবে। আধুনিকতাবাদ বা বিদেশি প্রভাব বা শিল্পায়ন— এই বিষয়গুলিতে আমাদের মতামত যাই হোক না কেন, আধুনিক ভারতবর্ষের কাছে তা সমস্যা নয়, আমাদের প্রশ্ন হল আজকের দিনের সমস্যার সমাধান আমরা কীভাবে করব।

আমার বিশ্বাস জাপানের আধুনিক প্রজন্ম আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকে যতটা বুঝতে পেরেছিল তার থেকে অনেকটাই বেশি তারা আমাদের বুঝবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই প্রকার। প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতার ভিত্তিতে আমরা এক নতুন ও আধুনিক যুগে আমাদের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষা দেবে।

আমাদের প্রজন্মের এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাখ্যা করবার পরে আমি কয়েকটি সমস্যার বিস্তারিত আলোচনায় মনোনিবেশ করব। অবশ্যই বর্তমানের সব থেকে বড় সমস্যা হল কীভাবে এই যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। যাঁরা রেডিয়ো শুনছেন বা খবরের কাগজ পড়ছেন, তাঁদের সকলেরই সেই সমস্যার বিষয়ে জানা আছে। আমি স্বাধীন ভারতের কিছু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। যে মুহূর্তে ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে সেই মুহূর্ত থেকে সব থেকে বড় যে কাজ আমাদের করতে হবে তা হল ভবিষ্যতে সেই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য আমাদের জাতীয় সুরক্ষাকে সংগঠিত করা। তার জন্য আমাদের আধুনিক অস্ত্র নির্মাণের শিল্প গড়ে তুলতে হবে যাতে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র আমরা নিজেরাই তৈরি করতে পারি। যার অর্থ হল আমাদের বৃহদাকার শিল্পোদ্যোগের পরিকল্পনা করতে হবে।

দেশের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন মেটানোর পরের কাজগুলির মধ্যে গুরুত্বের বিচারে সর্বপ্রধান কাজ হল দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূর করা। আজ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে ভারত একটি। কিন্তু ব্রিটিশ যখন ভারতবর্ষ অধিকার করেছিল তখন এ দেশে দারিদ্র্য ছিল না। বস্তুত এখানকার সম্পদই ইউরোপীয় দেশগুলিকে ভারতবর্ষের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব আছে সে কথা কেউ বলতে পারবে না। সেই দিক দিয়ে আমরা ধনী কিন্তু ব্রিটিশ ও অন্য বিদেশি শক্তির শোষণ আমাদের দেশকে দরিদ্র করেছে। সুতরাং আমাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল কীভাবে এই লক্ষ লক্ষ বেকার ভারতবাসীকে চাকরি দেওয়া যায় ও শোচনীয় দারিদ্র্য থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া যায়।

স্বাধীন ভারতবর্ষের তৃতীয় সমস্যা হবে শিক্ষার অভাব। বর্তমানে ব্রিটিশ শাসনাধীন

ভারতের ৯০% মানুষ নিরক্ষর। আমাদের কাজ হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারতের জনগণের জন্য অন্ততপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং তার সঙ্গে শিক্ষায় বিশেষভাবে আগ্রহী যারা তাদের জন্য উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কীয় আরেকটি সমস্যা আছে যার সমাধান ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সেই সমস্যা হল লিখিত ভাষার হরফের। বর্তমানে ভারতের দুটি হস্তলিপির প্রচলন আছে। এক হল সংস্কৃত (বা নাগরী) এবং অন্যটি হল আরবি (বা ফারসি)। এখন পর্যন্ত যা কিছু সরকারি কাজ ও জাতীয় সম্মেলন ইত্যাদিতে আমরা দু'টি ভাষারই ব্যবহার চালু রেখেছি। অবশ্য কোনও কোনও প্রদেশে সংস্কৃতের পরিবর্তিত রূপ চালু আছে, তবুও মূলত এই দুটি ভাষাই ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য এখন ল্যাটিন ভাষার হরফ ব্যবহার করবার কথা ভাবা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি ল্যাটিন ব্যবহারের পক্ষপাতী। আমরা এখন আধুনিক এক পৃথিবীতে বাস করি, কাজেই বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন এবং আমরা পছন্দ করি বা না করি, আমাদের ল্যাটিন হরফ আয়ত্ত করতেই হবে। আমরা যদি সারা ভারতবর্ষে ল্যাটিন হরফের ব্যবহার চালু করতে পারি তা হলে আমাদের সেই সমস্যার সমাধান হবে। তবে এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মীরাও সেই মত পোষণ করেন।

আমি স্বাধীন ভারতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা উল্লেখ করেছি: জাতীয় প্রতিরক্ষা, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে হলে আমাদের কী করা প্রয়োজন? আমরা কি বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর সেই ভার ছেড়ে দেব নাকি সরকার এই সমস্যাগুলির সমাধানের দায়িত্ব নেবে?

বর্তমানে এই সমস্যাগুলি জাতীয় সমস্যা, এর সমাধানের দায়িত্ব আমরা ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর ছেড়ে দিতে পারি না, বিশেষত অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে দারিদ্র্য ও বেকারত্বের সমস্যার সমাধান করার কথা ভাবি, তা হলে তা ঘটতে হয়তো শতাব্দী কেটে যাবে। কাজেই ভারতের জনসাধারণের অভিমত হল একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বেছে নেওয়া, যেখানে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানের দায়িত্ব কোনও ব্যক্তি বিশেষের উদ্যোগের উপরে ছেড়ে না দিয়ে সরকার সেই দায়িত্ব নেবে। কাজেই ভারতকে বৃহৎ শিল্পভিত্তিক দেশে পরিণত করা বা দেশের কৃষিকর্ম পদ্ধতির আধুনিকীকরণ, সব কাজগুলিতেই আমরা চাই আমাদের সরকারি ব্যবস্থা সেই দায়িত্ব নিক এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করুক যাতে দেশের মানুষ যত দ্রুত সম্ভব স্বাবলম্বী হতে পারে।

কিন্তু এই সমস্যাগুলির সমাধানের কাজ আমরা করতে চাই আমাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতিতে। অন্য দেশে এই সমস্যার সমাধানে তারা কী পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে তা আমরা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখব— কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতীয় পদ্ধতিতে, এবং ভারতীয় পরিস্থিতিতে যা করা সম্ভব তার ভিত্তিতেই আমাদের সমাধান খুঁজতে হবে। তার ফলে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, সেটা হবে এক ভারতীয় ব্যবস্থা যা ভারতীয়দের প্রয়োজন মেটাতে পারবে।

এখন ভারতীয় জনসাধারণ যাদের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমরা যদি অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করতে না পারি তা হলে দেশে এক বিভ্রান্তিময় ও জটিল অবস্থার সৃষ্টি হবে যা আমরা আজ চিন দেশে দেখেছি। আপনারা জানেন যে চিন

আজ কুয়োমিনটাং ও চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত। ব্যক্তিগতভাবে আমার জানা নেই কেন এই ঘটনা ঘটল, অথবা কুয়োমিনটাং পার্টি যদি চিনা জনসাধারণের কথাই মূলত চিন্তা করত তা হলে কমিউনিস্ট পার্টির মতো বিদেশি প্রভাবে প্রভাবান্বিত আরেকটি স্বতন্ত্র দলের প্রয়োজন হত কি না।

অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে। তার ফলে চিনের মতো একই ভুল আমরা করতে চাইব না। আমাদের প্রজন্মের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সর্বদাই সাধারণ মানুষ, কৃষক ও শ্রমিক— অর্থাৎ ৯০ শতাংশ মানুষের স্বার্থে কাজ করেছে, সেইজন্য আমরা দেখছি এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টির মতো স্বতন্ত্র কোনও রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন ঘটবে না। তা যদি না হত, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কর্মীরা যদি সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ না করত তা হলে আজ চিনে আপনারা যা দেখছেন আমাদের দেশেও সেই একই ঘটনা ঘটত।

এবার আমরা আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই— রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা বা সরকারের বিষয়ে। আমরা যদি একটা সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে আমাদের দেশের অর্থনীতির কাঠামো গড়ে তুলতে চাই তা হলে আমাদের এমন একটা শাসনব্যবস্থা প্রয়োজন যা সর্বাধিক দক্ষতার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রকল্পগুলি পরিচালনা করতে পারবে। সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে যদি দেশে অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে হয় তা হলে তথাকথিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তা সম্ভব হবে না। অতএব আমাদের অবশ্যই এমন একটা সরকার প্রয়োজন— যার চরিত্র হবে কর্তৃত্বপরায়ণ।

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে এবং ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলির গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাও আমরা বিবেচনা করে দেখেছি। এবং আমরা যে সিদ্ধান্তে এসেছি তা হল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের সমস্যার সমাধান করতে পারব না। সুতরাং আধুনিক ও প্রগতিশীল চিন্তাবিদরা মনে করছেন যে ভারতবর্ষে এমন একটি কর্তৃত্বপরায়ণ সরকার প্রয়োজন যারা জনসাধারণের কর্মসম্পাদনের মাধ্যম বা তাদের সেবক হিসাবে কাজ করবে, কোনও বিশেষ দলীয় বা ধনী ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হবে না।

স্বাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে এইটাই আমাদের বর্তমান চিন্তাভাবনা। আমাদের এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে যারা জনসাধারণের সেবকের ভূমিকায় কাজ করবে ও স্বাধীন ভারতের শিল্প, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংস্কার ও সংশোধনের জন্য যা প্রয়োজন তা করার জন্য তাদের পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।

এর পরবর্তী সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করবার আগে ধর্ম ও জাতিপ্রথা সম্বন্ধে স্বাধীন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি আমি উল্লেখ করতে চাই। এই প্রশ্ন প্রায়ই আমাদের কাছে উত্থাপিত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে বহু ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। সুতরাং স্বাধীন ভারতের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং সর্ব ধর্মের প্রতি পক্ষপাতশূন্য হবে। প্রতিটি মানুষ যাতে তাঁদের বেছে নেওয়া ধর্মের পথ অবলম্বন করতে পারেন সরকারকে সেই বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।

জাতিপ্রথার কথা বলতে হলে, আমি বলব জাতিপ্রথা আজকের দিনে কোনও সমস্যা নয়, কারণ অতীতে আমাদের সমাজে জাতিপ্রথার যে ভূমিকা ছিল, আজকের দিনে আর তা নেই। জাতিপ্রথা কী? এর অর্থ হল বিভিন্ন পেশা বা জীবিকার ভিত্তিতে সমাজকে কয়েকটা গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছিল এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ শুধুমাত্র নিজ নিজ গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

আজকের আধুনিক ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সেই পার্থক্য আর নেই। যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও কাজ পেশা রূপে গ্রহণ করতে পারেন, কাজেই সেই অর্থে জাতিপ্রথার ভিত্তি আজকের ভারতবর্ষে নেই। বৈবাহিক সম্বন্ধের কথায় আসি। আগের দিনে জাতির মধ্যেই বিবাহাদি সম্পন্ন হত। কিন্তু এখন ভিন্ন জাতির সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। সুতরাং জাতির মধ্যে ভেদাভেদ মুছে যাচ্ছে দ্রুত। বস্তুত আমাদের জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কখনও জাতির কথা জিজ্ঞাসা করা হয় না এবং আমাদের কিছু কিছু ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর জাতি কী সেটা আমাদের জানাও নেই, যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে আমাদের প্রজন্মে আমরা জাতি নিয়ে একেবারেই চিন্তা করি না। স্বাধীন ভারতে অতএব জাতিপ্রথা নিয়ে কোনও সমস্যা থাকবে না।

এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদের জানাতে চাই যে ব্রিটিশ সমগ্র পৃথিবীতে এই ধারণার সৃষ্টি করেছে আমরা নিজেদের মধ্যে সর্বদাই আভ্যন্তরীণ কলহে মত্ত, বিশেষত ধর্মের বিষয়ে। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেটা একেবারেই একটা অসত্য চিত্র। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে হয়তো কিছু বিভেদ আছে, কিন্তু সেই বিভেদ আপনারা যে-কোনও দেশের যে-কোনও সমাজেই দেখতে পাবেন। জগতের তথাকথিত প্রগতিশীল দেশগুলির উদাহরণ যদি আমরা দেখি, যেমন বর্তমান যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ের ফ্রান্স, বা হিটলার ও তাঁর পার্টি ক্ষমতায় আসার আগেকার জার্মানি, তা হলে সেখানেও আপনারা দেখবেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে তীব্র বিভেদ ছিল। এমনকী, স্পেনে তো একটা বড় আকারের গৃহযুদ্ধ ঘটেছিল। কিন্তু এমন কথা তো কেউ কখনও বলে না যে এই দেশগুলির জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ আছে, তাই তাদের স্বশাসনের ক্ষমতা নেই। শুধু ভারতেরই ক্ষেত্রে ব্রিটিশের বক্তব্য হল যে এই দেশের মানুষের মধ্যে এই বিভেদগুলি থাকার ফলে তারা স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নয়। কিন্তু আসল কথা হল আমাদের জনসাধারণের মধ্যে যে বিভেদগুলি আছে, তার অধিকাংশই ব্রিটিশ সরকারের সৃষ্ট। ব্রিটিশ শাসনকালের ইতিহাসে হাজারও উদাহরণ আছে যা আপনাদের কাছে স্পষ্টই প্রমাণ করে দেবে যে ভারতবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য ব্রিটিশ সর্বপ্রকারে চেষ্টা করেছে। এবং সেই কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টির জন্য এত চেষ্টা করার পরে এখন তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলছে যে আমরা স্বাধীনতা পাবার যোগ্য নই।

সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। রাশিয়া একটি আধুনিক শক্তিশালী দেশ এবং সেখানে কত বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন জাতির লোকের বসবাস। আপনারা চিন্তা করে দেখবেন যে সেখানকার জনসমাজ এই ধরনের মিশ্র জাতি দ্বারা গঠিত হওয়া সত্ত্বেও একটি মূল রাজনৈতিক শাসনের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হতে ও এত ক্ষমতাশালী জাতিতে পরিণত হতে তাদের কোনও বাধা হয়নি। তুলনামূলকভাবে ভারতবর্ষের জনসমাজে এতগুলি জাতি বা ধর্মের মিশ্রণ হয়নি, কাজেই এই দেশকেও একই শাসনের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ করতে না পারার কোনও কারণ নেই। এবং আপনারা দেখবেন ব্রিটিশ শাসনের আওতার বাইরে বিদেশে ভারতীয়দের মধ্যে কোনও বিভেদ নেই। পূর্ব এশিয়াতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এবং ভারতের জাতীয় সেনাদলেও ধর্ম, জাতি বা শ্রেণির একেবারেই কোনও ভেদাভেদ নেই। এটা শুধুমাত্র ভারতের অভ্যন্তরে, যেখানে ব্রিটিশ শাসন করছে ও নিয়ন্ত্রণ করছে, সেখানেই এই বিভেদগুলি দেখতে পাওয়া যায়।

জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে, আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে একটি বন্ধুজনোচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করব। ব্রিটিশ শাসকের প্রচারযন্ত্র সারা পৃথিবীতে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করবার চেষ্টা

করছে যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে সে দেশের মুসলমানদের সমর্থন নেই। এটা সম্পূর্ণ অসত্য। অনেক সময়েই আপনারা খবরের কাগজে মুসলিম লীগ বা হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কথা পড়ে থাকবেন। ব্রিটিশ শাসকেরা এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশেষভাবে ইন্ধন জোগাচ্ছে, কারণ এরা নীতিগতভাবে ব্রিটিশরাজের সমর্থক ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী। ব্রিটিশ আরও প্রাচর করছে যে ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করে মুসলিম লীগ। আসল কথা হল মুসলিম লীগ ও তার নেতা মিস্টার জিন্না মুষ্টিমেয় কিছু ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি। ভারতের অধিকাংশ মুসলমান জাতীয়তাবাদের নীতিতে বিশ্বাসী ও তারা অন্য সকলের মতোই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট একজন মুসলমান এবং কংগ্রেসের বহু সদস্যও তাই, যাদের মধ্যে অনেকেই এখন জেলে বন্দি।

এই তথ্যগুলি বাইরের জগতের কাছে অজানা। তাই বাইরের জগৎ মনে করে মিস্টার জিন্না ভারতীয় মুসলমানদের সমগ্র সম্প্রদায়ের মুখপাত্র এবং তারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করে না। আমি ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্রের এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আপনাদের সতর্ক করে দিতে চাই।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে কী ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শাসনধারা আমরা এ দেশে অনুসরণ করতে চাই সেই বিষয়ে আমি আপনাদের আগেই বলেছি। এর ফলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে যে তা হলে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারাটি কী? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আমার অভিমত জানিয়েছি দশ বছর আগে আমার লেখা 'The Indian Struggle' নামে একটি বইতে। সেই বইতে আমি লিখেছি যে আমাদের কাজ হল পৃথিবীর অন্যত্র যে শাসন প্রণালীগুলি চালু আছে তার সংমিশ্রণে ভারতবর্ষে একটা শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি ফ্যাসিজ়ম (যাকে ন্যাশনাল সোশ্যালিজ়ম বলা যেতে পারে) ও কমিউনিজ়মের মধ্যে যে বিষয়গুলিতে গুরুতর মতবিরোধ আছে সেগুলিকে একপাশে সরিয়ে রাখতে পারি তা হলে দুই পদ্ধতির ইতিবাচক দিকগুলিকে বেছে নিয়ে তার সংমিশ্রণে একটা শাসনব্যবস্থা চালু না করার কোনও কারণ আমি দেখি না। শুধুমাত্র নির্বোধেরাই এমন কথা ভাবতে পারে যে ফ্যাসিজ়ম বা কমিউনিজ়মের মধ্যে যে কোনও একটা শাসনপদ্ধতিতে পৌঁছবার পরে মানুষের বিচারবুদ্ধির বিকাশ স্তব্ধ হয়ে গেছে। দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র হিসাবে আপনাদের স্বীকার করতেই হবে যে মানুষের বিচারবুদ্ধির বিকাশ কখনওই স্তব্ধ হয় না ও বিশ্বের পুরাতন শাসনপদ্ধতিগুলির অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করতে হবে। সুতরাং ভারতবর্ষে আমরা বিরোধী মতানুসারী এই দুটি শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণের চেষ্টা করব এবং উভয়ের উৎকৃষ্ট অংশগুলি আমরা গ্রহণ করব।

এবার আমি ন্যাশনাল সোশ্যালিজ়ম ও কমিউনিজ়মের গ্রহণযোগ্য উপাদানগুলির একটা তুলনামূলক আলোচনা করতে চাই। আপনারা লক্ষ করবেন যে দুটি ব্যবস্থার মধ্যে কিছু কিছু সমতুল্য উপাদান আছে, যেমন উভয় পদ্ধতিই অগণতান্ত্রিক ও সমগ্রতাবাদী (টোটালিটারিয়ান) এবং উভয়েই পুঁজিবাদের বিরোধী। এই বিষয়গুলিতে সাদৃশ্য থাকলেও অন্য বিষয়ে তাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে। বর্তমানের ইউরোপে আমরা যে ন্যাশনাল সোশ্যালিজ়ম দেখছি, তা সেখানকার জাতীয় জীবনে ঐক্য ও সংহতি এনেছে ও সাধারণ মানুষের জীবনের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করেছে। কিন্তু পুঁজিবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেখানে চালু ছিল তাতে কোনও মৌলিক পরিবর্তন আনা তাদের

পক্ষে সম্ভব হয়নি। অপরপক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিজ়মের ভিত্তিতে যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তার মূল্যায়ন করলে আমরা দেখব তারা যে ব্যাপারে বিশাল সাফল্য পেয়েছে, সেটা হল তাদের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। কিন্তু কমিউনিজ়ম সে দেশের জাতীয়তাবোধের অনুভূতিকে যথার্থ মূল্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে। আমরা ভারতবর্ষে এমন একটা প্রগতিশীল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে চাই যা সমগ্র জাতির সামাজিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে পারবে এবং আমাদের জাতীয়তাবোধের অনুভূতির উপরে থাকবে তার ভিত্তি। অর্থাৎ তা হবে দেশাত্মবোধ ও সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ। এই শাসন ব্যবস্থা বর্তমান জার্মানির ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টরাও গড়ে তুলতে পারেনি।

কয়েকটি বিষয় আছে যেখানে ভারত সোভিয়েত রাশিয়াকে অনুসরণ করতে চায় না। প্রথমত ভারতবর্ষে শ্রেণিসংগ্রাম সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। স্বাধীন ভারতের সরকার যদি জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে শুরু করে তা হলে শ্রেণিসংগ্রামের কোনও প্রয়োজন থাকবে না। সরকারকে জনসাধারণের সেবক হিসাবে গড়ে তুলতে পারলে আমাদের সমস্যা আমরা সমাধান করতে পারব।

সোভিয়েত রাশিয়াতে আরও একটা বিষয় অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং সেটা হল শ্রমিক শ্রেণির সমস্যার উপরে। ভারত হল প্রধানত কৃষিনির্ভর স্বল্পবিত্তের চাষিদের দেশ, শ্রমিক শ্রেণির সমস্যাগুলির থেকে স্বল্পবিত্তের চাষিদের সমস্যাগুলিই এখানে প্রাধান্য পাবে।

আরও একটা বিষয় আছে যেখানে আমরা সম্পূর্ণ একমত নই, তা হল মার্কসের তত্ত্ব অনুসারে মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুত্ব আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করি, যদিও এক সময়ে তা উপেক্ষা করা হত। কিন্তু তার উপরে অনাবশ্যক জোর দেবার প্রয়োজন নেই।

এবারে তা হলে আমাদের আলোচনার প্রধান বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি করি— আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা হবে ন্যাশনাল সোশ্যালিজম ও কমিউনিজম-এর সংমিশ্রণে গড়া। উচ্চতর স্তরে সংমিশ্রণের মাধ্যমে যুক্তি ও বিপরীত যুক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব দূর করতে হবে। 'Law of Dialectic' সেটাই দাবি করে থাকে এবং তা যদি না করতে পারা যায় তা হলে মনুষ্যজাতির অগ্রগতিই স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেই কারণে ভারতবর্ষে আমরা রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করব।

এবারে আমি আমার আলোচনার শেষ বিষয়টি— আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থার বিষয়ে আমাদের চিন্তাধারার কথা বলব। এই বিষয়ে আমি ইতিমধ্যেই টোকিওতে কয়েকবার আলোচনা করেছি। যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে, স্বাধীনতা, ন্যায়নীতি ও পারস্পরিক আদানপ্রদানের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত পূর্ব এশিয়ার নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে তার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধানে আমার ব্যক্তিগত আগ্রহ আছে কারণ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমর্থন পাবার জন্য আমি বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কাজ করবার চেষ্টা করেছি এবং সেই সূত্রে আমার লীগ অফ নেশনস বা জাতিসঙ্ঘের কাজকর্ম পর্যালোচনা করবারও সুযোগ হয়েছিল।

লীগ অফ নেশনস-এর প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি, এবং কেন সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল সেই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা কাম্য ও তাতে সুফল পাওয়া যেতে পারে। কেন ব্যর্থ হল এই প্রশ্ন করা হলে আমি তার উত্তরে বলব ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা, এই তিনটি উদ্যোক্তা

দেশের স্বার্থপর মনোভাব ও দূরদৃষ্টির অভাবই ব্যর্থতার কারণ। আমেরিকা লীগ পরিত্যাগ করবার পরে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সই ছিল লীগের নিয়ন্ত্রক শক্তি। দুর্ভাগ্যক্রমে এই দু'টি দেশ অন্য সদস্য দেশগুলির কাছে নিঃস্বার্থ আচরণের উদাহরণ উপস্থাপন করার পরিবর্তে তাদের নিজস্ব সুবিধা ও স্বার্থে লীগ অফ নেশনসকে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে শুরু করল। আমরা যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন রাজনৈতিক আবহ গড়ে তুলতে চাই তা হলে তা হতে পারে শুধুমাত্র স্বাধীনতা, ন্যায়নীতি ও পারস্পরিক আদানপ্রদানের ভিত্তিতে। সেই জন্য আমার মতে পূর্ব এশিয়াতে যে কাজ শুরু হয়েছে তার ভিত্তি ও লক্ষ্য অভ্রান্ত। এখন যৌথ ঘোষণায় নীতিগতভাবে আমরা যা করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যা তাতে বাস্তবে রূপায়িত হয় সেটা নিশ্চিত করাই হবে আমাদের দায়িত্ব। যদি তা করতে পারা যায় তা হলে বলব আমাদের প্রচেষ্ট সফল, এবং যদি না করতে পারি তা হলে প্রচেষ্টা আবারও ব্যর্থ হয়েছে বলে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে।

আমার বক্তৃতায় এবং সাংবাদিকদের কাছে দেওয়া বিবৃতিতে আপনারা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে আমি এই যৌথ ঘোষণা সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী ও আশাবাদী। এর কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত যে কাজ শুরু হয়েছে তার ভিত্তি ও লক্ষ্য অভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত, বিশ্বে একটা রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি করতে হলে কোনও একটা বিশেষ অঞ্চলে তার প্রথম সূত্রপাত করা প্রয়োজন এবং সেই অঞ্চলে সাফল্য পেলে তখন তা ধীরে ধীরে বিশ্বের সর্বত্র বিস্তার করা যাবে। তৃতীয় কারণটি হল আমি দেখেছি আমাদের এই প্রস্তাব বা পরিকল্পনা এই দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সমর্থন পেয়েছে, বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে। যদি আমি দেখতাম যে আমাদের এই নতুন রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার পরিকল্পনায় কেবল কিছু রাজনীতিবিদ বা নেতাদের উৎসাহ আছে কিন্তু দেশের সাধারণ জনসমাজ হয় এর বিরুদ্ধে অথবা তারা এই বিষয়ে নিরুৎসাহী তা হলে নিশ্চয় ভাবে আমিও এতটা আশাবাদী হতাম না। কিন্তু যখন দেখছি জনসাধারণ ও বিশেষ ভাবে যুবসম্প্রদায় এই বিষয়ে আগ্রহী ও তারা উৎসাহভরে এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করছে, তাতে আমার বিশ্বাস যে নেতা, জনসাধারণ ও যুবসম্প্রদায়— সকলের সহযোগিতায় আমরা এই পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারব।

আমি আবারও আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই কাজ এদেশের সরকারের ও জনসাধারণের উপরে এক অপরিসীম দায়িত্ব দিয়েছে। আপনারা জানেন যে আপনাদের সরকার এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা, কাজেই আপনারা উদ্যোগী দেশ হিসেবে কী উদাহরণ স্থাপন করলেন তার উপরে এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করবে। লীগ অব নেশনস ব্যর্থ হয়েছিল সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগী দেশগুলির দূরদৃষ্টির অভাবে ও স্বার্থপতার কারণে। কিন্তু এইবারে যে দেশগুলি একযোগে এই পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করছে তারা, এবং বিশেষভাবে উদ্যোগী দেশটি যদি স্বার্থশূন্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নীতি অনুসরণ করতে পারে তা হলে পরিকল্পনা সফল না হবার কোনও সংগত কারণ নেই।

পরিকল্পনার উদ্যোগী দেশ হিসাবে জাপান এক বিশাল দায়িত্ব নিয়েছে সে কথা আমি আরও একবার জোর দিয়ে বলতে চাই। এবং যখন আমি দেশের দায়িত্বের কথা বলছি, তখন আমি এদেশের যুবসম্প্রদায়ের দায়িত্বের বিষয়ে জোর দিতে চাই কারণ আজকের যুবক-যুবতীদের মধ্যে থেকেই আগামী দিনের নেতারা আসবেন। যে কোনও চিন্তা, ভাবনা যা আজকের যুবক-যুবতীরা স্বাগত জানাচ্ছেন ও উৎসাহভরে সমর্থন করছেন, সেই চিন্তা, সেই

ভাবনা একদিন সমগ্র দেশ সমর্থন করবে। অপরপক্ষে যা আজকের যুবসম্প্রদায়ের কাছে সমর্থন পাবে না, তা আপনা থেকেই পরিত্যক্ত হবে। সুতরাং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার দায়িত্ব এই দেশের যুব সম্প্রদায়ের হাতেই অর্পিত হচ্ছে। আমার একান্ত আশা, প্রার্থনা ও বিশ্বাস, জাপান যে এই উদ্যোগ নিয়েছে তার সুবিশাল নৈতিক দায়িত্বের কথা এই দেশের আগামী দিনের প্রতিনিধি আজকের ছাত্র ও যুবক-যুবতীরা সম্যক উপলব্ধি করবেন।

অনেকেরই হয়তো সংশয় হবে যে-কোনও দেশ বা জাতি কি সেই সুবিশাল নৈতিক দায়িত্বভার নিতে পারবে, কোনও দেশে বা জাতি কি যথেষ্ট স্বার্থশূন্য ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হতে পারবে যা তাদের নতুন এই রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে? মনুষ্যজাতির ক্ষমতার উপরে আমার অগাধ আস্থা আছে। যদি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিঃস্বার্থে কাজ করা সম্ভব হয়, যদি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে উচ্চতর মানের নৈতিক জীবনযাপন সম্ভব হয় তা হলে সমগ্র জাতি কেন সেই উচ্চতর মানে পৌঁছাতে পারবে না, এর কোনও কারণ আমাদের জানা নেই। বিশ্বের ইতিহাসে আমরা এমন উদাহরণ দেখেছি যেখানে বিপ্লব সমগ্রদেশের মানসিকতা বদলে দিয়েছে এবং একটা পুরো জাতির নৈতিকতার মান তুলে দিয়েছে তুঙ্গে। সুতরাং সমগ্র দেশ বা জাতির নৈতিকতার মান সেই স্তরে উঠতে পারে কিনা সেই বিষয়ে কারুর মনে যদি সংশয় থাকে, তা হলে আমি বলব আমি তাদের সঙ্গে একমত নই, আমার মনে কোনও সংশয় নেই।

সব শেষে আমি আবার বলব আপনারা উদ্যোগী দেশের নাগরিক, কত বড় দায়িত্ব আপনারা কাঁধে নিয়েছেন সেই উপলব্ধি আপনাদের থাকা উচিত। এই কাজ শুধু রাজনীতিবিদ বা নেতাদের নয়। এই কাজ সমগ্র দেশের, বিশেষভাবে তাদের যারা দেশের আশা-ভরসা-ভবিষ্যৎ— অর্থাৎ ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের।

৫৪

ভারতবর্ষের অদৃষ্ট

[সিঙ্গাপুরে বক্তৃতা, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪][১]

টোকিও থেকে ফিরে আসার পরই নেতাজি সায়োনানে আসেন। জুলাই মাসে বর্ষা নামার ফলে আই এন এ-র পিছু হটে আসার পরে মালয়ের জনগণের মধ্যে যে হতাশার ভাব দেখা দিয়েছিল তার নিরসন ও নতুন উৎসাহের সঞ্চারই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সায়োনানে পৌঁছবার পর, ডিসেম্বর মাসের ১৭ তারিখে নেতাজি ভারতীয়দের এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিলেন যেখানে তিনি পূর্ববর্তী বছরের ঘটনাবলী ও আই এন এ-র পিছু হটে আসার বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: বিগত এক বছরে আমরা বহু সাফল্য অর্জন করেছি। গত বছরের অক্টোবর মাসে আমাদের আপৎকালীন সরকার গঠন ছিল আমাদের সাফল্যের প্রথম সোপান। যখন আমাদের মুক্তিসেনানী সায়োনান থেকে দিল্লি অভিমুখে তাদের যাত্রা শুরু করেছিল তখন সংশয়ান্বিত ভারতীয়েরা ভাবছিলেন কোনও সরকারের অধীনে আমরা আমাদের সংগ্রামে রত রয়েছি এবং আমাদের জয় কাদের জয় বলে চিহ্নিত হবে। ইতিহাসের পাতায় এমন আপৎকালীন সরকার গঠনের অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু আমাদের এই আপৎকালীন সরকার এই কারণে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র যে বিশ্বের আরও নয়টি শক্তিশালী রাষ্ট্রের কাছ থেকে সেই সরকার স্বীকৃতি পেয়েছিল। অন্য কোনও বিপ্লবী সরকার আজ পর্যন্ত এমন সম্মান পায়নি। এই রাষ্ট্রগুলির চোখে ভারতবর্ষ এখন আর একটি বিদেশি শক্তির কাছে পদানত দাস রাষ্ট্র নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা বহুবিধ বিপ্লবের কথাই পড়েছি। তার মধ্যে আয়ারল্যান্ডের উদাহরণ যদি আমরা চিন্তা করি, তা হলে দেখব আইরিশ জনগণও তাদের আপৎকালীন সরকার গঠন করেছিল। কিন্তু আমাদের আপৎকালীন সরকার বিশ্বের কাছে যে সম্মান পেয়েছে তাদের সরকার কোনও দিনও সেই সম্মান অর্জন করতে পারেনি। আইরিশদের সংগ্রামে আমেরিকার সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। ডি ভ্যালেরা আমেরিকায় গিয়েছিলেন তাদের সাহায্য চাইতে। তিনি অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন কিন্তু সম্মান পাননি এবং ফিরে এসেছিলেন নিরাশ হয়ে। আমাদের আপৎকালীন সরকার যে সম্মান পেয়েছে তার মূল কারণই হল যে এই সরকার বিশ্বের আরও নয়টি দেশের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভারতের ইতিহাসে মালয়ের ভারতীয় ভাইবোনদের একটি সম্মানের আসন থাকবে কারণ এই সায়োনানেই আজ়াদ হিন্দ ফৌজের জন্ম, এই সায়োনানেই আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। এবং এই সায়োনান থেকেই দিল্লি অভিমুখে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের যাত্রা শুরু হয়েছে। আশা করি সায়োনানের কাছ থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আমরা এই সাহায্য পেতে থাকব।

---

১. Challo Delhi, pp. 207-213

আমি যখন রেঙ্গুনে ছিলাম তখন আমার কাছে খবর আসে যে মালয় ও সায়োনানের জনগণের মধ্যে বিপ্লবের উৎসাহ ঝিমিয়ে আসছে। তা সত্য কিনা জানবার জন্য আজ আমি এখানে এসেছি। যদি সত্য হয় তা হলে আমি বলব সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের যুদ্ধে যোগ দিয়েছি, সেটা ছেলেখেলা নয়। সেটা ৩৮ কোটি ভারতবাসীর জীবনমরণের বিষয়। হয় আমরা বীরের মতো সেই যুদ্ধ করব নয় আমরা মৃত্যুবরণ করব। আমি জানি সায়োনানে ব্রিটিশ এজেন্টরা রয়েছে। যখন ব্রিটিশ এখান থেকে পিছু হটেছে তখন তারা এই এজেন্টদের রেখে গেছে মিথ্যা প্রচার ও গুজব ছড়াবার জন্য। কিন্তু আমরা ভারতীয়রা তাদের নিয়ে মাথা ঘামাব না। আমাদের জন্য একটা পথই খোলা আছে এবং সেই পথ দিল্লি অভিমুখী। সেখানে আপোষের কোনও প্রশ্ন ওঠে না। শত্রুপক্ষের এই এজেন্টরা আমাদের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু আমাদের হৃদয়মনের মধ্যে একটাই চিন্তা খোদাই করা আছে, তা হল ভারত ও তার স্বাধীনতা।

আমার সঙ্গে আজ আমি আমাদের ডিভিশনাল কমান্ডার কর্নেল এম জেড কিয়ানিকে এনেছি যিনি আরাকান ও ইম্ফলের যুদ্ধ সম্পর্কে সর্বাধুনিক খবরাখবর দিতে পারবেন। আমি অন্য কমান্ডারদেরও সঙ্গে করে আনতে পারতাম কিন্তু সকলের পক্ষে এখানে আসা তো সম্ভব নয়।

এখানে আসার আগে আমি টোকিওতে গিয়েছিলাম। নতুন ক্যাবিনেটের সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগসূত্র গড়ে তোলা ছাড়াও জাপানের সরকার এবং সেনা ও নৌবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করাই ছিল আমাদের এই সফরের উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় বিষয়েই আমাদের আলোচনা হয়েছে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে এবং আমরা সব প্রশ্নের মীমাংসায় পৌঁছাতে পেরেছি। সামরিক বিষয়গুলি আমি অবশ্যই আলোচনা করতে পারছি না কারণ আমাদের সামরিক গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হবে যা আমাদের অবস্থাকে সুদৃঢ় করবে এবং তার ফলে আমরা সহযোগিতায় যুদ্ধের কাজ চালিয়ে যেতে পারব সাফল্যের সঙ্গে।

গত বছরে ডিসেম্বরের শেষে আমি আন্দামান সফরে গিয়েছিলাম। ৩০ ডিসেম্বর আমি ব্রিটিশ চিফ কমিশনারের সরকারি বাসভবনে আমাদের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছি। নিপ্পনের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পরে স্থির হয় যে সেখানে আপৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে একজন কমিশনারকে নিয়োগ করা হবে এবং সেই কথা মতো কর্নেল এ ডি লোগানাদানকে চিফ কমিশনারের পদে নিয়োগ করে আন্দামানে পাঠানো হয়। জানুয়ারি মাসে আমি রেঙ্গুনে যাই এবং সেই সময় আমাদের সেনাবাহিনী ও লীগের প্রধান দপ্তরও রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসের ৪ তারিখে আরাকানে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়। আরাকানের এই যুদ্ধ ছিল একটা ছোট মাপের লড়াই কিন্তু এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি কারণ সেটা ছিল আমাদের মুক্তিসেনানীর প্রথম পরীক্ষা। এর আগে আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে কারুরই বিশেষ কিছু জানা ছিল না। বিশ্ব যে তাদের শক্তিমত্তায় আশ্চর্য হয়েছিল তাতে আমরা বিস্মিত হইনি, কিন্তু ফৌজের শক্তির উপরে যাদের আস্থা ছিল না তারাই অবাক হয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হবার আগে নিপ্পনের সেনা কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন তুলেছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানি ফৌজের পাশাপাশি যুদ্ধের সব কষ্ট সহ্য করতে পারবে কি না। সেনাধ্যক্ষদের বলা হয়েছিল যে তাঁরা যেন আগে তাঁদের অফিসার ও সেনাদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হবার পরে তবেই এই প্রশ্নের উত্তর দেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের এই

প্রশ্ন করা হলে তারা একবাক্যে উত্তর দিয়েছিল যে নিপ্পনের সেনারা যত কষ্ট সহ্য করতে পারে আমাদের সেনারা ততটা তো বটেই, তার থেকে বেশি কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত কারণ তাদের জানা ছিল যে, এই লড়াই তাদের স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য লড়াই। আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও জাপানের সেনাধ্যক্ষদের মনে সংশয় ছিল। সেই জন্য আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের বীরত্বের সঙ্গে শত্রুদের মুখোমুখি হতে দেখে তারা সকলেই খুব অবাক হয়েছিল।

এই যুদ্ধ যে জাপানের একার যুদ্ধ নয়। এ হল ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমাদের জাতীয় সংগ্রাম। আমাদের ভারতবর্ষে আমাদের কাছে তার গুরুত্ব অপরিসীম কারণ সেই যুদ্ধে আমাদের সেনানী প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৮ মার্চ আপৎকালীন সরকার ঘোষণা করে যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ ভারত-বর্মার সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে লড়াই করছে। মার্চ মাসে আমাদের অগ্রগতি এমন দ্রুতবেগে হয়েছিল যে ইম্ফলে আমাদের আক্রমণ দেরিতে হওয়ার জন্য বিস্মিত প্রশ্ন উঠেছিল যে ইম্ফল কীভাবে এখনও আমাদের আক্রমণ প্রতিহত করে চলেছে। যারা প্রশ্ন করছিল তাদের প্রতি আমি বিরক্ত বোধ করেছিলাম। এরা হল সেই সব ব্যক্তি যারা প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে তাদের নিজের ঘরের সুরক্ষায় বসে এই প্রশ্নগুলি করছিল। যুদ্ধের বিষয়ে যাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তারা এই ধরনের প্রশ্ন করবে না। কেবলমাত্র সামরিক পর্যবেক্ষকরাই ইম্ফল ও চট্টগ্রামের অবস্থানগত গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করতে পারবেন। যদি এই শহরগুলির সামরিক গুরুত্ব না থাকত তা হলে আমরা আরও আগেই এই শহরদু'টি অধিকার করে নিতে পারতাম। ভারতের পূর্ব সীমান্ত বরাবর সামরিক প্রতিরক্ষা ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইনের মতো। যতক্ষণ এই সীমান্তের প্রতিরক্ষা অটুট থাকবে ততক্ষণ ব্রিটিশ নিরাপদ কিন্তু একবার এই প্রতিরক্ষার ব্যূহ ভেদ করতে পারলে আমাদের সেনা দিল্লি অভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হতে পারবে অনায়াসে।

প্রতিটি যুদ্ধের ক্ষেত্রেই একটা কৌশলগত সময় ও ক্ষণ থাকে যা থেকে নির্ধারিত হয় যুদ্ধের গতি কোন দিকে যাবে। ভারতবর্ষের পূর্ব ইতিহাস যাদের জানা আছে তারা ভালভাবেই জানেন যে সর্বদা পানিপথেই ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু এবারকার এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের ভাগ্য স্থির হবে ইম্ফল ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী কোনও অরণ্যে। এই পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে একবার শত্রুপক্ষের প্রতিরক্ষা ভেদ করে বাংলাদেশ ও আসামের সমতলে পৌঁছতে পারলেই দিল্লি যাবার পথ আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং শত্রুপক্ষ সংগত কারণেই এই অঞ্চলে তাদের ব্যূহকে সুদৃঢ় করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। ইউরোপে ম্যাজিনো লাইনের প্রতিরক্ষা ভেঙে অগ্রসর হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফ্রান্সের পতন হয়েছিল। সুতরাং ইম্ফল ও চট্টগ্রামের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারলেই বাংলাদেশে আর কোনও যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকবে না ও কলকাতা অভিমুখে আমাদের অভিযান হবে অনায়াস ও রুটিন মাফিক।

ইম্ফল ও চট্টগ্রামের যুদ্ধ ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করবে, সে কথা আমি এই মাত্র আপনাদের বলেছি। আমরা যেন তেন প্রকারেণ এই দু'টি শহরের উপর আমাদের দখল রাখার চেষ্টা করব, সে জন্য যদি আমাদের দশবার আক্রমণ করতে হয় তবুও, কারণ এদের অবস্থানগত গুরুত্ব অসাধারণ। ইম্ফল থেকে পিছু হটে আসায় লোকে হতাশ হয়েছে এবং তারা আমাদের মতামত জানতে চেয়েছে। আমি তাদের বলেছি মনের মধ্যে সংশয় রাখার কোনও কারণই নেই। পথ আমাদের জানা আছে এবং আমরা সেই পথ থেকে বিচ্যুত হব না যতদিন না আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি।

বন্ধুরা, ইম্ফল ও চট্টগ্রামের গুরুত্ব আমাদের উপলব্ধি করতে হবে ও এই শহর দু'টি দখল করবার জন্য যে-কোনও ত্যাগ স্বীকারের জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। একবার যদি আমরা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ এই শহর দু'টিকে আমাদের দখলে আনতে পারি তা হলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে ও সমগ্র ভারতে তার একটা বিশাল প্রভাব দেখা যাবে। ভারতের পরিস্থিতি আমাদের সকলেরই ভালভাবে জানা আছে এবং আমরা জানি যে এমন কোনও ভারতীয় নেই যে ব্রিটিশদের পছন্দ করে। প্রতিটি ভারতবাসী ব্রিটিশদের ঘৃণা করে এবং মুষ্টিমেয় ক'জন যদি ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকে তা হলে তারা করেছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, ব্রিটিশদের প্রতি তাদের আনুগত্য আছে বলে নয়। আটত্রিশ কোটি ভারতবাসী যদি আজ জেগে উঠে একযোগে বিদ্রোহ করত তা হলে তারা শুধুমাত্র লাঠি আর পাথর— এই অস্ত্র দিয়েই ব্রিটিশদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারত। তা হলে আজাদ হিন্দ ফৌজের আর কোনও প্রয়োজন থাকত না। আমরা পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা স্বচক্ষে যেভাবে পূর্ব এশিয়াতে ব্রিটিশদের ধ্বংস হয়ে যেতে দেখেছি দুর্ভাগ্যবশত সেই অভিজ্ঞতা তাদের হয়নি। আপনাদের সেই আত্মবিশ্বাস আছে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হবেই। এখন আমাদের কর্তব্য হল ভারতের মাটিতে ব্রিটিশদের পরাস্ত করা যাতে ৩৮ কোটি ভারতবাসী তাদের নিজের চোখে ব্রিটিশদের পরাজয় দেখতে পায়। যেদিন তাদের সেই অভিজ্ঞতা হবে সেইদিন তারা সাহস পাবে, তাদের আত্মবিশ্বাস জাগবে ও দেশের প্রতিটি কোণে তখন বিদ্রোহ দেখা দেবে এবং তখন আমাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে।

বন্ধুরা, আপনারা সম্ভবত গত বছরের আগস্ট মাসের কথা মনে করতে পারবেন যখন আমি ফারার পার্কের এক বক্তৃতায় বলেছিলাম যে বছর শেষ হবার আগে আমরা ভারত-বর্মা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে পা রাখব। এ কথা যখন বলেছিলাম তখন আমি ভেবেছিলাম যে আমরা ডিসেম্বর মাসে আক্রমণ শুরু করতে পারব। কিন্তু প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতির জন্য আমাদের আরও কিছু সময় অতিবাহিত হয় এবং অবশেষে মার্চ মাসে আমরা ভারতে প্রবেশ করি। আকিয়াব থেকে কোহিমা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে আমাদের বাহিনী যুদ্ধ শুরু করে। প্রতিটি লড়াইয়ে আমরা শত্রুদের পরাস্ত করি কিন্তু আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয় যানবাহনের সমস্যার জন্য। প্রবল বর্ষণ শুরু হওয়ার ফলে আমাদের সামনে তখন দু'টি পথ খোলা ছিল: হয় সেই জঙ্গলের মধ্যে ঘাঁটি গেড়ে থাকা অথবা পিছিয়ে আসা। নিপ্পনের ও আমাদের সেনাপতিরা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেন এবং তাঁরা পিছিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন এই কারণে যে জঙ্গলের মধ্যে থাকা সেনাদের জন্য অত্যন্ত বিপদসংকুল হত। আমাদের পিছিয়ে আসাতে সামনের রাস্তা সম্পূর্ণ প্রতিরোধশূন্য দেখে শত্রুরা সেই জায়গাগুলি বিনা বাধায় অধিকার করে নিল ও প্রচারযন্ত্রের সব ক'টি অস্ত্র ব্যবহার করে তারা সমগ্র বিশ্বের কাছে প্রচার করতে শুরু করল যে এক বিশাল জয় তাদের করায়ত্ত হয়েছে। কিন্তু আমাদের সেনা ও অফিসারেরা জানেন আমাদের পিছিয়ে আসার প্রকৃত কারণ কী। যে অঞ্চলগুলির অধিকার আমরা হারিয়েছি তা আমরা যে অচিরেই পুনর্বার জয় করে নিতে পারব সেই বিশ্বাস আমাদের আছে। আমি আবারও ইম্ফল ও চট্টগ্রামের গুরুত্বের উপর জোর দেব এবং দু'টি শহর আমাদের যে কোনও মূল্যে অধিকার করতে হবে। গত ছয় মাসের লড়াইয়ের ফলে আমাদের ও শত্রুর— উভয়পক্ষের সমরশক্তির নির্ভুল মূল্যায়ন আমরা করতে পেরেছি।

আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সময় শত্রুপক্ষের প্রচার বলতে শুরু করেছিল যে আজাদ

হিন্দ ফৌজ নামে সেনাবাহিনীর কোনও অস্তিত্ব নেই, সে কেবল প্রচারের কারসাজি। কিন্তু আমাদের সেনা যখন যুদ্ধে নামল তখন ব্রিটিশ প্রচারের সুর বদল হল, তারা বলতে লাগল আমাদের বাহিনীর রসদ ও সরঞ্জামের ঘাটতি আছে। প্রত্যুত্তরে আমি বলেছিলাম যে মাংস, রাম, বিয়ার ও হুইস্কি, যা ব্রিটিশ সেনাদের অপর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করা হয়ে থাকে, এই ক'টি জিনিস ছাড়া আমাদের সেনাবাহিনীর আর কোনও রসদের অভাব নেই। আমাদের সেনারা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত অবস্থাতেই লড়াই করতে প্রস্তুত। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক বিপ্লবের উল্লেখ আছে, কিন্তু আপনারা এমন একটাও উদাহরণ দেখাতে পারবে না যেখানে রসদ ও রণসামগ্রীতে বিপ্লবী সেনাদল তাদের প্রতিপক্ষের থেকে বেশি শক্তিশালী ছিল। বিপ্লবী সেনারা সাফল্য পেয়েছে তাদের সৈন্যসংখ্যা বা অস্ত্রসম্ভারের জোরে নয়, তাদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের জোরে কারণ তারা লড়াই করেছে একটা পবিত্র কর্তব্যসাধনের উদ্দেশ্যে। আয়ারল্যান্ডের উদাহরণ যদি দিই তা হলে দেখবেন, তাদের ছিল মাত্র ৫০০০ বিপ্লবী সৈন্য যারা স্বদেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল। অপরপক্ষে বিপ্লবী নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য ব্রিটিশ ৫০,০০০ সৈন্যের এক সুসজ্জিত বাহিনী পাঠিয়েছিল। কিন্তু সৈন্যসংখ্যা বা অস্ত্রসজ্জায় অনেক বেশি শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ হেরেছিল মর্মান্তিকভাবে। আমাদের শত্রুপক্ষের শক্তি সম্পর্কে আমার খুব ভাল মতোই জানা আছে এবং আমরা কী করতে পারি তাও আমি জানি। আমাদের বিশাল ত্যাগস্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ৩৮ কোটি ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেবার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সৈন্য ও প্রতিটি অফিসারকে জীবন দিতে হয় আমরা তার জন্য প্রস্তুত। পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয়কে যদি কপর্দকহীন হতে হয়, তাও কিছুই নয়। আমাদের মাতৃভূমির সেবার জন্য আমরা যে এই সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছি সে জন্য আমরা গর্বিত। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য আমরা যে সৈন্য ও সামগ্রী পেয়েছি সে জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। ৩০ লক্ষ ভারতীয় আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এখন রক্তের বিনিময়ে যদি আমাদের মুক্তি জিতে নিতে হয় তা হলে আমি বলব সেই মূল্য খুব বেশি কিছু নয়। আমাদের কাঁধে এখন যে দায়িত্ব রয়েছে তা হল আমাদের সেনাদলকে আরও শক্তিশালী করা ও ভারতের দিকে এগিয়ে চলা— আমাদের সামনে এখন শুধুমাত্র এই একটিই পথ। আমাদের রক্ত দিতে হবে। আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে অনেক সহসৈনিক তাদের জীবন দিয়েছে; আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিণতির দিনে আমরা কতজন বেঁচে থাকব তা কারুর জানা নেই। সৈন্য বা অফিসার— যারা তাদের জীবন দিতে প্রস্তুত নয় এই বাহিনীতে তাদের কোনও স্থান নেই। সেনাদলের পাশাপাশি দেশকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এবং দেশবাসীকে সেই ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

গতবছরে শুধুমাত্র বঙ্গদেশেই ২০ লক্ষ মানুষ অনাহারে মরেছে। ব্রিটিশদের সঙ্গে ৫ লক্ষ ভারতীয় বর্মাদেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল যাদের মধ্যে এক লক্ষেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যদি এই সংখ্যক মানুষ তাদের প্রাণ দিত তা হলে আমাদের মাতৃভূমি আজ স্বাধীন দেশ হতে পারত। দেশের মুক্তির জন্য যদি আপনারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত না থাকেন তা হলে ভারতীয় বলে নিজেদের পরিচয় দেবার অধিকার আপনাদের নেই। কিছু তথাকথিত ভারতীয় ভাবে যে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হবে তখন তারা ভারতে ফিরে যাবে, আবার ব্রিটিশরা যদি ফেরত আসে তা হলেও তারা ভারতে ফিরে যেতে পারবে। আমি এই বিশ্বাসঘাতকদের আশ্বাস দিতে প্পারি যে তারা ভারতে ফিরে যেতে পারবে না। আমরা তাদের জন্য ভারতবর্ষকে স্বাধীন করছি না। স্বাধীন ভারতে তাদের কোনও স্থান

থাকবে না। আমরা এই বিশ্বাসঘাতকদের বন্দি করব ও তার পরে স্বাধীন ভারতের সরকারের দয়ার উপরে তাদের ভাগ্য নির্ভর করবে। আমাদের কাছ থেকে একটিমাত্র সাহায্য যা তারা আশা করতে পারে তা হল ব্রিটেনে যাবার জন্য একটা করে তৃতীয় শ্রেণির টিকিট।

বন্ধুরা, আমাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতির কাজ আরও জোরদার করতে হবে। পরের আগ্রাসনের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে এবং আমরা সেই যুদ্ধের জন্য সামগ্রী সংগ্রহ করছি। আমাদের ধনী বন্ধুরা, যাঁরা এখনও হাত গুটিয়ে রেখেছেন তাঁদেরও এগিয়ে আসতে হবে ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। যে সব বিত্তশালী ভারতীয়রা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছেন এবং যাঁরা নিজেদের প্রাণ বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত নন তাঁদের 'হবিব মিক্সচার' খাওয়া দরকার। জনাব হবিব হলেন প্রথম দেশপ্রেমিক যিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দান করে দিয়েছেন, এই সম্পত্তির পরিমাণ হবে এক কোটি তিন হাজার টাকা। টাকার কথা ভেবে ভেবে যে সব ব্যক্তির রাতে ঘুম আসতে চায় না, তাঁরা এক কাজ করতে পারেন— অনিদ্রা রোগ সারাবার জন্য তাঁরা তাঁদের সব টাকাকড়ি আমাদের খাতে দান করে দিতে পারেন। আমি আপনাদের এই কথা বলতে পারি যে যতক্ষণ পুরো দেশ, সমগ্র জাতি তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে না পারবে ততক্ষণ জয় আমাদের করায়ত্ত হবে না। আমাদের কাজে যারা বাধা দিচ্ছে আমরা তাদের অবশ্যই অনুপ্রাণিত করব, তাদের সামনে আমরা একটার পর একটা উদাহরণ তুলে ধরব। সৌভাগ্যক্রমে এমন ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু তা হলেও তারা আমাদের আন্দোলনের ক্ষতিসাধন করছে। তারা ভাবে আমাদের কেবল কথাই সার এবং আমরা তাদের কোনও মতেই দমন করতে পারব না। এখন পুরো দেশকেই সামরিক শৃঙ্খলায় সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। যারা দুর্বল তাদের আমরা শক্তি জোগাব। এবং এই সব শত্রুপক্ষের দালাল, যারা ভারতীয়ের ছদ্মবেশ ধারণ করে আছে তাদের যদি আমরা দমন করতে বাধ্য হই তা হলে পুরো দেশ আমাদের সমর্থন করবে। এতদিন পর্যন্ত আমরা আপনাদের কাছে গেছি হাত জোড় করে। জাপান, জার্মানি বা ইংল্যান্ডে সরকার কখনও অনুরোধ করে না, তারা আদেশ করে। কেবল সায়োনানই নয়, হয়তো আমেরিকা ছাড়া বাকি বিশ্বের সর্বত্রই খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে। আমেরিকায় খাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়নি কারণ সেই দেশের মাটিতে যুদ্ধ হচ্ছে না। আপনারা যদি আজ যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজি থাকেন তা হলে খাদ্যের কোনও সমস্যাই থাকবে না। এ ছাড়া ঝাঁসির রানি রেজিমেন্টেও আমাদের আরও স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজন। তাই আমি আমার বোনদেরও ডাক দিই তাঁরা যেন এগিয়ে আসেন ও রেজিমেন্টে যোগ দেন।

আমি আপনাদের আজ একটা প্রশ্ন করতে চাই। এবং আমি চাই তার উত্তরে আপনারা সত্য বলবেন। রেঙ্গুনে থাকার সময় আমি এই মর্মে একটা রিপোর্ট পাই যে সায়োনানের ভারতীয়দের মধ্যে বিপ্লবের জন্য উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসছে। এখন আমাকে বলুন আপনাদের মধ্যে কত জন আমাদের সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছুক, এই যুদ্ধের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে এবং আমাদের পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করতে ও প্রয়োজন হলে প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।

[তাঁর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতার সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের জীবন বিসর্জন দিতে ও ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে কোনও ত্যাগ স্বীকারে তাদের সংকল্পের জন্য জানাল। তারা উচ্চৈস্বরে আওয়াজ দিল 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'নেতাজি কি জয়' ও 'চলো দিল্লি'।]

৫৫

আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব

[সিঙ্গাপুর থেকে বেতার সম্প্রচার, ১ জানুয়ারি ১৯৪৫][১]

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! গত অক্টোবর মাসে আমি পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে সফরের জন্য বর্মাদেশ ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। সেই কারণে আমি বেতারের মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। গত নভেম্বর মাসে টোকিও থেকে বেতার ভাষণে আমি আপনাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বিশ্বের পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা করব বলে। শুরু করবার আগে আমি আপনাদের সকলকে নববর্ষের অভিনন্দন জানাই। নতুন বছরে যুদ্ধ পৌঁছেছে জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে। ভারতীয় জনগণকে বিশেষতঃ পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের বিরাট স্বার্থত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের এই যুদ্ধের জন্য ভারতীয়দের প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি পূর্ব এশিয়া সফরে গিয়েছিলাম। পূর্ব এশিয়াতে এমন কোনও স্থান নেই যেখানে ভারতীয়রা বসবাস করেন না এবং ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধের বিষয়ে প্রতিটি ভারতীয়দের উৎসাহ আছে। পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র পুরুষেরা দলে দলে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন এবং আমাদের তহবিলে বিরাট অঙ্কের অর্থও জমা পড়ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা জয়যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই ভাবেই চলতে থাকবে। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জন্য আর্থিক সাহায্য আসতেই থাকবে। আমি মালয়, জাপান, ফ্রান্স, ইন্দোচিন ও ইস্ট ইন্ডিজ় সফর করেছি যেখানে আমি ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর তরফে যুদ্ধের জন্য যে প্রস্তুতি চলছে তার তদারক করেছি। শুধুমাত্র মালয়েই আমি ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জন্য ৭,০০০,০০০ ডলার সংগ্রহ করতে পেরেছি।

আমাদের যে সব বন্ধুরা এখন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ কারাগারগুলিতে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছেন আজ এই মুহূর্তে তাঁদের কথা আমার মনে পড়ছে। সেই স্বদেশপ্রেমী বীর যোদ্ধাদের কীর্তিকর্মের কথা এখন আমি বিস্তারিত বলতে চাই না, তাঁদের একটাই অপরাধ ছিল যেটা হল তাঁরা তাঁদের দেশের মুক্তির জন্য কাজ করছিলেন। সব শেষে সত্য ও ন্যায়ের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়ী না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হব না।

আমরা যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। গত অক্টোবর ও নভেম্বরে তার পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু এখন সেটা কাচের মতোই স্বচ্ছ। কিছুদিন আগেও যারা বলছিল যে ইউরোপের যুদ্ধ ১৯৪৪ সালেই শেষ হয়ে যাবে, তারা এখন বলতে শুরু করেছে যে সেই যুদ্ধ ১৯৪৫ সালে, এমনকী হয়তো ১৯৪৬ সালেও শেষ হবে না। পশ্চিমে জার্মানির প্রতিআক্রমণ এবং ভি-ওয়ান ও ভি-টু ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সময়সীমাকে বানচাল করে দিয়েছে

---

১ Testament of Subhas Bose. pp. 66-68.

ও তাদের মিথ্যা প্রচারের মুখোশ খুলে দিয়েছে। ইংল্যান্ডে এখন মর্মান্তিক অবস্থা। রণসম্ভারের উৎপাদনে জার্মানি তাদের প্রতিপক্ষকে ছাড়িয়ে গেছে ও তাদের শত্রুপক্ষও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে জার্মানির প্রতিরক্ষা অত্যন্ত সুদৃঢ়।

অপরপক্ষে রাশিয়া, আমেরিকা ও ব্রিটেনের মধ্যে গভীর মতানৈক্য আছে। গ্রিস, বেলজিয়াম ও ইতালিতে অনুসৃত ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে আমেরিকার সংবাদমাধ্যম যে ভাবে সমালোচনা করেছে তাতেই প্রমাণিত হয় যে ইউরোপে মিত্রশক্তির নীতির বিষয়ে ব্রিটেন ও আমেরিকা একমত পোষণ করে না। ব্রিটিশ সেনারা গ্রিসের জনগণকে মুক্তি দেবার নামে তাদের উপর মেশিনগান ব্যবহার করছে। সম্প্রতি মিস্টার চার্চিল ও মিস্টার ইডেন গ্রিসের বিষয়ে তাদের মতামত দিয়েছেন। ভিতরকার মতভেদ প্রকাশ পেয়েছে যখন মিস্টার রুজভেল্ট বলেছেন যে আটলান্টিক চার্টার-এর কোনও অস্তিত্বই নেই।

একদিকে আমেরিকা ও ব্রিটেনে যখন সৈন্যসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে বিপুলভাবে, অন্যদিকে তখন জাপান ও জার্মানিতে অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের হার বাড়ছে প্রতি ঘণ্টায়। এমনকী যুদ্ধে জার্মানির হার হলেও বলশেভিকদের মোকাবিলা করবার জন্য ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যদের রাখতেই হবে এবং তাতে সুবিধা হবে জাপানের। ইঙ্গ-মার্কিন জোটের এই নীতি তাদের সাম্রাজ্যবাদকে চিরদিনের মতো ধ্বংস করে দেবে। এখানে আমরা যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছি তাদের ইউরোপের পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে হবে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের নীতি আরও দুর্বল। আমেরিকা এই অঞ্চলে কয়েকটা দ্বীপ অধিকার করাতে মিত্রশক্তির প্রচার মাধ্যম কিছু উপকরণ পেয়েছিল বলা যেতে পারে। কিন্তু এখন আমেরিকা টের পাচ্ছে যে এই দ্বীপগুলি অধিকার করে নেওয়ায় তাদের বিশেষ কিছু লাভ হয়নি, এমনকী জেনারেল উইডমেয়ার প্রকারান্তরে সে কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন। গত অক্টোবরে আমেরিকা ঘোষণা করে যে ফরমোসা ও ফিলিপাইনের উপকূলে জাপানি নৌবাহিনী বিপুলভাবে পরাস্ত হয়েছে কিন্তু আমেরিকান নাবিক এবং ভারতে কার্যরত ব্রিটিশ সাংবাদিকরা সেই ঘোষণার সততায় সন্দেহ প্রকাশ করায় পুরো ঘটনার সম্পর্কে আমেরিকার মিথ্যাচার উদঘাটিত হয়ে গেছে। তাদের এখন চেতনা হচ্ছে যে মস্কো অভিমুখে রওনা দেবার সময় নেপোলিয়নের ভাগ্যে যা ঘটেছিল আমেরিকার নৌবাহিনীরও সেই একই পরিণতি ঘটেছে। আগামী দিনের ঘটনাবলী প্রমাণ করে দেবে আমার বক্তব্য সঠিক কিনা। ফিলিপাইনে জাপানিরা আমেরিকানদের বিরুদ্ধে আঘাতের পর আঘাত হানছে। যখন ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী চুঙকিঙ ও ভারতবর্ষের মধ্যে স্থলপথে একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবার বিষয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছে তখন জাপানিরা কিন্তু জাপান ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে যোগাযোগের পথটি ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছে। সমগ্র জাপানি জাতি এখন যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনবৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেছে। শত্রুপক্ষ চাইছে যুদ্ধের আশু পরিসমাপ্তি হোক কিন্তু তার সম্ভাবনা কম। অন্যদিকে যুদ্ধ যতই দীর্ঘ হবে ততই জার্মান ও জাপানিদের পক্ষে সুবিধা। জাপানি কামিকাজি যোদ্ধারা আমেরিকানদের একেবারে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে। আমি বেশ কয়েকবার জাপানে গিয়েছি ও তাদের সামরিক শক্তিমত্তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এই বিষয়ে লেখা লন্ডনে রয়টারের সামরিক পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট এবং আমেরিকান আন্ডার সেক্রেটারির যুদ্ধ বিষয়ক রিপোর্ট আপনারা পড়বেন। প্রথমটি লেখা হয়েছে গত ডিসেম্বরের ৫ তারিখে ও পরেরটি ডিসেম্বরের ২১ তারিখে। এই রিপোর্টগুলি পড়লে বোঝা যাবে জাপানের সমরশক্তির বিষয়ে ইংল্যান্ড ও

আমেরিকা কতটা উদ্বিগ্ন। ভারতীয় জাতীয় বাহিনীও আক্রমণ শুরু করবে অচিরেই ও ব্রিটিশ সেনারা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হবে যতক্ষণ না তারা পরাস্ত হচ্ছে।

ভারত-বর্মা সমরাঙ্গনে লড়াই করে আমরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি এবং এই অভিজ্ঞতাকে আমাদের অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। আমাদের জয় যে হবেই সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের শত্রুদের দুর্বলতা সম্বন্ধে আমাদের জানা আছে এবং জয় সম্বন্ধে আমাদের আত্মবিশ্বাস এখন দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। আমরা জানি যে ভারত-বর্মা সীমান্তে আমাদের কঠিন লড়াই হবে। ইম্ফল ও চট্টগ্রামের যুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। আমরা শত্রুদের সঙ্গে লড়ব ধৈর্য্যসহকারে ও অদম্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে।

ভাই ও বোনেরা! আমাদের প্রতিশ্রুতি আমরা রক্ষা করব এই আশ্বাস আমি আপনাদের দিতে পারি। ভারতীয় জাতীয় বাহিনী অল্পদিনের মধ্যে আসাম ও বঙ্গদেশের সমতলে পৌঁছবে। যেদিন আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছব সেদিন আমাদের সাহায্য করার দায়িত্ব হবে আপনাদের। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আপনারা প্রস্তুত হতে থাকুন। কিন্তু সময় উপযুক্ত না হলে ১৯৪২-এর পুনরাবৃত্তি করবেন না। যাঁরা ব্রিটিশ জেলে বন্দি হয়ে আছেন তাঁদের কাছে আমাদের নববর্ষের বার্তা পৌঁছে দেবেন এবং বলবেন যে তাঁদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। জয় হিন্দ!

৫৬

আমাদের অমর যোদ্ধারা

[দিনের বিশেষ বিবৃতি, ২ জানুয়ারি ১৯৪৫][১]

আজাদ হিন্দ ফৌজের সহযোদ্ধাবৃন্দ!

নতুন বছরের এই বিশেষ দিনটায় আমি প্রথমেই আপনাদের অনুরোধ করব আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনের সময় থেকে আপনারা যে সাফল্য অর্জন করেছেন পিছন ফিরে সেই দিকে দেখতে। বহু সমস্যা ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আপনারা যা অর্জন করতে পেরেছেন ও যেভাবে আপনাদের অগ্রগতি হয়েছে তা যে রীতিমতো চমকপ্রদ সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। স্বাধীনতার জন্য যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা যা ভারতীয় জনগণকে আজ অনুপ্রাণিত করছে, পূর্ব এশিয়াতে বসবাসকারী ভারতীয় ও আমাদের মিত্রগোষ্ঠীর কাছ থেকে পাওয়া বহুবিধ মূল্যবান সাহায্য এবং সর্বোপরি আপনাদের কঠিন পরিশ্রম ও দেশের জন্য আত্মবিসর্জনের সঙ্কল্প— কেবলমাত্র তার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। ১৯৪৩ সাল শেষ হবার আগেই আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারত-বর্মা সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছিল। ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ তারিখে বর্মাদেশের আরাকান অঞ্চলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু।

২১ মার্চ, ১৯৪৪ তারিখে আমরা সমগ্র বিশ্বের কাছে ঘোষণা করতে পেরেছিলাম যে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করেছে এবং আমাদের সেনারা ভারতভূমির পবিত্র মাটিতে পা রেখে লড়াই করছে। সেই লড়াই এখনও চলছে ও আমাদের বহু সেনা রণাঙ্গনে তাঁদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সেনাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ ইতোমধ্যেই এক গৌরবময় ও অমর দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছে যা চিরকাল ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করতে থাকবে। কমরেডরা! আজকের এই পুণ্যদিনে আসুন আজ আমরা সকলে সেই অমর বীরদের উদ্দেশ্যে নীরব শ্রদ্ধা জানাই ও চূড়ান্ত জয় করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার শপথ নিই। আজ ভারত আপনাদের ডাক দিয়েছে, নিহত যোদ্ধাদের আত্মা আপনাদের আরও বীরত্বের পরিচয় দেবার জন্য এগিয়ে আসতে অনুরোধ করছে। সুতরাং আসুন কোমর বেঁধে আমরা আবার লড়াই শুরু করি। আমাদের তে-রঙা পতাকা ভারতের রাজধানীতে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কোনও বিশ্রাম নেই, কোনও বিরাম নেই। কমরেডরা! আজকের এই পুণ্যদিনে আসুন আজ আমরা সকলে সেই অমর বীরদের উদ্দেশ্যে নীরব শ্রদ্ধা জানাই ও চূড়ান্ত জয় করায়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার শপথ নিই। আজ ভারত আপনাদের ডাক দিয়েছে, নিহত যোদ্ধাদের আত্মা আপনাদের আরও বীরত্বের পরিচয় দেবার জন্য এগিয়ে আসতে

১. Testament of Subhas Bose, pp. 174-175

অনুরোধ করছে। সুতরাং আসুন কোমর বেঁধে আমরা আবার লড়াই শুরু করি। আমাদের তে-রঙা পতাকা ভারতের রাজধানীতে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কোনও বিশ্রাম নেই, কোনও বিরাম নেই। কমরেডরা! ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করবার জন্য আমাদের অমর সহসৈনিকরা তাঁদের রক্ত দিয়ে তার মূল্য দিয়েছেন। আমরা তাঁদের ত্যাগে গর্বিত ও গৌরবান্বিত কিন্তু আমাদেরও সেই চূড়ান্ত ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

৫৭

সাহসিকতা ও কাপুরুষতা

[বিবৃতি, ১৩ মার্চ ১৯৪৫][১]

কমরেডরা!

যুদ্ধক্ষেত্রে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনা ও অফিসাররা গত বছরে যে ইতিবাচক সাফল্য লাভ করেছেন সে কথা আপনাদের সকলেরই জানা আছে। কিন্তু যে দেশাত্মবোধ, সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁদের জয়যুক্ত করেছে তাতে কালিমা লেপন করেছে কতিপয় অফিসার ও সেনার বিশ্বাসঘাতকতা ও কাপুরুষোচিত আচরণ। আমরা আশা করছিলাম যে নতুন বছরে সেই বিশ্বাসঘাতক ও কাপুরুষদের কথা আমরা মন থেকে মুছে ফেলতে পারব এবং এই নববর্ষে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের এক অকলঙ্ক অধ্যায়ের সূচনা হবে। কিন্তু সেই আশা পূরণ হল না। সম্প্রতি সেকেন্ড ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার্সের পাঁচজন অফিসারের বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমাদের সচেতন করে দিয়েছে যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক ও কাপুরুষদের অস্তিত্ব এখনও পূর্ণ মাত্রায় রয়ে গেছে। এই লজ্জাজনক ও ঘৃণ্য ঘটনাকে আমরা শাপে বর বলে ভাবতে পারব যদি ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমরা আজ়াদ হিন্দ ফৌজের মধ্য থেকে বিশ্বাসঘাতক ও কাপুরুষদের প্রভাব একেবারে মুছে ফেলতে পারি। অতএব আমাদের ফৌজকে কলুষমুক্ত করবার জন্য যা প্রয়োজন সবকিছু করবার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। এই কাজে আপনাদের সকলের পূর্ণ সহযোগিতা যে আমি পাব সেই বিশ্বাস আমার আছে। বিশ্বাসঘাতক ও কাপুরুষদের প্রভাব সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে হলে আমাদের নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে:

১) আজ়াদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি অফিসার, এন.সি. ও বা সেপাইকে ভবিষ্যতে এই ক্ষমতা দেওয়া হবে যার বলে তারা ফৌজের অন্য যে কোনও সদস্যকে, তার পদমর্যাদা যাই হোক না কেন, গ্রেপ্তার করতে পারবে যদি তারা মনে করে সেই সদস্য কাপুরুষের মতো আচরণ করছিল অথবা তাকে গুলি করতে পারবে যদি তারা মনে করে সেই সদস্য বিশ্বাসঘাতকের কাজ করছিল।

২) আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সব সদস্যদের আমি এই সুযোগ দিচ্ছি যে ভবিষ্যতে তারা যদি কর্তব্য অনুসারে কাজ করতে না পারে বা সাহসিকতার সঙ্গে যদি তারা লড়াই করতে না পারে তা হলে তারা যেন আমাদের ফৌজ ছেড়ে চলে যায়। আজ থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে এই সুযোগ তারা নিতে পারবে।

৩) অনিচ্ছুক সদস্যদের স্বেচ্ছায় আজ়াদ হিন্দ ফৌজ ছেড়ে চলে যাবার সুযোগ দেওয়া ছাড়াও আমি আমাদের ফৌজের সেনাদের মধ্যে থেকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের একেবারে

---

১. Testament of Subhas Bose, pp. 175-177.

নির্মূল করতে চাই। কোনও ব্যক্তির সম্পর্কে যদি সন্দেহ জাগে যে সে সঙ্কটকালে আমাদের পাশে দাঁড়াবে না বা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা হলে তাকে আমরা ফৌজ থেকে সরিয়ে দেব। এই কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে আমি আপনাদের কাছ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা চাই এবং আমাদের বাহিনীতে যদি এখনও কোনও বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষ থাকে তা হলে আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে এই ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সকল তথ্য আপনারা আমাকে বা আমার বিশ্বাসভাজন অফিসারদের কাছে জানাবেন।

৪) অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের নির্মূল করবার কাজ যে শুধু এখনই করা প্রয়োজন তা নয়, ভবিষ্যতেও আমাদের সকল সময় সতর্ক থাকতে হবে। তার ফলে ভবিষ্যতে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সদস্যকে অবশ্যকর্তব্য হিসাবে চোখ কান খোলা রাখতে হবে যাতে বিপদ ঘটবার আগে, কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কোনও প্রবণতার প্রথম আভাস পাওয়া মাত্র যেন তা নির্মূল করতে পারা যায়। ভবিষ্যতে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের কোনও সদস্য যদি কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রবণতার কোনও আভাস পায় তা হলে তাকে তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়ে আমার কাছে, বা যে অফিসার কাছে আছেন তাঁর কাছে মৌখিক বা লিখিত ভাবে রিপোর্ট করতে হবে। অর্থাৎ আজ থেকে শুরু করে সর্বদাই আজ়াদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সদস্যকে মনে রাখতে হবে যে তারা ফৌজের এবং ভারতীয় জাতির সম্মান ও সুনামের রক্ষাকর্তা।

৫) যখন আমরা আমাদের বাহিনীকে কলুষমুক্ত করতে পারব ও সকল অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের অপসারিত করতে পারব তখন, তার পরেও, যদি আমরা কোনও কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ পাই তা হলে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড।

৬) আমাদের ফৌজের সেনাদের মধ্যে কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে নীতিগত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে আমাদের যা করতে হবে তা হল যে কোনও প্রকারের কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি একটা তীব্র ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করা। এই ফৌজের প্রতিটি সদস্যের মনের মধ্যে এই ধারণাকে বদ্ধমূল করে দিতে হবে যে বিপ্লবী সেনাবাহিনীতে কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার থেকে ঘৃণ্য অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কীভাবে আমরা সেই তীব্র ঘৃণার মনোভাব সৃষ্টি করতে পারি সেই বিষয়ে পৃথক ভাবে আপনাদের কাছে আমরা তথ্য জানাব যাতে আমাদের সৈন্যদের মধ্য থেকে কাপুরুষ ও বিশ্বাসঘাতকদের আমরা একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি।

৭) এই কলুষমুক্তির পরে, আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতিটি সেনাকে দেশমাতার মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবার শপথগ্রহণ করতে হবে। এই শপথের ভাষা এবং কীভাবে এই শপথ নেওয়া হবে সেই বিষয়ে আমরা পৃথকভাবে আপনাদের কাছে তথ্য জানাব।

৮) কারুপুষ ও বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে যারা আমাদের কাছে তথ্য দিতে পারবে বা তাদের গ্রেপ্তার করতে পারবে বা গুলি করতে পারবে তাদের জন্য আমরা বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা করব।

সুভাষচন্দ্র বসু
সর্বাধিনায়ক
আজ়াদ হিন্দ ফৌজ, ১৩ মার্চ ১৯৪৫

৫৮

একটি স্বপ্নের পরিসমাপ্তি

[২৪ এপ্রিল ১৯৪৫, রেঙ্গুন ছেড়ে ব্যাঙ্ককের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে নেতাজির বার্তা][১]

বর্মাদেশের অধিবাসী বর্মী ও ভারতীয় বন্ধুদের উদ্দেশে:

ভাই ও বোনেরা!

আজ আমি বর্মাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি অতি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আমরা পরাজিত হয়েছি। কিন্তু এ কেবল প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধ যেখানে আমাদের পরাজয় ঘটেছে। এখনও এই সংগ্রামের অনেক পর্যায় বাকি আছে যা আমাদের লড়তে হবে। কাজেই প্রথম ধাপে পরাস্ত হলেও আমি আশাহত হবার কোনও কারণ দেখছি না।

বর্মাদেশে বসবাসকারী আমার দেশবাসীরা, আপনারা যেভাবে মাতৃভূমির প্রতি আপনাদের কর্তব্যপালন করেছেন সারা বিশ্বের জনগণের কাছ থেকে তা বাহবা পেয়েছে। আপনারা অকাতরে জন, ধন ও রসদ দিয়ে এই যুদ্ধের জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন। কিন্তু ভাগ্য আমাদের প্রতিকূল ছিল এবং বর্মার এই যুদ্ধে আমরা এখনকার মতো পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছি।

স্বার্থশূন্য ত্যাগের যে সঙ্কল্প আপনাদের আচরণে প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষত আমার হেড কোয়ার্টার্স বর্মাদেশে স্থানান্তর করণের পরে, তা আমার আজীবন মনে থাকবে।

আত্মত্যাগের এই সঙ্কল্প কখনওই আপনাদের মন থেকে মুছে যাবে না, সেই বিষয়ে আমার পূর্ণ আস্থা আছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য সেই সঙ্কল্প আপনাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকুক, এই আমার আন্তরিক কামনা। আমি আপনাদের কাছে এই অনুরোধ করব যে আপনারা আপনাদের শির উন্নত করে রাখবেন এবং সেই শুভদিনের জন্য অপেক্ষা করবেন, যেদিন আবারও একবার আপনারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেবার সুযোগ পাবেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য শেষ যুদ্ধের ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন বর্মাবাসী ভারতীয়রা সেই ইতিহাসের পাতায় এক সম্মানের আসন পাবেন।

আজ আমি স্ব ইচ্ছায় বর্মাদেশে ছেড়ে যাচ্ছি না। এই দেশে থেকে আপনাদের সঙ্গে আজকের এই সাময়িক পরাজয়ের মনোকষ্ট ভাগ করে নিতেই আমি ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু আমার মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের বিশেষ অনুরোধ ও উপদেশে আমাকে বর্মাদেশ ছেড়ে

---

১. India Fights On (Bangkok: Provisional Government of Azad Hind, 1945) নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহালয়ে প্রতিলিপি রাখা আছে, এবং Testament Subhas Bose, pp. 247-248.

যেতে হচ্ছে যাতে আমি অন্য কোনও স্থান থেকে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারি। স্বভাবগতভাবে আমি আশাবাদী এবং অচিরেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এই বিশ্বাস আমার অবিচল আছে। আমি আপনাদেরও অনুরোধ করব সেই আশা মনের মধ্যে অম্লান রাখবেন।

আমি সর্বদাই বলে থাকি যে ভোর হবার আগের মুহূর্তগুলিই ঘনতম তমসায় ঢাকা থাকে। আমরাও এখন রাত্রির নিবিড়তম আঁধারে আচ্ছন্ন কাজেই ভোর হতে আর দেরি নেই।

ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবে।

আজকের এই বার্তা আমার অসমাপ্ত থেকে যাবে যদি এই স্বাধীনতা সংগ্রামে বর্মাদেশের সরকার ও জনগণের কাছ থেকে পাওয়া অপর্যাপ্ত সাহায্যের জন্য সর্বসমক্ষে আমি আবারও একবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করি। একদিন আসবে যেদিন স্বাধীন ভারত এই উপকারের ঋণ উদার হাতে শোধ করে দেবে।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ, আজ়াদ হিন্দ জিন্দাবাদ জয় হিন্দ
সর্বাধিনায়ক
আজ়াদ হিন্দ ফৌজ, ১৩ মার্চ ১৯৪৫

৫৯

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভারতীয়রা আপনাদের নামে জয়ধ্বনি দেবে

[দিনের বিশেষ বার্তা, ২৪ এপ্রিল ১৯৪৫][১]

আজ়াদ হিন্দ ফৌজের বীর সেনানী ও অফিসারদের প্রতি!

আজ আমি অতি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বর্মাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি— এই দেশ যেখানে আপনারা ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বীরত্বব্যঞ্জক অনেক লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সেই লড়াই এখনও অব্যাহত আছে। ইম্ফলে ও বর্মাতে আমাদের স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আমরা পরাজিত হয়েছি। কিন্তু এ কেবল প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধ যেখানে আমাদের পরাজয় ঘটেছে। এখনও এই সংগ্রামের অনেক পর্যায় বাকি আছে যা আমাদের লড়তে হবে। স্বভাবতই আমি চূড়ান্ত আশাবাদী এবং কোনও মতেই হার স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত নই। ইম্ফলের সমতলে, আরাকানের পাহাড়ে, জঙ্গলে, বর্মাদেশের বিভিন্ন স্থানে ও তেলের খনিতে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনাদের সাহস ও শৌর্যের কাহিনী আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য অমর হয়ে থাকবে।

কমরেডরা! আজকের এই সঙ্কটকালে আমি শুধুমাত্র একটা আদেশই আপনাদের দিতে পারি, এবং তা হল যদি সাময়িকভাবে আপনাদের হার স্বীকার করে নিতে হয় তা হলে আপনারা যেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যেতে পারেন, তেরঙা পতাকা যেন সগর্বে উড্ডীন থাকে, যদি মরতেই হয় তা হলে বীরের মতো লড়াই করে যেন মৃত্যুবরণ করতে পারেন এবং সম্মান ও শৃঙ্খলার সর্বোচ্চ মান যেন সর্বদা রক্ষিত হয়। আপনাদের এই সুমহান ও বিশাল আত্মত্যাগের জন্যই ভারতবর্ষের আগামী প্রজন্ম ভবিষ্যতে জন্ম নেবে স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে, বিদেশিদের পদানত দাসরূপে নয়। তারা আপনাদের নামে জয়ধ্বনি দেবে কারণ আপনারা, তাদের পূর্বসূরীরা মণিপুরে, বর্মাতে, আসামে লড়াই করেছেন, কখনও কখনও হার স্বীকার করতে হয়েছে কিন্তু সাময়িক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আপনারা সাফল্যের সঙ্গে গৌরবময় যে পথে অগ্রসর হয়েছেন তার জন্য।

ভারতের মুক্তির সম্বন্ধে আমার অটল বিশ্বাস এখনও অটুট আছে। আমি আপনাদের নিরাপদ হাতে আমাদের জাতীয় পতাকা তুলে দিয়েছি, সেইসঙ্গে দিয়েছি আমাদের জাতীয় সম্মান ও ভারতীয় যোদ্ধাদের বীরত্বের ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব। আমার মনের মধ্যে এতটুকু সংশয় নেই যে আপনারা, ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের সেনানিদের অগ্রদূতরূপে দেশের সম্মান রক্ষার জন্য সবকিছু, এমনকী নিজের জীবনও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। আপনাদের সহযোদ্ধারা

---

১. India Fights On, pp. 17-19 এবং Testament of Subhas Bose, pp. 248-249.

যারা অন্য কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করতে থাকবে, তাদের সামনে থাকবে আপনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা তাদের সর্বদাই অনুপ্রাণিত করবে।

আজ আমি যদি কেবলমাত্র আমার ইচ্ছানুসারে কাজ করতে পারতাম তা হলে এই বিপদের দিনে আমি আপনাদের পাশে থাকতাম এবং আপনাদের সঙ্গে সব অসুবিধা, সব দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নিতাম। কিন্তু আমার মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ অফিসারদের বিশেষ অনুরোধ ও উপদেশে আমাকে বর্মাদেশ ছেড়ে যেতে হচ্ছে যাতে আমি অন্য কোনও স্থান থেকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতি অব্যাহত রাখতে পারি। পূর্ব এশিয়ার ও ভারতের অভ্যন্তরের ভারতীয়দের আমি জানি, সেইজন্যই আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন তারা এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এবং আপনাদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। আমার দিক থেকে আমি বলতে পারি যে ১৯৪৩ সালের ২৩ অক্টোবর আপনাদের কাছে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে ৩৮ কোটি স্বদেশবাসীর স্বার্থে, তাদের মুক্তির জন্য আমি লড়াই চালিয়ে যাব, সেই প্রতিশ্রুতি আমি যেভাবেই হোক পূরণ করব। সব শেষে আপনাদের কাছে আমার এই আবেদন যে আমার মতো আপনারাও মনের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে রাখবেন, আমার মতো আপনারাও মনের মধ্যে এই বিশ্বাস রাখবেন যে ভোরের আলো ফোটবার আগের মুহূর্তগুলিই সর্বদা ঘনতম তমসায় ঢাকা থাকে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং সেই দিন আসন্ন।

ঈশ্বরের আশীর্বাদ আপনাদের উপর থাকুক!

ইনকিলাব জিন্দাবাদ,
আজ়াদ হিন্দ জিন্দাবাদ, জয় হিন্দ
সুভাষচন্দ্র বসু
সর্বাধিনায়ক
আজ়াদ হিন্দ ফৌজ

৬০

আমাদের সংগ্রাম চলবে

[ব্যাঙ্ককে বক্তৃতা, ২১ মে ১৯৪৫][১]

বোন ও ভাইয়েরা,

গত জানুয়ারি মাসে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবার পর থেকে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। ইউরোপে জার্মানদের প্রতিরোধ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। এখানে বর্মাদেশে আমাদের স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আমরা পরাজিত হয়েছি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের হতোদ্যম হবার কোনও কারণ আমি দেখি না। ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়া থেকে যখন আমাদের শত্রুরা বিতাড়িত হয়েছিল তখন যদি তারা হাল ছেড়ে না দিয়ে থাকে, যখন আমাদের শত্রুরা একের পর আরেক রণক্ষেত্রে বিপুলভাবে পরাস্ত হয়েছে তখনও যদি তারা যুদ্ধ অব্যাহত রেখে থাকে এবং প্রতিআক্রমণ শুরু করবার মতো সাহস দেখিয়ে থাকে তা হলে আমাদেরও প্রমাণ করতে হবে যে অন্ততঃপক্ষে তাদের সমান মাপের শক্তিমত্তা ও যুদ্ধে জেতার মতো মানসিকতা আমাদের আছে। আপনারা জানেন আমি সর্বদাই বলে থাকি যে স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা আমরা তখনই অর্জন করতে পারব যখন শত্রুদের থেকে আমরা বেশি সাহসী হব ও যুদ্ধে জেতার জন্য আমাদের বেশি আগ্রহ থাকবে, যখন আমাদের দূরদৃষ্টি তাদের থেকেও সুদূরপ্রসারী হবে। বর্মাদেশ থেকে বিতাড়িত হবার পরেও আমাদের শত্রুরা আবার ফিরে এসে আক্রমণ করতে পারে, তা হলে আমরাই বা কেন আবার বর্মাতে ফিরে আসতে পারব না? মূল প্রশ্ন হল আমাদের মনোবল ভেঙে গেছে কিনা এবং আমরা নিজেদের পরাজিত মনে করছি কিনা। গত ইউরোপীয় যুদ্ধে মিত্রশক্তির সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফশ একটা ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন, "সেই সেনাবাহিনীই যুদ্ধে পরাস্ত হয় যারা মনে করে যে তারা পরাজিত হয়েছে।" আমার সঙ্গে যাঁরা বর্মা থেকে এসেছেন তাঁদের মধ্যে একজনও পুরুষ বা মহিলা নেই যাঁরা নিজেদের পরাজিত ভাবছেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ঘটেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনও এই সংগ্রামের অনেক পর্যায় বাকি আছে এবং শেষ পর্যায়ের যুদ্ধেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে। এই সংগ্রাম অনেকাংশেই দুই মল্লবীরের মধ্যে লড়াইয়ের মতো। যখন দুই মল্লবীরের শক্তি প্রায় সমতুল্য তখন যে মল্লবীর শেষ পর্যন্ত তার দম ধরে রাখতে পারবে জিত হবে তারই। আমাদের যদি জেতবার আকাঙ্ক্ষা বেশি থাকে, আমরা যদি বেশিদিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারি, যদি শত্রুপক্ষের থেকে আমাদের আত্মিক শক্তি বেশি থাকে, তখনই আমি বলব আমরা স্বাধীনতালাভের যোগ্য হয়েছি। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মধ্যে কেউ কেউ

---

১. India Fights On, pp. 1-13, মূল হিন্দুস্থানী থেকে অনূদিত।

আছেন যাঁরা অতি সহজেই স্বল্প ব্যর্থতার পরেই আস্থা হারিয়ে ফেলেন— এমনকী ভয়ার্ত হয়ে ওঠেন। পরাধীন দাসরূপে সারা জীবন কাটানোর এই হল মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব। ভারতীয় জনগণকে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে ও যেকোনও পরিস্থিতিতে লড়াই চালিয়ে যাবার মানসিক ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হবে, যদি চূড়ান্ত যুদ্ধে তাঁরা জয়যুক্ত হতে চান।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও একটা কথা আপনাদের কাছে উল্লেখ করতে চাই। আধুনিক যুগের যুদ্ধে— বিশেষত বর্তমান যুদ্ধের মতো বিশাল আয়তনের যুদ্ধে বহু ঘটনাই ঘটবে যা আগে থেকে অনুমান করা যায়নি বা আশাও করা যায়নি। একজন বিখ্যাত রণবিশেষজ্ঞ এবং আধুনিক যুগের যুদ্ধবিদ্যার জনক বলে যাঁকে অভিহিত করা যায়, সেই জার্মান জেনারেল ও সাহিত্যিক ক্লসউইটজ্ একবার বলেছিলেন, "যুদ্ধে বহু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে।" তাঁর মন্তব্য যে কতটা সত্য তা প্রমাণ করবার জন্য আমি আপনাদের কাছে কয়েকটা উদাহরণ দিই।

১৯১২ সালের বলকান অঞ্চলের যুদ্ধে চারটি শক্তিশালী দেশ— রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রিস ও সার্বিয়া— তুরস্কের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধভাবে আক্রমণ করে। পরের পর লড়াইয়ে তুরস্ক পরাজিত হতে থাকে, এবং এক সময়ে বলকান শক্তিজোট প্রায় কনস্টান্টিনোপলের প্রবেশপথে এসে পৌঁছে যায়। যখন তুরস্কের হার অনিবার্য, কোথাও কোনও আশার আলো নেই তখন হঠাৎ চার বলকান শক্তির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় ও তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। সে যাত্রায় কনস্টান্টিনোপল রক্ষা পেয়ে যায় ও তুরস্কের সেনাবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে হৃত অঞ্চলের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। তা হলে আমরা দেখলাম যে যখন তুরস্ক প্রায় পরাস্ত হয়েছিল ও জেতবার কোনও আশাই ছিল না তখন যদি তারা শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করত তা হলে তারা পরে যে ভাবে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে পুনর্দখল করতে সমর্থ হল সেটা তারা পারত না।

তুরস্কের সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে আরেকটা উদাহরণ দিই। গত বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানি ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সঙ্গে একজোটে লড়াই করছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা হেরে যায়। অটোমান সাম্রাজ্যের গৌরবময় রাজধানী কনস্টান্টিনোপল মিত্রশক্তি দখল করে নেয় এবং সুলতান, যিনি খলিফাও ছিলেন, তাঁকে প্রায় বন্দি অবস্থায় রাখা হয়। যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয় হয়েছে মেনে নিয়ে সুলতান মিত্রশক্তির জারি করা সবরকম অপমানজনক শর্তে বশ্যতা স্বীকার করে নেন ও তুর্কীদেরও তিনি কোনও প্রতিরোধ করতে নিষেধ করেন। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে একজন ব্যক্তি কিন্তু পরাজয় স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। মুস্তাফা কামাল পাশা, বহু দক্ষ তুর্কী অফিসারদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। তিনি কনস্টান্টিনোপল ছেড়ে আনাতোলিয়াতে চলে যান ও বিশ্বস্ত কয়েকজন অফিসারের সাহায্যে আনাতোলিয়াতে বসবাসকারী তুর্কীদের তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করে এক নতুন বাহিনী গড়ে তোলেন। দেখা গেল এই নবগঠিত বাহিনী তাদের বীরত্ব, মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের জোরে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারা যুদ্ধে জয়ী হয়ে স্বাধীনতা ফিরে পেল যা তারা হারিয়েছিল যখন জার্মানি ও অস্ট্রেয়া-হাঙ্গেরির মতো শক্তিশালী মিত্ররা তাদের পাশে ছিল। যুদ্ধের ইতিহাসে বহু অভাবনীয় ঘটনার মধ্যে এটা প্রকৃতই একটা যেখানে শক্তিশালী মিত্রদের পাশে নিয়ে তুরস্ক শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়েছিল অথচ সেই পরাজয়ের পরে তারা যখন একাই লড়বার সঙ্কল্প নিল তখন অবশেষে জয় তাদের করায়ত্ত হল। এই ইতিবৃত্তের গোপন রহস্যটা হল

যখন সুলতান ও তাঁর অধীনস্থ অন্যান্য অফিসারেরা পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তখন কামাল পাশা ও তাঁর সহযোগীরা তা করেননি।

পৃথিবীর অন্য এক প্রান্তের আরেকটি দেশ থেকে আরেকটি উদাহরণ আপনাদের দিই। সে দেশটি হল আয়ারল্যান্ড। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন আয়ারল্যান্ডের শত্রুপক্ষ ব্রিটেন এক জীবনমরণ সংগ্রামে জড়িত তখন আইরিশ বিপ্লবীরা স্বাধীন হবার জন্য একটা প্রচেষ্টা চালায়। তাদের মূলমন্ত্র ছিল "ব্রিটেনের দুঃসময় হলেই তা আয়ারল্যান্ডের সুসময়।" সেই অনুসারে তারা ১৯১৬ সালের ইস্টারের সময় বিদ্রোহ করে। ইস্টারের এই বিদ্রোহ কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই নির্মমভাবে দমন করা হল। সেইসময় কিছু আয়ারল্যান্ডবাসী তাদের স্বদেশি বিদ্রোহীদের "বদ্ধ পাগল" আখ্যা দিয়েছিল। ইস্টারের এই বিদ্রোহ অতি সহজে দমন করা গেলেও বাস্তবে এই আন্দোলনের প্রভাব ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং ১৯১৯ সালে আরও শক্তিশালী একটা বিদ্রোহের আকারে তা প্রকাশ পেল— বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার ঠিক এক বছর পরে।

ইতিহাসের এও এক আশ্চর্য ঘটনা যে ১৯১৬ সালের আইরিশ বিদ্রোহ ব্রিটিশ অতি সহজেই দমন করতে পেরেছিল যখন তারা নিজেরাই এক জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল কিন্তু সেই একই আইরিশ বিদ্রোহীদের হাতে তাদের পরাজয় ঘটল যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে তারা বিজয়ীর শিরোপা মাথায় পরেছে। যদি ১৯১৬ সালে আইরিশ বিদ্রোহীরা মানসিকভাবে পরাজয় স্বীকার করে নিত তা হলে ১৯১৯ সালের বিদ্রোহ কখনওই ঘটত না এবং আয়ারল্যান্ডও বর্তমানের রূপ পেত না। ভারতবর্ষেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়নের জন্য একটা বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিল, যে প্রচেষ্টা সহজেই ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয়দের মানসিকতা সেই পরাজয়কে মেনে নেয়নি। গত যুদ্ধে ব্রিটিশদের সাফল্য ও ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতের জনগণের মধ্যে একটা রাজনৈতিক সচেতনতা দেখা দিতে থাকে এবং সেটা এমন একটা বিশাল আকার ধারণ করে যে এখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ সেই আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি।

এইসব ঘটনা থেকে আমরা যা উপলব্ধি করতে পারি তা হল যে কোনও দেশ ও জাতি যদি জেতবার আশা এবং চূড়ান্ত জয় যে তাদের অনিবার্য এই আত্মবিশ্বাসটা হারিয়ে ফেলে তা হলে তারা কোনও দিন জয়যুক্ত হতে পারবে না।

অপরপক্ষে, সাময়িক ব্যর্থতা ও পরাজয় সত্ত্বেও সব শেষে আমরা সফল হবই এই অবিচলিত বিশ্বাসকে অবলম্বন করে আমরা যদি লড়াই চালিয়ে যেতে পারি তা হলে পৃথিবীর কোনও শক্তিই প্রাপ্য সাফল্য থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে পারবে না। আমাদের লড়াই হল ন্যায় ও সত্যের জন্য, স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্মগত অধিকার ফিরে পাবার জন্য এ লড়াই আমরা নিশ্চয় জিতব, আমাদের শুধু লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না।

আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধের প্রথম দফায় আমরা হেরে গেছি, এই সত্যকে লুকিয়ে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বর্মাদেশের লড়াই শেষ হয়ে গেছে। তার বিপরীতটাই সত্য কারণ আজাদ হিন্দ ফৌজ ও জাপানের সেনাবাহিনী বর্মাদেশের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে এখনও লড়ছে, এবং তারা সেই লড়াই চালিয়ে যাবে যতক্ষণ তাদের

শরীরে এতটুকু প্রাণশক্তি অবশিষ্ট থাকে। আমরা যারা বর্মা ছেড়ে চলে এসেছি আমরা লড়াই থেকে পালিয়ে আসিনি। আমাদের আসার একটাই উদ্দেশ্য, তা হল অন্যান্য রণক্ষেত্রে লড়াই অব্যাহত রাখা। আমরা এক রণক্ষেত্র থেকে অন্য রণক্ষেত্রে চলেছি। আমাদের সামনে শুধু একটাই লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার একটাই পথ— সেই পথ হল সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সুতরাং বর্মাদেশে সম্প্রতি আমাদের যে হার স্বীকার করতে হয়েছে তা কোনওভাবেই আমাদের ভবিষ্যতের কর্মপন্থাকে প্রভাবিত করছে না। "চলো দিল্লি" এখনও আমাদের স্লোগান ও আজ়াদ হিন্দ ফৌজের রণহুঙ্কার। হয়তো আমরা ইম্ফল হয়ে দিল্লি যাব না। যেমন রোমে যাবার পথ অনেক, দিল্লি যাবারও অনেক পথ আছে। এবং এই অনেক পথের একটা ধরেই আমরা অগ্রসর হব এবং একদিন আমরা আমাদের লক্ষ্য— ভারতের রাজধানী দিল্লিতে পৌঁছব। যদি আমাদের মুক্তিফৌজের সব সেনাদের শুধু আত্মাটুকুই অবশিষ্ট থাকে, তা হলেও মাতৃভূমির অভিমুখে আমাদের অভিযান বন্ধ হবে না।

সাম্প্রতিক সকল অভিজ্ঞতা থেকে একটা বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই যা আমাদের কাছে দুঃখজনক ও অপমানকর। গত পনেরো মাসে রণক্ষেত্রে আমাদের যে ক'বার পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়েছে সেগুলি ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে ততটা নয় যতটা ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর হাতে। ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মে, ইম্ফল, কলকাতা ও দিল্লি অভিমুখে যাত্রার পথে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীই আমাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ বছর ব্রিটিশদের বর্মাদেশে পুনঃপ্রবেশের সময় অন্য কোনও বাহিনীর তুলনায় ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীরই ভূমিকা ছিল মুখ্য। গত শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সাহায্যেই ব্রিটিশদের পক্ষে বর্মাদেশ অধিকার করা সম্ভব হয়েছিল। এখন আবারও ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সাহায্যেই ব্রিটিশ শক্তি বর্মাতে পুনঃপ্রবেশ করল। তবুও আমি এ কথাও বলব, যে ঘন মেঘ আমাদের আকাশকে আচ্ছন্ন করেছে তাতে একটিই রূপালি রেখা চোখে পড়ছে এবং সেটা হল গত যুদ্ধের সময়কার ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে আজকের ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর পার্থক্য আছে। আজ়াদ হিন্দ ফৌজের অনেক সেনারই ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সেনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগ হয়েছিল। অনেক সময়েই আমাদের সেনাদের তারা জানিয়েছে যে যদি আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনারা আরও অগ্রসর হতে পারে তা হলে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সেনারা তাদের সঙ্গে হাত মেলাবে। আজ়াদ হিন্দ ফৌজের প্রতি এবং ভারতের মুক্তির জন্য ফৌজের সংগ্রামের প্রতি ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে অনেকেরই যে সহানুভূতি আছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনই তারা বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেবার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত নয়। বহুদিন বিদেশি শাসকের অধীনে থাকার ফলে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সেনারা তাদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে এবং তাদের ভয় হল যে শেষ পর্যন্ত যদি ব্রিটিশ শক্তিরই জয় হয় তা হলে তারা বিপদে পড়বে। উপরন্তু তারা আমাদের শত্রুপক্ষের প্রচারে কিছুটা বিশ্বাসও করেছে যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ (ভারতীয় জাতীয় বাহিনী) জাপানিদের হাতে খেলার পুতুলবাহিনী। বর্মাতে আসবার পর ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সেনাদের চোখ খুলবে। তারা নিজের চোখে দেখতে পাবে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার ও আজ়াদ হিন্দ ফৌজ কী করেছে এবং কীভাবে তারা ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই করেছে। তারা নিজের কানে শুনবে "জয় হিন্দ" ধ্বনি— প্রতিটি স্বাধীন ভারতীয় যে ধ্বনি দিয়ে পরস্পরকে সম্বোধন করে। তারা আরও শুনবে ভারতের উদ্দীপক জাতীয় সংগীত বর্মাদেশের স্বাধীন ভারতীয়দের কণ্ঠে। ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীর সেনা ও আরও যারা ব্রিটিশদের সঙ্গে বর্মাদেশে

এসে পৌঁছচ্ছে তাদের এই দেশে আসার পরে যে অভিজ্ঞতা হবে, আগামী দিনের জন্য তার প্রভাব হবে অচিন্তনীয়।

বন্ধুরা! আমি আবার ইউরোপের যুদ্ধের কথায় আসি। এমন একটা সময় ছিল যখন জার্মান সেনাবাহিনী রাশিয়াতে প্রবেশ করে স্টালিনগ্রাড পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। আমি চিন্তা করি যে তখন কতজন মনে ভাবতে পেরেছিল যে একদিন ঘটনার স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হবে, সোভিয়েত বাহিনী পৌঁছে যাবে বার্লিনে। এই যুদ্ধের একটা চমকপ্রদ বিস্ময় হল জার্মানির পরাজয়। ক্লসউইটজ্ একেবারে যথার্থ কথাই বলেছিলেন যখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে "যুদ্ধে বহু বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে।" তবে এখনও আরও অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে বাকি আছে এবং তার মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা আমাদের শত্রুপক্ষকে বিশেষ খুশি করবে না। আপনাদের সকলেরই জানা আছে যে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল যে যদি জার্মানি পরাস্ত হয় তা হলে সেই ঘটনা সোভিয়েত ও ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে একটা তীব্র বিরোধিতার সূচনা করবে। সেই বিরোধিতা এখনই শুরু হয়ে গেছে ও দিনে দিনে তা আরও বাড়তে থাকবে। সেইদিন খুব বেশি দূরে নয় যখন আমাদের শত্রুরা উপলব্ধি করবে যে তারা জার্মানিকে পরাস্ত করতে সফল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পরোক্ষভাবে তারা ইউরোপীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অন্য একটি শক্তিকে প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করেছে— সেই শক্তিটি হল— সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভবিষ্যতে হয়তো দেখা যাবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া আরও বিপজ্জনক শত্রুরূপে দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পটপরিবর্তনের উপর আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গেই নজর রাখতে থাকবে এবং সেই পরিবর্তন থেকে তারা যথাসম্ভব সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতে থাকবে। আমাদের বৈদেশিত নীতির মূল কাঠামো আগেও যা ছিল ভবিষ্যতেও তাই থাকবে— ব্রিটেনের শত্রু হবে ভারতের মিত্র।

এতদিনে এই বিষয়টা স্পষ্টই বোঝা গেছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্য ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিজোটের উদ্দেশ্য থেকে একেবারেই আলাদা, যদিও জার্মানি ছিল দুই পক্ষেরই শত্রু। সান ফ্রান্সিসকোর সম্মেলনে সেটা আবারও প্রমাণিত হল কারণ সেখানে সোভিয়েত বৈদেশিক কমিশনার এম মলোটভ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিজোটের দাবির কাছে কিছুতেই মাথা নত করলেন না। এমনকী মন মলোটভ ব্রিটেন ও আমেরিকা, যারা যথাক্রমে ভারতবর্ষ ও ফিলিপাইনসের প্রতিনিধিত্ব করছিল, তাদের কাগজপত্রগুলি যথাযথ কিনা সেই সম্বন্ধেও প্রশ্ন তোলার স্পর্ধা দেখালেন। সান ফ্রান্সিসকোর সম্মেলনে সোভিয়েত ও ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর মধ্যে যে মতবিরোধের প্রকাশ দেখা গেল তা প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক গভীর ও আরও বিশাল মাপের বিরোধের পূর্বাভাস মাত্র, যা আগামী দিনের পৃথিবীর জন্য জমা করা রইল। এদিকে সোভিয়েত ও ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর মধ্যে মতবিরোধ চলতে থাকলেও আমাদের কিন্তু ভারতের প্রধানতম শত্রু ব্রিটেনের প্রকৃত ক্ষমতা ও মতিগতি সম্বন্ধে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন থাকতে হবে। যতদিন ব্রিটেন আমেরিকার সহযোগিতা ছাড়াই যুদ্ধ চালাচ্ছিল, সে যুদ্ধ ইউরোপ বা পূর্ব এশিয়া যেখানেই হোক না কেন, তারা প্রতিটি লড়াইয়ে পরাজিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে তাদের সাফল্যের প্রথম ও প্রধানতম কারণ হল আমেরিকার নেতৃত্ব ও আমেরিকার সাহায্য। আমি আগেও বলেছি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়ু ফুরিয়ে আসছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এখন একটি অবক্ষয়ী ও মৃতপ্রায় সাম্রাজ্য এবং বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে তার ফুরিয়ে আসা জীবনকে প্রলম্বিত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু একজন

মরণাপন্ন বৃদ্ধ ব্যক্তির আয়ু দক্ষ চিকিৎসক ও ওষুধ-ইঞ্জেকশনের সাহায্যে বাড়ানো গেলেও তার যৌবনোচিত উদ্দীপনা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আমেরিকান ক্র্যাচের উপরে ভর দিয়ে এগিয়ে যাবে ভাবছে, কিন্তু সেই ক্র্যাচে বেশিদিন কাজ হবে না। আমাদের এখন একটা কাজই করতে হবে যেটা হল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধিষ্ঠানের উপরে সজোরে একটা আঘাত হানতে হবে কারণ তাদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের মূল ভিত্তিই হল ভারতবর্ষে।

পূর্ব এশিয়াতে আমাদের কর্মযজ্ঞ অপরিবর্তিত থাকবে। পূর্ব এশিয়াতে আমার স্বদেশবাসী যাঁরা রয়েছেন তাঁদের কাছে আমার দাবি "সর্বাত্মক প্রস্তুতি"-র জন্য প্রচেষ্টা। সাম্প্রতিক যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ করবার জন্য আমাদের প্রয়োজন আরও সেনা, আরও অর্থ ও আরও রসদ। সর্বোপরি আমাদের প্রয়োজন অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও অনমনীয় সঙ্কল্প। আমি আপনাদের মনে করিয়ে দেব ব্রিটিশদের ১০০ বছর লেগেছিল ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ভারতবাসীদের সম্পূর্ণরূপে পদানত করতে। আমাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করবার জন্য যদিও আরও কয়েক বছর লড়াই চালিয়ে যেতে হয় তা হলে তাতে কারওর কোনও অসন্তোষের কারণ আমি দেখি না। ভারতীয়রা পৃথিবীর যে যেখানে আছেন— এমনকী আমাদের শত্রুদের আপন দেশেও তাঁরা আজ সকলে পূর্ণ সচেতন যা আমাদের পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের জন্য প্রকৃতপক্ষে খুবই আশাব্যঞ্জক। সম্প্রতি আপনারা এর উদাহরণ দেখেছেন সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে যেখানে আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়রা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের নেতৃত্বে ভারতের পূর্ণ স্বরাজের দাবি করেছেন। এমনকী ব্রিটিশ সরকারের উর্দি পরা খানসামা স্যার ফিরোজ খান নুন পর্যন্ত সর্বজনসমক্ষে বলতে বাধ্য হয়েছেন যে পৃথিবীর কোনও শক্তিই ভারতবর্ষকে তার ন্যায্যত প্রাপ্য স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। তাঁর মত অনুসারে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ও বাহিরে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি এখন ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়েছে ও তাদের আর চুপ করিয়ে রাখা যাবে না।

সবশেষে, আমি আপনাদের— থাইল্যান্ডে আমার স্বদেশবাসীদের— আহ্বান করব, আপনারা এগিয়ে আসুন। আমাদের সামনে যে কঠিন লড়াই এখনও বাকি আছে তার প্রস্তুতিতে সাহায্য করে আপনাদের কর্তব্যপালন করুন। সর্বোপরি আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে আমাদের মতো আপনারাও মনের মধ্যে সেই আশা ও আত্মবিশ্বাস রাখুন যে যুদ্ধশেষে জয় আমাদেরই হবে। আত্মিক শক্তিই আমাদের আন্দোলনের মূল ভিত্তি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং তা ঘটবে অদূর ভবিষ্যতে। এই অটল বিশ্বাস নিয়ে আসুন আমরা ভারতের মুক্তির সংগ্রাম অব্যাহত রাখি।

জয় হিন্দ!

[এই বক্তৃতার শেষে নেতাজি সমবেত জনতাকে প্রশ্ন করলেন তাদের মধ্যে কত জন জয়যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চান। উপস্থিত জনতার প্রতিটি মহিলা ও পুরুষ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সমর্থন জানালেন উদ্দীপ্ত কণ্ঠে দীর্ঘ জয়ধ্বনি দিয়ে। সভা শেষ হল জাতীয় সংগীত গাওয়ার পর।]

৬১

জার্মানির পরাজয়

[২৪ মে ১৯৪৫ তারিখে বর্মাদেশের বাইরের কোনও অজ্ঞাত স্থান থেকে ইউরোপীয় পরিস্থিতি নিয়ে দেওয়া বিবৃতি এবং আপৎকালীন সরকারের পক্ষে আজাদ হিন্দ রেডিয়ো, সিঙ্গাপুরের মাধ্যমে ২৫ মে ১৯৪৫ তারিখে সম্প্রচারিত][১]

এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এক নাটকীয় ভঙ্গিতে ইউরোপের যুদ্ধের পরিস্থিতির অকস্মাৎ পরিবর্তন ঘটেছে। যদিও জার্মানি যে আর বেশিদিন লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে না সেটা বছরের প্রথম থেকেই সকল পর্যবেক্ষকের চোখে ধরা পড়েছিল কিন্তু কেউই অনুমান করতে পারেনি ঠিক কখন ও কীভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটবে।

হিটলারের মৃত্যুর খবর ঘোষণা করার মুহূর্ত পর্যন্ত যে সাহস, প্রকৃত যোদ্ধার মানসিকতা ও আত্মত্যাগের সঙ্গে জার্মান সৈন্যেরা লড়াই করেছে, তা অবশ্যই সমগ্র বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করবে। আমার নিজের অভিমত হল জার্মানির পরাজয় সামরিক নয়, এ হল রাজনৈতিক পরাজয়। সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্য দেশগুলির সঙ্গে জার্মানির বৈদেশিক নীতিই তাদের শোচনীয় সামরিক পরাজয়ের জন্য মূলত দায়ী। বৈদেশিক নীতির বিষয়ে জার্মান সরকার যে মারাত্মক ভুল করেছিল তা হল তারা জার্মান জাতির প্রতি বিসমার্কের এই উপদেশটি "কখনও একই সঙ্গে দুটি পৃথক রণক্ষেত্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না"— সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিল। যখন ১৯৪০ সালে সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী এম মলোটভ বার্লিন সফরে এলেন তারপর থেকেই ইউরোপীয় পরিস্থিতির মোড় ঘুরল। ঠিক সেই সময়েই জার্মান রাজনীতিবিদদের উচিত ছিল যে কোনও প্রকারে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া। বিসমার্ক বেঁচে থাকলে তিনি সেটাই করতেন। কিন্তু জার্মান জাতির দুর্ভাগ্য যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যেমন ঘটেছিল ঠিক তেমনই এই যুদ্ধেও রাজনীতিবিদদের ভুল চালের জন্য তাদের পরাজয় ঘটল।

যে প্রশ্নটি এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হল ভবিষ্যতে ইউরোপে কী ঘটতে চলেছে। আমার নিজের ধারণা এই বিষয়ে একেবারেই স্বচ্ছ, এবং আমি অতীতে এই বিষয়ে বহুবার যে মতামত ব্যক্ত করেছি এখনও দৃঢ়ভাবে সেই অভিমতই প্রকাশ করব। অর্থাৎ জার্মানির পতন সোভিয়েত ও ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর মধ্যে একটা তীব্র বিরোধের সূচনা করবে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধে যোগদান করেছিল তার সঙ্গে যে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যের বেশ কিছুটা তফাত আছে তা সারা বিশ্বের জানা আছে। সোভিয়েত সরকার জানে তাদের সৈন্য ও তাদের জনগণের সাহসিকতা,

১. India Fights On, pp. 26-31, এবং Testament of Subhas Bose, pp. 79-81.

যুদ্ধজয়ের মানসিকতা ও স্বার্থশূন্য আত্মত্যাগই জার্মানির পরাজয়ের জন্য প্রথম ও প্রধান কারণ। অতএব তাদের নিজস্ব ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন সোভিয়েত সরকার কখনওই যুদ্ধোত্তর ইউরোপের পুনর্গঠনের কাজে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের কাছে নতিস্বীকার করবে না। এই মন্তব্য যে নির্ভুল তা ইতোমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে সান ফ্রান্সিসকোতে, যেখানে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন কার্যত বানচাল হয়ে গেল যখন এম মলোটভ শহর ছেড়ে চলে গেলেন।

ইউরোপীয় রাজনীতিতে যা ঘটতে চলেছে সান ফ্রান্সিসকোর সম্মেলন তারই পূর্বাভাস মাত্র। ইউরোপ এখন ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বর্তমান যুদ্ধের আগে ইউরোপীয় রাজনীতিতে একটা অস্থিরতা ছিল, বৃহৎ শক্তিগুলি ছিল একে অপরের বিপরীত দিকে। জার্মানির কিন্তু ইউরোপের পুনর্বিন্যাসের একটা পরিকল্পনা ছিল এবং তারা সেই পরিকল্পনা অনুসারে গত পাঁচ বছর ধরে কাজ করে চলছিল। এখন জার্মানির পতনের ফলে সেই পরিকল্পনা রূপায়ণের আর কোনও সম্ভাবনা রইল না। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে মাত্র আর একটি দেশ আছে যাদের একটি পরিকল্পনা আছে যা রূপায়ণের চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে— সে দেশ হল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ব্রিটেনেরও একটি পরিকল্পনা আছে— যদি আমরা তাকে পরিকল্পনা আখ্যা দিতে পারি, তা হল তাদের নিজস্ব স্বার্থে ফ্রান্স এবং সম্ভব হলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে ইউরোপে শক্তির একটা ভারসাম্য বজায় রাখা। ইউরোপীয় দেশগুলি এই পরিকল্পনা কোনও মতেই মেনে নেবে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা বিবেচনা করলে আমরা দেখব পৃথিবীর ইতিহাসে "আমেরিকান শতাব্দী" প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের যতই আগ্রহ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাক না কেন আটলান্টিক মহাসাগরের ওপার থেকে ইউরোপীয় রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব হবে না। উপরন্তু পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন বা আমেরিকা কখনওই সামাজিক পুনর্গঠনের এমন কোনও পরিকল্পনা নেবে না যা ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। ফলস্বরূপ আমাদের এই সিদ্ধান্তেই আসতে হচ্ছে যে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ব্যবস্থা এত সফল হয়েছে সেই ব্যবস্থা ইউরোপীয় দেশগুলিতে প্রয়োগ করে দেখা ছাড়া আর বিকল্প কোনও পথ নেই। ইউরোপ পুনর্গঠনে সোভিয়েত পরিকল্পনা গ্রহণ করার পথে যে ব্রিটেন ও আমেরিকা এবং আমেরিকার থেকে ব্রিটেনই যে আরও বেশি অন্তরায় সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এর প্রধানতম কারণ হল গত পাঁচ বছরে ইউরোপের জনসাধারণের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এতটাই তীব্রভাবে বামের দিকে ঝুঁকেছে যে জাতীয়তাবাদী-সমাজবাদী জার্মানির পতনের পরে পুনর্গঠনের চরিত্র মূলত বামপন্থী না হলে কোনও প্রশাসন ব্যবস্থা তা সহ্য করবে না এবং বর্তমান সামাজিক কাঠামোতেও তা বেমানান হবে। জার্মানির ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে গত বারো বছরে, জার্মানির জাতীয়তাবাদী-সমাজবাদী সরকারের হাতে তাদের পুরাতন পুঁজিবাদী কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে। জার্মান জনগণের সামনে কেবলমাত্র যে পথ খোলা আছে তা হল চরমপন্থী এক সামাজিক শাসনব্যবস্থা যা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রাখতে পারবে। তবে এই পথে তারা অগ্রসর হবে কিনা তা নির্ভর করছে মিত্রশক্তি জার্মান জনগণের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করবে তার উপরে।

জার্মানির সঙ্গে যদি অপমানজনক আচরণ না করা হয় এবং জাতির মনে প্রতিশোধের মনোভাব পোষণ করবার মতো পরিস্থিতি যদি সৃষ্টি না করা হয় তা হলে অনিবার্যভাবেই জাতীয়তাবাদী-সমাজবাদী ব্যবস্থা থেকে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন আসবে, জার্মান জনগণ

কিছুদিনের জন্য এই পরিবর্তিত ব্যবস্থায় নিমজ্জিত হয়ে থাকবে, এবং তারপর আবার আমরা চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উত্থান হতে দেখব যা থেকে আবার একটা ইউরোপীয় যুদ্ধের— হয়তো বা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হবে। আজ ইউরোপে একজন ব্যক্তিই আছেন যাঁর হাতে ইউরোপীয় দেশগুলির ভাগ্য নির্ধারিত হতে পারে আগামী কয়েক দশক ধরে, তিনি হলেন মার্শাল স্টালিন। তার ফলে আগামী দিনগুলিতে সমগ্র বিশ্ব, সর্বোপরি ইউরোপ রুদ্ধশ্বাস উৎকণ্ঠায় সোভিয়েত ইউনিয়নের গতিবিধির উপরে নজর রাখতে থাকবে। জার্মানির এই দুঃখজনক সময়ে আমি আমার নিজের ও ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে জার্মান জনগণকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের সমর্থন ও সাহায্য করবার জন্য।

৬২

যুদ্ধবন্দিদের প্রতি দুর্ব্যবহার

[বর্মাদেশে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর হাতে বন্দি আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে বিবৃতি, ব্যাঙ্কক, ৩০ মে ১৯৪৫][১]

বর্মাদেশের নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া খবর যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তাতে জানা গেছে যে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর হাতে বন্দি আজ়াদ হিন্দ ফৌজের (ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর) অফিসার ও সেনাদের উপর প্রতিশোধমূলক ও বর্বরোচিত আচরণ করা হচ্ছে। ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী, বিশেষত ব্রিটিশদের স্বভাবই আছে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধবন্দিদের প্রতি দুর্ব্যবহার করার জন্য জার্মানি ও জাপানের সমালোচনা করা, সে কথা সর্বজনবিদিত। এখন আমি তাদের প্রশ্ন করতে চাই যে কেন আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনা, যারা তাদের হাতে বর্মাতে ধরা পড়েছে, তাদের সঙ্গে তারা সেই একই দুর্ব্যবহার করছে। বর্মাদেশের মিত্রশক্তির বাহিনীতে যদিও একাধিক দেশের সৈন্য আছে কিন্তু আজ়াদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সেনাদের উপর দুর্ব্যবহারের দায়িত্ব কেবলমাত্র ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উপরেই বতাবে। অন্যদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই অজুহাত দেখাতে পারবে না যে আমাদের হাতে বন্দি তাদের সেনাদের উপর আমরা দুর্ব্যবহার করছি। মিত্রশক্তির সেনারা স্বেচ্ছায় আমাদের কাছে এসেছে ও আজ়াদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিতে চেয়েছে। এমনকী কিছুদিন আগে দিল্লি রেডিয়ো থেকেও জানানো হয়েছে যে যারা আজ়াদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছে তারা আমাদের কাছে ভাল ব্যবহার পেয়েছে।

এমন হতে পারে যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা পাল্টা দুর্ব্যবহার করবার অবস্থায় আমরা নেই অথচ তারা আছে, সুতরাং তারা আমাদের অফিসার ও সেনাদের সঙ্গে যথেচ্ছাচার করতে পারে। আমি কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সাবধান করে দিতে চাই যে তারা যদি আজ়াদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সেনাদের উপর দুর্ব্যবহার চালিয়ে যেতে থাকে তা হলে আমরাও বাধ্য হব পাল্টা ব্যবস্থা নিতে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা নেবার আগে আরেকটা উপায় আছে যেটা সহজ ও কার্যকরী। আমার স্বদেশবাসীরা যদি ভারতের অভ্যন্তরে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ও বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তা হলে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে ও তাদের অন্যায় তারা উপলব্ধি করবে। ভারতকে স্বাধীনতা দেবার জন্য ব্রিটিশদের বাধ্য করবার মতো যথেষ্ট জোরালো জনমত দেশে না থাকতে পারে কিন্তু ব্রিটিশদের হাতে যুদ্ধবন্দি হয়ে আছে যে সব আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনা, তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় জনমত যে আমাদের দেশে আছে এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আজাদ হিন্দ ফৌজের এইসব সেনারা সৎ এবং প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী, তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার

---

১. India Fights On, pp.32-34.

জন্য লড়াই করছিল। তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সাহসের সঙ্গে লড়েছে সেটা ঠিক, কিন্তু তারা নিষ্পাপ মন ও নিষ্কলঙ্ক হাতে সেই লড়াই করেছে। অতএব দেশবাসীর কাছে আমার এই আবেদন যে এই যুদ্ধবন্দিদের তারা সমর্থন করুক, কারণ তারা তাদেরই দেশের লোক, স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তারা লড়াই করেছে এবং তার জন্য এখন তারা ব্রিটিশের নির্মম, প্রতিহিংসাপরায়ণতার শিকার হয়েছে। আমি দেশবাসীর কাছে আরও আবেদন করব যে যুদ্ধবন্দিদের ভাগ্যে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছে সেই বিষয়ে নির্ভুল তথ্য দিতে তারা যেন ব্রিটিশদের বাধ্য করে কারণ আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহের যে আইন প্রয়োগ করার বিষয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ প্রবলভাবে সচেতন তারা নিজেরা সেই আইন কত দূর মেনে চলে তা যাতে বিশ্বের সকলে বিচার করতে পারে।

৬৬

ওয়াভেলের প্রথম প্রস্তাবের বিষয়ে অভিমত

[আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের বেতারকেন্দ্র থেকে বিবৃতি,
সায়গন, ১৮ জুন ১৯৪৫][১]

বোন ও ভাইয়েরা!

গত ১৪ জুন নতুন দিল্লি থেকে ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের দেওয়া বেতার বক্তৃতা আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম, যেখানে তিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেছেন, এবং যার জন্য লর্ড ওয়াভেলকে লন্ডন অভিমুখে একটা দীর্ঘ সফর করতে হয়েছে। যদিও ভাইসরয়ের কথা বলার ভঙ্গিতে এই ধারণাই হয় যে দেশপ্রেমিক ভারতীয়রা এই প্রস্তাবে রাজি হবেন কিনা সেই বিষয়ে তিনি নিজেই বিশেষ আশাবাদী নন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের জনগণ যে এই বিষয়টি নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

এই সন্ধিক্ষণে স্বদেশবাসীকে জানানো প্রয়োজন যে ব্রিটিশ সরকারের এই প্রস্তাবে এখানকার পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে। প্রথমত আমরা মনে করি, এবং যেটা ভাইসরয় নিজেও স্বীকার করেছেন, সেটা হল এর পিছনে ব্রিটিশ সরকারের এইমাত্র উদ্দেশ্য হল জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতীয়দের সমর্থন জোগাড় করা। ক্লান্ত ব্রিটিশ সেনারা এখন ইউরোপীয় যুদ্ধের শেষে বিশ্রাম চাইছে, কাজেই তারা চায় অন্যেরা তাদের হয়ে যুদ্ধ করুক যাতে যুদ্ধের শেষে জয় করায়ত্ত হলে ব্রিটিশ তার মুনাফা লুটতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতীয় সেনারাও রণক্লান্ত এবং বর্মাদেশে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক সাফল্যের পরে তারাও বিশ্রাম আশা করতে পারে। তার ফলে সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ব্রিটিশদের এখন যে কাজটা করা অত্যন্ত প্রয়োজন তা হল ভারতীয়দের অর্থ, ও ভারতীয় সেনাদের রক্তদানে সম্মত করা। যখন ভারতের অভ্যন্তরে ও ভারত-বর্মা সীমান্তে লড়াই চলছিল তখন ব্রিটিশের পক্ষে ভারতীয় সৈন্যদের এই বলে প্রতারণা করা সহজ ছিল যে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য লড়াই করা তাদের কর্তব্য। এবং তারপরেও ব্রিটিশ সেই প্রতারণা চালিয়ে গেছে এই কথা বলে যে বর্মাদেশের যুদ্ধও সেই প্রতিরক্ষারই অঙ্গ।

কিন্তু এখন যে যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে ভারতের অর্থ ও রক্ত ব্রিটিশের প্রয়োজন, তা বর্মাদেশের সীমানা অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। কাজেই এই নতুন রণক্ষেত্রগুলিতে ভারতীয়দের অংশগ্রহণে সম্মত করবার জন্য এখন একটি নতুন ফন্দির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এই কারণেই ব্রিটিশ সরকার এখন এই নতুন প্রস্তাব এনেছে, যা

---

১. Testament of Subhas Bose, pp.83-87.

বাস্তবে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের পুরনো প্রস্তাবের সামান্য পরিবর্তিত বয়ান মাত্র।

এর উত্তরে আমরা ভারতীয়েরা কী বলব সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আমাদের অবশ্যই চিন্তা করে দেখতে হবে যে জাপানের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের এই যে লড়াই, যাতে আমাদের যোগ দিতে বাধ্য করার চেষ্টা চলছে, তাতে আমাদের কী লাভ হতে পারে? ব্রিটিশ শক্তি তাদের সাম্রাজ্যের সীমান্ত বিস্তারের আগ্রাসী যুদ্ধে যোগ দিতে যদি ভারতীয়দের বলপূর্বক বাধ্য করে সেটা এক ব্যাপার। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভারতীয়রা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ব্রিটিশদের পক্ষে ব্রিটিশদের যুদ্ধে লড়াই করতে সম্মত হয় তা হলে সেটা হবে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। এই সময়ে ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধে সহযোগিতার অর্থ হবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আমাদের নৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ভারতীয়দের জন্যও— সেটা হবে রাজনৈতিক আত্মহননের সমান।

যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রিটিশ প্রচারযন্ত্র ও তাদের মুখপাত্রেরা ভারতীয় জনগণকে বোঝাতে পেরেছিল যে জাপানিরা এসে ভারতের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছে কাজেই দেশের সুরক্ষার বেড়া ভেঙে পড়ার অবস্থা। কিন্তু এখন পূর্ব এশিয়াতে যুদ্ধের পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়াতে কোনও ভারতীয়েরই আর এখন ব্রিটিশের হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তার ফলে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে যে কোনওভাবে সম্মতি দেওয়ার অর্থই হল ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতীয়দের অমূল্য জীবন স্বেচ্ছায় বিসর্জন দেওয়া ও দুর্মূল্য রসদ জোগানো। কিন্তু তার পরিবর্তে ভারতীয়রা কী পাবে? কিছুই নয়। হয়তো ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কয়েকটা চাকরি, তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

লর্ড ওয়াভেল ও ব্রিটিশ সরকার আমাদের বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করছে যে এই প্রস্তাবে রাজি হলে আমরা 'স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে' পৌঁছতে পারব, কিন্তু এই নিয়ে যুক্তি-তর্ক-আলোচনার সময় আর নেই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন করা বা না করায় ভারতীয়রা আর আগ্রহী নয়। পূর্ণ স্বরাজ ছাড়া আর কোনও কিছুতে ভারত আর সম্মত হবে না। কিন্তু কোনও ভারতীয় যদি স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজিও থাকে তা হলেও এখনকার এই প্রস্তাবে রাজি হবার পরিবর্তে আন্দোলন চালিয়ে গেলে তাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর সম্ভাবনা বেশি। যে মুহূর্তে আমরা এই প্রস্তাবে সম্মতি দেব, সেই মুহূর্তেই ব্রিটিশ সরকার এই সিদ্ধান্ত নেবে যে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারও দেবার প্রয়োজন নেই কারণ তাদের জানা হয়ে যাবে যে আমরা তার থেকে আরও অনেক স্বল্পমূল্যেই বিকিয়ে যাব। আমার এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে এই প্রস্তাবে রাজি হলে ভবিষ্যতে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পাওয়াও আমাদের পক্ষে দুরূহ হবে, পূর্ণ স্বরাজের কথা তো দূরের কথা। সংক্ষেপে, এই প্রস্তাব মেনে নিলে আমাদের কোনও লাভ নেই কিন্তু ক্ষতি অনেক এবং আমাদের সাহসের অভাব ব্রিটেনকেই লাভবান করবে।

সাধারণ পরিস্থিতিতে ভারতীয় জাতীয় নেতাদের দশজনের মধ্যে হয়তো একজনও বর্তমানের এই প্রস্তাবে সাড়া দিতেন না কিন্তু ধূর্ত ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা ভারতের কাছে এই প্রস্তাব পেশ করবার জন্য উপযুক্ত একটা মানসিক সময় বেছে নিয়েছেন। তাঁরা আশা করছেন যে ভারতীয়রা এখন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক যুদ্ধজয়ের দৃষ্টান্তে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে ও তার ফলে তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে বর্তমান যুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীনতা লাভের কোনও আশা নেই। সুতরাং মন্দের ভাল— এই অভিমত অনুসারে, যে প্রস্তাব এখন ব্রিটিশ তাদের সামনে রেখেছে সেটাই তারা মেনে নেবে। শ্রীরাজাগোপালাচারী প্রমুখ

নৈরাশ্যবাদী ও মধ্যপন্থী রাজনৈতিক নেতা এই ধরনের মনোভাব পোষণ করতে পারেন কিন্তু এই মনোভাব ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক এবং এর ফলে অবধারিতভাবে আমাদের স্বাধীনতা লাভের সময়সূচি বহু বছর পিছিয়ে যাবে।

এই যুদ্ধের প্রথম বিস্ময়কর ঘটনা হল জার্মানির পরাজয়। কিন্তু আরও অনেক বিস্ময়কর ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে এবং তার মধ্যে বেশ কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের শত্রুপক্ষের কাছে খুব সুখকর হবে না। ইউরোপে যুদ্ধের অবসান হয়েছে ঠিকই কিন্তু পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ আরও দীর্ঘদিন চলবে এবং ভবিষ্যতে আমাদের সামনে আরও অনেক সুযোগ আসবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন অব্যাহত রাখার ও পরিশেষে স্বাধীনতা অর্জন করার। সেই কারণেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের সামনে এই অপমানকর প্রস্তাব রেখেছে এবং তারা আশা করছে যেহেতু এই মুহূর্তে যুদ্ধের পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে সুতরাং সেই সাফল্যে অভিভূত হয়ে আমরা ভারতবাসীরা এই প্রস্তাব এক কথায় স্বীকার করে নেব, কিন্তু আমি মনে করি এই প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার একেবারেই কোনও যুক্তিসম্মত কারণ নেই। প্রথমত, ব্রিটিশ এখনও যুদ্ধে জয়ী হয়নি; এবং দ্বিতীয়ত, বর্তমানের এই যুদ্ধ চলাকালীন আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে সফল নাও হই তবুও যখন যুদ্ধ শেষ হবে ও শান্তি ফিরে আসবে সেই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে আমরা আরও একবার, শেষ সুযোগ পাব আমাদের স্বাধীনতা পাবার। ইতিহাসের পাতায় সফল বিপ্লবের আরও কিছু উদাহরণ পাওয়া যাবে, যা শুরু হয়েছিল একটা বড় যুদ্ধ শেষ হবার পরে এবং অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রত্যাশিতভাবে বিপ্লবীরা সাফল্য লাভ করেছিল। আয়ারল্যান্ডের উদাহরণ দিই। ১৯১৬ সালে আয়ারল্যান্ডের ইস্টার বিপ্লব নির্মমভাবে দমন করা হয়ে থাকলেও ১৯১৯ সালে কিন্তু বিপ্লবীরা সফল হল, যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশরা সদ্য জয়ী হয়েছে। অনুরূপভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় ঘটেছিল কিন্তু ১৯১৮ সালে তাদের পরাজয়ের পরে তুর্কিরা তাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করে এবং ১৯২১ সালে অবশেষে তারা জয়ী হয়। বর্তমান যুদ্ধে ইউরোপে মিত্রশক্তির জয়ের পরে সিরিয়া ও লেবানন ইতিমধ্যেই স্বাধীন হবার জন্য যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে এবং এক সময়ে জয় যে তাদের করায়ত্ত হবে সেই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

১৯৪২ সালে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতের সামনে যে প্রস্তাব রেখেছিলেন সেই প্রস্তাব আমরা সদর্পে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। সুতরাং আজ সেই একই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে নিজেদের অপমানিত করবার কোনও কারণই আমি দেখি না। এবার আমি ব্রিটিশ প্রস্তাবের গুণাগুণের কথা আলোচনা করব। সতর্কভাবে পরীক্ষা করলে, আমরা দেখব ১৯৪২ সালে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতের সামনে যে প্রস্তাব রেখেছিলেন, বর্তমান প্রস্তাবের বক্তব্য ও সারমর্ম সেই প্রস্তাবের সঙ্গে হুবহু এক। এবারের প্রস্তাবে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে আমাদের জন্য আরও তিনটি আসন রাখা হয়েছে। সেইগুলি হল স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও পররাষ্ট্র; এই দপ্তরসহ অন্য দপ্তরগুলিতে সদস্য নিয়োগ করবেন ভাইসরয় এবং সদস্যেরা সরাসরি ভাইসরয়ের কাছেই দায়বদ্ধ থাকবেন, জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে নয়। অপরদিকে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ বিষয়ক দপ্তরটি ব্রিটিশদের জন্য সংরক্ষিত আছে, অর্থাৎ সর্বাধিনায়ক (সি-ইন-সি)-এর পদটি। বর্তমান প্রস্তাব সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের পুরাতন প্রস্তাবের নতুন সংস্করণ হলেও তাতে এই ধরনের কিছু অত্যন্ত আপত্তিকর বিষয় রয়েছে যে জন্য প্রস্তাবটি একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর

বক্তৃতায় ভাইসরয় খুব স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন যে তিনি কংগ্রেসকে আরও অনেকগুলি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে একটি বলে গণ্য করেন, যে নীতি ব্রিটিশ সরকার আগাগোড়াই অনুসরণ করে এসেছে। ১৯৩১ সালে লন্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তিনি অবজ্ঞাভরে এই নীতিকে অস্বীকার করে বলেছিলেন যে তিনি সেখানে সমগ্র ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন। আজ যদি কংগ্রেস ওয়াভেলের এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তা হলে ব্রিটিশ সরকার এতদিন ধরে কংগ্রেসের ভূমিকার যে ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছে, সেই ব্যাখ্যাই আজ কংগ্রেস স্বীকার করে নিল বলে ধরতে হবে। কীভাবে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী নেতারা এই প্রস্তাবে সম্মতি দেবার কথা ভাবতে পারছেন সেই বিষয়টা আমি মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করতে পারছি না।

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে আরও একটা দুষ্ট অভিসন্ধি আছে। তিনি কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের মুক্তি দেবার আদেশ দিয়েছেন কিন্তু এও বলেছেন যে তাঁর প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়া পর্যন্ত ১৯৪২ সালের বিদ্রোহে যারা যোগ দিয়েছিল তাদের কাউকে মুক্তি দেওয়া হবে না। তাঁর বক্তৃতায় কোথাও তিনি উল্লেখ করেননি যে তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলে ১৯৩৯ ও ১৯৪২ সালে যাদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। কোনও সাংবিধানিক পরিবর্তন ঘটার পরে গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সর্বত্রই রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেবার নীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সেই নীতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হল।

ব্রিটিশ সরকার আমাদের এই কথাই বলে আসছে যে যুদ্ধ যতদিন চলবে ততদিন কোনও সাংবিধানিক পরিবর্তন ঘটবে না, যদিও আমরা দেখছি যে সারা পৃথিবী জুড়ে সর্বত্র সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এখানে পূর্ব এশিয়াতে আমরা কিন্তু এর বিপরীত দৃষ্টান্তই দেখছি। যুদ্ধ চলাকালীন একাধিক দেশে স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছে ও জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে। সুতরাং আপনারা জানবেন যে ব্রিটিশদের এই প্রস্তাব একেবারেই অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা আওয়াজ এবং এর উদ্দেশ্যই হল ভারতীয়দের দাবির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে যথাসম্ভব বিলম্ব ঘটানো এবং শেষে সেই দাবিকে অগ্রাহ্য করা। দায়িত্বসম্পন্ন সরকার গঠন যদি ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য হত তা হলে তারা অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষকে স্বয়ংশাসিত দেশ হিসাবে ঘোষণা করত এবং জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিত।

ভারতের বোন ও ভাইয়েরা! আপনারা দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ পুঁজিবাদীদের হাতে রাজনৈতিক নির্যাতন ও অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়ে রয়েছেন। আসুন আমরা আরও কিছুকাল সেই যন্ত্রণা সহ্য করি। আমাদের যতটুকু আত্মিক ও আর্থিক পুঁজি আছে সবটুকু ব্যবহার করে আসুন আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি এবং সর্বোপরি আসুন আমাদের স্বাধীনতার দাবিতে আমরা অচল থাকি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে পারলে ও স্বাধীনতার বিষয়ে কোনও আপোষ মীমাংসার পথে না গেলে আমরা সারা বিশ্বের অভিমতের কাছে আমাদের স্বাধীনতার প্রশ্নটা জিইয়ে রাখতে পারব। স্বাধীনতার লাভের সেটাই পথ। অপরপক্ষে আমরা যদি এই প্রস্তাব স্বীকার করে নিই, তা হলে আমরা আমাদের সংগ্রামের অবমাননা করব ও সেইসঙ্গে বিশ্বের নৈতিক সহানুভূতিও হারাব।

হয়তো আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট পথ কোনটা? এর উত্তর আমার কাছে একেবারে স্পষ্ট। প্রথমত

আমরা ভারতের বাইরে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাব যতদিন আমাদের শেষ সৈনিক জীবিত থাকবে এবং যতদিন আমাদের বন্দুকে শেষ বুলেটটি অবশিষ্ট থাকবে। দ্বিতীয়ত বিদেশে ভারতের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন যাঁরা বিশ্বের দরবারে এবং সকল আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমাদের আন্দোলনের কথা সর্বসমক্ষে বলতে পারবেন। এবং সবশেষে, আমার স্বদেশবাসী, আপনাদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে সুযোগ আসা মাত্র যাতে আপনারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারেন যা তখন দাবানলের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং হয়তো ব্রিটিশ ভারতীয় সেনারাও আপনাদের সঙ্গে হাত মেলাবেন।

বোন ও ভাইয়েরা! সব শেষে আপনাদের কাছে আমার এই আবেদন, আপনারা আশা ছাড়বেন না। আমি আবারও বলছি ভারতের অভ্যন্তরে ও বাইরে যে শক্তিগুলি কাজ করছে অপ্রতিরোধ্য তাদের গতি। পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যা ভারতীয় জনগণকে তাদের স্বাধীনতালাভের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। ধৈর্য্য ও সংকল্প আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারবে। ভাইসরয় আপনাদের কাছ থেকে শুভবুদ্ধি ও সহযোগিতা চেয়েছেন। তাঁকে আপনারা জানিয়ে দিন যে, আমাদের শুভবুদ্ধি ও সহযোগিতা আমরা রেখেছি ভারতের মুক্তি সংগ্রামের জন্য, আর অন্য কোনও কাজে তার অসদ্ব্যবহার আমরা করব না।

৬৪

স্বাধীনতার বিষয়ে কোনও আপোষ নয়
[সিঙ্গাপুর থেকে বেতার ভাষণ, ১৯ জুন ১৯৪৫][১]

ভারতের বোন ও ভাইয়েরা!

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব ও তার উত্তরে আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত সেই বিষয়ে গতকাল আমি সাধারণভাবে আলোচনা করেছিলাম। আজ আমি আবারও সেই একই বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু তার আগে এই বিষয়ে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে সেইদিকে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। এই বেতারকেন্দ্র থেকে সেই বিবৃতি গতকাল এবং আজ আবার আপনাদের জন্য সম্প্রচার করা হয়েছে। এই বিবৃতির গুরুত্ব আছে কারণ রাজনীতির বিষয়ে সচেতন পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা এই বিবৃতির মাধ্যমে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেছেন এবং যে কারণে এই বিবৃতি একটা অতিরিক্ত গুরুত্ব পেয়েছে সেটা হল পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা এই বিবৃতিতে আলোচিত নীতিতে বিশ্বাস করেন ও সেই নীতিতে তাঁরা অবিচল থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অর্থাৎ কংগ্রেস যদি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে ভারতীয় সেনাদল যখন সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে যোগ দেবে তখন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে, তা হলে সেইক্ষেত্রে স্বদেশীয় সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ছাড়া আমাদের 'আজ়াদ হিন্দ ফৌজ'-এর অন্য কোনও পথ থাকবে না কারণ ভারতীয় সেনারা তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মিত্রগোষ্ঠীতে পরিণত হবে। ব্রিটিশ ও আমেরিকান সংবাদ সংস্থাগুলি ভারতের অভ্যন্তরের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রতিদিনের বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠাচ্ছে। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে এখন কী ঘটছে তার একটা অভ্রান্ত ছবি আমরা পাচ্ছি। ভারত থেকে পাওয়া সংবাদ অনুসারে আমি যা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করছি তা হল অধিকাংশ ব্যক্তিই ব্রিটিশ প্রস্তাবের গৌণ ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আলোচনায় ব্যস্ত; অথচ প্রস্তাবের মৌলিক অংশগুলিতে তাঁরা একেবারেই গুরুত্ব দিচ্ছেন না এবং প্রস্তাবে সম্মতি দিলে তার যে অবধারিত পরিণতি ঘটতে বাধ্য সে বিষয়টা তাঁদের চিন্তার বাইরে থাকছে। সেই কারণে আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ যে ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করবার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির বিষয়টি আপনারা অনুধাবন করবেন, কারণ প্রস্তাব গ্রহণ করলে অন্ততপক্ষে পাঁচ লক্ষ ভারতীয় সেনাদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের জন্য লড়াই করতে পাঠানো হবে; এই সেনারা ভারত-বর্মা সীমান্ত বা বর্মাদেশের ভিতরে লড়াই করবে না, বর্মাদেশ ছাড়িয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের পাঠানো হবে। এই সিদ্ধান্তের দায়িত্ব

---

১. Testament of Subhas Bose, pp. 87-95.

কিন্তু কংগ্রেস নেতাদেরই নিতে হবে। আমি মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজ়াদ, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতাদের প্রশ্ন করতে চাই, এবং সে প্রশ্ন আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই করব, তাঁরা কি সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদের লড়াইয়ে যোগ দেবার দায়িত্ব নিতে এবং সেই যুদ্ধে পাঁচ লক্ষ ভারতীয়দের জীবন বিসর্জন দেবার জন্য পাঠাতে প্রস্তুত আছেন?

ব্রিটিশ সরকারের এই বর্তমান প্রস্তাবের আসল কারণটা আমার স্বদেশবাসীরা সম্ভবত উপলব্ধি করতে পারেননি। আমি ইতিমধ্যে অন্য একটি স্বতন্ত্র বিবৃতিতে জানিয়েছি এবং এখানে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করছি যে বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে যে দূর প্রাচ্যে ভবিষ্যতের যুদ্ধ পরিচালনা করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ সরকারকে উপযুক্ত সংখ্যায় সৈন্য এবং অর্থ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করতে বলেছে। ব্রিটিশ সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য প্রস্তুত কিন্তু ব্রিটেন থেকে যথেষ্ট সংখ্যায় সৈন্য জোগাতে তারা অক্ষম, তার কারণ আমি পরে ব্যাখ্যা করছি। সেই কারণে ব্রিটিশ সরকার লর্ড ওয়াভেলকে ডেকে পাঠায় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাবি অনুযায়ী সৈন্য সরবরাহের জন্য তাঁকে ভারত থেকে পাঁচ লক্ষ ভারতীয় সেনা জোগাড় করতে বলে। ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল লর্ড ওয়াভেল এই দাবি পূরণ করার অক্ষমতা জানিয়ে বলেন ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর বৃহদংশ দীর্ঘ দিন ধরে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপে যুদ্ধে নিযুক্ত আছে এবং এখন তারা রণক্লান্ত। লর্ড ওয়াভেল ব্রিটিশ মন্ত্রীসভাকে জানিয়ে দেন যে ভারতীয় জনগণকে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে দূর প্রাচ্যে ব্রিটেনের হয়ে লড়াই করতে ইচ্ছুক পাঁচ লক্ষ ভারতীয় সেনা জোগাড় করা সম্ভব হবে না। এই ঘটনার পরে, কীভাবে ভবিষ্যতে পূর্ব এশিয়া, অর্থাৎ মালয়, থাইল্যান্ড, ইন্দোচিন, চিন ও জাপানে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কাজে ভারতবর্ষের সমর্থন ও সাহায্য আদায় করা যায় সেই বিষয়ে লর্ড ওয়াভেল ও ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার মধ্যে বার্তা বিনিময় হতে থাকে। পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের লড়াই করবার জন্য পাঁচ লক্ষ ভারতীয় সেনা ও উপযুক্ত সরঞ্জাম পাবার কাজে যেন তেন প্রকারেণ ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনুমোদন পাওয়া ও কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পরোক্ষ সম্মতি আদায় করাই হল ব্রিটিশ প্রস্তাবের পিছনে প্রকৃত অভিসন্ধি। কাজেই দূর প্রাচ্যের যুদ্ধে যদি ভারতীয় সেনাদের নিযুক্ত করা যায় তা হলে চুঙকিঙের বিরাট লাভ হবে। সেই কারণেই আমরা অবাক হচ্ছি না যখন দেখছি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে চুঙকিঙ সরকার ও তার প্রচার মাধ্যম অত্যন্ত আনন্দিত এবং কংগ্রেস যাতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সেই বিষয়ে তারা সচেষ্ট। এটা হতে পারে যে ভবিষ্যতে দূর প্রাচ্যে যদি ভারতীয় সেনাদের পাঠানো হয় তা হলে তাদের যে আজ়াদ হিন্দ ফৌজ অর্থাৎ ভারতের জাতীয় সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে সে কথা হয়তো ভারতের অল্প সংখ্যক লোকেরই জানা আছে কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে পূর্ব এশিয়ার পাঁচ লক্ষ ভারতীয় সেনার প্রাণকে হেলায় বিসর্জন দেবার পরিকল্পনাকে অনুমোদন করবে বা সেই বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবে এমন ভারতীয় নিশ্চয় নেই।

আমি আগেই বলেছি যে কয়েকটা নিশ্চিত কারণ আছে যে জন্য ভবিষ্যতে দূর প্রাচ্যে লড়াই করবার জন্য ব্রিটেন থেকে প্রয়োজনীয় সৈন্য জোগাড় করা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। প্রথমত গত পাঁচ বছর নয় মাসে বহু যুদ্ধক্ষেত্রের বহু লড়াইয়ে ব্রিটিশদের বিশাল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তার ফলে ব্রিটিশ জনগণ এখন ক্লান্ত এবং ব্রিটিশ সেনারা আবারও একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে রাজি নয়, এবং তাদের জানা আছে যে সেই যুদ্ধের

পরিস্থিতি ইউরোপের যুদ্ধের থেকে আরও কঠিন ও কষ্টদায়ক হবে। দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধের শেষে এখন ব্রিটিশ সরকারের তহবিল শূন্য, তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছে, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ঘটেনি। যুদ্ধসামগ্রীর জোগান অব্যাহত রাখবার কারণে ব্রিটিশ শিল্পজগৎকে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা কেবলমাত্র যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছিল। তার ফলে যুদ্ধ শুরু হবার আগে বিশ্বের বাজারে তাদের শিল্পসামগ্রীর যে চাহিদা ছিল, যুদ্ধ চলাকালীন সেই বাজার অনেকাংশে তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। কিন্তু আমেরিকার শিল্পক্ষেত্রে তেমন ঘটনা ঘটেনি এবং বিদেশে ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্যের বাজার এখন প্রায় সবটাই আমেরিকার দখলে চলে গেছে। যদি দীর্ঘদিন ধরে এই যুদ্ধ চলতে থাকে তা হলে যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হলেও যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়কার ব্রিটিশ বৈদেশিক বাণিজ্যের সিংহভাগই চলে যাবে অন্যের দখলে এবং ব্রিটেনের পক্ষে সেটা একটা বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে। এই কারণে সেনাবাহিনী এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের থেকে কলখারখানার শ্রমিকদের যত শীঘ্র অব্যাহতি দেবার কথা ভাবতে ব্রিটিশ নেতারা বাধ্য হচ্ছে যাতে সেই দেশ যুদ্ধোত্তর সময়ের উপযোগী শিল্পোৎপাদনে আবার ফিরে যেতে পারে। দূর প্রাচ্যে আবার একটা দীর্ঘ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এবং একই সঙ্গে যুদ্ধোত্তর কালে শান্তি ফিরে আসার পরের সময়ের জন্য শিল্পোৎপাদন শুরু করা— এই দুটো কাজ এক সঙ্গে করা ব্রিটেনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাজেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই সৈন্য সরবরাহের আরও যে একটা বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে, পূর্ব এশিয়ায় ভবিষ্যৎ যুদ্ধে কামানের সামনে যাদের অক্লেশে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে, সেই ভারতীয় সেনাদের ব্যবহার করার কথা তারা এখন ভাবছে। ভারতীয় জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতি ব্যতিরেকে যদি ভারতবর্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ সেনাদের যুদ্ধে নিযুক্ত করা যেত, তা হলে কোনওদিনই ওয়াভেলের প্রস্তাব পাবার সৌভাগ্য আপনাদের হত না। কিন্তু যেহেতু ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাদল দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধের পরে নিতান্তই ক্লান্ত, সেই কারণে লর্ড ওয়াভেল ও ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার জন্য কংগ্রেসের সম্মতি আদায় করা একান্ত আবশ্যক যাতে ভবিষ্যতে তাদের নিজেদের যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাদের কামানের মুখে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে।

স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কোনও সদস্য যে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে দৃষ্টিপাতও করতেন না সেই বিষয়ে আমার মনের মধ্যে কোনও সংশয় নেই। প্রস্তাবটি বিবেচনা করতে চাইলে যে মৌলিক নীতি ও বিশ্বাসের উপর ভারতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি তাঁদের সেই নীতি ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে হত। কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে 'স্বাধীনতা' কথাটির উল্লেখ পর্যন্ত নেই— মহাত্মা গান্ধী সেইদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দ্বিতীয়ত ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে কোনওভাবে সহযোগিতা না করা ও সর্বপ্রকারে তার প্রতিরোধ করার নীতিতে কংগ্রেস বিশ্বাসী। তৃতীয়ত, তিন বছর আগে কংগ্রেস যে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের শপথ নিয়েছিল এখনও তারা সেই শপথে অঙ্গীকারবদ্ধ ও আজও দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে ভারতীয়দের জাতীয় স্লোগান হল 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। সেই কারণেই কোনও কংগ্রেস সদস্য যিনি তাঁর নীতিতে বিশ্বাসী, তিনি কখনওই লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের দিকে ফিরেও তাকাবেন না, সেই বিষয়ে বিবেচনা করা তো দূরের কথা। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে এতজন কংগ্রেস সদস্য ও কংগ্রেস নেতা ওয়াভেলের প্রস্তাব নিয়ে বাস্তবিক চিন্তা-ভাবনা করছেন তার কারণ হল ইউরোপ ও বর্মাদেশের যুদ্ধে

ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর সাফল্যের পরে সারা ভারতবর্ষকে একটা পরাজিতের মনোভাব গ্রাস করেছে। হতাশা ও পরাজয়ের আশঙ্কায় কিছু কিছু কংগ্রেস সদস্য আজ তাদের আজীবনের নীতিকে ভুলতে বসেছেন এবং ১৯৪২ সালে যে প্রস্তাবকে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এখন সেই একই প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করবার কথা চিন্তা করছেন।

স্বদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের আমি যে কথা বলতে চাই, অকপটে ও স্পষ্ট ভাষায়, তা হল হতাশা ও পরাজয়ের যে মনোভাব আজ তাঁদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করেছে তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে হতাশা ও নৈরাশ্যের কোনও কারণ থাকতে পারে না। চূড়ান্ত ফলাফল যাই হোক না কেন, পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ চলবে দীর্ঘদিন ধরে এবং তা হবে অত্যন্ত কঠিন লড়াই। সমগ্র বিশ্বের জানা আছে যে তথাকথিত ইউনাইটেড নেশন বা রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনও সংহতি নেই। যুদ্ধ অব্যাহত রাখার বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার উদ্দেশ্য ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠীর থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন এবং সেই পার্থক্য প্রতিদিনই বাড়ছে। সম্প্রতি ইউরোপে এই দুই পক্ষ তাদের সেই বৈষম্যের উপরে মৈত্রীর প্রলেপ দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার কারণ হল তারা দূর প্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে একটা চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইউরোপে জার্মানির পতনের পর থেকে এশিয়ার রাজনীতিতে সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রহ ক্রমশই বাড়ছে। এই আগ্রহ না থাকলে সোভিয়েত বিদেশমন্ত্রী এম. মলোটভ সানফ্রান্সিসকোতে ঘোষণা করতেন না যে এমন দিন আর বেশি দূরে নয় যখন বিশ্বের দরবারে স্বাধীন ভারতবর্ষের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে।

পূর্বদিকে যুদ্ধ যখন অব্যাহত আছে, তখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটতে বাধ্য। এবং তার মধ্যে কোনও কোনও ঘটনা আমাদের শত্রুপক্ষের জন্য অনুকূল হবে না এবং হয়তো সেই ঘটনাগুলি স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবর্ষের সামনে নতুন সুযোগ এনে দেবে। ইউরোপে মিত্রশক্তির জয় হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও সিরিয়া ও লেবানন তাদের দেশকে স্বাধীন করবার জন্য বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় তারা যে ভাবে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনকে কাজে লাগাচ্ছে, তাতে সিরিয়া ও লেবানন ভারতবর্ষের সামনে একটা উদাহরণের সৃষ্টি করছে যে আমরাও ঠিক সেইভাবে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কাজে লাগাতে পারি। আজ যদি ব্রিটেন ও আমেরিকার সমর্থনে সিরিয়া ও লেবানন ফ্রান্সের বিরোধিতা করতে পারে তা হলে অদূর ভবিষ্যতে অন্য আরব দেশগুলি যে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের বন্ধুশক্তিগুলিকে ব্যবহার করবে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতারা সে বিষয়ে সচেতন ও তারা উপলব্ধি করছে যে ভারতবর্ষও তার স্বাধীনতা অর্জনে বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির সমর্থনকে ব্যবহার করবে, এবং এই বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা রাষ্ট্রসঙ্ঘেরও সদস্য। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিশ্বের রাজনীতিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে আলোচনায় নতুন করে প্রাণসঞ্চার হয়েছে এবং এই বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সম্মেলনগুলিতে ভারতবর্ষের কথা বারে বারেই উঠতে থাকবে। ভারতবর্ষ একটা আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে থাক সেটা ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা একেবারেই চাইবে না, বরং তারা চাইবে এই আলোচনাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা আভ্যন্তরীণ বিষয়রূপে আবদ্ধ রাখতে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না, যে মুহূর্তে স্বদেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতারা ব্রিটিশদের সঙ্গে একটা

সমঝোতায় আসবে, তখনই ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে পরিণত হবে এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মতো বিদেশি শক্তিগুলির পক্ষে তখন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার বিষয়ে কোনওভাবে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

আমাদের শত্রুপক্ষের সাম্প্রতিক সামরিক সাফল্য সত্ত্বেও ভারত কিন্তু তার স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ভারতীয়রা স্বদেশে যা করছেন, তা ছাড়াও দুটি উল্লেখযোগ্য শক্তি ভারতের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছে। প্রথমত যারা ভারতের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিয়েছে তারা এবং দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের বিষয়ে বিশ্বের দরবারে যারা তাদের অভিমত ব্যক্ত করছে, তারা। যারা ভারতের শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে রত তারা ভবিষ্যতেও সেই সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বলতে পারি যে তারা তাদের লড়াই অব্যাহত রাখবে শেষ সেনানী ও শেষ বুলেট পর্যন্ত। একইভাবে যারা আজ ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছে এবং বিশ্বের দরবারে যারা ভারতের স্বপক্ষে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে প্রবক্তার ভূমিকা নিয়েছে, তারাও তাদের কাজ অব্যাহত রাখবে। ভারতের বাইরে ও ভারতের অভ্যন্তরে এই যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য। ভারতের অভ্যন্তরে আমার স্বদেশবাসীরা, আপনারা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে নাও পারেন, তা হলে অন্ততঃপক্ষে শত্রুর বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন, তাদের সঙ্গে কোনও আপোষ মীমাংসায় যাওয়া বা তাদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তাব আপনারা প্রত্যাখ্যান করুন।

এই প্রসঙ্গে আমি মহাত্মা গান্ধীর কাছে, কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সদস্যদের কাছে, এবং কংগ্রেসের লক্ষ লক্ষ মহিলা ও পুরুষ কর্মী যারা নেতাদের পিছনেই আছেন তাঁদের সকলের কাছে একটা আন্তরিক আবেদন করব যে তাঁরা যেন এই সঙ্কটময় মুহূর্তে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রকৃত মূল্যায়নে ভুল না করেন। যদি আমরা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নির্ভুল মূল্যায়ন করতে না পারি তা হলে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আমরা সঠিক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হব। ভারতীয়রা পরাস্ত হয়নি। আমাদের সংগ্রাম এখনও ব্যর্থ হয়নি। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আমাদের জন্য প্রতিকূল নয়। বরং তা আমাদেরই সাহায্য করছে এবং যতদিন যাবে ততই তা আমাদের অনুকূলে কাজ করবে। অতএব কেন আমরা এখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করব যা আমরা তিন বছর আগে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম?

আজ আমি একজন সাধারণ কংগ্রেস সদস্য হিসাবে কথা বলছি, আমি আমার সমগ্র কর্মজীবন কংগ্রেসের নীতির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে দেশের সেবা করেছি ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি। স্বদেশে আমার ভাই ও বোনেরা, আপনারা যদি এমন ধারণা পোষণও করে থাকেন যে চূড়ান্ত পর্যায়ে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির হাতে আমাদের মিত্রদের পরাজয় ঘটবে তা হলেও ভারতবর্ষের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের হতোদ্যম হবার কোনও কারণ নেই। ভবিষ্যতে বিশ্ব রাজনীতির মঞ্চে যাই ঘটুক না কেন ভারতবর্ষের জয় অনিবার্য। ভারতের ভাগ্যাকাশের নক্ষত্রেরা এখন ঊর্ধ্বগামী। এই সন্ধিক্ষণে একটা ভুল পদক্ষেপ নিয়ে যেন আমরা সেই ঊর্ধ্বগামী নক্ষত্রকে নীচে নামিয়ে না আনি। আমরা বহু বহু দিন ধরে বহু অন্যায় অত্যাচার সহ্য করছি। আসুন আমরা আর অল্প কিছুদিন আরও অল্প কিছু অত্যাচার সহ্য করি। কিন্তু এই যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত আমরা যেন আমাদের নীতিতে অবিচল থাকতে পারি। স্বদেশবাসী ভাই ও বোনেরা, লর্ড ওয়াভেলের এত ব্যস্ততা কীসের জন্য তা কি আপনারা

বুঝতে পারছেন না? সিমলার সম্মেলন পিছিয়ে দেবার জন্য মিস্টার জিন্নার প্রস্তাব তিনি কেন প্রত্যাখ্যান করলেন তাও কি আপনারা বুঝলেন না? আজ আমরা যারা ভারতের বাইরে আছি, তাদের কাছে পুরো ঘটনাক্রমটাই অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সহজে বোধগম্য। জুলাই মাসের ৫ তারিখে ইংল্যান্ডের নির্বাচন হতে চলেছে। সেই নির্বাচনে ভারতবর্ষ একটা বিতর্কিত বিষয় হোক কনজ়ারভেটিভ পার্টি তা চায় না, তা যাতে না হতে পারে সেই কারণেই ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনের এক মাস আগে আমাদের সামনে ওয়াভেলের এই প্রস্তাবের প্রলোভন রাখা হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল কী হবে কারওর জানা নেই। কিন্তু সকলেই জানে যে ৫ জুলাইয়ের পরে পার্লামেন্টে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও লেবার পার্টি আরও শক্তিশালী হয়ে দাঁড়াবে। কনজ়ারভেটিভদের আশঙ্কা হল যে যদি লেবার পার্টি শাসনক্ষমতা পায় এবং তার আগে যদি ভারত-সংক্রান্ত সমস্যার মীমাংসা না হয় তা হলে এবার লেবার পার্টি সেই সমস্যার মীমাংসার চেষ্টা করবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি দরাদরি করায় বিশ্বাস করি না কারণ আমার মতে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা কোনও আপোষ মীমাংসায় রাজি হতে পারি না। কিন্তু দরাদরিতে আপনাদের যদি আগ্রহ থাকে ও ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে যদি আপনারা আপোষের জন্য সঙ্কল্প নিয়ে থাকেন তা হলে আমি আপনাদের অনুরোধ করব, অনুগ্রহ করে ৫ জুলাইয়ের আগে আপনারা সেই আপোষে রাজি হবেন না। মিস্টার জিন্না যখন সিমলার সম্মেলন পিছিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন তখন তাঁর মনে কী ছিল আমি জানি না, কিন্তু তিনি যদি ৫ জুলাইয়ের আগে তাঁর হাতের মোক্ষম তাসটি ব্যবহার করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন তা হলে তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রশংসা আমাকে অতি অবশ্য করতেই হবে। আমি এই ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যে লর্ড ওয়াভেল যেন তেন প্রকারেণ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। যদি তিনি সেটা পারেন তা হলে তা কনজ়ারভেটিভ পার্টির পক্ষে একটা বিরাট সাফল্য বলে গণ্য হবে ও নির্বাচনে কনজ়ারভেটিভ পার্টির প্রার্থীদের ভোটের সংখ্যা অনেক গুণ বাড়াতে সাহায্য করবে। অধিকন্তু যদি ৫ জুলাইয়ের আগে লর্ড ওয়াভেল কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পারেন তা হলে নির্বাচনের পরে লেবার পার্টি ক্ষমতায় এলেও কনজ়ারভেটিভ পার্টি তখন লেবার পার্টিকে ভারতবর্ষের বিষয়টিকে নিয়ে আবারও আলোচনা শুরু করতে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে।

আমি এ কথা বলতে চাই না যে আমি লেবার পার্টির সঙ্গে দর কষাকষি করতে ইচ্ছুক। একেবারেই তা নয়। আমার নিজের কাজের পরিকল্পনা স্পষ্টতই আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাওয়া যতদিন আমাদের একজন সেনা জীবিত থাকবে ও আমাদের দেহে এক বিন্দু রক্ত অবশিষ্ট থাকবে। কিন্তু আপনারা যদি সেই পথের পথিক না হতে চান যেহেতু আপনারা মনে করেন সেটা অতি বিপজ্জনক এক অভিযান, এবং আপনারা যদি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দর কষাকষিতে বদ্ধপরিকর থাকেন তা হলে আমি বলব সেই দরাদরির সর্বোত্তম সময় হল ৫ জুলাইয়ের পরে। ৫ জুলাইয়ের আগে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে সম্মতি না দিলে ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে আপনারা লেবার পার্টির প্রার্থীদের ভোট বাড়াতে সাহায্য করবেন। আমাদের যেটা মনে রাখতে হবে তা হল ক্রিপস্ ও ওয়াভেল এই দুই প্রস্তাবই এসেছে সংখ্যাগরিষ্ঠ টোরি মন্ত্রীসভার শাসনকালে এবং দুই ক্ষেত্রেই লেবার পার্টি ছিল পার্লামেন্টে সংখ্যালঘিষ্ঠ; সুতরাং প্রস্তাব দুটির উদ্ভাবনার দায়িত্ব লেবার পার্টির নেতাদের উপরে ছিল না। যদি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করানোতে ব্যর্থ হন তা হলে,

সঙ্গত কারণেই ব্রিটিশ জনগণ লেবার পার্টিকে আরেকটা সুযোগ দেবে ভারতবর্ষের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। অতএব, যদি আপনারা দরাদরি করতে চান তা হলে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করুন। এতে যে লেবার পার্টির পক্ষে নির্বাচনে জিততে ও ক্ষমতায় আসতে সাহায্য হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তারপরে, লেবার পার্টি নিশ্চিতভাবে ভারতের প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করবার জন্য উদ্যোগ নেবে এবং তারা আশা করতে থাকবে যে কনজ়ারভেটিভ পার্টি যে কাজ করতে পারেনি, তারা সেই কাজে সফল হবে। মনে রাখবেন, আমার বিশ্বাস এই যে ৫ জুলাইয়ের পরে যে মন্ত্রীসভাই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা মনে করবে ভারতবর্ষের সমস্যাটি বহুদিনের এবং এই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন ও সেটা তাদের কর্তব্য। সুতরাং লেবার মন্ত্রীসভার সঙ্গে দর কষাকষিতে আপনারা যা আদায় করে নিতে পারবেন তা কনজ়ারভেটিভ পার্টির উদ্যোগে রচিত লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের থেকে অনেকাংশে বেশি সুবিধাজনক হতে বাধ্য।

স্বদেশের বোন ও ভাইয়েরা! আমি আবার আগামীকাল এই সময়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। আজকের ভাষণ শেষ করবার আগে আমি শুধু আরেকটি কথা বলতে চাই। আপনারা এখন তীব্র ভাষায় ভাইসরয়কে নিন্দা করছেন এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে বর্ণ হিন্দু ও মুসলমানদের সমসংখ্যক আসন দেবার জন্য আপনারা তাঁর সমালোচনা করছেন। কিন্তু কেন আপনারা এই প্রশ্নের আরও একটু গভীরে যাচ্ছেন না এবং কেন আপনারা চিন্তা করতে চাইছেন না যে এই প্রস্তাবের পিছনের অভিসন্ধিটা আসলে কী? আমার কাছে যে সংবাদগুলি এসেছে তার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে, এখনও পর্যন্ত একজন ভারতীয় নেতাও সেটা করেননি। হিন্দু মহাসভা যে ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেছে তা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমি লক্ষ করেছি, তবে সেটা তাদেরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। মুসলমানেরা যদি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের অধিকাংশ আসন নেয়, তা হলে আমাদের প্রতিবাদ সেই সদস্যদের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত নয়। আসল প্রশ্ন হল কোন ধরনের মুসলমানদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ দেওয়া হচ্ছে? যদি মৌলানা আবুল কালাম আজ়াদ, আসফ আলি ও রফি আহমেদ কিদোয়াইয়ের মতো মুসলমানদের আমরা কাউন্সিলে পাই তা হলে তাঁদের হাতে ভারতের ভবিষ্যৎ নিরাপদ থাকবে। এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এঁদের মতো দেশপ্রেমিকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। একজন দেশপ্রেমিক মুসলমানের সঙ্গে দেশপ্রেমিক হিন্দুর কোনও পার্থক্য নেই। বর্তমান ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিতে কেবলমাত্র মুসলিম লীগের মনোনীত সদস্যদেরই বসানো। হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির সবগুলিই দেওয়া হবে কংগ্রেসকে। বাকি আসনগুলি ভাইসরয় তাঁর নিজের মনোনীত প্রার্থীদের দেবেন, যাঁরা ভাইসরয়ের নির্দেশ অনুসারে কাজ করবেন।

এর ফলে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেস সদস্যরা স্থায়ীভাবে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত হবে কারণ মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতায় কাজ করতে থাকবে। সুতরাং এই ধূর্ত কৌশলে ভাইসরয়, যেমন এতদিন করে এসেছেন, সেইভাবেই স্বেচ্ছাচারী শাসকের মতো ভারতের শাসনকার্য চালাতে থাকবেন; উপরন্তু তিনি এখন থেকে সেই শাসনকাজে কংগ্রেসেরও সমর্থন পাবেন।

এখন প্রশ্ন হল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মুসলিম লীগের সদস্যেরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন কিনা। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে তাঁরা নিশ্চিতভাবে সহযোগিতা করবেন কারণ ভাইসরয় তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে এই সদস্যদের অধিকাংশ

আসন দিয়ে পাল্লা তাঁদের দিকেই ঝুঁকিয়েছেন। যদি যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মেলায় তা হলে ভারতীয়দের কাছ থেকে সেনা ও রসদ সংগ্রহের ব্রিটিশ অভিসন্ধি সহজেই পরিপূর্ণ হবে।

আমার মনের মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই যে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিষয়ে মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে একটা গোপন বোঝাপড়া হয়েছে, হয়তো সেই বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে অথবা তা না হয়ে থাকলেও আকারে ইঙ্গিতে মতের আদানপ্রদান হয়েছে। কিন্তু মিস্টার জিন্না ও তাঁর সহকর্মীরা ওয়াভেলের উপর টেক্কা দেবেন। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে মুসলিম লীগ পার্টির সদস্যেরা ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ নীতিকে পূর্ণ সমর্থন দেবেন এবং তার পুরস্কার স্বরূপ তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা অনুসারে পাকিস্তানের দাবি আদায় করে নেবেন। কংগ্রেস পার্টি যদি এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করে তা হলে তাদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের স্থায়ী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসাবেই থাকতে হবে। এবং এই প্রস্তাবে সম্মতি দেবার মূল্য তাদের দিতে হবে ব্রিটিশদের যুদ্ধনীতিতে সমর্থন করবার মাধ্যমে। ধূর্ত কৌশল দ্বারা কংগ্রেসের সহযোগিতা নিশ্চিত করবার পরে ব্রিটিশ ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির সিদ্ধান্তেও কংগ্রেসের সম্মতি আদায় করবার চেষ্টা করবে। একই সঙ্গে কংগ্রেসও রাজনৈতিক আত্মহননের জন্য দায়ী হবে কারণ তারা স্বীকার করে নেবে যে কংগ্রেস সমগ্র ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না, তারা ভারতের অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটি।

অতএব আমি আপনাদের বলব, না আমি আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ করব, যে আপনারা এই বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবেন এবং লর্ড ওয়াভেলের এই নির্লজ্জ ও ভারতের পক্ষে অমঙ্গলসূচক প্রস্তাব আপনারা প্রত্যাখ্যান করবেন। যে সব ভারতীয় নেতারা এখনও পর্যন্ত লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি আমি তাঁদের মনোভাব বুঝতে পারছি। কিন্তু যে সব নেতারা মন্তব্য করেছেন, যেমন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, তাঁদের বক্তব্য আমাকে একাধারে বিস্মিত ও মর্মাহত করেছে। তাঁরা সিমলা সম্মেলনের আগে সকল রাজনৈতিক বন্দিদের জেল থেকে মুক্তি দেবার দাবি পর্যন্ত করেননি। এমনকী, ভাইসরয় যখন তাঁর প্রস্তাবে ১৯৪২ সালের আগে এবং পরে যাদের কারারুদ্ধ করা হয়েছে সেই সব বন্দিদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন, তখনও এই নেতারা ভাইসরয়ের কোনও সমালোচনা করেননি। ভাইসরয় কেবলমাত্র এই বলেছেন যে কংগ্রেস কর্মীরা বাধ্য ছেলের মতো আচরণ করবে ও তাঁর প্রস্তাবে সায় দেবে, এবং তাই যদি তারা করে তা হলে ১৯৪২ সালের আন্দোলনে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাদের জেল থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে কিনা সেটা নতুন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বিবেচনা করে দেখবে। নতুন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এইসব বন্দিদের মুক্তি দেবে এই মর্মে কোনও প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

উপসংহারে, আমি এই কথা বলতে চাই যে যদিও হিন্দু মহাসভা এবং অন্যান্য পাকিস্তান বিরোধী গোষ্ঠীগুলি যেভাবে এগিয়েছে তাদের সেই কর্মপদ্ধতির সঙ্গে আমি একমত নই, কিন্তু তবুও আমার দৃঢ় ধারণা তারা খোলাখুলিভাবে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাদের মত প্রকাশ করে ভারতের পক্ষে একটা বিশাল উপকার করেছে। প্রকৃতপক্ষে আমি আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এই কথা বলব যে এই সংকটকালে প্রত্যেক স্থিরবুদ্ধি ও দেশপ্রেমিক ভারতীয়কে, বিশেষত সকল প্রগতিশীল কংগ্রেস সদস্যের কর্তব্য হল

সারা দেশ জুড়ে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদের ঢেউ তোলা। মহাত্মা গান্ধী সর্বদাই জনগণের মতামতের মূল্য দিয়ে থাকেন, প্রকৃত নেতার যা করা উচিত। সিমলা সম্মেলনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব না করবার যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন সেটাই এই মুহূর্তে সঠিক পদক্ষেপ কারণ এর ফলে তিনি স্বাধীনভাবে নিজের মতপ্রকাশের পথ খোলা রেখেছেন যাতে তিনি দেশের জনগণের মত অনুসারে এবং দেশের কল্যাণের জন্য যা করণীয় সেই কাজটি করতে পারেন। আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে দেশবাসীরা এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীরা অনতিবিলম্বে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে তাদের অভিমত প্রকাশ করবে। মহাত্মা গান্ধী সেই জনমতকে উপেক্ষা করতে পারবেন না এবং তিনি তখন কংগ্রেসকে এই অবাঞ্ছিত প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করবার পরামর্শ দেবেন। বোন ও ভাইয়েরা, ভারতবর্ষের ভাগ্য আপনাদের হাতেই ন্যস্ত; আপনারা প্রতিবাদ করুন যাতে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবটি ভারত প্রত্যাখ্যান করতে পারে, যেমন তারা ১৯৪২ সালে ক্রিপসের প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

জয় হিন্দ।

৬৫

ওয়াভেলের প্রস্তাবের মুখোশ খুলে গেছে

[সিঙ্গাপুর থেকে বেতার ভাষণ, ২০ জুন ১৯৪৫][১]

ভারতের বোন ও ভাইয়েরা!

আজকের এই সঙ্কটকালে আমি যদি আপনাদের পাশে থাকতাম তা হলে যেভাবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতাম সেইভাবেই আজ আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। মনে রাখবেন আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে যে ১৯২১ সাল থেকে বিশ্বস্ত ও অনুগত সদস্যরূপে কংগ্রেসের সেবা করেছে, সুখের ও দুঃখের দিনে, লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন অগ্রাহ্য করে। ১৯৩৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক ঘটনাগুলি ঘটেছে, আশা করি আপনাদের সেইগুলি ভাল মনে আছে। সেই সময়, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলিকে যুদ্ধের সমর্থনে ব্যবহার করতে চেয়েছিল, কিন্তু দু'টি কারণে কংগ্রেস যুদ্ধের ব্যাপারে কোনও সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। প্রথমত, স্বাধীনতার জন্য ভারতের জাতীয় দাবিকে ব্রিটিশ সরকার মেনে নেয়নি এবং দ্বিতীয়ত, এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে, যাতে ভারতবর্ষের কোনও আগ্রহ ছিল না। তখন মোট ১১টা প্রদেশের মধ্যে মাত্র ৮টিতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ছিল, কাজেই সেই ৮টি প্রদেশ ছাড়া যুদ্ধের বিষয়ে কেন্দ্রের ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কংগ্রেসের সহযোগিতার কোনও প্রশ্ন ছিল না। ১৯৩৯ সালের যুদ্ধে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করার সিদ্ধান্ত নেবার পরে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি একযোগে পদত্যাগ করল, যদিও তারা ক্ষমতায় থাকলে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য বিষয়গুলিতে ভারতবর্ষের জনগণ যে প্রকৃতই উপকৃত হত সেটা প্রতিটি কংগ্রেস সদস্যেরই জানা ছিল। মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করবার পরে কংগ্রেস আবার ধীরে ধীরে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করল যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটল ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে এবং এই নতুন আন্দোলনের স্লোগান হল 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।'

আজ এখন, এই ১৯৪৫ সালে আমাদের সামনে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, আমাদের বলা হয়েছে যে যদি দূর প্রাচ্যের যুদ্ধে কংগ্রেস ব্রিটিশদের পূর্ণ সমর্থন দেয় তা হলে কংগ্রেস এখনই দু'টি জিনিস পেতে পারে এবং ভবিষ্যতে স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেতে পারে, এই দু'টি জিনিস হল, প্রথমত, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কিছু চাকরি ও দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক সরকারে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির পুনর্নির্বাচন।

ভারত থেকে পাওয়া তথ্যগুলি থেকে মনে হচ্ছে যে কোনও কোনও কংগ্রেস সদস্য লর্ড

---

১. Testament of Subhas Bose, pp. 96-101.

ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য খুবই আগ্রহী, যার অর্থ হল স্বায়ত্ত শাসন (মনে রাখবেন স্বাধীনতা নয় কিন্তু), প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলিতে কংগ্রেসকে পুনর্বার যোগ দেবার সুযোগ ও কংগ্রেস সদস্যদের জন্য ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কয়েকটি সদস্যপদ, এই কয়েকটা প্রতিশ্রুতিতেই তারা সন্তুষ্ট। কিন্তু এই সব প্রলোভন কংগ্রেসের সামনে বহুবারই রাখা হয়েছে। প্রথমত, ব্রিটিশ আগাগোড়াই আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের আশ্বাস দিয়ে এসেছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৩৯ সালে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলির ৮টি আমাদের অধীনে ছিল এবং তখন আমরাই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তৃতীয়ত, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের পদ সর্বদাই কংগ্রেস সদস্যদের জন্য সহজলভ্য ছিল, তাদের জন্য, যারা সেই পদলাভের জন্য নিজেদের বিকিয়ে দিতে রাজি ছিল।

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে দু'টি নতুন শর্ত আছে। প্রথম শর্ত হল ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, সুস্পষ্ট ভাষাতে এই শর্তটিও দেওয়া হয়েছে যে এই প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ার অর্থ হল দূর প্রাচ্যে আগামী দিনের যুদ্ধে সর্বাঙ্গীণ সমর্থন দেওয়া। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি যখন পদত্যাগ করেছিল তখন কিন্তু এই শর্ত ছিল না এবং কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি ইচ্ছে করলে ১৯৩৯ সালের পর ক্রিপসের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারত ও তার জন্য ব্রিটেনের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কোনও প্রতিশ্রুতি দেবার একেবারেই কোনও প্রয়োজন তাদের ছিল না।

যারা এখন লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে সম্মতি দেবার জন্য উন্মুখ হয়েছে, তাদের সামনে আমি কয়েকটা প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই যাতে আমাদের সমানে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করা যায়। (১) যে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে আমরা আন্দোলন করছিলাম সেই উদ্দেশ্য কি আমরা ভুলে যাব কারণ লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে সেই বিষয়ে একেবারেই কোনও উল্লেখ, এমনকী আংশিক উল্লেখ পর্যন্ত নেই। (২) পূর্ণ স্বরাজের অর্থ কি ভাইসরয়ের কাউন্সিলের ভারতীয়করণ, না কি তার অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ব্রিটিশ সরকারের থেকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছেদ করা? (৩) ১৯৩৯ সালে কী কারণে তা হলে মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করল? (৪) 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' স্লোগানটির তা হলে কী পরিণতি হল? (৫) ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের পদ গ্রহণের জন্য আমরা তা হলে কেন শ্রী আনে ও ডক্টর খারের সমালোচনা করলাম?

বন্ধুরা! আজ যারা আপোষ মীমাংসা চাইছে তারা এই যুক্তি খাড়া করতে পারবে না যে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কাঠামো যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে তার সঙ্গে অতীতের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কোনও মৌলিক পার্থক্য আছে। ভাইসরয় নিজেই এই বিষয়ে কোনও সংশয় রাখেননি। তিনি খুব স্পষ্ট করেই জানিয়েছেন যে তাঁর প্রস্তাব বর্তমান সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধা আছে এবং সেই প্রস্তাবে কোনও সাংবিধানিক পরিবর্তনের কথা বলাও হয়নি। উপরন্তু ভাইসরয়ই তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল নিয়োগ করবেন এবং কাউন্সিলের সদস্যেরা তাঁরই আজ্ঞাবহ থাকবে, আইন প্রণয়নকারী কোনও সংস্থার কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে না।

এবং সব থেকে আপত্তিকর যে ঘটনাটা ঘটবে তা হল, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের কোনও মূল্য থাকবে না এবং তারা যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, কাউন্সিলের সেই সিদ্ধান্তকে ভেটো দিয়ে নাকচ করে দেবার পূর্ণ ক্ষমতা ভাইসরয়ের সর্বদাই থাকবে। এই ধরনের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রই তা হলে আমরা পেতে চলেছি; ব্রিটেনের

হাতে এই ধরনের 'নতুন সুবিধা'ই তাহলে এখন ভারত পেতে চলেছে। আমি আরও যা বলতে চাই তা হল যদিও কাউন্সিলে নতুন কিছু চাকরির সুযোগ আমাদের ভারতীয়দের সামনে খুলে দেওয়া হচ্ছে, যেমন স্বরাষ্ট্র, বৈদেশিক ও অর্থ দপ্তর, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি যেমন যুদ্ধ দপ্তর এখনও ব্রিটিশ সেনাধিনায়কের হাতেই থাকবে। এই দপ্তরের প্রধান শুধু যে তাঁর নিজের দপ্তরের উপরে কর্তৃত্ব করবেন তাই নয়, তদুপরি যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন এই অজুহাতে তিনি কার্যত সব দপ্তরগুলিকেই নিয়ন্ত্রণ করবেন। তিনি কাউন্সিলে যা-ই উত্থাপন করুন না কেন সেই প্রস্তাবগুলি অবশ্যই ভাইসরয়ের অনুমোদন লাভ করবে এবং অন্য সব এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরের সেই প্রস্তাবে সায় দেওয়া ছাড়া আর কোনও পন্থা থাকবে না। এক দিকে আইনানুসারে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরেরা ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেলের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন এবং অন্য দিকে তাঁরা নীতিগতভাবে ব্রিটেনের যুদ্ধে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতেও দায়বদ্ধ থাকবেন।

অতএব, লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবকে সব থেকে ভালভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে স্বর্গগত বিঠলভাই প্যাটেলের কথায়, যিনি বলেছিলেন এটা হল 'ভাইসরয়ের স্বরাজ' কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেটা এমনকী এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের স্বরাজও নয়। বৈদেশিক দপ্তরের ভার একজন ভারতীয়ের হাতে তুলে দেবার ব্যাপারটাতেও, আমার মতে, কিছুটা চোখে ধুলো দেওয়া হচ্ছে কারণ উপজাতি ও সীমান্ত বিষয়ক দপ্তরগুলিসহ ভারতীয় রাজ্যবিষয়ক দপ্তরও থাকবে এই সদস্যের আওতার বাইরে। এই নতুন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে যদিও সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করার অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতানুসারে কাজ হবার কোনও প্রশ্নই উঠবে না এবং যদিও আগের মতোই ভাইসরয় এবং গভর্নর-জেনারেলের হাতেই সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে কিন্তু তবুও তিনি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে তাঁর স্বৈরাচারী ভূমিকাটি এই কূট রাজনৈতিক কৌশলে আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চান। এবং এই কৌশলে তিনি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে সর্বদাই তাঁর নিজের মতের পিছনে স্থায়ীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিশ্চিত করতে পারবেন।

আমার বিশ্বাস, লর্ড ওয়াভেলের উদ্দেশ্য হল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত সব আসনগুলি মুসলিম লীগের সদস্যদের দেওয়া যদি তারা সেই দাবি করে। একই ভাবে তিনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি সব কংগ্রেসের সদস্যদের দেবেন, যদি কংগ্রেস দাবি করে। সমাজের অন্য সম্প্রদায়ের সদস্যদের লর্ড ওয়াভেল নিয়োগ করবেন তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী এবং এটা বলবার অপেক্ষা রাখে না যে এই সব সদস্যরা সম্পূর্ণভাবেই লর্ড ওয়াভেলের মতানুসারে কাজ করবেন। সুতরাং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে হয় কংগ্রেস ব্লক নয়তো মুসলিম লীগ ব্লকের সমর্থন আদায় করে নিতে পারলে ভাইসরয় সর্বদাই তাঁর মতের সমর্থনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের পাশে পাবেন। এবার প্রশ্ন হল এই দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে কাদের ভাইসরয়ের আজ্ঞানুসারে কাজ করবার সম্ভাবনা বেশি? কংগ্রেস ব্লকের পক্ষে সেটা করা কঠিন হবে কারণ তা হলে তারা দেশের জনসাধারণ ও কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের সমালোচনা থেকে রেহাই পাবে না। কিন্তু ভাইসরয়ের পক্ষে মুসলিম লীগের আনুগত্য পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হবে কারণ তিনি তাদের সামনে এই প্রলোভন রাখবেন যে যদি তারা ভাইসরয়ের মত অনুসারে কাজ করে তা হলে ব্রিটিশ সরকার পুরস্কার স্বরূপ তাদের পাকিস্তান গঠনের স্বপ্ন সফল করতে সাহায্য করবে। অপরপক্ষে যদি মুসলিম লীগ ব্লক তাঁর বিরোধিতা করে তা হলে ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের পরিকল্পনাকে সমর্থন না করে অবিভক্ত ভারতের পরিকল্পনাকে সমর্থন করবে, এই মর্মে তিনি তাদের ভয় দেখাতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও একটি মন্তব্য করব যে ইতোমধ্যেই যদি ব্রটিশ সরকার ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা গোপন বোঝাপড়া হয়ে থাকে যার ভিত্তিতে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে এরা একযোগে কংগ্রেসের বিরোধিতা করবে, তা হলে সেটা কাউকেই বিস্মিত করবে না। এই বিশ্লেষণ যদি নির্ভুল হয় এবং আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তাই, তা হলে কংগ্রেস লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে কাউন্সিলে যোগ দিলে তাদের সর্বদাই সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী হিসাবে থাকতে হবে। উপরন্তু ব্রিটিশের যুদ্ধকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবার প্রতিশ্রুতি দেবার ফলে কংগ্রেস সর্বদাই ব্রিটিশ যুদ্ধনীতির সমর্থনে কাজ করতে বাধ্য হবে।

সুতরাং এই পর্যায়ে আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল শান্ত ও আবেগমুক্তভাবে চিন্তা করে দেখা যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমাদের দেশের ও কংগ্রেসের কোনও উপকার হবে কিনা এবং প্রস্তাব গ্রহণ করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কী হতে পারে। আমার বিচারে আমি যা বুঝেছি তাতে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কয়েকটা অতিরিক্ত সদস্যপদ পাওয়া ছাড়া কংগ্রেসের আর কোনও লাভ হবে না বলে আমি মনে করি না কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লীগ এই দুই পক্ষেরই অনেক লাভ হবে। এর ফলে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের সাহায্যে ভারতীয় জনসাধারণের নামে যুদ্ধ চালাতে পারবে এবং সেই যুদ্ধের রসদ জোগানোর জন্য তারা আমাদের দেশকে আরও শোষণ করবে, সৈন্য ও সামগ্রী জোগাতে হবে আমাদের আগের থেকে আরও অনেক বেশি। কংগ্রেসকে ধোঁকা দিয়ে মুসলিম লীগ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে তাদের সর্বদাই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত করে রাখবে এবং ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যে তারা তাদের পাকিস্তান গঠনের স্বপ্নকেও সফল করবে।

ব্রিটিশ সরকারের এখনই যা প্রয়োজন অর্থাৎ কংগ্রেসের সহায়তায় যুদ্ধের গতিকে অব্যাহত রাখা, সেই উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেলে তাদের আর কংগ্রেসের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে না। কাজেই তারা তখন কংগ্রেসকে বর্জন করে মুসলিম লীগের সঙ্গে খোলাখুলি সৌহার্দ্য গড়ে তুলবে এবং ভারতকে তারা দ্বিখণ্ডিত করবে। ইতোমধ্যে কংগ্রেস তাদের নিজেদের ভাবমূর্তিকে অবমাননা করে সারা দুনিয়ার চোখে ক্ষুদ্রতর, হীনতর করে তুলবে কারণ তারা ততদিনে তাদের মৌলিক নীতিকে বিসর্জন দিয়েছে ও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের যুদ্ধে যোগ দিয়ে তারা তাদের বিপ্লবী চেতনাকে ভুলতে বসবে ও সংগ্রামী জাতীয়তাবোধের অনুভূতিও তাদের সত্তা থেকে বিলুপ্ত হবে। কংগ্রেস স্বেচ্ছায় যদি স্বীকার করে নেয় যে তারা ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছে না, ভারতের অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের মধ্যে কংগ্রেস একটি তা হলে তারা নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক আত্মহননের দিকে এগিয়ে যাবে। সবশেষে আরও বলব যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করলে তারা সারা পৃথিবীর স্বাধীনচেতা মহিলা ও পুরুষের সহানুভূতি হারাবে এবং সোভিয়েত রাশিয়াসহ কয়েকটি বন্ধু রাষ্ট্রেরও সমর্থন হারাবে।

বোন ও ভাইয়েরা! আপনারা যদি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করেন তা হলে আপনাদের এই ক্ষতিগুলি হবে। কয়েকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী কংগ্রেস সদস্য ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কয়েকটা পদে চাকরি পাবেন, এ ছাড়া আপনাদের আর কোনও লাভ হবে না। আজ আপনাদের ধৈর্যের উপর আমি আর বেশিক্ষণ অত্যাচার করব না, কিন্তু শেষ করবার আগে আমার গতকালের বক্তৃতা থেকে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত, লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য কী সেটা ভুলে যাবেন না। সেই উদ্দেশ্য হল আপনাদের প্রবঞ্চনা করে পাঁচ লক্ষ ভারতীয় সেনানীকে ব্রিটেনের লড়াই লড়বার

জন্য দূর প্রাচ্যে অর্থাৎ বর্মাদেশেরও বাইরে, প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে পাঠানো। দ্বিতীয়ত, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে যদি আপনি বিশ্বাস করেন, তা হলে যুদ্ধে আমাদের শত্রুপক্ষের সাম্প্রতিক সাফল্যে আপনাদের হতোদ্যম বা নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই; আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতবর্ষ যে সম্মান অর্জন করেছে এর আগে কখনও তা হয়নি। ভারতের অভ্যন্তরে আপোষহীন ও অনমনীয় প্রতিরোধ, পূর্ব এশিয়ায় সশস্ত্র সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে কূটনীতির ব্যবহার, এই সবের সমন্বয়ে আমরা এই যুদ্ধের শেষে স্বাধীনতা অর্জন করবই। সেটা হবে প্রকৃত স্বাধীনতা, ব্রিটিশ সম্রাজ্যের অধীনে থেকে স্বায়ত্ত শাসন নয় অথবা ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ভারতীয়করণ নয়। আমাদের জীবনে, স্বাধীনতা লাভের পথে বৃহত্তম প্রতিবন্ধকতা আসছে হতাশা ও হার স্বীকার করার মনোবৃত্তি থেকে। পরাজয়ের আগেই পরাজিত হয়েছি ভেবে আমরা হাল ছেড়ে দিতে চলেছি। যারা লড়াই করে ও সেই লড়াইয়ে প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত থাকে, তারা পরাজিতের মনোভাবের কাছে নতিস্বীকার করে না। যারা চেয়ারে বসে রাজনীতি করে এবং যারা কাপুরুষ তারাই সহজে হতাশা ও নিরুৎসাহের শিকার হয়।

বর্মার সাম্প্রতিক লড়াইয়ে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু সেই ক্ষতি আমাদের সংকল্পকে আরও দৃঢ়, আরও তীব্র করেছে। আমরা লড়াই চালিয়ে যাব যতদিন আমাদের শেষ সেনা জীবিত থাকে ও আমাদের বন্দুকে শেষ বুলেটটি অবশিষ্ট থাকে। আমাদের সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সেনাই আজও অক্ষত ও তারা লড়াই চালিয়ে যাবে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির মিথ্যা প্রচার সত্ত্বেও, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে পূর্ব এশিয়াতে তাদের সামরিক ক্ষমতা ততটা জোরালো নয় যতটা তারা প্রচার করছে। বর্মাদেশে এখনও কঠিন লড়াই চলছে এবং পূর্ব এশিয়ার অন্যত্রও ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে দীর্ঘদিন কঠিন লড়াই লড়তে হবে, তবেই যুদ্ধের শেষ ফলাফল জানা যাবে।

আমার স্বদেশবাসী! এখনও যারা কারাগারে বন্দি সেই সহযোদ্ধাদের কথা এবং এই স্বাধীনতার জন্য যারা অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, তাদের কথা আপনারা ভুলে যাবেন না। আরও মনে রাখবেন যে ১৯৪২ সালের আগে যারা কারারুদ্ধ হয়েছিল সেই বন্দিদের এবং যাদের ১৯৪২ সালের পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কিন্তু 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যাদের কোনও ভূমিকা ছিল না, তাদের সকলকে ভাইসরয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। সব শেষে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যা, তা হল আপনারা যদি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনও আপোষে রাজি হতে চান তা হলে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সেই নির্বাচনের শেষ লেবার বা কনজ়ারভেটিভ, যারাই মন্ত্রীসভা গঠন করুক না কেন আপনারা নিশ্চিতভাবে সব থেকে সুবিধাজনক উপায়ে আপনাদের দাবি আদায় করে নিতে পারবেন যদি সেই দরাদরি ৫ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারেন। ৫ জুলাইয়ের আগে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য লর্ড ওয়াভেল কোনও প্রচেষ্টা বাকি রাখবেন না, কারণ সেই সিদ্ধান্ত কনজ়ারভেটিভ পার্টিকে সাহায্য করবে। কিন্তু আপনাদের সামনে তিনি যে প্রলোভন সৃষ্টি করেছেন আপনারা সেই ফাঁদে পা দেবেন না।

ভারতে আমার বোন ও ভাইয়েরা! এই সংকটকালে ভারতের ভাগ্য আপনাদের হাতে। সমগ্র দেশ দুড়ে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করার এখনই হল সর্বোৎকৃষ্ট সময়।

'জয় হিন্দ!'

৬৬

ওয়াভেলের প্রস্তাবকে আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করুন

[সিঙ্গাপুর থেকে বেতার ভাষণ, ২১ জুন ১৯৪৫][১]

ভারতের বোন ও ভাইয়েরা!

গত তিনদিন ধরে আমি যখন আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছি তখন আমি এই বিষয়টি এক প্রসারিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখানোর চেষ্টা করেছি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুই ক্ষেত্রেই যার ব্যাপ্তি, এবং এ ছাড়াও আমি বাস্তব পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভারতের সমস্যাটি বিবেচনা করে দেখবার কথা ভাবছিলাম। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা থেকে আমাদের কাছে যে রিপোর্ট আসছে তাতে মনে হচ্ছে যাঁরা এই বিষয়ে তাঁদের মতামত মুখে প্রকাশ করছেন তাঁরা ভারতের এই সমস্যাটি দেখছেন অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে বর্তমানে, ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। যাঁরা ভারতবর্ষের সমস্যাটি প্রকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকের বক্তব্যই সহজে ভারতবর্ষের বাইরে গিয়ে পৌঁছবে না, বিশেষত যখন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছে কারাগারে বন্দি। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসবার আগে যদি মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি সব রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবি করতেন তা হলে আমাদের চিন্তার কোনও কারণ থাকত না। যদি সকল রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হত ও তারা সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির মিটিংয়ে মিলিত হতে পারত, তা হলে সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মতামত আমরা জানতে পারতাম। কিন্তু ধূর্ত ও কৌশলী ব্রিটিশ সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বাকি রাজনৈতিক বন্দিদের কারারুদ্ধ করে রেখে কেবলমাত্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদ্যদের মুক্তি দিয়েছে যাতে কংগ্রেসের বামপন্থী সদস্যগোষ্ঠীর বক্তব্য একেবারেই না প্রকাশ পায়, তাদের কণ্ঠ যাতে কার্যত রুদ্ধ করে রাখা যায়।

আমার নিজের মনের মধ্যে এই বিষয়ে কোনও সংশয় নেই যে ১৯৩৯ সালে, এই যুদ্ধের আরম্ভে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের জনমত যেমন ছিল তা থেকে এখন অনেকাংশে বিপ্লবের স্বপক্ষে ঝুঁকেছে। সুতরাং আজ যদি একটা সভায় সব কংগ্রেস সদস্যদের একত্রে ডাকা সম্ভব হত, এমনকী আমরা যদি সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটিরও একটা পূর্ণাঙ্গ সভা ডাকতে পারতাম তা হলে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব বিশাল সংঘ্যাগরিষ্ঠতায় প্রত্যাখ্যাত হত। ভারতের পরিস্থিতি ব্রিটিশ সরকার ও লর্ড ওয়াভেলের ভাল মতোই জানা আছে, কাজেই তাদের জানা ছিল যে ব্রিটিশ প্রস্তাব গ্রহণ যদি সাধারণ কংগ্রেস সদস্যদের অথবা সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অভিমতের উপর নির্ভর করে তা হলে সেই প্রস্তাব

---

১. Testament of Subhas Bose, pp. 101-109.

গ্রহণের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও থাকবে না। সুতরাং তারা এখন এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যে কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্বরূপ কেবলমাত্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাই লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু কংগ্রেসের সংবিধান অনুসারে, কংগ্রেসের পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটি এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

তথাপি আমি এটা স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি সে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে যদি কংগ্রেসের সব ধরনের সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব থাকত অথবা যদি একটা প্রকৃত সংকটকালীন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা হলে ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব নেবার নীতিগত (আইনগত নয়) যৌক্তিকতা থাকত। এটা সর্বজনবিদিত যে কংগ্রেসের বামপন্থী শরিক যারা যথেষ্ট প্রভাবশালী, ওয়ার্কিং কমিটিতে কিন্তু তাদের কোনও প্রতিনিধি নেই। এবং এই যুক্তিও কেউ দেখাতে পারবে না যে দেশে এখন এমন একটা জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে সাধারণ কংগ্রেস সদস্যদের বা সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে কোনও আলাপ-আলোচনা না করে কংগ্রেস কার্যকরী কমিটিকেই এত বড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্যই যে ব্রিটিশ সরকার এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে সাধারণ কংগ্রেস সদস্যদের সম্মিলিত সভায় বা সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কাছে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব পেশ না করে তারা সেই প্রস্তাব রেখেছে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সামনে, সেটা আমি বুঝি। কিন্তু কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি কেন লর্ড ওয়াভেলের এই চতুর ফন্দিতে জেনেশুনে ধরা দিতে চাইছে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। প্রথমত কংগ্রেসের সংবিধান অনুসারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শুধুমাত্র একটা কার্যনির্বাহী গোষ্ঠী, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত নেবার বা আইন প্রণয়নের অধিকার এই কমিটির নেই। কিন্তু আমরা যদি সম্পূর্ণ নৈতিক দিক থেকেই বিচার করি, তা হলেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে এটা অন্যায় আচরণ হবে যদি তারা এমন একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যা আগামী বেশ কয়েক দশক ধরে কংগ্রেস ও ভারতবর্ষের সমগ্র ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে। যদিও এখন দেরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও এই অন্তিম মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধীর কাছে আবারও আমার আন্তরিক ও বিনীত অনুরোধ যে কংগ্রেসের সদস্যদের সম্মতি ব্যতিরেকে আপনারা এই সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি আরও বিশেষভাবে এই আবেদন করছি কারণ লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করলে আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি তা ব্যর্থ হয়ে যাবে, কংগ্রেসের মৌলিক নীতি ও সিদ্ধান্ত থেকে আমরা বিচ্যুত হব এবং দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস স্বার্থশূন্য ভাবে যে কাজ করেছে, তারও কোনও মূল্য থাকবে না।

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করার ফল কী হবে সেই বিষয়ে এখন আমি কয়েকটা কথা বলব। প্রথমত ও প্রধানত, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হল পূর্ণ স্বরাজ, অথচ লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে 'স্বাধীনতা' কথাটি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, কোথাও কোনও জায়গায় তার উল্লেখমাত্র নেই। দ্বিতীয়ত, ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে কংগ্রেস ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করবে না বলে জানিয়েছিল এবং এই যুদ্ধবিরোধী নীতি গ্রহণ করার ফলে কংগ্রেসকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের মূল ভিত্তিই হল যারা এই প্রস্তাবে সম্মতি দেবে তাদের দূর প্রাচ্যে ব্রিটেনের যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। এবং এই যুদ্ধ ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য লড়তে হচ্ছে সে কথা কারুরই ভাবার কোনও কারণ নেই। তৃতীয়ত, এই প্রস্তাব গ্রহণ করার অর্থ হল ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে তোলা দাবিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেওয়া। যদি

এই প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করে তা হলে তাদের 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' স্লোগান ভুলে গিয়ে নতুন কোনও স্লোগান ভাবতে হবে, যে স্লোগানে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের প্রতিশ্রুতির কথা প্রচারিত হবে।

কংগ্রেস যদি তার মৌলিক নীতিকে বিসর্জন দিয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তা হলে তাদের সঙ্গে ইন্ডিয়ান লিবারেল ফেডারেশনের কী পার্থক্য থাকল সেই কথা আমি জানতে ইচ্ছুক। আমার আগের বক্তৃতাগুলিতে আমি বলেছি যে সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনও কংগ্রেস সদস্য লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের দিকে তাকিয়েও দেখত না, সেই বিষয়ে বিবেচনা করা তো দূরের কথা। বর্তমানে কয়েক জন কংগ্রেস নেতার মধ্যে আপোষ করার যে মনোভাব দেখা যাচ্ছে তার এক মাত্র মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে তাঁরা হয়তো ভাবছেন যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠীর জয় হতে চলেছে এবং আমাদের স্বাধীনতা পাবার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। পরিস্থিতির এই বিশ্লেষণ একেবারেই ভুল। ইউরোপে ও বর্মাদেশে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক সাফল্য সত্ত্বেও এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিষয়টি বহুভাবে আলোচিত হচ্ছে। পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল যাই হোক না কেন, সে যুদ্ধ হবে দীর্ঘ ও কঠিন, এবং জাপানের সেনাবাহিনী যে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য প্রাণপাত করে লড়াই করবে, সে কথা এমনকী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠীও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। যদিও সাম্প্রতিক যুদ্ধের ফলাফল আমাদের বিরুদ্ধে গেছে কিন্তু বর্মাদেশেরও বহু অঞ্চলে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে এখনও মরণপণ লড়াই চলছে। জাপানের সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রাও ব্রিটিশ ও তাদের মিত্র শক্তি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাদের লড়াই চালিয়ে যাবে। সম্প্রতি বর্মাদেশে পরাজয় হওয়া সত্ত্বেও আজ়াদ হিন্দ ফৌজের মূল বাহিনী অক্ষত আছে, তাদের মনোবল অটুট আছে এবং আজ়াদ হিন্দ ফৌজ লড়াই চালিয়ে যাবে যত দিন তাদের শেষ সেনা জীবিত ও শেষ বুলেটটি অক্ষত থাকবে।

যদি ভারতবাসীরা দেশের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত রাখতে পারে তা হলে এই যুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন কেউ রুখতে পারবে না। দেশের ভিতরে প্রতিরোধ, পূর্ব এশিয়াতে সশস্ত্র আগ্রাসন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তববাদী নীতির ব্যবহার, এই সবের সমন্বয়ে এই যুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষে আমরা এক স্বাধীন দেশ, স্বাধীন জাতির উত্থান দেখতে পাব। কিন্তু পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশের অভ্যন্তরে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। পূর্ব এশিয়ার সশস্ত্র আগ্রাসন যে অব্যাহত থাকবে সেই প্রতিশ্রুতি দেবার ক্ষমতায় আমি আছি। এবং আমি এই আশ্বাসও দিতে পারি যে যদি দেশের ভিতরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারি তা হলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা একটা বিশ্বব্যাপী আলোচনার বস্তু বলে গণ্য হতে থাকবে ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রক্রিয়া আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ ভারতের আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ ও গোলযোগ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নয় কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'টি বিষয়ে তারা ভীত। তাদের ভয় যে যদি ভারতের মধ্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিরোধ চলতে থাকে তা হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের সম্বন্ধে আলোচনা চলতেই থাকবে। ভয়ের আরও একটি কারণ তাদের আছে, সেটা হল ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশদের প্রতি অসহযোগী ও বৈরী মনোভাব থাকলে ব্রিটিশের পক্ষে দূর প্রাচ্যের আগামী যুদ্ধের জন্য সেনা ও রসদ সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, অর্থাৎ ভারত থেকে তারা কোনও সাহায্য পাবে না। ব্রিটিশের

জানা আছে ভারতবর্ষ থেকে বিপুল পরিমাণে সাহায্য না পেলে, বিশেষত ভারত থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে না পারলে দূর প্রাচ্যের যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। লর্ড ওয়াভেলের এই প্রস্তাবে তাই তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারবার পরিকল্পনা করেছেন, প্রথমত, ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য প্রসারণের যুদ্ধে সর্বাত্মক সহযোগিতার অঙ্গীকার পাবার জন্য ভারতকে প্রলোভন দেখানো; এবং দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের প্রশ্ন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে পরিণত করা যাতে সেই উদ্দেশ্যে ভারতের প্রতি সোভিয়েত রাশিয়াসহ রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন দেশের যাবতীয় সাহায্যকে বাতিল করে দেওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে আমি গত ১৯ তারিখের বিবৃতিতে যা বলেছিলাম তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই। সেই বিবৃতিতে অতি বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমি প্রকাশ করেছিলাম লর্ড ওয়াভেলের কূটকৌশলী প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে পূর্ব এশিয়ায়, বর্মা অতিক্রম করে সুদূর প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের আগামী যুদ্ধে ভারতীয়দের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ সেনা দাবি করা। এই অতি প্রয়োজনীয় সাহায্য যদি ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় জনগণের সহযোগিতা ছাড়াই আদায় করে নিতে পারত তা হলে ওয়াভেলের প্রস্তাব সম্ভবত কখনওই দিনের আলো দেখতে পেত না। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী ঠিক ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মতোই রণক্লান্ত এবং ব্রিটিশ সরকার ও তাদের প্রতিনিধি লর্ড ওয়াভেল মনে করছেন যে এই বিশাল সামরিক সাহায্য পেতে হলে এখন ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে সহানুভূতি ও উৎসাহ নিয়ে অগ্রসর হওয়াটা একান্ত প্রয়োজন।

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবার আগে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেদের চিন্তা করে দেখতে হবে তাঁরা দূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পাঁচ লক্ষ ভারতীয় প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য পাঠাতে প্রস্তুত আছেন কিনা। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে সম্মতি দিলে কংগ্রেসের কী ক্ষতি হতে পারে তা আমি চিন্তা করে দেখেছি। প্রস্তাবে সম্মতি দেবার আগে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সতর্ক ভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে এর ফলে তাঁদের কী লাভ হবে এবং আমাদের যা ক্ষতি হবে সেই ক্ষতিকে পূরণ করবার জন্য সেই লাভ যথেষ্ট কিনা। যা ক্ষতি হবে সেই তুলনায় যদি আমাদের যথেষ্ট লাভ না হয় তা হলে এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করাই যুক্তিযুক্ত হবে, যেমন আমরা ১৯৪২ সালে ক্রিপসের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। কোনও কোনও কংগ্রেস সদস্য আছেন যাঁরা ভাবছেন এখন আমরা যা করবার কথা ভাবছি, সেটা হয়তো আমাদের ভবিষ্যতে করতেই হবে। এটা একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা। আমি এর আগে কোনও বক্তৃতায় বলেছি, বর্তমানে এই যুদ্ধ চলাকালীন দুর্ভাগ্যক্রমে যদি আমরা স্বাধীনতা নাও পাই, যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুযোগ আমরা আবারও পাব।

যুদ্ধের শেষে ও শান্তি ফিরে আসার আগের সময়টা অস্থিরতায় কাটে এবং এমনকী বিজয়ী পক্ষেরও তখন একটা অনিশ্চিত সময়। জয় করায়ত্ত হলেও তারা তখন ক্লান্তি অপনোদনের জন্য কিছুটা বিশ্রাম চায়। ঠিক সেই কারণেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে আয়ারল্যান্ড ও তুরস্কে বিপ্লবীরা জয়ী হয়েছিল, অথচ আগে তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি।

আমার সামনে রাখা একটা প্রতিবেদনে আমি পড়ছি যে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুল কালাম আজ়াদ বলছেন, "বর্তমানে আলোচনায় যদি আমরা সফল না হই তা হলে আবার আলোচনায় বসার আগে, কংগ্রেস যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।" আমি কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এই বিষয়ে একমত হতে পারলাম না যে যখন যুদ্ধ চলছে তখন আমরা কেন দেশের মধ্যে নতুন করে আমাদের আন্দোলন শুরু করতে পারব না।

কিন্তু তা হবার পরেও যদি দেখা যায় যে আমাদের পরাধীন অবস্থা তখনও ঘোচেনি তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আবারও একটা বড় আকারের আন্দোলন শুরু করবার সুযোগ ভারতীয়দের আসবে, সেই বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত এবং আমার মনে কোনও সংশয় নেই যে সেই যুদ্ধোত্তর আন্দোলনে বর্তমানের ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

ভারতীয় নেতারা যাঁরা বর্তমানে কারাগারের বাইরে আছেন তাঁদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশই লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবটা বিস্তীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাঁরা একটা অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণে শুধু বর্তমানে ও নিকট অতীতে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। আমরা যদি লর্ড ওয়াভেলের এই প্রস্তাব গ্রহণ করি তা হলে আমাদের লাভ ও ক্ষতি যা হবে তার একটা তুলনামূলক বিচার আমি এখন করব। তাঁর প্রস্তাবে তিনি বলেছেন যদি আমরা দূর প্রাচ্যের আগামী যুদ্ধে সাগ্রহ অংশগ্রহণে সম্মতি দিই তাহলে আমরা যে সুবিধাগুলি পাব তা হল: (১) স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি; (২) ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কয়েকটা চাকরি এবং (৩) প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই তিনটি প্রতিশ্রুতি এর আগেও আমাদের দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার সর্বদাই আমাদের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ১৯৩৯ সালে ৮টি প্রদেশের মন্ত্রীসভা ছিল আমাদের নিয়ন্ত্রণে এবং আমরা স্বেচ্ছায় সেই মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছি। যে সব কংগ্রেস সদস্য নিজেদের বিকিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন তাঁদের জন্য ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের চাকরি সর্বদাই খোলা ছিল। এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে যে ওয়াভেলের প্রস্তাবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে আমাদের জন্য অধিক সংখ্যক আসন বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু তার পাশাপাশি এ কথাও মনে রাখতে হবে প্রস্তাবে সম্মতি দেবার অর্থই হল ব্রিটেনের যুদ্ধে আমাদের সর্বাত্মক সমর্থন দেওয়া। ঠিক এই কারণেই কি ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করেনি? তারা তো ১৯৩৯ সালের পরেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারত এবং তার জন্য যুদ্ধে সমর্থন করবারও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ব্রিটেনের সাম্রাজ্য রক্ষা করার যুদ্ধে দেশের রসদ ব্যবহারের সম্মতি দেবার থেকে পদত্যাগ করাই তারা বাঞ্ছনীয় মনে করেছিল।

ব্রিটেনে অনেকেই এখন এই প্রস্তাবের উপযোগিতা সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা বলছেন, কারণ তাঁদের মতে এই প্রস্তাব গৃহীত হলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ভারতীয়করণের কাজ অনেকটা অগ্রসর হবে। আশা করি কোনও কংগ্রেস সদস্যর মুখে এই ধরনের কথা শোনা যাবে না কারণ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ভারতীয়করণ কংগ্রেসের দাবি নয়, ভারতবর্ষ থেকে ভাইসরয় ও ব্রিটিশ কমান্ডার ইন চিফ সহ ব্রিটিশ শাসনের সম্পূর্ণ অবসানই কংগ্রেস দাবি করছে। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল খুব স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন প্রস্তাবে কোনও সাংবিধানিক পরিবর্তনের কথা একেবারেই বলা হয়নি। অধিকন্তু এই নবগঠিত ভাইসরয়ের কাউন্সিল শুধুমাত্র উপদেষ্টার ভূমিকাতে কাজ করবে, ভাইসরয়ই সদস্যদের নির্বাচন করবেন ও এই সদস্যেরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁরই আজ্ঞাবহ থাকবে, কোনও কেন্দ্রীয় নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তাদের দায়বদ্ধতা থাকবে না। এমনকী কাউন্সিলের ভিতরেও সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতের কোনও গুরুত্ব থাকবে না কারণ ভাইসরয়ের পূর্ণ ক্ষমতা থাকে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সুপারিশ বা প্রস্তাবের উপর ভেটো দেবার। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে সম্মিলিতভাবে, অথবা সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে কোনও সিদ্ধান্ত নেবার কোনও প্রশ্নই উঠবে না। কাজেই এই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলকে কোনওভাবেই একটা মন্ত্রীসভার সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে না

কারণ সেখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সদস্যপদটি থাকবে ব্রিটিশ যুদ্ধমন্ত্রীর, অর্থাৎ কমান্ডার ইন চিফের এবং তিনি যা চাইবেন ভাইসরয়ের তাতে সম্পূর্ণ সম্মতি থাকবে। কাজেই ভাইসরয়ের পরেই যুদ্ধমন্ত্রী হবেন সর্বশক্তিমান। যতক্ষণ ভাইসরয় ও যুদ্ধমন্ত্রী একযোগে কাজ করবেন ততক্ষণ তাঁরা অন্য সব দপ্তরগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। অন্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলরেরা তার প্রতিবাদ করতে পারবেন না কারণ তাঁরা ভাইসরয়ের কথা মানতে বাধ্য, যদিও তা আইনসম্মত নয় কিন্তু যেহেতু নীতিগতভাবে তাঁরা যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সর্বাঙ্গীণ সমর্থনের অঙ্গীকার করেছেন। বহির্বিভাগীয় দপ্তরের ভার থাকবে একজন ভারতীয়ের উপরে কিন্তু বৈদেশিক সিদ্ধান্তগুলি থাকবে এই দপ্তরের আওতার বাইরে। এই দপ্তরের ভার যে ভারতীয় সদস্যের উপরে থাকবে তার ভূমিকা হবে ভাইসরয়ের কাউন্সিলের প্রতিরক্ষা সদস্যের এবং তার কাজ হবে শুধু আর্মির ক্যান্টিনের দেখাশোনা করা।

যে সব কংগ্রেস সদস্য লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে সম্মতি দেবার জন্য এত আগ্রহী তাঁদের আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আমরা কোন মুখে সেই মন্ত্রীসভাগুলিতে ফিরে যাব যেখান থেকে আমরা ১৯৩৯ সালে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে চলে এসেছিলাম। আমি আরও জিজ্ঞাসা করতে চাই যে মিস্টার আনে ও ডক্টর খারে যখন ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের চাকরি নিয়েছিলেন তখন কংগ্রেস কেন তাঁদের ধিক্কার দিয়েছিল এখন যখন কংগ্রেস সেই একই কাজ করবার কথা ভাবছে। এই বিষয়ে আমি যতই চিন্তা করছি ততই আমার মনে হচ্ছে যে এই প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়ায় কংগ্রেসের এবং ভারতবর্ষের সম্মান ও প্রতিষ্ঠার অপূরণীয় ক্ষতি হবে। এর ফলে আমরা ঘড়ির কাঁটাকে ২৫ বছর পিছিয়ে দিতে চলেছি। আমাদের নীতিকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেবার পরিবর্তে আমরা যা পাব তা হল কয়েকজন উচ্চাভিলাষী ও ক্ষমতালিপ্সু কংগ্রেস সদস্যের জন্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কয়েকটা চাকরি, এই মাত্র।

কংগ্রেস যদি এই প্রস্তাবে সম্মতি দেয় তা হলে কংগ্রেসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লীগ কীভাবে লাভবান হবে সেটাই আমি এখন দেখাবার চেষ্টা করব। আমার বিশ্বাস, মুসলিম লীগ যদি দাবি করে তা হলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত সব আসনগুলি মুসলিম লীগের সদস্যদের দেওয়াই হল লর্ড ওয়াভেলের উদ্দেশ্য। তেমনই কংগ্রেস যদি দাবি করে তা হলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত সব আসনগুলি তিনি কংগ্রেসকে দেবেন। বাকি আসনগুলি লর্ড ওয়াভেল তাঁর নিজস্ব খেয়ালখুশি মতো বিতরণ করবেন এবং বলাই বাহুল্য যে এই আসনগুলি যে সদস্যদের দেওয়া হবে তাঁরা একেবারেই লর্ড ওয়াভেলের দাসানুদাস হয়ে থাকবেন। তার ফলে ভাইসরয় যদি কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ, এই দুই গোষ্ঠীর যে কোনও একটার সমর্থন পান তা হলে তিনি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে সর্বদাই পাকাপাকিভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেন। আমি অনুমান করছি যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কংগ্রেস সদস্যেরা সব সময়ে ভাইসরয়ের সঙ্গে আপোষ করবেন না অথবা করতে পারবেন না, কারণ তা করলে তারা কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের উপহাসের পাত্র হবেন। কিন্তু ভাউইসরয় যদি মুসলিম লীগের সামনে এই টোপটি ফেলেন যে পাকিস্তান সৃষ্টির স্বপ্ন সফল করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার তাদের মদত দেবে তা হলে মুসলিম লীগ সদস্যগোষ্ঠী যে ভাইসরয়ের সঙ্গে সর্বদাই হাত মেলাবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যে মুহূর্তে সেটা ঘটবে তখন থেকেই ভাইসরয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারবেন এবং কংগ্রেস সদস্যরা স্থায়ীভাবে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত হবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাইসরয়ের কাছে দেওয়া অঙ্গীকার অনুসারে যুদ্ধে ব্রিটেনকে সর্বাঙ্গীণ

সমর্থন দিয়ে যেতে তারা বাধ্য থাকবে। কাজেই, প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে ব্রিটিশ সরকারের এই লাভ হবে যে তারা কংগ্রেসের সহায়তায় ভারতীয় জনগণের নামে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে। অন্যদিকে মুসলিম লীগও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেসকে স্থায়ীভাবে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পর্যবসিত করে ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পাকিস্তানের গঠনের স্বপ্ন সফল করতে সক্ষম হবে।

প্রস্তাবটি গ্রহণ করলে আমরা কী হারাব তা আমি জানিয়েছি। কংগ্রেস যদি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শুরু করে তা হলে আমরা আরও কী হারাব সেই বিষয়ে আমি এবার আলোচনা করব। প্রথমত, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও বিশেষভাবে ভারতীয় জনগণের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় একটা তীব্র আঘাত লাগবে। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে শরিক হবার ফলে কংগ্রেস তার বিপ্লবী মানসিকতা এবং সাহসী ও সংগ্রামী স্বাদেশিকতার বোধ হারাবে। এবং সর্বশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্য তারা সারা বিশ্বের মুক্তি-অভিলাষী জনগণের সহানুভূতি হারাবে এবং তারা সোভিয়েত রাশিয়া ও আরও কিছু বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্র আমাদের সংগ্রামে যাদের সমর্থন আছে ও যারা সেই সংগ্রামে সক্রিয় সাহায্য দিতে ইচ্ছুক তাদের সমর্থনও হারাবে।

বন্ধুরা, আমি এ পর্যন্ত লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবকে পুরোপুরি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছিলাম, কিন্তু এর সামাজিক প্রভাবের কথা এখনও বিবেচনা করিনি। এখন আমি সেটা করবার চেষ্টা করব। এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করার ফলে হয়তো কংগ্রেস, অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও, রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক নীতির অনুপ্রবেশ ঘটাবে। তারা স্বীকার করে নেবে যে মুসলিম লীগ হল ভারতবর্ষের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি এবং তার ফলে অন্য সব মুসলমান প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন, আজ়াদ মুসলিম লীগ, জামায়েত-উল-উলেমা, শিয়া কনফারেন্স, মজলিশ-ই-আহরার, প্রজা পার্টি, মুসলিম মজলিস, সর্ব ভারতীয় মোমিন পার্টি ইত্যাদি যারা এতদিন ধরে বিশাল স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে একটা জাতীয়তাবাদী ভূমিকা নিয়েছিল তারা প্রতারিত হবে। অধিকন্তু কংগ্রেস স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে যে 'কংগ্রেস' নামটি 'উচ্চবর্ণের হিন্দু'দের সঙ্গে সমার্থক, শুধু 'হিন্দু' কথাটির সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই।

ভাইসরয় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি কংগ্রেস প্রার্থীদের ও মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি মুসলিম লীগ প্রার্থীদের দেবেন এবং নিম্নবর্ণের হিন্দু সদস্যদের তিনি নিজেই নিয়োগ করবেন এই অনুমানের ভিত্তিতে আমি আমার এই বক্তব্য রাখছি। এখন আমি লর্ড ওয়াভেলের কাছে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। আবুল কালাম আজ়াদের মতো বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত মুসলমান, যাঁরা মুসলিম লীগের সদস্য নন, তাঁদের কি তিনি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মুসলমান সদস্যদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন? এবং যেহেতু গত নির্বাচনে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ভোটের মধ্যে অধিকাংশই গেছে কংগ্রেসের পক্ষে, তিনি কি নিম্নবর্ণের হিন্দুর জন্য সংরক্ষিত সদস্যপদের প্রার্থী নির্বাচন নিজের হাতে না রেখে কংগ্রেসের হাতে ছেড়ে দেবেন? তিনি যদি এটা না করেন তা হলে এটা জলের মতো পরিষ্কার যে ভাইসরয়ের উদ্দেশ্য হল কংগ্রেসকে শুধু উচ্চবর্ণের হিন্দুদের পার্টিতে পর্যবসিত করা। যে কেউ লর্ড ওয়াভেলকে এই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন ও পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যেই আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে।

ভাইসরয়ের প্রস্তাবে আর যা কিছু আপত্তিকর বিষয়বস্তু থাক বা না থাক, শুধুমাত্র এই একটি বিষয়, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবকে প্রাধান্য দেবার ইচ্ছার জন্যই প্রস্তাবটিকে

সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেওয়া উচিত এবং যে কোনও জাতীয়তাবাদী পার্টির পক্ষে যে এই প্রস্তাব একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় সে কথা তাঁকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। কংগ্রেস হল একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান যা সব ধর্মের ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। এই জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কংগ্রেস অনেক লড়াই করেছে ও অনেক নির্যাতন সহ্য করেছে। এতদিনের এত লড়াইয়ের পরে আজ যদি কংগ্রেস তাদের জাতীয় ভাবমূর্তিকে বিসর্জন দিয়ে সাম্প্রদায়িক পার্টির তকমা গায়ে লাগায় এবং ভারতের অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের একটি এই পরিচয়ে যদি তারা সন্তুষ্ট থাকতে চায় তা হলে সেটা অবধারিত আত্মঘাতের সমতুল্য হবে। এর আগেই আমি যা বলেছি তার পুনরাবৃত্তি করে এই কথাই বলব যে কনজ়ারভেটিভ পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্য আগ্রহী ও লর্ড ওয়াভেল ৫ জুলাইয়ের আগে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য নিতান্তই উৎসুক কারণ তাঁর প্রস্তাব একবার কাজে পরিণত হয়ে গেলে সেটা কনজ়ারভেটিভ পার্টিকে নির্বাচনে যথেষ্ট সাহায্য করবে, এমনকী হয়তো পার্টির ক্ষমতায় ফিরে আসাটাও নিশ্চিত করবে। যদি কনজ়ারভেটিভ পার্টি ক্ষমতায় ফিরতে নাও পারে তাহলে যেহেতু কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে সেই কারণে লর্ড ওয়াভেল নতুন লেবার মন্ত্রীসভাকে ব্রিটেনের ভারত সম্পর্কীয় নীতির পরিবর্তন করা থেকে নিরস্ত করতে পারবেন। অপরপক্ষে আমরা যদি এই প্রস্তাব এখন গ্রহণ না করি তা হলে লেবার পার্টি ক্ষমতায় এলে তারা অবশ্যই ভারতের বিষয়টা পুনর্বিবেচনা করবে এবং তখন হয়তো আমরা তাদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারব, আমাদের জন্য আরও সুবিধাজনক শর্তে। এবং যদি কনজ়ারভেটিভ পার্টিই আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে তা হলে তারাও ভারতের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে নতুন প্রস্তাব আনতে বাধ্য হবে, অন্যথায় ভারত সমস্যা একটা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়ে উঠবে যেটা ব্রিটেনের জন্য অত্যন্ত অপ্রীতিকর হবে। আমরা কিন্তু দরাদরি করবার আবারও একটা সুযোগ পাব, হয়তো আরও ভাল সুযোগ পাব। আমি এই কথাগুলি বলছি তাঁদের জন্য যাঁরা ব্রিটেনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার নীতিতে বিশ্বাসী এবং যাঁরা সরাসরি লড়াই করে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার কথা ভাবছেন না।

সব শেষে আমি আপনাদের আরও একবার মনে করিয়ে দিতে চাই, যেমন আমি গতকাল বলেছিলাম, যে এই সংকটকালে ভারতের ভাগ্য আপনাদের হাতে এবং সেই দায়িত্ব একান্তভাবেই আপনাদের— ভারতীয় জনগণের, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নয়। কাজেই আপনারা এই কৌশলী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ভাবে বিদ্রোহ করুন এবং ৫ জুলাই ১৯৪৫ তারিখের আগে যাতে এই প্রস্তাব আবর্জনার স্তূপে নিক্ষিপ্ত হয় সেটা নিশ্চিত করুন।

৬৭

ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিষয়ে চিন্তাভাবনা

[সিঙ্গাপুর থেকে বেতার ভাষণ, ২২ জুন ১৯৪৫][১]

ভারতের বোন ও ভাইয়েরা! ভারতবর্ষ থেকে সদ্য পাওয়া খবরে আমরা যা শুনছি তাতে জানা গেছে যে গত কাল রাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিমলা সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য লর্ড ওয়াভেলের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান মনোভাব যাদের জানা আছে তারা খবরটাতে বিস্মিত হবে না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভিতরে মতামতের বিষয়ে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানিয়েছেন: 'ভাইসরয়ের প্রস্তাবের বিষয়ে কংগ্রেস নেতাদের মতামত তিনটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত। প্রথম দলের পুরোভাগে আছেন মিস্টার গান্ধী ও সর্দার বল্লভভাই, যাঁরা ভাইসরয়ের বেতার ভাষণে 'উচ্চ বর্ণের হিন্দু' কথাটির ব্যবহারের তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন। মধ্যবর্তী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মিস্টার নেহরু ও মৌলানা আবুল কালাম আজ়াদ এবং সামান্যতম যে ক্ষমতার হস্তান্তর হবে বলে আশা করা যাচ্ছে তাতে সন্তুষ্ট না হলেও তাঁদের অভিমত হল যদি পরে ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে আবার উত্থাপন করবার জন্য যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে এবং দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রা যদি উন্নত করা যায় তা হলে একটা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে প্রস্তাবটিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা যেতে পারে। তৃতীয় দলের নেতৃত্বে আছেন মিস্টার রাজাগোপালাচারী ও মিস্টার ভুলাভাই দেশাই। তাঁরা মনে করেন যে সিমলা সম্মেলনের বসবার শর্তাবলীতে এতটাই বিস্তার ও নমনীয়তা আছে যে কংগ্রেসের সব ভয় অমূলক। তাঁদের সুপারিশ হল খুঁটিনাটি নিয়ে চিন্তা না করে কংগ্রেসের পক্ষে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে সেই অনুসারে কাজ করা যায় কিনা তার একটা ন্যায্য বিচার বিবেচনা করা উচিত হবে এবং তার ফলে এটাও বাস্তবে দেখিয়ে দেওয়া যাবে যে কংগ্রেস সহযোগিতায় বিশ্বাসী।'

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক সংবাদদাতার বিশ্লেষণ নির্ভুল কিনা এতদূর থেকে সেটা আমার পক্ষে বিচার করা শক্ত, তবে তা যদি নির্ভুল হয় তা হলে আমি অবাক হব না। বস্তুত আমি গতকাল বর্তমান কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির রাজনৈতিক চরিত্রের সম্পর্কে যা বলেছিলাম এই বিশ্লেষণ সেই একই কথা বলছে। শোনা যাচ্ছে যে র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টি সিমলা সম্মেলনকে বর্জন করেছে, বর্জন করবার কারণ হল শ্রমিক শ্রেণীর কোনও প্রতিনিধিদের এই সম্মেলনে ডাকা হয়নি। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়ার রাজনৈতিক সংবাদদাতার রিপোর্ট পড়ে মনে হচ্ছে যে র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টির এই মতকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কোনও সদস্য সমর্থন করেনি। তাদের যুক্তি হল

১. Testament of Subhas Bose, pp. 109-114.

তারা সিমলা সম্মেলনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে ঠিক, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই যুক্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বর্তমানে প্রস্তাবের শর্তাবলীতে যা বলা হয়েছে তাতে প্রস্তাবে সম্মতি দেবার কী অর্থ হতে পারে সেই বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। যে কেউ এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে তাদের সকলকেই পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধে যোগদানের এই প্রস্তাবকে সর্বাঙ্গীণভাবে গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং কংগ্রেসের ক্ষেত্রে তার অর্থ দাঁড়াবে এই রকম— ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভাগুলি যখন পদত্যাগ করেছিল তখন তারা যুদ্ধে যোগদানের বিষয়ে যে নীতি অনুসরণ করেছিল এখন কংগ্রেসকে সেই নীতি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। এছাড়াও যারা এই সম্মেলনে যোগ দেবে তাদের সকলকেই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেলের বর্তমান সাংবিধানিক পদমর্যাদা স্বীকার করে নিতে হবে এবং যেহেতু মন্ত্রীর দায়িত্বের পরিবর্তে কেবলমাত্র উপদেষ্টার ভূমিকায় কাজ করতে দেওয়া হবে, সুতরাং সেই অপমানজনক পরিস্থিতিও তাদের মেনে নিতে হবে। এই বিষয়ে লর্ড ওয়াভেল কোনও সত্য গোপন করার চেষ্টা করেননি। বরং তিনি খুব স্পষ্ট ভাষাতেই বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে শুধুমাত্র তাঁরই হাতে। সুতরাং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যেরা তাঁর কাছেই দায়বদ্ধ থাকবেন, নির্বাচক জনগণের কাছে নয় এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে শাসনের ভার সংখ্যাগরিষ্ঠের গোষ্ঠীর হাতে দেওয়া অথবা যৌথভাবে দায়িত্বের ভার বহন করার প্রশ্নই উঠবে না। অতএব যাঁরা সিমলা সম্মেলনে যোগ দেবেন তাঁদের সকলকেই স্বাধীনতা লাভের দাবির কথা ভুলে যেতে হবে এবং তার সঙ্গে তাঁদের আরও ভুলে যেতে হবে নির্বাচকদের কাছে দায়বদ্ধ কেন্দ্রীয় জাতীয় সরকারের কথা, সাধারণত যে দাবি করা হয়ে থাকে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের ভারতীয়করণেই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এবং ১৯৩৫ সালের আইনের কাঠামোর মধ্যে এই কাউন্সিলের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকবে। তার ফলে এই বিষয়ে কোনও সংশয় থাকতে পারে না যে সিমলা সম্মেলনে অংশ নেবার জন্য আমন্ত্রণ গ্রহণ করার অর্থই হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মৌলিক নীতিসমূহকে বিসর্জন দেওয়া। এর মধ্যে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় গ্রহণ করা শপথের কথাও বলতে হয় যার জন্য আমাদের অনেক ভাই, বন্ধু, সহকর্মী এখনও জেলের মধ্যে বন্দিদশায় দিন কাটাচ্ছেন। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও বেদনাদায়ক যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্যও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসবার আগে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেবার দাবি করেননি। অথচ তাঁদের মধ্যে অনেকেই লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের কিছু কিছু বিষয়ের উপরে বিভিন্ন জায়গায় বিবৃতি দিয়েছেন।

গতকালের বক্তৃতায় আমি বলেছি যে ওয়ার্কিং কমিটি হল একটি কার্যনির্বাহী সংস্থা এবং সংবিধান তাদের এই ক্ষমতা দেয়নি যার দ্বারা তারা এত লক্ষ ভারতবাসীর ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে এবং সমগ্র দেশকে এমন একটা পথে পরিচালিত করতে পারে যা কংগ্রেসের মৌলিক ভাবধারা ও নীতির পরিপন্থী। ওয়ার্কিং কমিটিতে যেহেতু কংগ্রেসের অন্তর্গত সব গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধি নেই এবং যেহেতু দেশের মধ্যেও এই বিষয়টিতে কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যায়নি, সেই কারণে ওয়ার্কিং কমিটির আইনগত অধিকার তো অবশ্যই নেই— কোনও নীতিগত যৌক্তিকতাও নেই, যার বলে তারা সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি এবং সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে তাদের নিজেদের দায়িত্বে সিমলা সম্মেলনে অংশগ্রহণের

সিদ্ধান্ত নেওয়ারও কোনও যৌক্তিকতা নেই, বিশেষত পুরো প্রস্তাবটাই যখন কংগ্রেসের মৌল নীতির বিরোধী।

আমি মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির কাছে করজোড়ে আবেদন করছি, যদিও এখন শিরে সংক্রান্তি তবুও, যে তাঁরা যেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি এবং সমগ্র কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করে আজ এই সংকট মুহূর্তে এই বিরাট দায়িত্ব নেবার আগে শান্তভাবে চিন্তা করে দেখেন। কেন যে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা এমন অন্যায্য আচরণ করছেন সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য। লর্ড ওয়াভেল ও ব্রিটিশ সরকারের যে তাড়া আছে সেটার কারণ আমি বুঝি। তাদের নিজস্ব অভিসন্ধি আছে; প্রথমত লর্ড ওয়াভেল ও ব্রিটিশ সরকারের জানা আছে যে ভারতীয় জনগণ এখন ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক সামরিক সাফল্যে অভিভূত হয়ে আছে এবং তারা যেন অবশেষে অনুভব করছে যে এই যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর জয় অনিবার্য। তাদের এই মানসিক অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাই লর্ড ওয়াভেল ও ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য, তাই লোহা যখন তেতে আছে তখনই তারা আঘাত করার কথা ভাবছে। লর্ড ওয়াভেল ও ব্রিটিশ সরকারের ভয় হচ্ছে যে কয়েক মাস পরে গোটা পৃথিবী উপলব্ধি করবে যে যুদ্ধে জার্মানি পরাভূত হলেও দূর প্রাচ্যে জাপানকে পরাস্ত করা তত সহজ হবে না। দ্বিতীয়ত লর্ড ওয়াভেল ও ব্রিটিশ সরকারকে যে কোনও ভাবে এই নেতাদের ধাপ্পা দিয়ে দূর প্রাচ্যে তাদের সাম্রাজ্যবাদী সমরের জন্য ৫০০,০০০ ভারতীয় সেনা ও বিশাল পরিমাণে সামরিক রসদ জোগাড় করতে হবে। তৃতীয়ত, লর্ড ওয়াভেল ও ব্রিটিশ সরকারকে ৫ জুলাই ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনের আগে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে একটা চুক্তিতেই আসতে হবে। লর্ড ওয়াভেল ও ব্রিটিশ সরকারের এত ব্যস্ততা কেন তার সম্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে এই তিনটি কারণের মধ্যে। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কেন তাদের ফাঁদে পড়বে তার কোনও ব্যাখ্যা আমার জানা নেই। এই প্রসঙ্গে আমি আবার আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে কেন লর্ড ওয়াভেল আকাশ পাতাল হন্যে হয়ে ঘুরছেন যাতে ৫ জুলাইয়ের আগের ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে তিনি একটা সমঝোতায় পৌঁছতে পারেন, এ কথা আমি আগেই আপনাদের বলেছি।

লেবার পার্টি যদিও লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের শর্তাবলীতে তাদের সমর্থন দিয়েছে তবুও কনজ়ারভেটিভ পার্টি, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বর্তমানে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাদের উপরের প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। কাজেই লর্ড ওয়াভেল যদি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছতে সফল হন তাহলে সেটা হবে কনজ়ারভেটিভ পার্টির সাফল্য এবং হয়তো সেটা নির্বাচনে কনজ়ারভেটিভ পার্টির সদস্যদের ভোটসংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করবে এবং তারা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারবে। লর্ড ওয়াভেলের সাফল্য সত্ত্বেও যদি কনজ়ারভেটিভ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় এবং তার ফলে লেবার পার্টি যদি ক্ষমতায় আসে তা হলে কনজ়ারভেটিভ পার্টি আর কিছু না হোক অন্ততপক্ষে লেবার পার্টিকে ভারতবর্ষের সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করতে বাধা দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু অপরপক্ষে লর্ড ওয়াভেল যদি সফল না হন, তাঁর অক্ষমতা কনজ়ারভেটিভ পার্টির ব্যর্থতা বলে ধরা হবে, এবং সেটা হয়তো নির্বাচনে লেবার পার্টিকে সাহয্য করবে। লেবার ক্যাবিনেট তখন ভারতবর্ষের বিষয়টি আবার আলোচনার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হবে কারণ বৈদেশিক ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলি কনজ়ারভেটিভরা সমাধান করতে পারেনি সেই কাজগুলি লেবার ক্যাবিনেট যে করতে পারে সেটা প্রমাণ করবার জন্যই সেটা তাদের করতে হবে। সিমলা সম্মেলনে কনজ়ারভেটিভরা

ব্যর্থ হলেও যদি তারা ক্ষমতায় আসে তা হলে তখন তাদের ভারতের সম্বন্ধে এই আলোচনা আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। কনজ়ারভেটিভ পার্টি ক্ষমতায় আসার পর যদি তারা এই সমস্যা সমাধান না করতে পারে তা হলে সেটা একটা আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হবে এবং ভবিষ্যতের আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে সেই বিষয়টি বারে বারেই আলোচনার জন্য উঠতে থাকবে ও তার মধ্যে বড় তিনটি সম্মেলনও রয়েছে।

আমি আমার স্বদেশবাসীদের এই কথাটা বোঝাতে চাই যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলিতে ভারতের সমস্যার আলোচনা যাতে না হয় সেই জন্য কনজ়ারভেটিভ পার্টি সব কিছু করতে রাজি আছে। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব যদি আমরা এখন প্রত্যাখ্যান করি, এবং আমি আশা করছি যে তাই ঘটবে, তা হলেও, যে পার্টিই ৫ জুলাইয়ের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাক না কেন, ভবিষ্যতে আমরা যে আবার এই বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দর কষাকষির সুযোগ পাব সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বস্তুত ব্রিটিশ সরকারের সামনে দূর প্রাচ্যে যে দীর্ঘ ও কঠিন লড়াই অপেক্ষা করে আছে, সেটা হল আরেকটা বাড়তি কারণ যে ব্রিটেনকে এখন ভারতীয়দের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখতেই হবে।

আমি এই কথাটা স্পষ্ট করে বলতে চাই যে ব্রিটিশ যদি ভারত ছেড়ে না যায় তা হলে তাদের সঙ্গে দরাদরির কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যেহেতু ভারতের অভ্যন্তরে এতজন ব্যক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার কথা ভাবছে, তাদের কর্তব্য হল সেই আলোচনা কখন ও কীভাবে করা উচিত হবে সেই বিষয়ে চিন্তা করা। এই প্রসঙ্গে আমি বলব সেই আলোচনার প্রশস্ত সময় হল নিশ্চিত ভাবে ৫ জুলাইয়ের পরে, এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবি লেবার পার্টি মেনে নেবে সে বিষয়ে আশা যদিও খুবই কম তবু তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আমাদের লাভবান হবার সম্ভাবনা বেশি। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষের প্রশ্ন উঠতে পারে কেবলমাত্র দু'টি শর্তে। প্রথম হল যদি আমাদের স্বাধীনতা পাবার কোনও সম্ভাবনা একেবারেই না থাকে, এবং দ্বিতীয়ত এটাই যদি ব্রটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ মীমাংসার শেষ সুযোগ হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে। প্রথম শর্তের বিষয়ে আমি বলব যে যদিও সাম্প্রতিক যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী অনেক সাফল্য পেয়েছে তবুও ভারতীয়দের স্বাধীনতা পাবার সম্ভাবনা এখন আগের থেকে অনেক বেশি। এবং দ্বিতীয় শর্তের বিষয়ে আমি আবার বলব ব্রিটেনে যে পার্টিই মন্ত্রীসভা গঠন করুক না কেন ৫ জুলাইয়ের পরে ভারতীয়রা আবার ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সুযোগ পাবে যখন তারা দরাদরি করতে পারবে।

আমার মতে তিনটি কারণ আছে যার জন্য এই যুদ্ধের শেষে ভারত তার স্বাধীনতা পাবে। কারণগুলি হল (১) ভারতের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন; (২) ভারতের বাইরে সশস্ত্র সংগ্রাম; এবং (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনীতির ব্যবহার। ভারতের ভিতরে যদি আমরা নৈতিক প্রতিরোধও গড়ে তুলতে থাকি তাতেও কাজ হবে। ভারতের সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিক জগতের সামনে জাগিয়ে রাখতে হবে এবং আমাদের এমনভাবে কূটনীতির ব্যবহার করতে হবে যাতে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্তর্জাতিক জগতের সমর্থন আমরা পেতে পারি। অন্য যে সব দেশ ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে অর্থাৎ যারা ব্রিটেনের শত্রুপক্ষ, তাদের কাছ থেকে— নৈতিক সমর্থন ও ব্যবহারিক সাহায্য— উভয় প্রকার সাহায্যই ভারতে নিতে হবে। সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলতে হলে, বর্মাদেশে আমাদের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আজ়াদ হিন্দ ফৌজের মূল বাহিনীর ক্ষমতা এখনও অটুট এবং

আমরা হাল ছাড়ব না। আমরা লড়াই চালিয়ে যাব যতদিন আমাদের শেষ সেনার দেহে প্রাণ থাকে ও শেষ বুলেটটি অবশিষ্ট থাকে। আমরা যারা পূর্ব এশিয়াতে আছি, দেশের মানুষদের থেকে যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আরও অনেক বেশি বাস্তবমুখী। দেশের মানুষজন ব্রিটিশ প্রচারের দ্বারা সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে থাকে ও ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর শক্তি সম্বন্ধে যে অতিরঞ্জিত প্রচার করা হয়ে থাকে তাতে তারা বিশ্বাস করে। স্বদেশবাসীরা যদি আমাদের কথার উপর ভরসা রাখতে পারে তা হলে যুদ্ধের সম্পর্কে আমাদের যা মতামত সেটা তারা গ্রহণ করবে এবং সেই অনুসারে কংগ্রেসের কর্মধারার পরিবর্তন করবে।

স্বদেশবাসী যারা লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করার কথা ভাবছে, তাদের আমি বলব অদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে এবং সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হতে যখন তাদের পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে পাঁচ লক্ষ ভারতীয় প্রাণকে কামানের গোলার সামনে পাঠাতে হবে এবং তাদের আরও প্রস্তুত হতে হবে আজ়াদ হিন্দ ফৌজে তাদেরই স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য কারণ আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনানী যেখানেই ব্রিটিশ সেনাদের দেখবে সেখানেই তারা তাদের বিরুদ্ধে লড়বে। এই কংগ্রেসিরা যদি আজ়াদ হিন্দ ফৌজে তাদের ভাই ও বোনেদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পিছপা না হয়, তারা যদি তাতে লজ্জাবোধ না করে তা হলে তারা অন্ততপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার্থে পাঁচ লক্ষ ভারতীয়দের কামানের গোলার মুখে পাঠাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুক। এই যুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা লাভের বিষয়ে যাদের সন্দেহ আছে তাদের আমি বলব যে ভারত দেশের মুক্তির জন্য লড়াই করার এমন সুযোগ আর কখনও পাবে না। এই যুদ্ধ শেষ হবে অক্ষশক্তির জয়ে, সেটা যে অবধারিত ঘটতে চলেছে তা আমি জানি। সেই সঙ্গে ভারতও স্বাধীন হবে এবং বিশ্বের নতুন শক্তি গোষ্ঠীগুলির নতুন বিন্যাসে যখন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির একাধিপত্য আর থাকবে না, সেখানে ভারত তার উপযুক্ত স্থানে অধিষ্ঠিত হবে। এবং যুদ্ধে জাপানের যদি পরাজয়ও ঘটে তবুও ভারত আবার সুযোগ পাবে ব্রিটেনের সঙ্গে চুক্তি করার। কিন্তু ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে আমাদের দেশের যুবশক্তিকে কসাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া ও আমাদের দেশের সম্পদকে সেই যুদ্ধে অপচয় করার প্রস্তাবে সায় দেওয়া বাতুলতা ও অপরাধও বটে। আমি তাই আবার একবার আপনাদের কাছে আবেদন করব যে আপনারা ওয়াভেলের এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করুন এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন। এবং তার পরে পরিস্থিতির বিচার বিবেচনা করে আপনাদের কর্মপন্থা ঠিক করে নিন। কংগ্রেস নেতাদের কাছে আমার একটি আন্তরিক অনুরোধ যে আপোষের জন্য আপনাদের উপর জোর খাটানো হলেও আপনারা তা মেনে নেবেন না।

৬৮

ওয়াভেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করুন

[আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের বেতারকেন্দ্র থেকে ভাষণ,
সিঙ্গাপুর, ২৩ জুন ১৯৪৫][১]

ভারতের বোন ও ভাইয়েরা! গতকাল আমি আপনাদের বলেছিলাম যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হল একটি কার্যনির্বাহী কমিটি এবং পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, সেই কমিটির পক্ষে তাদের নিজস্ব ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি বা কংগ্রেসের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া কংগ্রেসের সংবিধান অনুসারে অন্যায় এবং নৈতিক দিক থেকেও তা অনুচিত। আমার আরও যা যোগ করা উচিত ছিল তা হল এই কাজ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও সৌজন্যের পরিপন্থী হবে। কংগ্রেসের বাইরে কোনও নিরপেক্ষ দর্শকের মনে হবে যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যেন অশোভন ব্যস্ততা প্রকাশ করছে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির তুলনায় মিস্টার জিন্না সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করছেন। আমার কাছে আসা তথ্য অনুসারে মিস্টার জিন্না ঘোষণা করেছেন যে ২৪ তারিখে লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে তাঁর যে বৈঠকের কথা আছে তার আগে তিনি মুসলিম লীগের প্রতিনিধিদের সিমলা সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য কোনও পরামর্শ দেবেন না। মিস্টার জিন্নার গূঢ় অভিসন্ধি যাই থাক না কেন তিনি কিন্তু লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য অযৌক্তিক আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। মিস্টার জিন্না আরও একটা সতর্ক দূরদর্শিতা দেখিয়েছেন লর্ড ওয়াভেলকে সম্মেলনটি পিছিয়ে দেবার অনুরোধ করে।

আমি মনে করি যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও সিমলা সম্মেলন পিছিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ ও দাবি করত তা হলে লর্ড ওয়াভেলকে বাধ্য হয়ে তাই করতে হত। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে সিমলা সম্মেলনের আগে ও সম্মেলন চলাকালীন বৈঠকে বসতে চেয়েছে সেটা ভাল। মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস প্রতিনিধিদের উপদেশ দেবার জন্য তাঁরা প্রস্তুত, এই মনোভাব নিয়ে যদি ওয়ার্কিং কমিটির কোনও কোনও সদস্য সিমলার উদ্দেশ্যে রওনা দিতেন সেটা আরও একটা অবিবেচনার কাজ হত এবং তা করলে ব্রিটিশ প্রস্তাবে যে কোনও শর্তেই হোক সম্মতি দেবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ থেকে একটা অশোভন আগ্রহ প্রকাশ পেত। এখন হাতে কিছুটা সময় পাওয়া গেছে এবং আমি আশা করব যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শেষ সিদ্ধান্ত নেবার আগে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির একটা বৈঠক ডাকা হবে। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কিছু সদস্য এখনও কারাবন্দি এই অজুহাতে শুধুমাত্র ওয়ার্কিং কমিটির মত অনুসারে ওয়াভেলের প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া

---

১. *Testament of Subhas Bose*, pp. 114-1117.

অনুচিত হবে। বন্দিদের মুক্তির জন্য যদি মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দাবি করতে থাকেন তা হলে ভাইসরয়কে এই বিষয়ে কংগ্রেসের দাবি মেনে নিয়ে তাদের মুক্তি দেবার আদেশ দিতেই হবে। কারণ ভাইসরয় যদি বন্দিমুক্তির দাবি প্রত্যাখ্যান করেন তা হলে তাঁর আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য আমি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিকে ডাকবার অনুরোধ করেছি। আমি এ কথা বলতে চাইছি না যে সেই কমিটি বর্তমানে যেভাবে গঠন করা হয়েছে, তাতে একমাত্র তাদের হাতেই আমাদের দেশের জাতীয় বিবেক ও নীতির রক্ষণাবেক্ষণের ভার আছে। সম্প্রতি সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কয়েকজন সদস্যের মতের বিরোধিতা করে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহকরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষে সম্মতি দিয়েছে এবং তার জন্য কমিটি তাদের প্রতিনিধিমূলক চরিত্রের ভাবমূর্তি কিছুটা হারিয়েছে। কংগ্রেস হাইকমান্ড একদিকে তাদের অভিজ্ঞ ও প্রবীণ সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে কারণ তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য দাবি করছিলেন। আবার অন্যদিকে সি রাজাগোপালাচারীর মতো কংগ্রেস সদস্য, যিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নিঃশর্ত সহযোগিতার নীতি অবলম্বনের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে জনগণের কাছে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর বিরুদ্ধে একেবারেই কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এতে কি কংগ্রেস মুখ্য নেতৃত্ব কুখ্যাতি ও উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠেনি? অন্যদিকে শ্রীভুলাভাই দেশাই, যিনি গত আইনঅমান্য আন্দোলনে কোনও ভাবেই অংশগ্রহণ করেননি, তাঁকে সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলিতে কংগ্রেস পার্টির নেতার পদে নির্বাচিত করা কি অন্যায্য ও বুদ্ধিহীনের মতো কাজ হয়নি? কিন্তু এসব সত্ত্বেও, আমি তবুও যে দাবি করছি যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নয়, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিরই উচিত হবে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়া তার কারণ এই নয় সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির মধ্যে অনেক মতভেদ নেই, কিন্তু অন্তত সেটা সংবিধানসঙ্গত ও যথাযথ কাজ হবে। যেহেতু এই প্রশ্নটি কংগ্রেসের মৌল নীতি ও সিদ্ধান্ত, বিশেষ করে পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্য যেখানে পৌঁছবার জন্য কংগ্রেস সর্বদাই চেষ্টা করেছে সেইগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে, সেই কারণে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে পারে যারা প্রকৃত জনগণের প্রতিনিধি তারা, এবং সেটাই ন্যায়সংগত ও যথাযথ হবে।

আমি এর আগেও বলেছি যে মহাত্মা গান্ধী যদি অত্যন্ত সতর্ক না হন তা হলে দেখা যাবে ভাইসরয় ও মিস্টার জিন্নার ধূর্ত কৌশলে কংগ্রেসকে এমন একটা অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যে কংগ্রেস শুধুমাত্র সেই আসনগুলিতে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের মনোনয়ন করতে পারবে যা ভাইসরয় উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। অথবা বলা যায়, এমন একটা ভীতিকর সম্ভাবনা রয়েছে যেখানে মহাত্মা গান্ধীকে তারা স্বীকার করাতে বাধ্য করবেন যে 'কংগ্রেস' ও 'উচ্চবর্ণের হিন্দু' সমার্থক। সেটা হবে ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক মৃত্যুর সমান এবং সেই অবস্থান থেকে কংগ্রেসের পক্ষে উঠে আসা প্রায় একটা অসম্ভব ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে।

এই বিপদ এড়ানো যেতে পারে যদি সিমলা সম্মেলনে উপস্থিত কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা কমান্ডার ইন চিফের আসনটি ছাড়া অন্য সব আসনগুলির জন্য একটি নামের তালিকা পেশ করে। কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা কি তাই করবেন? ওয়ার্কিং কমিটি এই ধরনের চিন্তা করছে শুনে আমার ভাল লাগছে কিন্তু শুধু তো চিন্তা করলেই হবে না। কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের

চেষ্টা করতে হবে যাতে ভাইসরয় ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে এক্সিকিউটিভ কমিটি গঠন না করে তার পরিবর্তে রাজনৈতিক ও জাতীয় প্রয়োজনের ভিত্তিতে কমিটি গঠনে বাধ্য হন। সামনের সমস্যাগুলি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। শান্তি সম্মেলনেও যেমন, ঠিক তেমনই রাজনৈতিক গোল টেবিল বৈঠকেও কেবলমাত্র তাদেরই বসতে দেওয়া উচিত হবে যারা তর্ক করতে ও লড়াই করতে প্রস্তুত, আমি সব সময়েই তাই মনে করি। ব্রিটিশরা যে এখন সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনতে উদ্যত হয়েছে সেটা মিস্টার জিন্না বা মুসলিম লীগের জন্য নয়, সেটা ঘটেছে কংগ্রেসের জন্য কারণ কংগ্রেস সর্বদাই সর্বপ্রকারে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যথাসাধ্য লড়াই করেছে।

১৯৩১ সালের গোল টেবিল বৈঠকের সময় আমি বলেছিলাম যে কেবল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সঙ্গে আরও যারা লড়াই করেছে তারাই কেবল লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্য। আমার স্বদেশবাসীকে আমি মনে করিয়ে দিয়েছিলাম আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার লয়েড জর্জ শিন ফেইন পার্টিকে জব্দ করবার জন্য আয়ারল্যান্ডের সব দলের প্রতিনিধিদের একটা জাতীয় সম্মেলন ডেকেছিলেন এবং তখন শিন ফেইন পার্টি সেই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেনি কারণ তাদের মতে সেই সম্মেলন আয়ারল্যান্ডের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করেনি। শিন ফেইন পার্টি তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছিল এবং অবশেষে একদিন ব্রিটিশকে গোল টেবিল বৈঠকে বসতেই হয়েছিল যেখানে আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধি রূপে কেবলমাত্র শিন ফেইন পার্টিই উপস্থিত ছিল। আমাদের ক্ষেত্রেও যা আমাদের মনে রাখতে হবে তা হল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেছিল তারাই কেবলমাত্র মুখপাত্র হিসাবে ভারতীয়দের হয়ে কথা বলতে পারে, একমাত্র তাদেরই যোগ্যতা আছে ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোল টেবিল বৈঠকে বসার। মুসলিম লীগের গুরুত্ব বেড়েছে মূলত এই কারণেই যে ব্রিটিশরা তাদের পিছনে মদত দিচ্ছে। মুসলিম লীগকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দিয়ে জামায়েত-উল-উলেমা, মজলিশ-ই-আহরার, খুদাই-খিদমতগার, আজ়াদ মুসলিম লীগ, শিয়া কনফারেন্স, প্রজা পার্টি, অল ইন্ডিয়া মুমিন পার্টি ইত্যাদি জাতীয়তাবাদী দলগুলিতে তাদের পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে, এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটা বিশাল ও প্রভাবশালী মুসলমান গোষ্ঠী, যারা স্বাধীনতার সংগ্রামে সর্বদাই আমাদের পাশে থেকেছে ও চরম স্বার্থত্যাগ করেছে, তাদের সঙ্গে কংগ্রেস বিশ্বাস ভঙ্গ করছে।

ভারত থেকে আসা তথ্যানুসারে যা দেখা যাচ্ছে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বিভিন্ন জায়গা থেকে আওয়াজ উঠছে। দুর্ভাগ্যবশত এই সব প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরগুলি একযোগে কথা বলছে না। ১৯৪০ সালে যখন একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে কংগ্রেস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা আপোষের দিকে এগোচ্ছে তখন আমরা রামগড়ে একটা সর্বভারতীয় আপোষবিরোধী সম্মেলন ডেকেছিলাম যাতে ভারতের জনজীবনের সব বিরোধী গোষ্ঠীগুলি একযোগে প্রতিবাদ করতে পারে। এখন ঠিক সেইরকম একটি সম্মেলনের আয়োজন করা প্রয়োজন এবং তা অবিলম্বে করা উচিত। যদি একটা সর্বভারতীয় ওয়াভেল-বিরোধী সম্মেলন এখন ডাকা যেত যার মাধ্যমে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিরোধী মতগুলির একটা সম্মিলিত প্রতিবাদ আমরা পাঠাতে পারতাম তা হলে যথার্থই উপকার হত। এই সম্মলেনের মাধ্যমে, কোনও একটা বিশেষ দিনে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মিটিং ডাকা যেতে পারে, যেখানে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের জনগণকে তাদের প্রকৃত

মতামত জানাবার সুযোগ দেওয়া হবে। যদি ৫ জুলাই, যেদিন ইংল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে সেই দিনটি আমরা সর্বভারতীয় ওয়াভেল-বিরোধী দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করতে পারতাম তা হলে সেটা চমৎকার হত।

এখানে পূর্ব এশিয়াতে আমরা ৪ জুলাই একটা বিশেষ উৎসবের আয়োজন করতে চলেছি। ৪ জুলাই সারা বিশ্বে আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস রূপে উদযাপিত হয়। পূর্ব এশিয়াতে ৪ জুলাই হল এমন একটা দিন যে দিন ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস লীগের জীবনে নতুন আলোর ছোঁয়া লেগেছিল এবং লীগ একটি নতুন পথে যাত্রা শুরু করেছিল। পূর্ব এশিয়ার যেখানেই ভারতীয়রা আছেন, সেইখানেই এই দিনটি আনন্দের সঙ্গে উদযাপিত হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই দিন আমরা সর্বসাধারণের কাছে তাদের মতামত জানতে চাইব। আমরা পূর্ব এশিয়ার জনগণের কাছে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব সম্পর্কে গণভোট নেব এবং সেই ভোটের ফলাফলে যদি প্রস্তাবটিকে সমর্থনের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয় তা হলে সেখানেই ও তখনই আমরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে-কোনও পরিস্থিতিতে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্তে নতুন করে শপথ নেব। এমনকী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যদি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে সম্মতিও দেয়, তবুও আমাদের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হবে না।

ভারতের বোন ও ভাইয়েরা! আজকের মতো আমি এখন শেষ করব। আগামী সোমবার, ২৫ তারিখে আমি ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য একটা বিশেষ ভাষণ দেব। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যদি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করে তা হলে বিপ্লবীদের করণীয় কী হবে সেই বিষয়ে আমি তাদের পথনির্দেশ দেব। আরও অনেক ভাইসরয় আসবেন ও যাবেন, কিন্তু ভারতবর্ষ বেঁচে থাকবে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা একদিন বিজয়ী হব।

জয় হিন্দ।

৬৯

ব্রিটেনের সঙ্গে কোনও আপোষ নয়

[সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের জনসভায় দেওয়া বক্তৃতার সারাংশ,
সিঙ্গাপুর থেকে বেতারভাষণ, ২৪ জুন ১৯৪৫][১]

বন্ধুরা! প্রায় ছ'মাস পরে আজ আমি আবার আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যতে আমাদের করণীয় কী সেই সম্বন্ধে আলোচনার জন্য। বর্মাদেশ থেকে আপনাদের জন্য কোনও সুসংবাদ আমি আনতে পারিনি, সে জন্য আমি দুঃখিত। গত বছরে ইম্ফলের দখল নেওয়াতে আমরা ব্যর্থ হবার পর আমাদের শত্রুরা বর্মাদেশের ভিতরে অগ্রসর হতে সফল হয়। জাপানি সেনাবাহিনী ও ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী তাদের মূল বাহিনীকে আটকাতে সক্ষম হলেও ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রসজ্জিত গাড়িসহ শত্রুপক্ষের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যান্ত্রিক ইউনিটগুলি অবশেষে আমাদের প্রতিরোধ ভেঙে অগ্রসর হয় ও আমাদের হেড কোয়ার্টার্স দখল করে নেবার অবস্থায় চলে আসে। তখন হেড কোয়ার্টার্স সেখানেই রেখে শত্রুপক্ষের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যান্ত্রিক ইউনিটগুলির আক্রমণের মুখোমুখি হব অথবা নিরাপদ কোনও স্থানে হেড কোয়ার্টার্স স্থানান্তরিত করব কিনা সেই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজে আমাদের সহযোদ্ধারা যখন রণক্ষেত্রের সম্মুখভাগে তখনও লড়াই করছে তখন রেঙ্গুনে আমাদের অবস্থান বিপজ্জনক হলেও, তা ছেড়ে চলে আসবার সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের পক্ষে সহজ হয়নি। কিন্তু সতর্ক চিন্তাভাবনার পর, আজাদ হিন্দ আপৎকালীন সরকারের মন্ত্রীসভা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় কয়েকটা কারণে আমাদের কোনও একটা নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়াই উচিত হবে।

রেঙ্গুন ছাড়বার পরেও, বর্মাতে আমাদের হেড কোয়ার্টার্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল, যেমন বর্মাদেশের অধিপতি ডক্টর বা ম'র সরকারও করেছিল এবং ভারতের স্বার্থেই আমাদের তা করবার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। এখন বর্মাদেশের পরিস্থিতি হল শান প্রদেশগুলিতে, টোঙ্গু এলাকায়, প্রোমে এবং আরাকানে, দেশের সর্বত্র লড়াই চলছে। শত্রুপক্ষের মূলবাহিনীকে এখনও আটকে রাখা সম্ভব হয়েছে, এবং কেউ জানে না আরও কতদিন এই যুদ্ধ চলবে বা বর্মাদেশ কবে শত্রুরা জিতে নিতে পারবে। জাপানের সেনাবাহিনীর তুলনায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সামর্থ্য অনেক কম তবু তারা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতেও সাহসের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মূল বাহিনী আছে বর্মাদেশে আমাদের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে, যারা এখনও লড়াই করছে কিন্তু আমাদের হেড কোয়ার্টার্স বর্মা থেকে সরিয়ে আনতে হয়েছে। আমাদের বাহিনীকে আমরা রেখে এসেছি নবগঠিত বর্মা

---

১. Testament of Subhas Bose, pp. 117-123, মূল হিন্দি থেকে অনূদিত।

কমান্ডের হাতে, মেজর জেনারেল লোগানাদান যার সর্বাধিনায়ক ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরশাদ তাঁর অধীনে সেনাবাহিনীর প্রধান।

আপৎকালীন সরকারকে তাদের হেড কোয়ার্টার্স বর্মা থেকে সরিয়ে আনা হয়েছে যাতে বর্মাদেশের বাইরে আমরা আবার আমাদের বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে পারি এবং অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাতে আমরা লড়াই চালিয়ে যেতে পারি। যদি বর্মাদেশের বাইরে আমাদের আর কোনও সেনা না থাকত তা হলে খুব সম্ভবত আমরা বর্মাতেই থেকে যেতাম আমাদের কমরেডদের সঙ্গে ও শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতাম এবং তারপর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হোক না কেন আমরা তার সম্মুখীন হতাম। আরও একটা কারণ ছিল যে জন্য আমরা বর্মাদেশ থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছি। সাম্প্রতিক সামরিক সাফল্যের পর আমাদের শত্রুপক্ষ যে অন্যত্রও সামরিক ও রাজনৈতিক আক্রমণ শুরু করবে সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল। কাজেই সেই আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল যাতে যখন তারা আক্রমণ শুরু করবে তখন তার মুখোমুখি হতে পারি। আমাদের দুর্ভাগ্য যে বর্মাদেশের ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপে সংকট দেখা দিল। শত্রুপক্ষ পুরোপুরি সেই সুযোগ গ্রহণ করল এবং তৎক্ষণাৎ তারা ভারতের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ শুরু করল— সেই রাজনৈতিক আক্রমণ এল লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের মাধ্যমে।

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের পিছনে মূলত দুটি অভিসন্ধি আছে: প্রথমত, পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধের জন্য ভারতের সাহায্য আদায় করা এবং দ্বিতীয়ত, ভারতীয় জনগণের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করা যাতে ভারতের সমস্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয় হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকে। ভবিষ্যতে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হলে আমেরিকার সাহায্যার্থে ব্রিটেনকে বিপুল পরিমাণে অর্থ, সামগ্রী ও সেনা সরবরাহ করতে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এবং অবশ্যই ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীও রণক্লান্ত এবং দূর প্রাচ্যে এখনই আবার একটা দীর্ঘ যুদ্ধে যোগ দিতে তারা আগ্রহী নয়, যেখানে যুদ্ধের পরিস্থিতিও আরও অনেক বেশি কঠোর ও কষ্টসাধ্য। সুতরাং একমাত্র ভারতবর্ষ থেকে সেনা সংগ্রহ করা যেতে পারে যাদের অনায়াসেই কামানের মুখে ঠেলে দেওয়া যায়। কিন্তু সমগ্র ভারতের জনগণের ক্ষমতা ও রসদ যতক্ষণ না অধিগ্রহণ করা যাচ্ছে, ভারতের জনগণকে যতক্ষণ না যুদ্ধের জন্য উদ্দীপিত করা যাচ্ছে ততক্ষণ ব্রিটিশ কোনও ভাবেই ভারত থেকে সেনা সংগ্রহ করতে পারবে না, যা তাদের পূর্ব এশিয়ায় ভবিষ্যতে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের পিছনে আরও একটা যে উদ্দেশ্য আছে তা হল ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঘরোয়া বিষয় হিসাবে গণ্য করা এবং তা করতে পারলে বন্ধুভাবাপন্ন যে রাষ্ট্রগুলি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতীয় জনগণের পক্ষ সমর্থন করছে, তাদের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত করা যাবে। মিত্রশক্তি গোষ্ঠী সব দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিষয়ে এত কথা বলেছে যে এখন বিশ্বের সকল পরাধীন দেশগুলি তাদের নিজেদের স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে সেই বাগাড়ম্বরের পূর্ণ সুযোগ নিতে শুরু করেছে। এর উদাহরণ হল সিরিয়া ও লেবানন। সান ফ্রানসিসকো সম্মেলনে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী এম মলোটভ যে মন্তব্য করেছেন তাতে তিনি শুধু যে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সম্মেলনে অংশগ্রহণের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন তাই নয়, তিনি ব্রিটিশ সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে আরও বলেছেন অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিদের মুক্ত কণ্ঠস্বর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শুনতে পাওয়া যাবে। ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেছে যে যদি ভারতীয় জনগণের সঙ্গে কোনও আপোষ মীমাংসায় না

পৌঁছানো যায় তা হলে ভারতের সমস্যা আন্তর্জাতিক মঞ্চে আলোচিত হতে থাকবে ও বন্ধুভাবাপন্ন বিদেশি শক্তিগুলি তখন ভারতবাসীর পক্ষ নিয়ে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করতে থাকবে, এবং যদি ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে রত না হতাম, তা হলেও সেটা ঘটত।

আপনারা যদি ভারত সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী সেটা বুঝতে চান তা হলে আপনাদের শুধু এইটুকু মনে রাখতে হবে যে-কোনও বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্র যে ভারতের স্বীধানতালাভের সপক্ষে তাদের সমর্থন দেবে এমন ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে সেই বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার দৃঢ়সংকল্প। অতএব আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে এমন কোনও বোঝাপড়া আমরা হতে দেব না, যে বোঝাপড়া ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতাদানের ভিত্তিতে হচ্ছে না। কারণ তেমন আপোষে সম্মতি দিলেই ভারতের সমস্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সমস্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার কয়েক বছর আগে যখন লীগ অফ নেশনস বর্তমান ছিল, পরলোকগত বিঠলভাই প্যাটেল ও আমি জেনেভা গিয়েছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল লীগ অফ নেশনসের কাছে ভারতের স্বাধীনতার দাবি পেশ করা। তখন আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি কারণ লীগ অফ নেশনসের কোনও সদস্য রাষ্ট্র ভারতের স্বাধীনতার দাবির সপক্ষে সুপারিশ করে ব্রিটেনের বিরাগভাজন হতে চায়নি। কিন্তু তার পর থেকে পরিস্থিতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে এবং এখন ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে আবার বিশ্বের দরবারে আনবার ও সেই দাবির সফল হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। জাপান ও আরও আটটি দেশ যে আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে সেটাই সারা বিশ্বের চোখে ভারতের দাবিকে আরও সোচ্চার করে তুলেছে।

লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব সম্পর্কে কোনও আলোচনার আগে আমি বিশ্ব পরিস্থিতির বিষয়ে কিছু বলতে চাই। আমি ছ'মাস আগেই যা বলেছিলাম ঠিক তাই ঘটেছে। জার্মানির পতন সোভিয়েত রাশিয়া ও ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর মধ্যে একটা তীব্র মতানৈক্য ডেকে এনেছে। তাদের মধ্যে যে মতবৈষম্য আছে তা এই মুহূর্তে তারা তাতে সম্প্রীতির একটা প্রলেপ দিয়েছে কিন্তু সেটা একেবারেই বহিরঙ্গের সম্প্রীতি ও এশিয়াতে তারা পরস্পরের সঙ্গে একটা মুখোমুখি সংঘাতের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মতবৈষম্যের মধ্যে এখনকার মতো একটা প্রলেপ পড়লেও দুই পক্ষের মধ্যে মূলত যে পার্থক্য ছিল তা এখনও বজায় আছে এবং সে বিভেদ মুছে যাবার নয়। জার্মানির পতনের ফলে ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর অনুপাতে সোভিয়েতের শক্তি অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমেরিকা এখন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মনোযোগ দিয়েছে এবং তারা ব্রিটেনের কাছ থেকে আরও সাহায্য দাবি করছে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল ভবিষ্যতে পূর্ব এশিয়ায় প্রধানত দুটি জায়গায় লড়াই হবে। এক হল জাপানে ও অন্যটি হল চিনে। এখন আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব নয় কোন স্থানে যুদ্ধে আগে হবে কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে জাপান দুটি লড়াইয়ের জন্যই সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি আরও জানি যে পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি অঞ্চলে জাপানের সেনাবাহিনীকে স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভরভাবে গঠন করা হয়েছে। সুতরাং যদি এক রণক্ষেত্রে জাপানকে পিছু হটতে হয় তা হলে তা অন্য রণক্ষেত্রের সেনাবাহিনীর শক্তিকে প্রভাবিত করবে না। ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর এ কথা ভালভাবেই জানা আছে যে এই সংগ্রাম হতে চলেছে দীর্ঘ ও কঠোর। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল জেনারেল স্লিম, ১৪ নম্বর সেনাবাহিনীর

বিশিষ্ট সেনাধিনায়কের একটা মন্তব্য। তিনি অতি সম্প্রতি বর্মাদেশের যুদ্ধে লড়াই করেছেন ও কিছুদিন আগে ইংল্যান্ডে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বহু দেশই বলে থাকে যে যতদিন তাদের শেষ সেনা জীবিত থাকবে ততদিন তারা লড়াই অব্যাহত রাখবে, হাল ছাড়বে না। কিন্তু একমাত্র একটা দেশই আছে যারা সেই কাজটি করে তাঁকে, এবং সেই দেশ হল জাপান। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন জাপান যেমন শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে, আমরাও তেমনই আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্য ঠিক তাই করব। আজ়াদ হিন্দ ফৌজ লড়াই করবে যতদিন তাদের শেষ সেনা জীবিত থাকবে ও যতদিন তাদের শেষ বুলেটটি অবশিষ্ট থাকবে।

পূর্ব এশিয়ার সমস্যা সমাধানের জন্য মার্শাল স্টালিন, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এবং প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের আগামী বৈঠকে বিশেষ কোনও ফল পাওয়া যাবে কিনা সেই বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। চুঙকিঙ ও ইয়েনানের মধ্যে তিক্ত সম্পর্ক এবং চিন সম্পর্কে আমেরিকার উচ্চাভিলাষের কথা মনে রাখলে চিনের সমস্যার সহজ সমাধান হবে বলে আমি মনে করি না। আমার মতে চুঙকিঙের সাথে বোঝাপড়া করার থেকে ইয়েনান সরকারের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ হবে নানকিঙের সঙ্গে সন্ধি করা। যতদিন চুঙকিঙের উপরে আমেরিকার প্রভুত্ব বজায় থাকবে ততদিন কীভাবে চিনদেশের মধ্যে ঐক্যসাধন সম্ভব হবে সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য। জাপানের দিক থেকে বিচার করলে চিন সম্পর্কে তাদের নতুন নীতি এবং যুদ্ধের অবসান হলে চিন থেকে সৈন্য অপসারণের প্রতিশ্রুতি থেকে মনে হয় যে চিনের ঐক্যসাধনকে তারা স্বাগত জানাবে এবং তাদের প্রধান উদ্দেশ্য চিরকালই ছিল ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাব থেকে এবং এই শক্তিগোষ্ঠীর আওতা থেকে চিনকে মুক্ত রাখা এবং এখনও তাই আছে। প্রতিটি ভারতবাসীরও চিনের প্রতি শুভকামনা আছে এবং তারা চিনকে দেখতে চায় মহান নেতা সান ইয়েত সেনের নির্দেশিত পথে অগ্রসর হতে। এশিয়া কোনও দিনও মুক্তি পাবে না যতদিন না চিন স্বাধীন হচ্ছে ও ভারত স্বাধীন হচ্ছে।

বর্মাদেশে আমাদের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও শেষ যুদ্ধে আমরা যে বিজয়ী হবই সেই বিষয়ে আমাদের আশা ও আত্মবিশ্বাস দুইই অটুট আছে। তিনটি মূল কারণে এই যুদ্ধের শেষে ভারত তার স্বাধীনতা ফিরে পাবেই। প্রথমত, পূর্ব এশিয়ায় আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম, দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কূটনীতির ব্যবহার এবং তৃতীয়ত, ভারতের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। বলাই বাহুল্য ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ যতই তীব্র হবে আমাদের স্বাধীনতা জিতে নিতে তত কম দিন অপেক্ষা করতে হবে। ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ যদি শুধুমাত্র নৈতিক চরিত্রের হয় তবুও ভারত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি আলোচ্য বিষয় হয়ে জেগে থাকবে এবং এই আলোচনার বহু সুযোগও আসবে। আমাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। সেই সংগ্রাম একটা দ্বিমুখী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে। ভারতের আন্দোলনকে এই সংগ্রাম প্রভাবিত করবে ও সেই সঙ্গে শত্রুপক্ষের নিরন্তর ও সফল অপপ্রচারে আমাদের দেশবাসীর মনের মধ্যে যে পরাজিতের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করতেও সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, জগতের সামনে আমাদের ন্যায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং বন্ধু রাষ্ট্রগুলির সমর্থন পেতেও তা আমাদের সাহায্য করবে। এই সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হলে চূড়ান্ত জয় সম্পর্কে আমাদের আত্মবিশ্বাস অটুট রাখতে হবে। গত বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফশ তাঁর স্মৃতিকথায় যা লিখেছিলেন এই প্রসঙ্গে আমি তার উল্লেখ করব। তিনি

বলেছিলেন, 'যে শত্রু মনে করে যে তার হার হয়েছে তাকেই শুধু পরাস্ত করা যায়। যতক্ষণ সেনাবাহিনী মনে করে তাদের হার হয়নি, ততক্ষণ কোনও একটা রণক্ষেত্রে পরাজয় প্রকৃত পরাজয় নয়।' উদাহরণ স্বরূপ, ১৯৪২ সালে বর্মাদেশ থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করা হয়েছিল কিন্তু তারা আবার বর্মাতে ফিরে আসতে পেরেছে। বর্মাতে আমরা যেখানে যেখানে পরাস্ত হয়েছি, কে বলতে পারে যে তা আমরা আবার পুনরুদ্ধার করতে পারব না? যখন আমরা বর্মা ছেড়ে চলে আসছি আমি আমার কমরেডদের মার্শাল ফশের উপরের উক্তি মনে করিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি এও বলেছিলাম যে আমরা কেউ পরাজিত হইনি কারণ আমাদের মধ্যে একজনও মনে করছে না যে সে পরাজিত হয়েছে বা যুদ্ধে আমরা পরাস্ত হয়েছি।

একজন প্রকৃত বিপ্লবী তিনিই যিনি কখনও পরাজয় স্বীকার করেন না, যিনি কখনও তাঁর মনোবল হারান না বা বিষণ্ণ বোধ করেন না। একজন প্রকৃত বিপ্লবী বিশ্বাস করেন যে তিনি যে ব্রত নিয়েছেন তা ন্যায়ব্রত এবং সব শেষে যে তাঁর লক্ষ্যে তিনি পৌঁছবেন সেই আত্মবিশ্বাস তাঁর আছে। বর্মাদেশে যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে আমাদের হার স্বীকার করে নিতে হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমরা শত্রুপক্ষের উপরে আমাদের ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছি। আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার ও আজ়াদ হিন্দ ফৌজ যে কাজগুলি সম্পন্ন করতে পেরেছে বর্মাদেশে প্রবেশ করার পর সেই কাজের বিষয়ে আমাদের শত্রুরা অবহিত হয়েছে, তারা দেখেছে ও তারা শুনেছে। আগে শত্রুরা আমাদের বলত 'জাপানের ক্রীড়নক, তাদের হাতের খেলার পুতুল ফৌজ'। বর্মাদেশে ঢোকার পর থেকে তারা আমাদের বলতে লাগল 'জাপানের দ্বারা প্রভাবিত ভারতীয় জাতীয় ফৌজ' কিন্তু এখন তারা আমাদের 'ভারতীয় জাতীয় ফৌজ' নামে অভিহিত করতে শুরু করেছে। ব্রিটিশ মান্দালয় অধিকার করে নেবার পরে ফতোয়া জারি করল কোনও ভারতীয় 'জয় হিন্দ' বলে সম্ভাষণ করতে পারবে না। আপনারা জানেন 'জয় হিন্দ' কথার অর্থ হল ভারতের জয় হোক। তার ফল যা হল, তাতে আমাদের বালকসেনার ছেলেমেয়েরা মান্দালয়ের পথে নেমে ব্রিটিশ অফিসারদের 'জয় হিন্দ' বলে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। আমি যা বলতে চাইছি তা হল আমরা যদি সাহসভরে আমাদের লড়াই চালিয়ে যাই, আমরা যদি আমাদের রক্ত দিতে ভয় না পাই তা হলে আমরা যে শুধু আমাদের স্বদেশবাসী, আমাদের সংগ্রামের প্রতি যাদের হয়তো কোনও আস্থা নেই বা থাকলেও তারা বিশেষ আশাবাদী নয়, তাদের আমরা আগ্রহী করতে পারব, উপরন্তু আমরা শত্রুদের উপরেও প্রভাব ফেলতে পারব।

আমি এবার আবার লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে ফিরে আসি। সেই প্রস্তাবে তিনটি প্রধান বিষয় আছে: প্রথমত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি, দ্বিতীয়ত, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তৃতীয়ত, প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই প্রস্তাবে এমন কিছু নেই যা কোনও জাতীয়তাবাদী ভারতীয়ের কাছে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে, এবং সাধারণ অবস্থায় কোনও কংগ্রেস সদস্য এমন প্রস্তাবের দিকে ফিরেও তাকাত না। কারণ ব্রিটিশ সর্বদাই আমাদের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে, দ্বিতীয়ত, ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যেরা ভাইসরয়ের কাছেই দায়বদ্ধ থাকবেন, অন্য কারুর কাছে নয়, কাজেই সেই কাউন্সিলে আসন সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যের দিকে কোনও অগ্রগতি হবে না। উপরন্তু ভেটো দেবার অধিকার থাকবে ভাইসরয়ের উপরে, কাজেই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের নেওয়া

যে কোনও সিদ্ধান্ত, এমনকী সেই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া হলেও, তা তিনি বাতিল করে পারবেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল হবে একটি উপদেষ্টা গোষ্ঠী, মন্ত্রীসভা নয় এবং ক্ষমতা সর্বদাই থাকবে ভাইসরয়ের হাতে। তৃতীয়ত, প্রদেশগুলিতে মন্ত্রীসভার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোনও গুরুত্বই নেই, কারণ ১৯৩৯ সালে ব্রিটিশ পরিচালিত যুদ্ধের অংশীদার হবে না বলে আটটি প্রদেশের মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছাতেই পদত্যাগ করেছিল।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, ভারতীয় নেতারা যাঁরা কারাগারের বাইরে আছেন তাঁরা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিগোষ্ঠীর সাম্প্রতিক সামরিক সাফল্যে ভয়ে ও শ্রদ্ধায় এতটাই আপ্লুত যে তাঁরা ইতিমধ্যেই মনে মনে পরাজয় স্বীকার করে বসে আছেন। সেই কারণেই মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২৫ তারিখে সিমলায় লর্ড ওয়াভেলের ডাকা সম্মেলনে তাঁরা যোগ দেবেন, যে সম্মেলনে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবটি আলোচিত হবে। আমরা এখন আমাদের দেশবাসীদের রাজি করাবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করছি যাতে তাঁরা কোনও মতেই যেন লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে সম্মতি না দেন ও সিমলা সম্মেলন যেন কোনও মতেই সফল না হয়। আমাদের প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয় এবং কংগ্রেস যদি ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে যোগ দেবার প্রস্তাবে সম্মতি দেয় তা হলে ভারতের ভিতরে আমাদের এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে কংগ্রেস এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে আপোষ মীমাংসা ব্যর্থ করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা চাই যাতে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন একটা আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয় হয়ে থাক এবং আমার যাতে পূর্ণ স্বাধীনতা পাবার উদ্দেশে কাজ চালিয়ে যেতে পারি।

পূর্ব এশিয়াতে আমাদের কাজ দুই প্রকার। ১৯৪৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি আমরা যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছি সেই সংগ্রামকে অব্যাহত রাখা এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করা ও তথাকথিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিরোধগুলি আছে তার প্রত্যেকটিকে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধকে আমাদের নিজেদের কাজে লাগানো। পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধে মালয় হল আমাদের কেন্দ্র। যতদিন আমরা ব্রিটিশকে মালয়ের বাইরে রাখতে পারব, ভারতের মুক্তির জন্য আমাদের কাজ চলবে নিরবচ্ছিন্নভাবে। অতএব ব্রিটিশ যখনই মালয়ে পা দিতে চাইবে আমরা আমাদের সবটুকু শক্তি দিয়ে তাদের প্রতিরোধ করব।

ভবিষ্যতে যখন ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা হবে, সেই ইতিহাসে মালয়ের ভারতীয়দের এক গৌরবময় স্থান থাকবে। স্বাধীনতার জন্য ভারতের সংগ্রামে মালয়ের ভারতীয়রা বিপুলভাবে সাহায্য করেছে সেনা, অর্থ ও সামগ্রী দিয়ে। তার জন্য ভারত চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবে। বিশেষত মালয় হল আজ়াদ হিন্দ ফৌজ ও আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের জন্মস্থান। মালয়ের বহু তরুণ ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে অসীম সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছে, তাদের প্রাণ দিয়েছে এবং মালয় থেকেই 'ঝাঁসির রানী বাহিনী'-তে সর্বাধিক সংখ্যায় মহিলারা যোগ দিয়েছেন। আমাদের সংগ্রামে মালয়ের ভারতীয়দের যে মহান অবদান আছে সেই অবদান তাদের অব্যাহত রাখতে হবে। মালয় থেকেই আমরা সর্বপ্রথম আমাদের 'সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি'-র ডাক পাঠিয়েছিলাম।

আজ আমি আপনাদের কাছে আরও সেনা, আরও অর্থ ও আরও সামগ্রীর জন্য আবেদন করছি। বর্মাদেশে আমাদের সাম্প্রতিক ব্যর্থতার পরে আপনাদের উপরে দায়িত্ব আরও

বেড়েছে। আপনারা অতীতে এই সংগ্রামের জন্য যা করেছেন তার ভিত্তিতে আমার কোনও সন্দেহ নেই যে আপনারা ভবিষ্যতেও করবেন, এবং আরও বেশি করবেন। আপনাদের কাছে আমার শুধু এই অনুরোধ আমাদের এই সংগ্রাম যে ন্যায়ের সংগ্রাম সে বিশ্বাস আপনারা আপনাদের মনের মধ্যে রাখবেন। যতদিন এই বিশ্বাস আপনাদের থাকবে ততদিন চূড়ান্ত পর্যায়ে আমাদের জয় যে অনিবার্য সেই বিষয়ে আপনাদের আশা ও বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকবে।

জয় হিন্দ

বর্মাদেশ সম্পর্কে ব্রিটেনের নীতি

[সিঙ্গাপুর থেকে বেতারভাষণ, ২৫ জুন ১৯৪৫][১]

বর্মাদেশের নাগরিকরা তাদের মোহভঙ্গের প্রথম পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা হারানোর ক্ষতিপূরণ বাবদ তাদের উপহার দেওয়া হয়েছে একটা নতুন আইন যেটা এখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সামনে পেশ করা হয়েছে। যথারীতি এই আইনের সঙ্গে আছে ভবিষ্যতে কোনও এক সময়ে তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেবার অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। বর্তমানের জন্য বর্মাদেশ যা পাবে তা হল একটা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, যে কাউন্সিল বর্মার নাগরিকদের কাছে বা সেই দেশের নির্বাচকদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে না, কাউন্সিলের দায়বদ্ধতা থাকবে শুধুমাত্র স্বয়ং গভর্নরের কাছে। কয়েকজন সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিকে এবং কিছু ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের এই কাউন্সিলে আসন দেওয়া হবে। পার্লামেন্টের আদলে একটা বিতর্কসভা থাকবে বটে, কিন্তু গভর্নর বা তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের উপর এই বিতর্কসভার কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। যারা কথা বলতে ভালবাসে তাদের জন্য এটা একটা আমোদের উপকরণ হিসাবে থাকবে।

বর্মাদেশের নাগরিকেরা একবার স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে, তার সময়কাল যতই সীমিত হোক না কেন। ব্রিটিশ যদি ভেবে থাকে বর্মার নাগরিকদের এই চাতুরীতে ভোলানো যাবে তা হলে আমাকে এ কথা বলতেই হচ্ছে যে পূর্ব এশিয়া থেকে বিতাড়নের পরে ব্রিটিশের কোনও শিক্ষাই হয়নি। বলাই বাহুল্য যে বর্মার নাগরিকেরা যে বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়েছিল তা তখন পুরোপুরি ভেঙে যাবে, যখন তারা অবশেষে বুঝতে পারবে তাদের শুধুমাত্র স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি নয় এবং সেই প্রতিশ্রুতি নতুন কিছু নয় কারণ সেই একই প্রতিশ্রুতি তাদের অতীতেও দেওয়া হয়েছিল। আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে যখন তাদের মোহভঙ্গ সম্পূর্ণ হবে তখন তারা ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং সাম্প্রতিককালে তাদের দেশের স্বাধীন অবস্থায় তারা যে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছিল সেই অস্ত্র তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে।

এই প্রসঙ্গে একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বর্মাদেশের জাতীয় সেনাদলের সম্বন্ধে কোনও আলোচনাই হচ্ছে না। আয়তনে ছোট হলেও স্বাধীন বর্মাদেশের নিজস্ব একটা সেনাবাহিনী ছিল। কিন্তু এখন তাদের ব্রিটিশ উদ্ধারকারীদের শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনায় বর্মাদেশের নাগরিকদের নিজস্ব কোনও সেনাবাহিনী থাকল না। ব্রিটিশ যদি ভেবে থাকে যে এই ঘটনা বর্মার নাগরিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে তা হলে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। সাধারণ স্তরে

১. Testament of Subhas Bose, pp. 124-125

মোহভঙ্গের যে ঘটনা ঘটে চলেছে তার সঙ্গে আরও যোগ হয়েছে ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা আরোপিত অস্থায়ী আদেশ যার বলে কোনও ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বর্মার মুদ্রা কার্যত বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এটা সর্বজনবিদিত নীতি যে যখনই পৃথিবীর যে কোনও দেশে সরকারের পরিবর্তন হয় তখন নতুন শাসক শাসনভার নেবার পরে অন্তত কিছুদিন পুরনো মুদ্রা বজায় রাখে এবং তারপরে তার জায়গায় নতুন মুদ্রা চালু হয়। একদিক দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে বর্মাদেশের চালু মুদ্রা বাতিল করার আদেশ দিয়েছে তাতে আমি খুশি কারণ এই আদেশের ফলে বর্মার সাধারণ মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা আরও তীব্র হবে এবং তাতে তাদের অসন্তোষ ও ক্রোধ আরওই বাড়বে।

বর্মাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিস্টার অ্যামেরি ও প্রধানমন্ত্রী মিস্টার চার্চিলের আনা প্রস্তাব বাস্তবিক অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের। আমি আশা করতে থাকব ও প্রার্থনা করতে থাকব তারা যেন এই ধরনের গুরুতর ভুল করতেই থাকে যার ফলে বর্মাদেশে যে বিদ্রোহ যা অবধারিত ভাবে ঘটতে যাচ্ছে তা আরও শীঘ্র ঘটবে, আজ লোকে যখন ঘটবে ভাবছে তারও অনেক আগেই তা ঘটবে। পার্লামেন্টের সামনে এখন যে বিলটি উপস্থাপন করা হয়েছে সেই আইন পাশ হলে বর্মাদেশকে তা যেমন রাজনৈতিক দিক থেকে ১৯০৯ সালে পিছিয়ে দেবে, তেমনই অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশ বর্মাদেশকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা বর্মাদেশকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে, অর্থাৎ বার্মা অয়েল কোম্পানি, বার্মা করপোরেশন এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠান যাতে আগের মতোই বর্মাকে শোষণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেবে। যুদ্ধের আগে বর্মাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমন ছিল সেখানেই আবার ফিরে যাওয়ার ঘটনাকে বর্মাদেশের নাগরিকেরা স্বাগত জানাবে, এমন কথা শুধু তারাই ভাবতে পারে যাদের চিন্তা করার কোনও ক্ষমতা নেই।

লন্ডন থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে কোয়ালিশন ক্যাবিনেটের আনা প্রস্তাবকে লেবার পার্টি তাদের সমর্থন দিয়েছে। এটা আবারও প্রমাণ করছে, যদি সেই প্রমাণের কোনও প্রয়োজন কারুর থাকে, যে ভারতবর্ষ ও বর্মাদেশের মতো ইংল্যান্ডের উপর নির্ভরশীল দেশগুলির জন্য কনজ়ারভেটিভ ও লেবার পার্টির নীতির মধ্যে কোনও ফারাক নেই। যে সব ভারতীয়েরা ভেবে থাকেন যে লেবার পার্টি ক্ষমতায় এলে ভারতবর্ষের সুবিধা হবে তাদের আমি বর্মাদেশের অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দেব। আমার দিক থেকে আমি এই বলতে পারি যে আমি আশা ও প্রার্থনা করছি যেন কনজ়ারভেটিভ পার্টি আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। তা হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাবুকের আঘাত ভারতবাসীকে খোলাখুলি বিদ্রোহের পথ নিতে বাধ্য করবে এবং তখন তারা দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারবে।

৭১

জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা

[সিঙ্গাপুর থেকে বেতারভাষণ, ২৬ জুন ১৯৪৫][১]

ভারতবর্ষ আজ এক রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এখন একটা ভুল পদক্ষেপ স্বাধীনতার লক্ষ্যে আমাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে। আমি আজ কতটা চিন্তিত তা আপনাদের কাছে ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না, কারণ এক দিকে স্বাধীনতা প্রায় আমাদের নাগালের মধ্যে আবার অন্য দিকে একটা ভুল পদক্ষেপ সেই স্বাধীনতাকে দূর ভবিষ্যতে ঠেলে দিতে পারে। আপনাদের প্রথমেই বলি ভারতের মধ্যে শত্রুদের মিথ্যা প্রচার এখন এতটাই সফল যে প্রভাবশালী নেতারা, যাঁরা এক সময় বিশ্বাস করতেন স্বাধীনতা আমাদের হাতের মুঠোয় এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে কৃতসংকল্প ছিলেন, তাঁরাও এখন ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণের কথা চিন্তা করছেন।

এই সংকটকালে আমরা যারা দেশের বাইরে আছি, আমরা সারা বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা বাস্তব মূল্যায়ন করতে পারি যেটা দেশের অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। সেই জন্য আমি মনে করি যে আমরা কী ভাবছি সেটা আপনাদের কাছে খোলাখুলি প্রকাশ করা এবং যথাযথ পরামর্শ দেওয়াটা আমাদের কর্তব্য। রেঙ্গুনের হেড কোয়ার্টার্স ছেড়ে চলে আসার পর, আমরা বর্মাদেশের অন্যত্র আমাদের হেড কোয়ার্টার্স গড়তে পারতাম। স্বাধীন বর্মাদেশের সরকার ঠিক তাই করেছিল যখন আমাদের সৈন্যেরা বর্মাদেশের অভ্যন্তরেই লড়াই করছিল। কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম যে শত্রুপক্ষ ইউরোপ ও বর্মাদেশে তাদের সাম্প্রতিক সাফল্যকে তখনই কাজে লাগাবে এবং নতুন একটা রাজনৈতিক ও সামরিক আগ্রাসন শুরু করবে। সুতরাং সেই আগ্রাসনের মুখোমুখি হবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে এবং এমন একটা স্থানে আমাদের ঘাঁটি স্থাপন করতে হবে যেখান থেকে আমরা প্রয়োজন হলেই ভারতবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমার সায়োনান বা সিঙ্গাপুরে আসার মূল কারণই হল তাই।

ভারতে আজ সংকট দেখা দিয়েছে কারণ আমাদের দেশবাসীদের মধ্যে প্রভাবশালী কয়েকটা অংশ, যারা মাত্র তিন বছর আগেও 'মুক্তি অথবা মৃত্যু' বলে চিৎকার করছিল, তারা এখন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষে সম্মতি দিতে প্রস্তুত এবং সেই আপোষ হবে লর্ড ওয়াভেলের নিজস্ব শর্ত ও ইচ্ছানুসারে। দুটি কারণে এই মনোবৃত্তি একেবারেই ভ্রান্ত ও যুক্তিহীন। প্রথমত, স্বাধীনতার প্রশ্নে একেবারেই কোনও আপোষ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, এই

---

১. Testament of Subhas Bose, pp. 125-129

ব্যক্তিরা যা ভাবছে পরিস্থিতি একেবারেই তা নয় এবং আমরা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ অব্যাহত রাখি তা হলে এই যুদ্ধের শেষে আমরা অবশ্যই আমাদের স্বাধীনতা পাব।

আপনারা যাঁরা আমার কথা এখন শুনছেন তাঁদের মধ্যে কারুর মনে যদি সন্দেহ থাকে যে সারা পৃথিবীতে কী ঘটছে তা কীভাবে আমার এত ভালভাবে জানা আছে, তা হলে উনি একটা সহজ তথ্যের মাধ্যমে তার প্রমাণ পেতে পারেন। আমার গত সপ্তাহের আলোচনায় তিনি অবশ্যই লক্ষ করেছেন যে ভারতের অভ্যন্তরে প্রতিদিন যা ঘটছে সেই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছে যাচ্ছে। ঠিক তেমন সহজেই সারা পৃথিবীতে যা ঘটছে তার খবরাখবর নিয়মিত আমার কাছে আসছে। কিন্তু যাঁরা দেশের ভিতরে আছেন এবং ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃত্বের আওতার বাইরে সারা বিশ্বে যা ঘটছে সেই খবর যাঁদের কাছে পৌঁছচ্ছে না, বরং যাঁরা শত্রুদের অপপ্রচারের শিকার হচ্ছেন, তাঁদের পক্ষে বহির্বিশ্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা বাস্তব মূল্যায়ন করা কঠিন।

আজকের দিনে সারা বিশ্বের ঘটনাবলীর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে, এবং সেই ঘটনাবলীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ভাগ্যও কিছুটা জড়িয়ে গেছে। প্রশ্ন জাগতে পারে যে আমি কেমন করে এখনও এত আশাবাদী যখন আমাদের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে অনেকেই একটা পরাজিতের মনোভাব পোষণ করছেন? এর কারণ মূলত দু'টি। প্রথমত আমরা ব্রিটিশ ও তার মিত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িতে আছি, এবং সম্প্রতি বর্মাতে আমাদের সাময়িক ব্যর্থতা সত্ত্বেও পূর্ব এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা আশাহত নই। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুস্থানেই ভারতবর্ষ এখন আলোচিত একটা বিষয় এবং যদি আমরা এই বিষয়টিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সমস্যা না হতে দিই তা হলে বিশ্বের দরবারে এই বিষয়টি বারে বারেই আলোচনা ও বিচারের জন্য আসবে। আপনারা কি স্বচক্ষে দেখছেন না বা স্বকর্ণে শুনছেন না কী ভাবে সিরিয়া ও লেবানন তথাকথিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে মতবিরোধের সৃষ্টি করে এই যুদ্ধের পরিস্থিতিকে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে? সিরিয়া ও লেবাননের নেতাদের থেকে আমরা বুদ্ধি ও দূরদর্শিতায় কোনও অংশে খাটো নই। কিন্তু আমরা যদি ভারতের সমস্যাটি বিশ্বদরবারে আনতে চাই তা হলে আমাদের দু'টি কাজ করতে হবে। প্রথমত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনও আপোষ করা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের অধিকারকে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

যদি স্বদেশবাসী সশস্ত্র প্রতিরোধে সক্ষম না হন এবং এমনকী ব্রিটিশের যুদ্ধের বিরোধিতা করে আইনঅমান্য আন্দোলনের মাধ্যমেও যদি তাঁরা প্রতিবাদ করতে না পারেন, অন্ততঃপক্ষে তাঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন ও আপোষ মীমাংসার পথ বর্জন করতে পারেন। আমরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতীয়দের স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে জীবনযাপনের অধিকারের দাবি করতে থাকব, এবং যতদিন আমরা সেই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারব, পৃথিবীর কোনও শক্তিই ভারতের সমস্যাকে রাজনীতির আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে সরিয়ে দিতে পারবে না, যদি না আপনারা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ করে আমাদের বিশ্বাসের অমর্যাদা করেন।

আমি জানি দেশের কোনও কোনও নেতা আমার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন কারণ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁদের আপোষের পরিকল্পনার আমি বিরোধিতা করছি। তাঁরা আমার

বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়েছেন কারণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ও কংগ্রেসের মারাত্মক ভুলগুলির আমি সমালোচনা করছি এবং তাঁরা আমার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়েছেন কারণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে আমাদের দেশের জাতীয় অভিমত ও কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের মতামত অনুসারে কাজ করছে না সেই দিকে আমি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছি। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক এই নেতারা আমাকে গালমন্দ করছেন কারণ আমি জাপানের সাহায্য নিয়েছি। জাপানের সাহায্য নিয়েছি বলে আমি লজ্জিত নই। জাপান ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে স্বীকৃতি দেবে সেই ভিত্তিতেই জাপানের সঙ্গে আমার সহযোগিতার অঙ্গীকার এবং তারা ইতিমধ্যেই আজ়াদ হিন্দ অর্থাৎ 'স্বাধীন ভারতের' আপৎকালীন সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু যাঁরা এখন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাইছেন এবং সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের যুদ্ধে ব্রিটেনকে সাহায্য করতে চাইছেন তাঁরা কিন্তু ভারতের ভাইসরয়ের অধীনে তাঁর কাছেই দায়বদ্ধ থাকার চাকরি নিতে প্রস্তুত আছেন। ব্রিটেন স্বাধীন ভারতের সরকারকে স্বীকৃতি দেবে এই ভিত্তিতে নেতারা যদি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন তা হলে সেটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপারে দাঁড়াত। অধিকন্তু জাপান আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছে যার ফলে আমরা আমাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী গঠন করতে পেরেছি এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারছি। মনে রাখবেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই আমাদের একমাত্র শত্রু। আমাদের এই সেনাবাহিনী, আজ়াদ হিন্দ ফৌজ, প্রশিক্ষণ পেয়েছে ভারতীয়দের কাছ থেকে, যাঁরা ভারতীয় ভাষায় প্রশিক্ষণ দিতে পারেন। এই বাহিনী ভারতের জাতীয় পতাকা বহন করে থাকো ও তারা যে স্লোগান ব্যবহার করে তা ভারতের জাতীয় স্লোগান। এই বাহিনীর অফিসারেরা সকলেই ভারতীয় এবং অফিসারদের প্রশিক্ষণের স্কুলগুলি পরিচালনার ভার আছে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের উপরেই। এবং রণক্ষেত্রে এই সেনাবাহিনী তাদের নিজস্ব কমান্ডারদের অধীনে লড়াই করে, সেই কমান্ডারদের অনেকেই এখন জেনারেলের পদাধিকারী। এই সেনাবাহিনীকে যদি কেউ 'জাপানের হাতে ক্রীড়নক সেনাবাহিনী' বলে অভিহিত করতে চায় তা হলে আমি বলব প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীই হল ক্রীড়নক বাহিনী কারণ তারা ব্রিটিশ অফিসারদের অধীনে লড়াই করছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের জন্য। আমাকে কি একথা আপনারা বিশ্বাস করতে বলেন যে ২,৫০০,০০০ সেনার এই বাহিনীতে মাত্র কতিপয় ভারতীয় সেনার যোগ্যতা আছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ সম্মান 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' পাবার এবং আজ পর্যন্ত একজন ভারতীয়কেও পাওয়া যায়নি যিনি জেনারেল পদ অধিকার করার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছেন।

কমরেডরা! আমি বলেছি যে আমি জাপানের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে লজ্জিত বোধ করিনি। আমি আরেক ধাপ এগিয়ে বলতে পারি যে যদি প্রবল প্রতাপশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নতজানু হয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে পারে তা হলে আমরা পরাধীন ও নিরস্ত্র জাতি, আমাদের পক্ষে বন্ধু রাষ্ট্রের কাছে সাহায্য না চাওয়ার কোনও কারণ আমি দেখি না। আজ আমরা জাপানের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছি, আগামীকাল অন্য যে কোনও দেশের কাছ থেকে সাহায্য নিতে আমরা দ্বিধা করব না, যদি তা সম্ভব হয় এবং ভারতবর্ষের স্বার্থে যদি সেই সাহায্য বাঞ্ছনীয় হয়। যদি বিদেশ থেকে কোনও সাহায্য না নিয়ে আমরা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করতে পারতাম তা হলে আমার থেকে বেশি আনন্দিত আর কেউ হত না। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত আধুনিক যুগের ইতিহাসে একটা দৃষ্টান্তও দেখিনি যেখানে কোনও পরাধীন দেশ বিদেশের কোনও সাহায্য না নিয়ে স্বাধীন হতে পেরেছে।

এবং দাসত্বের বন্ধনে বন্দি ভারতীয়দের পক্ষে ব্রিটিশ নেতা অথবা ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে অনুগ্রহ ভিক্ষা করার থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শত্রুর সঙ্গে হাত মেলানো অনেক বেশি সম্মানজনক। আমাদের সব থেকে বড় সমস্যা হল যে আমাদের শত্রুদের আমরা যথেষ্ট পরিমাণে অপছন্দ করি না এবং আমাদের নেতারা সর্বদাই ভারতের শত্রুদের সাহায্য করবার জন্য ব্যগ্র।

আমাদের নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ বিদেশে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকেন অথচ দেশের ভিতরে তাঁরাই সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মেলান, আশ্চর্য নয় কি? কমরেডরা! আজ আমি মুখ খুলে একটা কথাও বলতাম না যদি আমি একজন চেয়ারে বসা রাজনীতিবিদ হতাম। আমি ও আমার সহযোদ্ধারা এখানে এক মরণপণ লড়াই করছি। রণক্ষেত্রে আমার কমরেডরা তাদের জীবন নিয়ে খেলা করছে। যারা যুদ্ধক্ষেত্রে নেই তাদেরও প্রতি মুহূর্তে বিপদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হচ্ছে। যখন আমরা বর্মাদেশে ছিলাম, বোমাবর্ষণ ও মেশিনগানের গুলি ছিল আমাদের প্রতিদিনের খোরাক। শত্রুপক্ষের বোমার নির্মম আঘাতে ও মেশিনগানের গুলিতে আমার অনেক কমরেডকে আমি প্রাণ দিতে দেখেছি, আহত বা পঙ্গু হতে দেখেছি। হাসপাতালের রোগীদের গুরুতর আহত করে রেঙ্গুনে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের গোটা হাসপাতাল আমি জমির সঙ্গে মিশে যেতে দেখেছি। আমি এবং আমার মতো অন্যান্য আরও অনেকে যে আজও বেঁচে আছি, সে শুধু ঈশ্বরের কৃপায়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেহেতু আমাদের কাজ করতে হচ্ছে, জীবনধারণ করতে ও লড়াই করতে হচ্ছে সেই জন্য আমি মনে করি আমার অধিকার আছে আপনাদের সঙ্গে কথা বলার ও আপনাদের উপদেশ দেবার। আপনাদের মধ্যে অনেকেরই জানা নেই বোমাবর্ষণ কী। আপনাদের মধ্যে অধিকাংশেরই জমির কাছাকাছি উড়ে যাওয়া বিমান থেকে মেশিনগানের গুলির সম্মুখীন হবার অভিজ্ঞতা নেই। কানের পাশ দিয়ে, শরীরের ডানদিক দিয়ে, বাঁদিক দিয়ে উড়ে যাওয়া বুলেটের শব্দের সঙ্গে আপনাদের মধ্যে অধিকাংশেরই কোনও পরিচয় নেই। যাঁরা এই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন অথচ তার পরেও নিজেদের মনোবল অটুট রেখেছেন তাঁরা লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের দিকে ফিরেও তাকাবেন না।

কমরেডরা! লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিষয়ে আমরা কী করব সেটা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। সর্বপ্রথম, যদিও হাতে সময় খুব কম তবু তার মধ্যেই আপনাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যাতে এই প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যেন কোনও মতেই গ্রহণ না করে। আপনারা যদি তা করতে সক্ষম না হন তা হলে আপনাদের এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যার ফলে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল থেকে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সেটা তত কঠিন হবে না। ভাইসরয় ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে কোনও একটা সংকটের সৃষ্টি আপনাদের করতে হবে। নতুন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত হলেই ভাইসরয় যে ভারত থেকে সৈন্য, অর্থ ও রসদ সংগ্রহ করতে শুরু করবেন দূর প্রাচ্যে ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর থেকে বহু বিষয়েরই অবতারণা হবে যেখানে ব্রিটিশ ও ভারতের মধ্যে স্বার্থের বিরোধ দেখা দেবে। তখন আপনাদের বিক্ষোভ ও আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে প্রচার শুরু করতে হবে। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কংগ্রেস সদস্যদের অবশ্যই তখন ভারতের স্বার্থের অনুকূলে তাদের সমর্থন দিতে হবে যা অবশেষে ভাইসরয়ের সঙ্গে সংঘাতে পরিণত হবে এবং ফলে অবধারিতভাবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল থেকে কংগ্রেস সদস্যদের পদত্যাগ করতে

হবে। তখন আপনাদের আন্দোলন শুরু করতে হবে যাতে ভারতীয় সেনাদের কামানের গোলার মুখে ঠেলে দেবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যেন পাঠানো না হয়। ব্রিটেনের যুদ্ধে ভারতকে দলে টানার পরিকল্পনাকে বানচাল করতে হবে এবং ভারতীয় সেনাদের যুদ্ধে পাঠানো বন্ধ করতে হবে। আপনারা জানেন, যে সব দেশ ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই সব দেশে কীভাবে গোপন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা যায় সেই বিষয়ে গত পাঁচ বছর ধরে ব্রিটিশ আমাদের মূল্যবান নির্দেশ দিচ্ছিল। আপনারা ভারতে বসে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেই যদি এখন সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন তা হলে তা চমৎকার ফল দেবে। কমরেডরা! আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করব। শেষ কবার আগে আমি শুধু আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে একজন বিপ্লবী বিশ্বাস করেন যে তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন তা ন্যায়সংগত এবং তিনি জানেন যে একদিন তিনি সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। ব্যর্থতা যাদের মনোবল ভেঙে দেয় তারা প্রকৃত বিপ্লবী নয়। বিপ্লবীর মন্ত্র হল "সব থেকে ভাল ফলের আশা করো, কিন্তু সব থেকে খারাপ ফলের জন্য প্রস্তুত থাকো।" আমি বিশ্বাস করি যে আমরা যদি আমাদের লড়াই চালিয়ে যাই এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যদি ঠিকমতো চাল দিতে পারি তা হলে এই যুদ্ধের শেষে আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করতে পারব।

"জয় হিন্দ!"

৭২

আমি একজন বিপ্লবী

[সিঙ্গাপুর থেকে বেতারভাষণ, ২৭ জুন ১৯৪৫][১]

কমরেডরা! গত কয়েকদিন ধরে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, যেমন একজন বিপ্লবী তাঁর সহ-বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং আজ আমি ভারতবর্ষে থাকলে যেমনভাবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলতাম তেমনভাবে। বিপ্লবী বলতে আমি তাঁদের কথা বলছি যাঁরা ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিশ্বাসী ও যাঁরা সেই স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনও আপোষে রাজি নন। উপরন্তু একজন বিপ্লবী বিশ্বাস করেন যে তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন তা ন্যায়সংগত এবং তার ফলে তিনি জানেন যে একদিন তিনি অবধারিতভাবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। কোনও ব্যর্থতা বা সাময়িক অসাফল্যে বিপ্লবী কখনও বিষণ্ণবোধ করেন না বা হতাশ হন না কারণ তাঁর মন্ত্র হল "সবথেকে ভাল ফলের আশা করো, কিন্তু সব থেকে খারাপ ফলের জন্য প্রস্তুত থাকো।" ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য আমরা বিপ্লবীরা সংগ্রামে নেমেছি এবং আমাদের জয় যে হবেই সেই বিষয়ে যেমন আমাদের অটল বিশ্বাস আছে, তেমনই যেকোনও পরিস্থিতিতে আমরা যে লড়াই চালিয়ে যাব সেই সংকল্পেও আমরা অনমনীয়। এই অটুট মনোবল নিয়েই আমরা এতদিন ব্রিটিশদের সম্মুখীন হয়েছি ও এখন আমরা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি। বিপ্লবী হিসাবে আমাদের বিচারে ভারতের স্বাধীনতা এক অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে বাধা দিতে পারে। এর মধ্যে একটা বিষয়েই শুধু অনিশ্চয়তা আছে, তা হল কোন সময়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, ভারতের স্বাধীনতা ঠিক কোন সময়ে আসবে তা নির্ভর করছে দু'টি বিষয়ের উপরে: প্রথম হল কতটা পরিশ্রম ও ত্যাগ করবার জন্য আমরা প্রস্তুত তার উপরে এবং দ্বিতীয় বিষয় হল বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করবার জন্য আমাদের কতটা প্রস্তুতি আছে তার উপরে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমাদের অন্ততপক্ষে যে তিনটি কাজ করতেই হবে তা হল: প্রথমত ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অস্ত্রধারণের অধিকারের অনুকূলে দেশের ভিতরে ও বাইরে জনমত গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, দেশের ভিতরে, শুধুমাত্র নীতিগত প্রতিরোধ হলেও আমাদের আন্দোলন অব্যাহত রাখতে হবে এবং যেভাবেই হোক ব্রিটিশের সঙ্গে কোনও আপোষ করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। তৃতীয়ত ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করতে হবে, এবং আমাদের দেশের স্বাধীনতার বিষয়ে বিশ্বের দরবারে অভিমত চাইতে হবে।

---

১. Testament of Subhas Bose, pp. 130-135

আমার আগের বক্তৃতাগুলিতে আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে পূর্ব এশিয়াতে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতীয়দের অস্ত্রধারণের অধিকারের দাবি আমরা অব্যাহত রাখব, এবং যতদিন সেটা আমরা করতে পারব, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিষয়টিও আলোচিত হতে থাকবে। তবে সেটা তখনই সম্ভব হবে যদি দেশের ভিতরে ভারতীয়রা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের সঙ্গে আপোষে সম্মতি দিয়ে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ না করেন কারণ তা হলে তখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আর আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয়বস্তু থাকবে না, সেটা পর্যবসিত হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ একটা বিষয়ে। সাম্প্রতিক সামরিক সাফল্য ও মিথ্যা প্রচারের সমন্বয়ে ব্রিটিশ এখন ভারতের মধ্যে আপোষের অনুকূলে একটা আবহ সৃষ্টি করেছে এবং আমার স্বদেশবাসীদের মধ্যে একাংশের এখন ধারণা হয়েছে যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠী এই যুদ্ধে জিততে চলেছে ও বর্তমানের এই যুদ্ধ চলাকালীন ভারতের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন করবার কোনও সম্ভাবনা আর নেই, এবং উপরন্তু তাঁরা আরও ভাবছেন ভারতকে এখন যা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেটায় সম্মতি দেওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও বিকল্প পথও নেই।

ব্রিটিশ যেই বুঝেছে যে ভারতে তাদের অপপ্রচারে কাজ হচ্ছে, গরম লোহায় তখনই তারা আঘাত হেনেছে এবং ভারতের জনগণের সামনে তারা একটা নতুন প্রস্তাব রেখেছে, যা ভাবে ও ভাষায় স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের প্রস্তাবের অতি সামান্য পরিবর্তিত সংস্করণ। সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনও প্রকৃত কংগ্রেস কর্মী লর্ড ওয়াভেলের এই প্রস্তাবের দিকে তাকিয়েও দেখত না। কিন্তু এখন এক পরাজিতের মনোভাব আমার স্বদেশবাসীর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করছে এবং তারা ভাবছে তারা তাদের সর্বস্ব হারিয়েছে। তাই জলে ডোবা মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চায় তারাও তেমনইভাবে এই প্রস্তাবকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জনের পথে শত্রুরা আচমকা একটা বাধার সৃষ্টি করেছে। বিপ্লবে বিশ্বাসী আমরা, আমাদের কর্তব্য হল আমাদের নাগালের মধ্যে যে হাতিয়ার আছে সেই হাতিয়ার ব্যবহার করে যেকোনও উপায়ে আমাদের বাধার অপসারণ করা, ভারতের ভিতরে ও বাইরে যে শক্তিসমূহ এখন কাজ করছে সেই শক্তি যাতে অভীষ্ট লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছে দিতে পারে। আমাদের হাতে সময় কম। কিন্তু তবুও আমাদের সাফল্যে আমি আশাবাদী। শুধু আমাদের চেষ্টা করতে হবে, সময় থাকতে স্বদেশবাসীদের চোখ যাতে আমরা খুলে দিতে পারি এবং তারা যাতে বুঝতে পারে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করলে, ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিটিশকে রসদ জোগালে আমাদের কী বিপদে পড়তে হবে। কারণ একদিকে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব যদি গৃহীত হয় তা হলে তা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাবে এবং অন্যদিকে এই প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তাতে কংগ্রেস আর সমগ্র ভারতীয় জনসমাজের প্রতিনিধি বলে গণ্য হবে না। কংগ্রেস তখন ভারতের অন্য আরও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একটিতে পর্যবসিত হবে এবং সর্বধর্মের মানুষের প্রতিনিধি জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে কংগ্রেসের যে পরিচিতি আছে সেই পরিচয়কেও তাদের বর্জন করতে হবে।

ভাইসরয় ও তাঁর ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিরা ভারতীয়দের জন্য একটা ফাঁদ পেতেছেন এবং সেটা যে কোনও কোনও ভারতীয় উপলব্ধি করতে পারছেন না, এই ঘটনা আমাকে বিস্মিত ও বেদনাহত করেছে। এমনকী এই ভারতীয়রা লর্ড ওয়াভেলের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করছেন, তাঁর সততার প্রশংসা করছেন কিন্তু আমি তো মনে করি ভাইসরয় নিজেই তাঁর চরিত্র,

অভিসন্ধি ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে ফেলেছেন। ২৫ জুন সিমলা সম্মেলনের উদ্বোধন করবার সময় তিনি ভারতীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে এই ভাষণ দিয়েছেন, "বর্তমানে অবশ্যই আপনারা আমার নেতৃত্বে কাজ করবার শপথ নেবেন যতদিন না সংবিধানে পরিবর্তন আনবার জন্য সম্মতি দেওয়া হয়। ভারতে শান্তিপূর্ণ সরকারি শাসন বজায় রাখার জন্য ব্রিটেনের মহামান্য সম্রাটের সরকারের পক্ষ থেকে আমার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।" এবং এও সব নয়। এর আগে লর্ড ওয়াভেল তাঁর বক্তৃতায় আরও বলেছেন, "আমাদের ইতিহাসের এই সংকট মুহূর্তে আজ আমি ভারতের সব অঞ্চল থেকে আপনাদের ডাক দিয়েছি যাতে আমরা আপনাদের পরামর্শ দিতে পারি ও আপনাদের সাহায্য করতে পারি এবং যাতে আমরা ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিতে পারি ও এই দেশকে আমরা একটি মহান দেশে পরিণত করতে পারি।"

কোনও আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয়ের পক্ষে এই ধরনের পিঠ চাপড়ানো কথা হজম করা সম্ভব নয়। যদি আমাকে প্রশ্ন করেন তা হলে আমি বলব লর্ড ওয়াভেলকে কেউ ভারতবর্ষের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব দেয়নি এবং ভারতবর্ষের ভাগ্যও তাঁর হাতে সমর্পণ করা হয়নি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণের নিয়ামকের ভূমিকায় লর্ড ওয়াভেলকে গ্রহণ করে নিয়েছেন কিনা সেকথা জানতে আমি খুবই আগ্রহী। সমগ্র বিশ্ব যখন আগ্রাসনের কথা বলছে ও ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠী দাবি করছে যে তাদের লড়াই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, তখন আসুন আপনাদের আমি মনে করিয়ে দিই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি হল আগ্রাসন, নির্মম নিগ্রহ, লুঠতরাজের উপর। আমরা যেন ভুলে না যাই ব্রিটিশের কোনও অধিকার নেই ভারতবর্ষে থাকার। আমাদের শুভানুধ্যায়ী সাজবার বা ভারতের পরিত্রাতার ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করার পরিবর্তে তাদের উচিত হবে এতদিন ধরে তারা ভারতে যত দুষ্কর্ম করেছে তার জন্য অনুতাপ প্রকাশ করা। সিমলা সম্মেলনে লর্ড ওয়াভেলের এই মেকী পরিত্রাতাসুলভ আচরণে অত্যন্ত নীচ স্তরের অসার দম্ভই প্রকাশ পাচ্ছে।

আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় যার মাধ্যমে লর্ড ওয়াভেলের প্রকৃত অভিসন্ধি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা হল সম্মেলনের টেবিলে সদস্যদের আসনের বিন্যাস। তাঁর ডানদিকের আসনটি, যা সাধারণভাবে সম্মেলনে উপস্থিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের দেওয়া হয়ে থাকে, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আবুল কালাম আজাদকে দেওয়া হয়নি। গতকাল রেডিয়ো নিউ দিল্লি থেকে এই খবরটি ঘোষণা করা হয়েছে; কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। যদি কোনও অভিযোগ করা না হয়ে থাকে তা হলে আমাদের অনুমান করে নিতে হবে যে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা সিমলা সম্মেলনে যোগদানের জন্য এতটাই উদগ্রীব যে তাঁরা তার জন্য যেকোনও অপমান বা অমর্যাদা উপেক্ষা করতে প্রস্তুত।

আরও একটা প্রাসঙ্গিক ও উল্লেখযোগ্য বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কিনা আমার জানা নেই। লর্ড ওয়াভেল যখন ব্রিটিশ সরকারের এই নতুন প্রস্তাবের বিষয়ে ঘোষণা করছিলেন ঠিক তখনই লন্ডনে ইন্ডিয়া অফিস থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্য নতুন রিক্রুট শুরু হচ্ছে। ভারতের উপর থেকে শাসনের শক্ত মুঠি আলগা করার কোনও অভিপ্রায় ব্রিটিশের যে নেই, এটা তার স্পষ্ট প্রমাণ, অবশ্য যদি এখনও কারুর কোনও প্রমাণের প্রয়োজন থাকে। গত ২৫ জুন লন্ডন থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে গ্রেট ব্রিটেনের লেবার পার্টির চেয়ারম্যান প্রফেসর হ্যারল্ড ল্যাস্কি এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, "এর ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের ও দেশের জনসাধারণের এই উপলব্ধি হবে যে

ব্রিটিশ দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষ ছেড়ে আসার কথা ভাবছে না অথবা বিকল্পে, রাজত্ব ছেড়ে আসার ক্ষতিপূরণ হিসাবে তারা আগামী বহু বছর ধরে ভারতীয়দের বাধ্য করবে ব্রিটিশ তহবিলে বিশাল অঙ্কের অর্থ দিতে।"

লর্ড ওয়াভেল কেন এই সিমলা সম্মেলনকে বন্ধ দরজার আড়ালে একটা গোপন বৈঠকে পরিণত করলেন সেই বিষয়ে আমাদের শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কৌতূহলী হয়েছেন কিনা আমি জানি না। আমাকে বলা হয়েছে যে যাঁরা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন তাঁদের সকলকে গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য শপথ নিতে হয়েছে। কেন তা করতে হল? একটা সম্মেলন যেখানে একটা পুরো জাতির ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে সেই সম্মেলন কখনও ক্যামেরায় ধরা থাকে বলে আমি শুনিনি। একমাত্র যে ব্যাখ্যা আমার মনে আসছে তা হল লর্ড ওয়াভেল ভারতীয় জনগণের মতামতকে ভয় পাচ্ছেন। বন্ধ দরজার আড়ালে তিনি ভারতের নেতাদের ঠকাবার চেষ্টা করছেন এবং তিনি ভয় পাচ্ছেন যে সম্মেলনের কার্যবিবরণী যদি জনগণের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায় তা হলে ভারতীয় নেতাদের তিনি যে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছেন সেই প্রচেষ্টা জনমতের চাপে বিফল হয়ে যাবে।

সিমলা সম্মেলনের কথা প্রসঙ্গে আমি অবশ্যই মহাত্মা গান্ধীকে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাব, কারণ তিনি সিমলা সম্মেলনে যোগদানে যোগ না দিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত থেকে আমার কাছে স্পষ্টভাবে যা প্রতিভাত হয়েছে তা হল ১৯৩১ সালে লন্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কীভাবে শাসিয়েছিল সেই কথা মহাত্মা গান্ধী নিশ্চয় ভুলে যাননি। লন্ডনের বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী গিয়েছিলেন কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে এবং সেখানে তাঁর সেই ভূমিকাকে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ভারতের অন্যান্য দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছিল। বর্তমানে, সিমলার এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ না করে মহাত্মা গান্ধী নিজেকে রাজনৈতিক দলগুলির ঊর্ধ্বে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতি শুধু যে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে তাই নয়, হয়তো তা ভারতবর্ষের আন্দোলনকেও সাহায্য করবে।

কমরেডরা! লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিষয়ে আমরা কী করব এখন আমাদের সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদিও আমাদের হাতে সময় অতি অল্প, কিন্তু সব থেকে আগে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যাতে কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মতি না দেয় সেই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে আমাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব সবকিছু আমাদের করতে হবে। লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র এক বিপুল প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। আপনাদের একটা সুসংগঠিত বিরোধিতা গড়ে তুলতে হবে। এতদূর থেকে আমার যা ধারণা হয়েছে তা হল দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেকেই লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আছেন, কিন্তু বিরোধীরা সকলে একজোট হয়ে একটা সংহত প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করছেন না যাতে এই প্রস্তাব একেবারেই গৃহীত না হয়। প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যানের আন্দোলনে আপনাদের বিপুল সাহায্য হবে যদি আপনারা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে একটা কার্যক্রম দাবি করতে থাকেন, যে কার্যক্রম অনুসারে ভাইসরয়ের এই নতুন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কাজ করবে। সেই কার্যক্রম থেকে দেশ তখন যাচাই করে নিতে পারবে যে নতুন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কাজ ভারতে সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া এবং এই দেশকে একটা মহান দেশে পরিণত করা নাকি ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ৫০০,০০০ ভারতীয় প্রাণকে কামানের গোলার মুখে ঠেলে দেওয়া।

এই কার্যক্রম যা নতুন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কাজে রূপায়িত করবে, তা অবশ্যই লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণের আগে ভাইসরয়ের সামনে পেশ করতে হবে। ভাইসরয় যদি তা অনুমোদন করেন তা হলে কার্যক্রম থেকে নিঃসংশয়ে জানা যাবে যে নতুন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল ভারতের স্বার্থে কাজ করবে কি না। প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করানোয় আপনারা সফল না হলে এমন একটা পরিস্থিতি আপনাদের সৃষ্টি করতে হবে যা ভাইসরয়ের কাউন্সিল থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে পদত্যাগ করায় বাধ্য করবে। কাজটা কঠিন হবে না। আপনারা সব রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেবার দাবি উত্থাপন করুন, যে দাবি আপনা থেকেই ভাইসরয় ও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে একটা সঙ্কটাবস্থার সৃষ্টি করবে যেমন ঘটেছিল ১৯৩৮ সালে যখন বিহার ও ইউনাইটেড প্রভিন্সের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা সব রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দেবার দাবি তুলেছিল এবং যার ফলে তখনকার গভর্নরের সঙ্গে তাদের মতানৈক্য ঘটেছিল। এ ছাড়াও, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত হবার পর থেকেই ভাইসরয় দূর প্রাচ্যে ব্রিটিশের যুদ্ধে সৈন্য, অর্থ ও সামগ্রী জোগান দেবার জন্য ভারতবর্ষের ভাণ্ডার থেকে শোষণ শুরু করবেন। স্বভাবতই এর ফলে প্রাসঙ্গিক নানা বিষয়ে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের স্বার্থের সংঘাত দেখা দেবে। আপনারা যদি আপনাদের আন্দোলন, এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কংগ্রেস সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যেতে পারেন তা হলে কংগ্রেস সদস্যেরা বাধ্য হবেন ব্রিটেনের স্বার্থে কাজ না করে ভারতবর্ষের স্বার্থের প্রতি তাঁদের সমর্থন দিতে যার ফলে অবধারিতরূপে ভাইসরয়ের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বাঁধবে। ভারতীয় সৈন্যদের যাতে দূর প্রাচ্যে কামানের গোলার সম্মুখে ঠেলে দেবার জন্য পাঠানো না হয় সেই দাবিতে আপনারা এরপরে বিক্ষোভ করতে পারবেন। তাতে ব্যর্থ হলে অন্তর্ঘাতের সাহায্যে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুতিকে বানচাল, যানবাহন বিপর্যস্ত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

আপনাদের জানা আছে যে গত পাঁচ বছর ধরে, যেসব দেশ ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল যেমন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, যুগোস্লাভিয়া ও গ্রিস, সেই দেশে কীভাবে গোপনে তারা তাদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ সংগঠন করেছে সেই বিষয়ে ব্রিটিশ আমাদের অনেক মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছে। এই গোপন কাজে বিদেশে প্রশিক্ষণ পেয়েছে এমন ব্যক্তি ভারতেও আছে, ব্রিটেনেও আছে। আপনারা যদি এই ধরনের ব্যক্তিদের কাজে লাগাতে পারেন অথবা অন্ততপক্ষে আপনারা যদি ব্রিটিশদের দেওয়া সেই অন্তর্ঘাতমূলক কাজের নির্দেশগুলি ভারতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে পারেন তা হলে আপনারা অবশ্যই কিছু ভাল ফল পাবেন।

সবশেষে বলি, যদিও এর গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়, আপনাদের এর সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে বিক্ষোভ সৃষ্টি করবার জন্যও প্রচার চালাতে হবে যাতে ভারতের ভিতরের থেকেও বিদ্রোহের প্রস্তুতি নেওয়া যায়। ১৯৩৯ সালের ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আজকের ভারতীয় সেনাবাহিনী এক নয়। ব্রিটিশ তথ্য অনুসারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা এখন ২৫০০,০০০। আজকের এই বাহিনীতে অনেকেরই রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবোধ আছে। এই বাহিনীতে সশস্ত্র বিদ্রোহের সময় আসবে তখন, যখন যুদ্ধশেষে এদের যুদ্ধের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে এবং তখনও যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না দেওয়া হয়ে থাকে। এই যুদ্ধকে ধন্যবাদ, কারণ এরজন্য ২৫০০,০০০ জন ভারতীয় সেনা অস্ত্রচালনায় দক্ষতা লাভ করেছে। যখন বাহিনী থেকে এদের অব্যাহতি দেওয়া হবে

তখন অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে আপনারা সেই অস্ত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করতে পারবেন। কেমনভাবে শত্রুর অস্ত্র লুণ্ঠন করে শত্রুর বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা যেতে পারে তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা।

আমরা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ না করে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে পারি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা যদি ঠিকমতো চাল দিতে পারি তা হলে এই যুদ্ধের শেষে আমরা আমাদের দেশকে স্বাধীন করতে পারব, এই বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে কোনও কারণে যদি আমরা সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হই তা হলে আমরা আমাদের মনোবল হারাব বা বিষণ্ণ বোধ করব। যদি এই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জীবন শুরু করতে না পারে তা হলে আমাদের যুদ্ধোত্তর কালে বিপ্লবের একটা পরিকল্পনা করতে হবে; যদি আমরা সেই কাজেও সফল না হই, তা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমরা আরও একবার সুযোগ পাব আমাদের স্বাধীনতা জিতে নেবার। যদি বিশ্বের সবক'টি পরাধীন দেশ দাসত্ব থেকে মুক্তি না পায় তা হলে এই যুদ্ধ শেষ হবার দশ বছরের মধ্যে অথবা তারও আগে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে সেই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

আমি এর আগেও বলেছি যে ভারতের স্বাধীনতা আসবেই, একমাত্র যা অনিশ্চিত তা হল সময়—কখন তা আসবে। সব থেকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আমাদের আর হয়তো মাত্র কয়েকটা বছর অপেক্ষা করতে হবে। তা হলে কেন আমরা উদগ্রীব হয়ে ভাইসরয়ের প্রাসাদে ছুটে যাব আপোষের জন্য? আপনারা বিপ্লবী, আপনাদের কর্তব্য হল স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন রাখা যতদিন না ভারতের জনগণ বিদ্রোহ করে এবং নতুন দিল্লিতে ভাইসরয়ের প্রাসাদে আমাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়।

"জয় হিন্দ!"

৭৩

কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যান

[২৮ জুন ১৯৪৫ অস্থায়ী সরকারের আজাদ হিন্দ রেডিয়ো সিঙ্গাপুর হইতে প্রচারিত][১]

বিপ্লবের সাথীগণ! গতরাত্রে আমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে ওয়াভেলের প্রস্তাব গ্রহণ করে আমাদের কোনও লাভ হবে না। পক্ষান্তরে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে। যদি আমরা প্রস্তাবটি সমর্থন করি আমরা সন্দেহাতীতভাবে কংগ্রেসের মনোনীত কিছু ব্যক্তির উচ্চপদ লাভ করিব। কিন্তু ইহাই সব। আমরা জাতি হিসাবে শেষ হয়ে যাব এবং কংগ্রেস এত বছর যেসব বক্তব্যের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল তাহা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

যখন কোনও স্বাধীন দেশ বৈপ্লবিক আন্দোলনে শক্তি লাভ করে, তখন বিদেশি ক্ষমতাশালী সরকার সর্বদাই বিপ্লবীদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করে যাহাতে তাদের কিছু সামান্য সুবিধা দিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ ধরে রাখতে পারে। যখন শিন ফেইন পার্টি আয়ারল্যান্ডে বিপ্লব সংগঠিত করে, ব্রিটিশ সরকার তখন সমস্ত দলকে নিয়ে আইরিশ সংবিধানের একটি খসড়া প্রস্তুত করার জন্য জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু শিন ফেইন পার্টি তথাকথিত সম্মেলন বর্জন করে এই কারণে যে, যাহারা স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে তাহারাই কেবলমাত্র তাহাদের দেশের সংবিধান তৈরি করার অধিকারী হয়। তাহারা জাতীয় বিপ্লব চালিয়ে যান এবং কিছুদিন পরে ব্রিটিশ সরকার অন্যান্য সমস্ত দলকে বাদ দিয়ে শিন ফেইন পার্টির শর্তে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়।

আপনারা স্মরণ করতে পারেন যে ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকে যখন অংশ গ্রহণের প্রস্তাব ওঠে, আমি বলেছিলাম যে কংগ্রেস একাকী এই সম্মেলনের অধিকারী, অন্য কেউ নয়। যাহারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেনি তাহারা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার দাবী করতে পারে না। কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন আমার কথার মূল্য দেয়নি। মহাত্মা গান্ধী অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধির সঙ্গে দ্বিতীয় গোলটেবিল সম্মেলনে যোগদান করেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি অনুধাবন করলেন যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ওই সম্মেলনে একের বিরুদ্ধে অন্যের বিরোধ লাগাতে চেয়েছিল। মহাত্মাজি এ বিষয়ে যে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন সেই শিক্ষা তিনি কোনওদিন ভোলেননি। ইহার থেকে বোঝা যায় যে, কেন তিনি সিমলা সম্মেলনে যোগদান করেননি। সিমলা সম্মেলনে যোগদানকে প্রত্যাখ্যান করে তিনি তাঁর মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন, এবং আমার এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে তাঁর এই অংশগ্রহণ না করায় অবশ্যই ভাল ফলে লাভ হবে। যদিও তিনি দেশাই-লিয়াকত আলি চুক্তি

---

১. *Testament of Subhas Bose*, pp. 135-138. মূল বক্তৃতাটি বাংলায় দেওয়া হয়েছিল।

সমর্থন করেছিলেন, যার জন্য লর্ড ওয়াভেলকে দ্রুত ইংল্যান্ডে যেতে হয় একটি নূতন প্রস্তাব আনতে। মহাত্মাজি সম্মেলনে অংশগ্রহণ না করে ঠিকই করেছিলেন। তিনি একাই কংগ্রেসকে রক্ষা করতে পারেন এবং দেশকে ভবিষ্যৎ অমর্যাদার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।

আমি এই মত পোষণ করি যে, কংগ্রেস সেই একই মারাত্মক ভুল করেছিলেন, যে ভুল মহাত্মাজি ১৯৩১ সালে সিমলা সম্মেলনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করে। কংগ্রেস আজ সেই একই কংগ্রেস যাঁরা অর্ধশতক ধরে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন। সেজন্য একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী কংগ্রেস যে কোনও শক্তির সঙ্গে মত ও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। কংগ্রেস সেজন্য নিজ সম্মান ক্ষুণ্ণ করে বিপথগামী রাজনৈতিক দলের সহিত সম্মেলনে যোগ দেবে। কংগ্রেসই ভারতে একমাত্র জাতীয় ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং ইহাদের একমাত্র অধিকার ভাষণ দেওয়া এবং সমস্ত ভারতবাসীর প্রতিনিধিত্ব করা। যাই হোক, এই পরিকল্পনা ভাইসরয়ের পরিকল্পনার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। তিনি তাঁর পরিষদে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে সমতা রক্ষার অনুমোদন দিয়েছিলেন, তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যাহাতে কংগ্রেসের পদমর্যাদাকে সচিব পর্যায়ের সংগঠনে নামিয়ে আনা। কিন্তু মহাত্মাজি তাঁর হাতের খেলা ভালই খেলেছিলেন। তিনি ভাইসরয়কে বাধ্য করেছিলেন মৌলানা আজাদকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তিনি নিজেকে সম্মেলন থেকে দূরে রেখেছিলেন। জিন্না, যাই হোক, মৌলানা আজাদ, একজন কংগ্রেস প্রতিনিধির সহিত স্বচ্ছন্দ বোধ করেননি। সুতরাং তিনি পণ্ডিত পন্থের সঙ্গে আলোচনা করেন কিন্তু মৌলানা আজাদের সঙ্গে নয়।

প্রস্তাবিত কার্যনির্বাহী পরিষদে থাকবে মুসলীম লীগ এবং কংগ্রেস প্রতিনিধি, এছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যথা শিখ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং অন্যান্যদের প্রতিনিধিত্ব। কংগ্রেস প্রতিনিধিগণ অবশ্য দেশের জন্য নমনীয় থাকবেন, কিন্তু লীগের সদস্যরা ভাইসরয়ের দ্বারা অবশ্যই জয়লাভ করবে, এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মত থাকবে। এমনকী কংগ্রেস এবং লীগ মনোনীত ব্যক্তিগণ যদি কোনও বিষয়ে একমত হন, ভাইসরয়ের ক্ষমতাবলে তা রদ হয়ে যাবে। সুতরাং সমস্ত বিষয়েই তাঁর নিজস্বতা থাকবে এবং যখন আমরা স্মরণ করি যে তিনি ৫,০০,০০০ সৈন্যবাহিনী চান জাপান যুদ্ধের জন্য, আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা ভয়ানক ভুল সিমলা আলোচনায় অংশগ্রহণ করা।

কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়তা দেন যে ভাইসরয়ের বিশেষ কর্তৃত্ব কদাচিৎ প্রয়োগ করা হবে, কিন্তু এই বিশেষ আশ্বাস পরিমাপ করে কংগ্রেসের মিথ্যা ধারণা জন্মায়। প্রথম অবস্থায়, প্রথম আসনটি প্রেসিডেন্টকে দেওয়া হয়েছিল, কংগ্রেসের মধ্য থেকে নয়, কিন্তু অন্য কোনও সংগঠনের মধ্য থেকে। সর্বত্র প্রথম আসনটি বৃহত্তম সংগঠনের প্রতিনিধিকে দেওয়া হয়। দিল্লি রেডিয়ো অনুযায়ী, প্রথম আসনটি কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে দেওয়া হয়েছিল, ভাইসরয়ের ক্ষমতা অনুসারে নয়, কিন্তু তাঁর বাম দলকে। এটি কোনও ব্যক্তিগত সম্মানের প্রশ্ন নয়।

আমরা সবাই যাকে ভালবাসি সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইহা অবমাননাকর। আমরা জানতে চাই যে এই ব্যবস্থা গ্রহণের বিপক্ষে কোনও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়েছিল কিনা। যদি না হয়, কংগ্রেস দেশকে প্রমাণ করেছিল যে ইহাকে গ্রহণ করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হওয়ায়, এমনকী এই অপমানকে ধৈর্যসহকারে সহ্য করার জন্য।

আমাদের কিছু দেশবাসী লর্ড ওয়াভেলের আন্তরিকতা এবং শুভ ইচ্ছার জন্য তাঁকে প্রশংসা করতেন। সম্মেলনের পূর্বে উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'আমি আপনাদের

আমন্ত্রণ জানাইতেছি যে ভারতকে নিকটতর স্বায়ত্তশাসনের জন্য আমাকে সাহায্য করুন। মহামান্য সরকারের নিকট ভারতের শান্তি ও মঙ্গলসাধনের জন্য আমি দায়বদ্ধ। আমি আপনাদের নিকট সনির্বন্ধ আবেদন করি আমাকে আমার কাজের জন্য সাহায্য করতে।' ইহা প্রকৃতই অদ্ভুত যে, ওয়াভেল এখনও নিজেকে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা মনে করেন। ইহা তাঁর কাছে পরিষ্কার করতে হবে যে ভারতীয়গণ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা। সেদিন অনেক আগেই অতীত, যখন ভারতীয়গণ এই প্রশংসার জন্য গর্ব অনুভব করতেন, এখন তাঁরা অপমানিত বোধ করেন যে তাঁরা ব্রিটিশদের দ্বারা পদদলিত।

বন্ধুগণ, আমরা আমাদের দেশবাসীগণকে পরবর্তী ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জানাই যে, সিমলা সম্মেলনে যোগ দিয়ে কংগ্রেস যে ভুল করেছিল তা সংশোধন করা। আমাদের দেশবাসীগণকে বাসস্থানে আনুন যা কার্যকরী কমিটির এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত লওয়ার কোনও অধিকার নেই।

এই সিদ্ধান্ত বা ক্ষমতা পুরোপুরি বৈঠকে লওয়া যায়। বর্তমান কার্যকরী কমিটিতে কোনও বামপন্থী উপাদান নেই। স্মরণ করুন আমরা বিপ্লববাদী। আমরা আশাবাদী। আমরা অবশ্যই আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাব সমস্তপ্রকার প্রলোভন সত্ত্বেও এবং আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব।

"জয় হিন্দ!"

মেঘের আড়ালে আলোক রেখা

[সিঙ্গাপুর থেকে বেতারভাষণ, ২৯ জুন ১৯৪৫][১]

ভারতের ভাই ও বোনেরা! সিমলা থেকে পাওয়া শেষ খবরে মনে হচ্ছে ভারতের আকাশে যে মেঘ ঘনিয়েছিল তার আড়ালে যেন আলোকরেখা চোখে পড়ছে। আজ মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা দাবি করেছেন যে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির সবক'টি মুসলিম লীগের সদস্যদেরই দিতে হবে ও অন্য কোনও গোষ্ঠীর মুসলমান সদস্যদের সেই আসনগুলিতে স্থান দেওয়া যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করবে এবং তারাও দাবি করবে যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির কয়েকটিতে অবশ্যই জাতীয়তাবাদী মুসলমান, যাঁরা মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত নন, তাঁদের স্থান দিতে হবে। আমার একান্ত আশা ও প্রার্থনা যে ব্রিটিশ প্রস্তাবে সম্মতি দেবার অতি আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস তাদের বর্তমান অবস্থান থেকে একচুলও নড়বে না। মুসলিম লীগের এই অযৌক্তিক দাবি মেনে নেওয়া কংগ্রেসের রাজনৈতিক আত্মহননের সমতুল্য হবে।

যদি সেই অভাবনীয় ঘটনা ঘটে অর্থাৎ এই মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে কংগ্রেস যদি মুসলিম লীগের দাবিতে নতিস্বীকার করে নেয়, তা হলে কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যেরা যে বিদ্রোহ করবেন তা নয়, সেই বিদ্রোহে যাঁরা বামপন্থী নন তেমন সাধারণ সদস্যদের বৃহদংশও নিশ্চিতভাবে যোগ দেবেন। সম্প্রতি একটা খবর আমাকে বড় আনন্দ দিয়েছে, যেটা হল নতুন দিল্লিতে পাঁচটি জাতীয়তাবাদী মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সদস্যেরা একটি সম্মেলনে মিলিত হয়ে ঘোষণা করেছেন যে মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান নয়। তাঁরা যে এইভাবে সম্মেলন ডেকেছেন তাতে এইটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে অন্য দলগুলিও এই একই মতামত বেশ জোরালো গলায় প্রকাশ করতে চাইছে। আমি শুধু আশা করছি যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাদের সদস্যেরা যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবের বিরোধী অথবা প্রস্তাবের বক্তব্য সম্পর্কে সন্দিহান তাঁরা সকলে একজোট হয়ে একটা সম্মিলিত প্রতিরোধ সৃষ্টি করবেন। প্রথমত ভারতবর্ষের সকল জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলি যে জোরালোভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করছে, এটা খুবই বাঞ্ছনীয়। হয়তো আজাদ মুসলিম লীগ বা জামায়েত-উল-উলেমা সারা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যদের একটা সম্মেলন ডাকার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। আমার সামনে যে তথ্য রয়েছে তাতে আমি দেখছি যে নতুন দিল্লির এই সম্মেলনের সীমান্ত

---

১. *Testament of Subhas Bose*, pp. 138-140.

এলাকার খুদাই-খিদমতগার এবং বাংলার প্রজা পার্টির প্রতিনিধিরা যোগ দেননি এবং এটাও পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে না মজলিশ-ই-আহরারও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল কিনা। যে সম্মেলন ডাকার কথা আমি বলছি সেখানে হয়তো পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে কারণ ইউনিয়নিস্ট পার্টির মুসলমান সদস্যরাও হয়তো মুসলিম লীগকে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করতে চাইবেন না।

ভারতবর্ষের স্বার্থের অনুকূলে, এবং ভারতবর্ষ যাতে অনতিবিলম্বে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে, সেই উদ্দেশ্য সাধনে সফল হতে গেলে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব আদ্যোপান্ত প্রত্যাখ্যান করাই উচিত কাজ হবে বলে যাঁরা আমার মতোই দৃঢ় মনোভাব পোষণ করে থাকেন, তাঁদের উচিত হবে দেশের মধ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া যতদিন না আমরা সম্পূর্ণভাবে বিপদের আশঙ্কা কাটিয়ে উঠতে পারি। উপরন্তু আমরা যদি প্রথম পর্যায়ের লড়াইয়ে হেরেও যাই ও কংগ্রেস যদি লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাবে সম্মতি দেয় তা হলে আমরা অবশ্যই আমাদের পরিকল্পনা মতো কাজ করে যাব এবং এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করব যে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হবে। এই বিপ্লবী সংগ্রামে আমরা কখনওই নিজেদের মনোবল হারাব না, হতোদ্যম হব না ও আশাহতও হব না, বিশেষত এইসময় যখন আমাদের আন্দোলনের সাফল্যের উপরে আমাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এতটাই নির্ভর করছে।

সিমলা সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর যোগদান না করার বিচক্ষণ সিদ্ধান্তে আমাদের মনের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে যে হয়তো বিপদ এড়ানো যেতে পারে। মৌলানা আজ়াদকে সম্মেলনে ডাকার সিদ্ধান্তে মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা কেন এত আপত্তি করেছেন সেটা আমি বুঝতে পারি। মহাত্মা গান্ধী যা করেছেন সেটা যে শুধু চমকপ্রদ ও যথাযথ তাই নয়, সেটা বিশেষভাবে একটা বিচক্ষণ পদক্ষেপ। শুধুমাত্র তিনি মুসলমান বলে যদি কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে সিমলা সম্মেলনে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করতে না দেওয়া হত তা হলে সেটা ব্যক্তিগতভাবে মৌলানা আজ়াদের প্রতি একটা চরম অবিচার হত এবং একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানগতভাবে বহু মুসলমান কংগ্রেস সদস্যদের প্রতিও অবিচার হত, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য এতদিন ধরে বহু স্বার্থত্যাগ করে চলেছেন।

এটা আমাকে আশ্চর্য করেছে যে মিস্টার জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনাতে সরাসরি কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কোনও বাক্যালাপ করেননি, যদিও তিনি পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থের মাধ্যমে অনেক কথা বলেছেন, যেগুলি অনেকাংশেই নিছক বলবার জন্যই বলা, কোনও কাজের কথা নয়। কংগ্রেস প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দিয়ে মৌলানা আবুল কালাম আজ়াদ ভারতের জন্য এক আন্তরিক সেবার কাজ করেছেন, তিনি সম্মেলনে সাধারণ ভারতীয়দের বক্তব্যকে কণ্ঠস্বর দিয়েছেন। সিমলা সম্মেলনে যোগ না দিয়ে মহাত্মা গান্ধী যে তাঁর ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি ও পদমর্যাদাকে বাড়িয়েছেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মূল পরিস্থিতি থেকে নিজেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখা মহাত্মার পক্ষে নতুন নয়, এবং এর ফলে সঠিক মুহূর্তে তিনি এগিয়ে আসতে পারবেন ও প্রস্তাবিত চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করবার উপদেশ দিতে পারবেন। ইতোমধ্যে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের বিপদ যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে এবং সময়ের অপচয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আমি আশা করব ও প্রার্থনা করতে থাকব যে ভারতবর্ষকে যাঁরা ভালবাসেন ও এই দেশকে

স্বাধীন দেখবার জন্য যাঁরা কাজ করে চলেছেন তাঁরা সকলে ব্রিটিশের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করানোর উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন, কারণ এই প্রস্তাব ভারতের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনাকে বিনাশ করবার জন্য রচনা করা হয়েছে। এই বাধা অপসারিত করতে পারলে তখন ভারতীয় জনগণ আবার তাঁদের মানসিক ভারসাম্য ফিরে পাবেন ও পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্যে তাঁরা আবার জাতীয় স্তরে সংগ্রাম শুরু করবার এক প্রথম শ্রেণীর পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন।

"জয় হিন্দ!"

৭৫

হয় মুক্তি নয় মৃত্যু

[ভাষণের সংক্ষিপ্তসার, জুলাই ১৯৪৫][১]

৪ জুলাই ১৯৪৩, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ব এশিয়াতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। সাম্প্রতিক যুদ্ধে আমাদের ফলাফল ভাল না হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব এশিয়ার ৩০ লক্ষ ভারতীয়রা সেই বিশেষ দিনটির দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছেন ৪ জুলাই ১৯৪৫ তারিখে। সেই দিনটিতে বিভিন্ন স্থানে জনসভা ডাকা হয়েছে, পথে পথে জনগণ এই বিশেষ বার্ষিকীর জন্য জমায়েত হয়েছেন এবং পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা আরেকবার আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের প্রতি ও তাদের নেতা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি তাঁদের আনুগত্যের শপথ নিয়েছেন। ভারতের মুক্তি সংগ্রাম জয়ী না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য তাঁরা যে কৃতসংকল্প সেকথা তাঁরা আবারও একবার জানিয়েছেন। নেতাজি সপ্তাহ উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানগুলি চলেছে পুরো এক সপ্তাহ ধরে ১০ জুলাই পর্যন্ত।

গত ৪ জুলাই, সায়োনানের সব মসজিদ, চার্চ ও মন্দিরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের দীর্ঘজীবন কামনা করে প্রার্থনাসভা বসেছিল, সেইসঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার সংকল্প— যার জন্য তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রাম, সেই ব্রতের সাফল্য কামনা করা হয়েছিল। দিনের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল সকালবেলায় জাতীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে এবং শেষ হয়েছিল সন্ধ্যাবেলায় যখন হাজার হাজার ভারতীয়রা সমবেত হয়েছিলেন এক বিশাল জনসভাতে যেখানে তাঁদের অতিপ্রিয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ভাষণ দিতে উঠেছিলেন।

সভার কাজ শুরু হবার আগে নেতাজি ভারতের নতুন জাতীয় সংগীতের গুরুত্বের কথা সকলকে মনে করিয়ে দিলেন—২১ অক্টোবর ১৯৪৩ আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার দিন থেকে যে জাতীয় সংগীতটি পূর্ব এশিয়ায় গাওয়া হচ্ছে। নেতাজি জানালেন এই নতুন জাতীয় সংগীতের রচয়িতা হলেন পূর্ব এশিয়ার ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের প্রধান কার্যালয়ের প্রচার দপ্তরের জনাব সৈয়দ মুমতাজ হুসেন। জাতীয় সংগীতের বক্তব্যকে প্রশংসা করে নেতাজি বলেন তিনি এই গানটিকে ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করলেন কারণ এই গান জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। ভারতমাতার সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ জনাব হুসেনকে তিনি পুরস্কৃত করলেন একটি সুদৃশ্য রৌপ্য পাত্রে ১০ হাজার ডলারের চেক উপহার দিয়ে।

তারপর নেতাজি হিন্দুস্থানিতে সমবেত জনসাধারণকে সম্ভাষণ করে দুই ঘণ্টারও বেশি

---

১. *Cholo Delhi,* pp. 218-222.

সময় নিয়ে বক্তৃতা দিলেন। তিনি সভায় সমাগত জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভারতবর্ষ পূর্ণ স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন কিনা। পরের দুই তিন সেকেন্ড সভা যেন উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে রইল। এবং তারপরে সমগ্র জনতা একযোগে উঠে দাঁড়াল যেন তারা একই ব্যক্তি, একই শরীর এবং তারা ঘোষণা করল, মুক্তি অথবা মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের নেতাকে অনুসরণ করবে।

৮ জুলাই সায়োনানের কনট ড্রাইভে সমুদ্রের ধারে, আজ়াদ হিন্দ ফৌজের আপৎকালীন সরকারের প্রধান এবং আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক মহানুভব নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু যখন ভারতীয় শহীদ, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের জীবন বিসর্জন দিয়েছে তাদের জন্য একটা স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন, সেটা পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনারূপে চিহ্নিত হয়ে রইল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনারা ও ঝাঁসীর রানি বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবীরা; তাঁরা চতুষ্কোণ চত্বরটির তিনদিক ঘিরে দাঁড়ালেন ও রাস্তার উপরেও বেশ কয়েকজন দাঁড়ালেন। বালক সেনার দল ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্কুলের ছাত্রীরাও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। জাপানের উচ্চপদস্থ কর্মীরা, আইএনএ-র আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের উচ্চপদস্থ অফিসার ও সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্যেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ঘড়ির কাঁটা ধরে ঠিক বেলা এগারোটায় নেতাজি এসে পৌঁছবার পরে অনুষ্ঠান শুরু হল। প্রথমে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হল ব্যান্ডে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে। এরপরে নেতাজি শহীদদের চরম ত্যাগের বিষয়ে উচ্চ প্রশংসা করে হিন্দুস্থানিতে বক্তৃতা দিলেন।

সমবেত জনগণের উদ্দেশ্যে নেতাজি বললেন, 'আজ আমাদের ভারতীয়দের জন্য এক স্মরণীয় দিন— যে দিনটি আমাদের ইতিহাসের পাতায় চিরদিন থাকবে। আপৎকালীন সরকারের নেতৃত্বে আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আপনারা জানেন গত ২৩ অক্টোবর আজ়াদ হিন্দের সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এবং ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ ভারতের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হল।

তারপর থেকে বিভিন্ন সময়ে আমাদের দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানিয়েছি। কিন্তু আজ আমরা এই প্রথম আমাদের স্বর্গগত বীর যোদ্ধাদের জন্য একটা স্মৃতিসৌধ গঠন করতে চলেছি এবং আমাদের মনে হয়েছে যে এই শহরই সেই প্রথম স্মৃতিসৌধের জন্য উপযুক্ত স্থান। সায়োনান হল আজ়াদ হিন্দ ফৌজের জন্মস্থল এবং আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারেরও জন্মও এই সায়োনানেই।

সায়োনান থেকে আজ়াদ হিন্দ ফৌজের সেনারা তাদের সহযোগী বাহিনী আজ়াদ হিন্দ দলের সঙ্গে বর্মার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল, তাদের শেষ গন্তব্যস্থল ছিল ভারতবর্ষ। আমাদের সেনাবাহিনীতে সায়োনান ও মালয় থেকে বহু সেনা এসে যোগ দিয়েছে ও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু কর্মীও সেখান থেকেই এসেছেন। সেই কারণেই আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার সায়োনানে আমাদের বীর যোদ্ধাদের প্রথম স্মৃতিসৌধ গড়বার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই শহর একসময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তের রক্ষাপ্রাচীর ছিল এবং তারপরে সেই শহরেই আবার ভারতের শেষ স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু।

একটা একটা সময় আসে যখন অনুভূতির গভীরতা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আজ

তেমনই একটা দিন— গম্ভীর ও পবিত্র। আসুন আমরা সেই অমর যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে নীরবে শ্রদ্ধা জানাই এবং একই সঙ্গে আসুন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে আমরা প্রার্থনা করি যেন তাদের আরব্ধ কাজ শেষ করবার মতো উপযুক্ত শক্তি তিনি আমাদের দেন। তাঁদের অমর আত্মা আজ আমাদের সঙ্গেই আছে ও সেই আত্মা আমাদের আরও কঠিন ও বীরত্বব্যঞ্জক সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করবে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও আমাদের বীর যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণায় আসুন আমরা আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রাখি, কোনও আপোষ মীমাংসা বা দ্বিধাগ্রস্ত অনিশ্চয়তাকে আমরা আমাদের মনে স্থান দেব না এবং যতদিন না আমাদের দেহ সম্পূর্ণ স্বাধীন হচ্ছে ততদিন আমরা হাল ছাড়ব না। সকল বিপদ ও সংকট সত্ত্বেও চূড়ান্ত জয় যে আমাদেরই হবে সেই সংকল্পে আসুন আমরা অটল থাকি এবং আমাদের আত্মবিশ্বাস যেন থাকে অচঞ্চল।'

নেতাজি এরপরে হিন্দুস্থানি হরফে লেখা একটি মার্বেল ফলক ভিত্তিপ্রস্তর রূপে স্থাপন করলেন, আমাদের জাতীয় পতাকা রইল অর্ধনমিত। সমবেত সেনারা স্থির ও ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়াল, দুই মিনিট নীরবতা পালন করে গার্ড অফ অনার দেওয়া হল। নেতাজি, জাপানের অফিসারেরা ও বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর নেতারা আজাদ হিন্দ ফৌজের আপৎকালীন সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসারদের পুষ্পার্ঘ্য দিলেন।

গার্ড অফ অনারের সঙ্গে তিনবার তোপধ্বনি হল। জাতীয় সংগীত গাওয়া হল ও জাতীয় পতাকা উড়তে লাগল পূর্ণ মর্যাদায় যখন অনুষ্ঠান শেষ হল।

৭৬

সাহসী সৈনিকের মতো যে কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়ান

[আজকের বিশেষ ঘোষণা, সিঙ্গাপুর, ১৪ আগস্ট ১৯৪৫][১]

কমরেডরা,

সায়োনানে ও অন্যত্রও নানা ধরনের অবাস্তব গুজব বাতাসে ভাসছে। সেই গুজবগুলির মধ্যে একটা হল যে যুদ্ধ থেমে গেছে। অধিকাংশ গুজবই হয় মিথ্যা নয় অতিরঞ্জিত। আজকের এই মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বত্র লড়াই চলছে এবং এটা যে শুধু আমাদের মিত্রপক্ষের রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে বলছি তা নয়, শত্রুপক্ষের রেডিয়ো রিপোর্টেও সেই একই কথা শুনছি। যুদ্ধের পরিস্থিতির যদি কোনও পরিবর্তন হয় তা হলে সবথেকে আগে আমিই আপনাদের সেকথা জানাব। সুতরাং আমার অনুরোধ আপনারা সকলে শান্ত থাকুন এবং যার যেমন কাজ সেইমতো করতে থাকুন। সর্বোপরি বাজারের উড়ো খবরে একেবারেই বিভ্রান্ত হবেন না। আমরা মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যুদ্ধে নেমেছি, যে পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক না কেন, আমরা সাহসী সৈনিকের মতো তার মুখোমুখি হব।

জয় হিন্দ

সুভাষ চন্দ্র বসু
সর্বাধিনায়ক
আজ়াদ হিন্দ ফৌজ

সায়োনান, ১৪ আগস্ট, ১৯৪৫
বিকাল ৩টা

---

১. নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহালয় থেকে।

৭৭

দিল্লির অভিমুখে অনেক পথ আছে

[আজকের বিশেষ ঘোষণা, ১৫ আগস্ট ১৯৪৫][১]

আজ়াদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সৈনিকদের প্রতি,

কমরেডরা, আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে আজ এক অভাবনীয় সংকট আমাদের গ্রাস করেছে। আপনাদের হয়তো মনে হবে ভারতের মুক্তির জন্য আপনাদের প্রচেষ্টায় আপনারা ব্যর্থ হলেন। কিন্তু আমি আপনাদের বলব এই ব্যর্থতা সাময়িক এবং কোনও পরাজয় বা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টায় কোনও ব্যর্থতাই আমাদের অতীতের সাফল্যকে মুছে দিতে পারবে না। আপনাদের মধ্যে অনেকেই ভারত-বর্মা সীমান্তে ও ভারতের অভ্যন্তরে লড়াই করেছেন ও সেই লড়াইয়ে অনেক বিপদ, অনেক কষ্টের অভিজ্ঞতা আপনাদের হয়েছে। আপনাদের সহযোদ্ধাদের মধ্যে অনেকের প্রাণ গেছে সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, যাঁদের আমরা আজ়াদ হিন্দ ফৌজের চির-অমর বীরের সম্মান জানাই। এই গৌরবময় আত্মবিসর্জন কখনও বৃথা যাবে না।

কমরেডবৃন্দ, আজ এই সংকট মুহূর্তে আমি আপনাদের প্রকৃত বিপ্লবী সেনাবাহিনীর মতো শৃঙ্খলা, শক্তি ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে আচরণ করতে আহ্বান করব। যুদ্ধক্ষেত্রে আপনারা ইতিমধ্যেই আপনাদের আত্মত্যাগ ও শৌর্য্যের প্রমাণ রেখেছেন। এখন আপনাদের কর্তব্য হল ভবিষ্যতের সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী থাকা এবং এই সাময়িক বিপর্যয়ের দিনে আপনারা যে আপনাদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রেখেছেন তার পরিচয় দেওয়া। এমন একটা নিদারুণ দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতেও আমার মনে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই যে আপনারা উন্নতশিরে, আশা ও আত্মবিশ্বাসকে মূলধন করে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হবেন।

কমরেডবৃন্দ, আমি অনুভব করছি যে এই সংকট মুহূর্তে ৩৮ কোটি ভারতবাসী আমাদের দিকে, ভারতের মুক্তিসেনাদের পানে তাকিয়ে আছে। কাজেই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ ভারতবর্ষের প্রতি আপনাদের আনুগত্য যেন অক্ষত থাকে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ যে দেশের মুক্তিতে সেই বিশ্বাস যেন আপনাদের অটুট থাকে। দিল্লির অভিমুখে যাত্রার পথ অনেক আছে এবং এখনও দিল্লিই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের অমর সহযোদ্ধাদের প্রাণবিসর্জন ও আপনাদের সকলের ত্যাগ আমাদের সংগ্রামকে অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত করবে। পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যা ভারতবর্ষকে চিরদাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং সেই দিন আসন্ন।

জয় হিন্দ

১৫ আগস্ট, ১৯৪৫ — সুভাষ চন্দ্র বসু

---

১. নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহালয় থেকে।

৭৮

ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন হবে

[মালয়, থাইল্যান্ড, ইন্দোচিন, জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, ফিলিপাইন, জাপান ও পূর্ব এশিয়ার অন্যত্র বসবাসকারী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বিশেষ বার্তা, ১৫ আগস্ট ১৯৪৫][১]

বোনেরা ও ভাইয়েরা,

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল এবং সেই অধ্যায়ে পূর্ব এশিয়ার ভাই ও বোনদের জন্য এক চিরন্তন স্থান থাকবে।

দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের এক মহান দৃষ্টান্ত আপনারা রেখেছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সৈন্য, অর্থ ও সামগ্রীর নিরবচ্ছিন্ন জোগান দিয়ে। আমি যখন সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির জন্য ডাক দিয়েছিলাম তখন যে স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহের সঙ্গে আপনারা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, আমি সেকথা কোনওদিনও ভুলব না। আজ়াদ হিন্দ ফৌজ ও ঝাঁসির রানি রেজিমেন্টের সৈনিক হিসাবে প্রশিক্ষণ নেবার জন্য আপনরা আপনাদের সন্তানদের পাঠিয়েছেন দলে দলে। আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকারের রণভাণ্ডারে অকাতরে পাঠিয়েছেন অর্থ ও সামগ্রী। সংক্ষেপে বলতে গেলে ভারতমাতার সুযোগ্য পুত্রকন্যার দায়িত্ব আপনারা পালন করেছেন যথার্থভাবে। আপনাদের এই কঠোর আত্মত্যাগের যে এখনই কোনও পুরস্কার পাওয়া গেল না তার জন্য আমার আক্ষেপ আপনাদের থেকেও বেশি। কিন্তু এই প্রচেষ্টা বিফলে যায়নি কারণ ভারতবর্ষ যে একদিন স্বাধীনতা পাবে আপনাদের আত্মত্যাগ সেটা নিশ্চিত করেছে। সেই আত্মত্যাগ সারা পৃথিবীর ভারতীয়দের মনে চিরদিন অনুপ্রেরণা জাগাবে। ভবিষ্যতের প্রজন্ম আপনাদের নাম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে, ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে আপনাদের অবদানের কথা এবং আপনাদের সাফল্যের কথা তারা সগর্বে উল্লেখ করবে। আমাদের দেশের ইতিহাসে এই অচিন্তনীয় সংকটকালে আমার শুধু একটা কথাই বলার আছে আপনাদের উদ্দেশ্যে। আমাদের এই সাময়িক ব্যর্থতায় আপনারা বিষণ্ণবোধ করবেন না। মনোবল হারাবেন না এবং আপনাদের আত্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখবেন। সর্বোপরি, ভবিষ্যতে ভারতের স্বাধীন অস্তিত্ব সম্পর্কে মনের মধ্যে যেন সন্দেহের কোনও অবকাশ না থাকে। পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যা ভারতবর্ষকে চিরদাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে পারে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে এবং সেইদিন আসন্ন।

জয় হিন্দ

১৫ আগস্ট, ১৯৪৫

সুভাষ চন্দ্র বসু

---

১. নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহালয় থেকে।

পত্রাবলী

হিকারি কিকানের প্রতি

হিকারি কিকান সমীপেষু
গোপনীয়

একতা-বিশ্বাস-ত্যাগ
ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ প্রধান কার্যালয়
পি ও বক্স নং ৮২, ৭ চ্যাম্পেরি লেন,
টেলিগ্রাম – জয়ভারত
সায়োনান
ফোন 31505
২৬ আগস্ট, ১৯৪৩

রেফারেন্স HQ/HK/137
দি হেডকোয়ার্টার্স
হিকারি কিকান
সায়োনান

মাননীয় মহোদয়গণ,

হিকারি কিকানের মাধ্যমে জাপানের ইমপিরিয়াল আর্মির কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমরা মাঝে মাঝে অর্থ ও সরঞ্জামের যে সাহায্য পেয়েছি ও যা আমরা ভবিষ্যতেও পেতে থাকব তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের একান্ত ইচ্ছা সেই সাহায্য আমরা এক বন্ধু রাষ্ট্রের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ হিসাবে গণ্য করব এবং স্বাধীন ভারতের সরকার সেই ঋণ স্বীকার করে তা পরিশোধ করে দেবে। সেই কারণে আমি অনুরোধ করব সরঞ্জামের এই ঋণ যা আমাদের দেওয়া হয়েছে তা যেন একটি খাতে রাখা হয়—'ভারতের খাত'—এবং সেই খাতের সুদেরও যেন হিসাব রাখা হয়।

যখন স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার গঠিত হবে এবং তা যখন জাপানের ইমপিরিয়াল সরকারের স্বীকৃতি পাবে, তখন পূর্ব এশিয়ার ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগকে দেওয়া এই সাহায্য স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারের ঋণ বলে গণ্য করা হবে—এবং সেই ঋণ স্বাধীন ভারতের সরকার পরিশোধ করবে।

এইমত ব্যবস্থা অনুমোদিত হলে আমি তার জন্য বাধিত থাকব।

বিনীত,
সুভাষ চন্দ্র বসু
প্রেসিডেন্ট,
ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ
পূর্ব এশিয়া

শিশির কুমার বসুর প্রতি[১]

ARZI HUKUMATE AZAD HIND
(THE PROVISIONAL GOVERNMENT OF FREE INDIA)

Unity-Faith-Sacrifice
The Indian Independence League

Chancery Lane
Syonan
Sri Sri Kali Puja
29 October, 1943

পত্রবাহক বিশেষ জরুরি কাজে দেশে যাচ্ছেন। আমার বন্ধু, সহকর্মী ও সমর্থকেরা তাঁর সাহায্য করলে আমি বিশেষ বাধিত ও সুখী হব।

বিনীত,
সুভাষ চন্দ্র বসু[২]

Unity-Faith-Sacrifice
The Indian Independence League

প্রতিমা পালের মা ও বাবার প্রতি[৩]

রেঙ্গুন
২২.১.৪৪

প্রীতিভাজনেষু,

আজ দুই সপ্তাহ হইল আমি আমার "হেড কোয়ার্টার" লইয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছি। অতঃপর এখানে থাকিব। আমি "[অস্পষ্ট] থেকে" আপনাকে টেলিগ্রাম দিয়াছিলাম; জানি না সেই টেলিগ্রাম আপনার হস্তগত হইয়াছে কিনা। সেই টেলিগ্রামে আমি লিখিয়াছিলাম যে আপনার অনুরোধমত, আপনার পরিবারবর্গের থাকার ব্যবস্থা করা হইতেছে। আমি এখানে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়াছি। অতঃএব এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আপনার ভ্রাতা আমাদের 'সংগঠন বিভাগে' শ্রীযুক্ত [অস্পষ্ট] অধীনে কাজ করিতেছেন। পত্রের উত্তর দেবেন। আপনাদের দুজনের বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছি। ভগবান আপনাদের সহায় হউন, আপনাদের মহান ব্রত সফল হউক, এই কামনা সর্ব্বদা করি।

আপনার শুভার্থী—
শ্রী সুভাষ চন্দ্র বসু

---

১. পেনাঙের সাবমেরিন থেকে পাঠানো নেতাজির এই চিঠিটি শিশির কুমার বসুর হাতে তুলে দেন একটি গুপ্ত দলের দলপতি "টি. কে. রাও"। ১৯৪৫ সালে যুদ্ধাবসানের পরে "ইন্দো-বর্মা যুদ্ধক্ষেত্র" থেকে নেতাজির নিজের হাতে লেখা আরেকটি অনুরূপ চিঠিও আর একজন গুপ্ত এজেন্ট শিশির কুমার বসুর হাতে দিয়েছিলেন যা তিনি ১৯৪৪ সালে দিতে পারেননি। প্রথম চিঠিটি ১৯৪৪ সালে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় চিঠিটি নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহালয়ে রাখা আছে।

২., ৩. পত্রের বানান ও অন্যান্য প্রতিলিপি মূলানুগ রাখা হল।

ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি

সায়োনান

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

রেঙ্গুন
১৩.৩.৪৪

মাননীয় ব্রহ্মচারীজি,

আপনার লেখা চিঠিগুলির (তিনটি, আমার ধারণা) জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনি যে এতটা ঔৎসুক্য দেখিয়েছেন সেটাতে আপনার মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

অনুগ্রহ করে স্বামীজিকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবেন এবং আপনিও জানবেন।

এখানকার কাজের চাপ ক্রমাগতই বাড়ছে— এবং দিনে-রাতে কাজ করেও আমি সবদিক সামলাতে পারছি না।

আশা করছিলাম যে অল্পদিনের জন্য সায়োনানে আসতে পারব—কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেটা আর সম্ভব হল না।

পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের অনুকূলে এবং সেইজন্যই আমাকে এখানে থাকতে হচ্ছে।

কোনও বই আমার জন্য উপযুক্ত মনে করলে অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠাবেন। আশাকরি স্বামীজি ও আপনারা সকলে ভাল আছেন।

জয় হিন্দ
সুভাষ চন্দ্র বসু

ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি

সায়োনান

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

বর্মা
১৮.৩.৪৪

মাননীয় ব্রহ্মচারীজি,

৭ মার্চ তারিখে লেখা আপনার সস্নেহ চিঠি ও বই যা লেফটেন্যান্ট কর্নেলের হাতে আপনি পাঠিয়েছেন, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাই।

আমার জন্য কোনও চিঠি থাকলে আপনি অনুগ্রহ করে লেফটেন্যান্ট কর্নেল আলাগাপ্পান বা অন্য যে কেউ লীগ রিয়ার হেডকোয়ার্টার্সের দায়িত্বে আছেন, তাঁদের হাতে দেবেন।

পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, বিশেষভাবে সেই কারণেই আমরা এখানে অসম্ভব ব্যস্ত।

অনুগ্রহ করে স্বামীজিকে আমার সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছা জানাবেন ও আপনিও গ্রহণ করবেন।

জয় হিন্দ
সুভাষ চন্দ্র বসু

ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি
সায়োনান
ব্যক্তিগত ও গোপনীয়

সদর দফতর আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

১৬.৪.৪৪

জয় হিন্দ,

রেঙ্গুনে চিঠি পাঠাবার একটা সুযোগ পেয়েছি এবং সীমানা অতিক্রম করবার আগে দুই এক লাইন লেখার এই সুযোগ আমি নিচ্ছি। কারণ একবার সীমানা অতিক্রম করে গেলে জানি না আবার কবে আপনাদের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করতে পারব।

যুদ্ধক্ষেত্রের খবর খুবই ভাল—সব মিলিয়ে— এবং সকলের মনোবলও তুঙ্গে।

অনুগ্রহ করে স্বামীজিকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন ও আপনিও গ্রহণ করবেন।

আমাদের সেনারা ছাড়াও সায়োনান ও রেঙ্গুনের পুনর্গঠন বিভাগ থেকে আরও বহু বহু লোক এগিয়ে এসে যোগ দিচ্ছে। স্বাধীন ভারতে আমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হব। আজ়াদ হিন্দ জিন্দাবাদ!

জয় হিন্দ
সুভাষ চন্দ্র বসু

লেফটেন্যান্ট এম. সত্যবতী থেভরের প্রতি
পিজেআর/৪/এম

আই এন এ সদর দফতর, আলা কামান
আজ়াদ হিন্দ ফৌজ
(হেডকোয়ার্টার্স, সুপ্রিম কমান্ড, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি)

হেডকোয়ার্টার্স
বর্মা
১৪ মে, ১৯৪৪

লেফটেন্যান্ট থেভর
ঝাঁসি রানি বাহিনী
সায়োনান

'জয় হিন্দ'

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়োনান ছেড়ে যাবার পর এই প্রথম আমি আপনার কাজের প্রতি নজর দিতে পেরেছি এবং গভীর ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমি আপনার কাজ লক্ষ করেছি। আপনার যোগ্যতার স্বীকৃতস্বরূপ আপনাকে লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত করতে পেরে আমি আনন্দিত বোধ করছি। ভবিষ্যতে ঝাঁসি রানি বাহিনীর পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে আমি কিছু নতুন আদেশ পাঠাচ্ছি। আপনি দেখবেন যে এই আদেশগুলির মাধ্যমে আমি শিবিরে নিয়মশৃঙ্খলার বাঁধন আরও জোরালো করতে চাইছি। আমি চাই শিবিরের ভিতরে দর্শনার্থী আসবার ও স্বেচ্ছাসেবীদের শিবিরের বাইরে যাবার অনুমতি দেবার বিষয়ে আপনি বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন। আমি খেয়াল করেছি যে রেঙ্গুনে একেবারে প্রথমদিক থেকেই স্বেচ্ছাসেবীদের রবিবার বাড়িতে যাবার অনুমতি দেওয়া হত এবং তার ফলে সায়োনানের তুলনায় নিয়মানুবর্তিতায় ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে সায়োনানে অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবীরাই শহরের বাইরের। সায়োনানের শহরের ভিতরকার স্বেচ্ছাসেবীদের বিষয়ে আমি আপনার উপরে সিদ্ধান্ত নেবার ভার দিলাম। প্রয়োজন মনে করলে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাদের বাইরে যাবার উপরে আপনি আরও বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ তারিখে লেখা যে প্রতিবেদন আপনি পাঠিয়েছেন আমি তা মনোযোগ সহকারে পড়েছি।

কয়েকটি বিষয়ে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

১. স্বেচ্ছাসেবীদের পাহারাদারির কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া ভাল। শুরুতে তারা রাতে শিবিরের মধ্যে পাহারা দেবার কাজ করতে পারে। ধীরে ধীরে সময় উপযুক্ত হলে, তারা দিনেরবেলায় শিবিরের ফটকের বাইরেও পাহারা দিতে পারবে।

২. কোনও ব্যক্তিবিশেষের নাম অনুসারে পল্টনের নাম দেওয়া আমি অনুমোদন করি না। আমি চাই এই পদ্ধতিতে নামকরণ আপনি বন্ধ করুন এবং তার পরিবর্তে সংখ্যা ব্যবহার করা শুরু করুন।

৩. সম্ভব হলে অনুগ্রহ করে প্রতি দুই সপ্তাহ অন্তর ওজন নেবার ব্যবস্থা করবেন। এর দ্বারা আপনি স্বেচ্ছাসেবীদের স্বাস্থ্যের প্রতি আরও ভাল নজর রাখতে পারবেন।

স্বেচ্ছাসেবীরা রান্না ও ঘর-গৃহস্থালীর কাজে অনাবশ্যক সময় অপচয় করুক সেটা আমি চাই না। সেসব কাজ তারা নিজের বাড়িতে অনেক করেছে। সামনে যে কর্তব্য আছে, শিবিরে থাকাকালীন তাদের সেই কাজেই মনোনিবেশ করা উচিত হবে। সুতরাং যখনই আপনি কোনও বিশ্বাসযোগ্য রাঁধুনি পাবেন তখন আমি চাই যে আপনি তাকে কাজে লাগাবেন।

৫. এনসিও-দের প্রশিক্ষণ দেবার জন্য যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে আমি বিশদভাবে জানতে ইচ্ছুক।

এই চিঠি পাবার পর অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে সর্বাধুনিক পরিস্থিতির একটা সমীক্ষা পাঠাবেন। বিশেষভাবে বাহিনী বর্তমানে কতটা শক্তিশালী সেই বিষয়ে আমি জানতে চাই। পদোন্নতির ব্যাপারে আপনি যদি কারুর নাম সুপারিশ করতে চান তা হলে অনুগ্রহ করে প্রতিবেদনের সঙ্গে সেই নামগুলিও আমাকে পাঠাবেন। স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য যে খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে তা সন্তোষজনক কিনা সেটাও আমি জানতে চাই। সায়োনানে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের রিয়ার হেডকোয়ার্টার্স ও আজ়াদ হিন্দ ফৌজের রিয়ার হেডকোয়ার্টার্স থেকে আশাকরি আপনি সর্বপ্রকার সাহায্য পাচ্ছেন। আমি শ্রী জে এ থিভি ও কর্নেল ভোঁসলেকে বলেছি আপনার যা যা সাহায্য প্রয়োজন সবকিছু যেন তাঁরা আপনাকে দেন। আমি বিশেষভাবে কর্নেল ভোঁসলেকে বলছি, তিনি যেন এনসিও-দের প্রশিক্ষণের বিষয়টা তদারক করেন ও বাহিনীর অফিসারদের জন্য আরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

কাজের অগ্রগতি কেমন হচ্ছে সেই বিষয়ে আমি ভবিষ্যতে আপনার কাছ থেকে একটি মাসিক তথ্য পেতে চাই।

বর্মাদেশে প্রথম সৈন্যবাহিনী পাঠাবার ব্যাপারে দেরি হবার জন্য আমি অত্যন্ত আশাহত। আমার দিক থেকে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং যানবাহনের ব্যবস্থাও করেছি কিন্তু এ পর্যন্ত ভাগ্য আমাদের সহায় হয়নি। তবে আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে বর্মাতে তাদের আনবার ব্যবস্থা করা যাবে।

এই চিঠির সঙ্গে বাহিনীর সদস্যদের জন্য আমি একটা ছোট বার্তা পাঠাচ্ছি যা আমি চাই বিভিন্ন ভাষায় আপনি তাদের পড়ে শোনাবেন।

আপনার কাজের সাফল্যের জন্য আমার শুভেচ্ছাসহ,

জয় হিন্দ

সুভাষ চন্দ্র বসু

ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি
সায়োনান

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

বর্মাদেশ
১৮.৬.৪৪

জয় হিন্দ!

সবে মাত্র আমি ব্যাঙ্কক থেকে এখানে এসে পৌঁছেছি। পথে কোনও কষ্ট হয়নি। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, এর বেশি কিছু লেখার নেই। আমাদের সম্মুখে রয়েছে কঠিন যুদ্ধ— অবশ্যই আমি সেই অবস্থার জন্য প্রস্তুত।

আজ আপনাকে চিঠি লেখার একটা সুযোগ পেয়েছি।

আশাকরি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কাজকর্মের একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা হবে। আমি আশা করছি অনাথ আশ্রমের জন্য আপনি ও স্বামীজি সবরকমের সাহায্য পাবেন, যা এই কাজের জন্য প্রয়োজন।

স্বামীজিকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাবেন ও আপনিও গ্রহণ করবেন।

জয় হিন্দ
সুভাষ চন্দ্র বসু

লেফটেন্যান্ট সত্যবতী থেভরের প্রতি

আই এন এ
সদর দপ্তর, আলা কামান
আজ়াদ হিন্দ ফৌজ
(হেড কোয়ার্টার্স, সুপ্রিম কমান্ড,
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি)

১৮ জুন ১৯৪৪

লেফটেন্যান্ট এম এস থেভর
কমান্ডান্ট, ঝাঁসি রানি প্রশিক্ষণ শিবির
সায়োনান

জয় হিন্দ

আপনার ১৫ জুন তারিখে লেখা চিঠি আমি পেয়েছি যা আপনি আমার সহকারীর হাতে পাঠিয়েছেন এবং যাতে আপনি পদোন্নতির জন্য কিছু সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন। আশা করছি ঝাঁসি বাহিনী এখানে আগামী দুই বা একদিনের মধ্যে এসে পৌঁছবে। তারা এসে পৌঁছবার পরে আমি বিষয়টা বিশদভাবে চিন্তা করে দেখব এবং ঝাঁসির রানি বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে পদোন্নতির ব্যাপারে অর্ডার দেব।

সায়োনান ছাড়বার আগে কর্নেল ভোঁসলে ও শ্রীথিভির সঙ্গে আমি কথা বলেছি। কর্নেল ভোঁসলেকে আমি সায়োনানের ঝাঁসির রানি বাহিনীর প্রশিক্ষণের বিষয়টি তদারক করবার জন্য বলেছি। আমি চাই যে তিনি অফিসার ও এনসিওগণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়াও বাহিনীর স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের জন্য আমি তাঁকে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে বলেছি। স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের এই প্রশিক্ষণ এই একই শিবিরে হবে অথবা অন্য একটি বিশেষ শিবিরে করা হবে কিনা সেই বিষয়টি চিন্তা করে দেখতে হবে। স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের প্রশিক্ষণের জন্য অন্য একটি বিশেষ শিবির পাওয়া বা গড়ে তোলার কাজটি সহজ হবে না। সুতরাং স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপকে বর্মা পাঠাবার সম্ভাবনাটিও হয়তো বিবেচনা করে দেখতে হতে পারে।

কর্নেল ভোঁসলেকে আমি ইতিমধ্যেই জানিয়েছি যে চিফ ইন্সট্রাক্টর তার কাজ সুষ্ঠুভাবে করছেন না ও তাঁকে সেই পদ থেকে সরাতে হবে।

প্রশিক্ষণ ছাড়া ঝাঁসির রানি বাহিনীর অন্যান্য বিষয়গুলি আগের মতোই শ্রীথিভি পরিচালনা করতে থাকবেন।

আশাকরি স্বেচ্ছাসেবীদের শিবিরের বাইরে যাবার অনুমতি দেবার এবং শিবিরের ভেতরে সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে আপনি আরও কড়া নিয়মশৃঙ্খলা আনতে পারবেন। অনুগ্রহ করে আপনি আপনার বাহিনীর সব মেয়েদের "জয় হিন্দ সাহেব" না বলে শুধু "জয় হিন্দ" বলে সম্বোধন করতে বলবেন।

আপনাকে আমি যা মুখেও বলেছি, আমি চাই আপনি আপনার সহকারীদের উপরে যতটা সম্ভব কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিজে বাহিনীর প্রশিক্ষণের বিষয়টিতে মনোযোগ দিন। নিজের

প্রশিক্ষণের বিষয়েও আপনাকে আরও মনোযোগ দিতে হবে। এবং মনে রাখবেন যে প্রকৃত নেতা তিনিই— যিনি শুধু যে নিজে পরিশ্রম করেন তাই নয়, অন্যদের কাছ থেকেও যিনি যথাসম্ভব বেশি কাজ আদায় করে নিতে পারেন।

মালয়ের প্রধান শহরগুলি যেখানে ট্রেনে করে যাতায়াত সম্ভব সেখানে প্রচারের কাজ করবার জন্য আপনার বাহিনী থেকে একটি দলকে পাঠাবার বিষয়টা শ্রীথিভির সঙ্গে অনুগ্রহ করে আলোচনা করবেন। এই দলের সঙ্গে যারা যাবে তারা যেন প্রত্যেকে নিজের রাইফেল নিয়ে যায়। শ্রীমতী লুকসমেয়া ও অন্যান্য মহিলারা যে সফরগুলি করছেন তা ছাড়াও এই প্রচারের কাজ করতে হবে।

অনেক শুভেচ্ছাসহ, জয় হিন্দ।

সুভাষ চন্দ্র বসু
সর্বাধিনায়ক
আজ়াদ হিন্দ ফৌজ

আর কে শেখরণের প্রতি

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

১৮ জুন ১৯৪৪

শ্রীআর কে শেখরণ
টোকিও

'জয় হিন্দ'

তোমার চিঠি পেয়ে এবং তুমি যে খুব ভালভাবে তোমার পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ সেকথা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। জাপানে থাকার সময়টা যতটা সম্ভব কাজে লাগাবার এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের মাতৃভূমির একজন সুযোগ্য সন্তানরূপে ফিরে আসবার যে সংকল্প তুমি নিয়েছ তা আমাকে অপরিসীম আনন্দ দিয়েছে। তুমি যে প্রশিক্ষণের জন্য জাপানে গেছ তা তোমাকে একজন পরিপূর্ণ সৈনিকে পরিণত করবে এবং দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষার কাজে একদিন তুমি নিযুক্ত হবে। যতদিন না তুমি নিজে সেই কাজে যোগ দিতে পারছ ততদিন আজ়াদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সেনানী যারা আরাকান, কালাদান, ইম্ফল ও কোহিমার রণক্ষেত্রে লড়াই করছে তাদের বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগ তোমাকে অনুপ্রেরণা জোগাবে ও সারাজীবন ধরে তুমি তাদের উদাহরণ অনুসরণ করতে থাকবে।

তুমি এখনও তোমার কৈশোর অতিক্রম করোনি কিন্তু তবুও তুমি তোমার ঘর ছেড়ে, তোমার মা বাবা, ভাই বোন সকলকে ছেড়ে হাজার মাইল দূরের দেশ জাপানে গেছ ও আগামী কয়েক বছর তুমি সেখানেই কাটাবে। অনেক দূরদেশে থাকলেও সর্বদাই কিন্তু তুমি আমার মনের খুব কাছে আছ।

সায়োনানে যখন তোমার সঙ্গে দেখা হল তখন তোমাকে অনেক কথাই আমার বলার ছিল। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে হবে সেই চিন্তাই আমাকে এমন উদ্বেল করল যে আমি কিছুই বলতে পারলাম না। তুমি চলে যাবার আগে মার্চ মাসে আরেকবার আমি সায়োনানে যেতে চেয়েছিলাম তোমাকে বিদায় জানাবার জন্য— কিন্তু তখন ভারত-বর্মা সীমান্তে যে সামরিক ব্যস্ততা চলছিল তার জন্য সম্ভব হল না। ভবিষ্যতে আমাকে হয়তো তোমার কাছ থেকে ক্রমশই আরও দূরে চলে যেতে হবে এবং হয়তো তোমাকে চিঠিও লিখতে পারব না। কিন্তু, স্নেহের শেখরণ, তুমি যখনই পারবে আমাকে চিঠি লিখো। আমি যেখানেই থাকি না কেন তোমার কথা আমার মনে থাকবে ও সবসময়েই আমি তোমার সাফল্য কামনা করতে থাকব।

জাপানে থাকাকালীন আশাকরি তুমি রোজই আমাদের জাতীয় সংগীত গাইতে থাকবে। এবং প্রতিদিন সকালে ও রাতে প্রার্থনা করবে যাতে তুমি ভারতমাতার এক সুযোগ্য সন্তান হয়ে উঠতে পারো।

জয় হিন্দ
সুভাষ চন্দ্র বসু
সর্বাধিনায়ক
আজ়াদ হিন্দ ফৌজ

সিংহল দপ্তরের সেক্রেটারির প্রতি

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

রেঙ্গুন,
২১ জুন ১৯৪৪

সেক্রেটারি, সিংহল দপ্তর
রিয়ার হেড কোয়ার্টার্স, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ,
সায়োনান

জয় হিন্দ,

ব্যাঙ্কক থেকে লেখা আপনার ১৪ তারিখের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করে আপনাকে আমি ১৮ তারিখে লিখেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আপনার আগে লেখা চিঠিগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়নি।

আপনার আগের চিঠিগুলি, যথাক্রমে ২৭ এপ্রিল, ২৮ এপ্রিল এবং ১২ মে তারিখে লেখা আমি যথাসময়েই পেয়েছিলাম।

সিংহলের শহুরে বাবুদের বিষয়ে, আমাদের প্রধানত যা বিবেচনা করে দেখতে হবে সেটা হল তারা নিজেদের সেই দেশেরই নাগরিক বলে মনে করে কিনা এবং তাদের বিশ্বাস করা যায় কিনা। তারা যদি তাই মনে করে এবং তাদের যদি বিশ্বাস করা যায়, তা হলে তাদের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগে যোগদানে কোনও আপত্তি নেই। আপনাকে শুধু সতর্ক থাকতে হবে তারা যেন কোনও গোপন অভিসন্ধি নিয়ে না আসে— অর্থাৎ আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে খবরাখবর অন্যত্র পাচার করবার উদ্দেশ্য নিয়ে না আসে।

গোপন কাজকর্মের বিষয়ে, আপনাকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগে জনসংযোগের কাজে সিংহলের শহুরে বাবুদের যোগদানের অনুমতি দিলেও, তাদের কোনওমতেই আমাদের গোপন বিপ্লবী কাজের মধ্যে সহজে প্রবেশাধিকার দেওয়া যাবে না। এই ব্যাপারে আপনি আপনার হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হবেন না এবং অবশ্যই অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

আমাকে অনেক সময়েই একটা প্রশ্ন করা হয়েছে, যে প্রশ্নের উত্তর আমি আজ এখানে দিতে চাই। ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের সিংহল দপ্তরে কোনও সিংহলিকে কাজ করতে বাধ্য করা হয় না, যদি সে সেখানে কাজ করতে না চায়। সে যদি চায়, তা হলে সে ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের অন্য কোনও দপ্তরে কাজ করতেই পারে। অনুরূপভাবে একজন ভারতীয়, যদি সে তাই চায়, তা হলে সে সিংহল দপ্তরে যোগ দিতে পারে এবং সে লঙ্কা বিভাগে কাজ করতে পারে, যদি লঙ্কার কাজেই মনোনিবেশ করবার জন্য তার বিশেষ আগ্রহ থাকে। অতএব, কোনও সিংহলী যদি আমাদের সেনাদলে যোগ দিতে চায়, তাকে লঙ্কা বিভাগে যোগ দিতে বাধ্য করা হবে না—যদি না সে সেই বিভাগে বেছে নেয়।

আমার শেষ চিঠিতে, আপনাকে আমি মেজর স্বামীর সঙ্গে, আজ়াদ স্কুলের প্রশিক্ষণের পরে লঙ্কার যুবকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করতে অনুরোধ করেছিলাম। আশাকরি মেজর স্বামী সায়োনান ছেড়ে চলে যাবার আগে আপনি এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে আমি একটা বিষয়ে জোর দিতে চাই। বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের অবশ্যই সবথেকে ভাল সেনানী বেছে নিতে হবে। আমরা কতজনকে নেব তা এই আলোচনার বিষয়বস্তু হবে না, যাদের নেব তারা যেন সবার সেরা হয়। সুতরাং আজ়াদের স্কুল থেকে আসা সব ছেলেদের এই বিশেষ প্রশিক্ষণে নেবার জন্য ব্যস্ততা দেখাবেন না, যদি না তারা মানসিকভাবে এই প্রশিক্ষণ পাবার যোগ্যতা দেখাতে পারে। সেনাদলে যোগ দিয়ে লড়াই করবার থেকে বিপ্লবী কাজকর্মে রত হওয়া অনেক বেশি কঠিন এবং এই কাজে আরও অনেক বেশি সাহস ও বীরত্বের প্রয়োজন। মেজর স্বামী আমাকে বলেছিলেন যে পেনাঙের সব ছেলেদের ঠিক এই মাপের যোগ্যতা নেই।

আপনাদের কাজে সাফল্যের জন্য অনেক শুভেচ্ছা রইল ও সকলকে আমার হার্দিক অভিনন্দন জানাই। জয় হিন্দ।

সুভাষ চন্দ্র বসু

লেফটেন্যান্ট সত্যবতী থেভরের প্রতি

সদর দপ্তর, আলা কামান
আজ়াদ হিন্দ ফৌজ
(হেড কোয়ার্টার্স, সর্বাধিনায়ক
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি)

গোপনীয়

রেঙ্গুন
২১ জুন ১৯৪৪

লেফটেন্যান্ট এম এস থেভর
কমান্ডান্ট, ঝাঁসি রানি প্রশিক্ষণ শিবির
সায়োনান

জয় হিন্দ,

আমি এই চিঠির সঙ্গে একটা বিজ্ঞপ্তির কপি পাঠাচ্ছি যা আমি কিছুদিন আগে পাঠিয়েছিলাম এবং হয়তো আপনার কাছে বিজ্ঞপ্তিটা পৌঁছয়নি।

আমি এখান থেকে ১৮ জুন তারিখে যে চিঠি পেয়েছিলাম আশাকরি আপনি সেই চিঠি পেয়েছেন।

আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে ঝাঁসী বাহিনী এখানে আজ নিরাপদে এসে পৌঁছেছে এবং পথে তাদের কোনও অসুবিধা হয়নি। আমার নির্দেশ অনুসারে আইএনএ-র ক্যাপ্টেন লী থাইল্যান্ড থেকে দলটির সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং রেঙ্গুনের ঝাঁসি প্রশিক্ষণ শিবিরের পরিচালক মুলমেইনে এসে দলটির সঙ্গে দেখা করেন। তারা সকলেই দারুণ ভাল মেজাজে আছে।

সায়োনানে থাকাকালীন আমার কাছে তথ্য এসেছিল যে আপনি বাহিনীর ব্যবহারের জন্য একটা গাড়ি চেয়েছিলেন। আমি এই বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি যে কেবলমাত্র বাহিনীর ব্যবহারের জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। যখনই আপনার গাড়ির প্রয়োজন হবে আপনি রিয়ার হেডকোয়ার্টার্সে টেলিফোন করলে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করবে আপনার অনুরোধ রাখার।

মেয়েদের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকবে আপনার কাজ উত্তরোত্তর কঠিন হতে থাকবে। সর্বোপরি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা ভিন্ন ভাষাভাষী মেয়েদের সঙ্গে আপনাকে সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য ভূমিকা নিতে হবে। এছাড়া আপনার অধীনে যেসব মেয়েরা থাকবে তাদের প্রতি আপনি একাধারে যেমন বন্ধুর মতো ব্যবহার করবেন তেমনই আপনাকে নিয়মশৃঙ্খলাও বজায় রাখতে হবে কঠোর হাতে। কাজটা কঠিন এবং এর জন্য আপনাকে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করতে হবে ও মনোযোগও দিতে হবে।

আমি আবারও আপনাকে মনে করিয়ে দেব যে, যে কাজ অন্য কেউ করতে পারবে সেই কাজগুলি নিয়ে আপনি নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন না। আপনাকে প্রশিক্ষণের কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে হবে—শিবিরে যে মেয়েরা আছে তাদের প্রশিক্ষণ ও আপনার নিজের প্রশিক্ষণের কাজে। প্রশিক্ষণ শিবিরের দায়িত্ব আপনার কাঁধে, আপনি একটা বোর্ডিং হাউজের ম্যানেজার নন। সর্বোপরি আপনার সামরিক দায়িত্বগুলি আপনি কীভাবে পালন করছেন তার উপরে আপনার নিজের পদোন্নতিও নির্ভর করবে।

শিবিরের গৃহস্থালীর কাজগুলি করবার জন্য একজন বয়স্ক মহিলাকে নিয়োগ করা যায় কিনা সেই বিষয়টাও চিন্তা করা প্রয়োজন, কারণ তা হলে এখন যারা এই কাজগুলি করছে তাদের তা থেকে অব্যাহতি দেওয়া যাবে। আপনি যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হন তা হলে লীগ হেডকোয়ার্টার্সকে আমি বলব তেমন একজন মহিলার সন্ধান করতে।

প্রশিক্ষণ ছাড়া ঝাঁসির রানি বাহিনীর অন্যান্য বিষয়গুলি আগের মতোই শ্রীথিভি পরিচালনা করতে থাকবেন। অনেক শুভেচ্ছাসহ,

জয় হিন্দ।

সুভাষ চন্দ্র বসু

লেফটেন্যান্ট এম সত্যবতী থেভরের প্রতি

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

গোপনীয়

বর্মা
৪ আগস্ট, ১৯৪৪

লেফটেন্যান্ট থেভর
কমান্ডান্ট,
ঝাঁসির রানি প্রশিক্ষণ শিবির
সায়োনান

'জয় হিন্দ'

আগামীকাল সকালে বিমানযোগে সায়োনানে চিঠি পাঠাবার একটা সুযোগ এসেছে, তাই একটু তাড়াহুড়োর মধ্যেই এই চিঠি লিখছি। কয়েকদিন আগে আমি আপনার চিঠি পেয়েছি যথাসময়ে। আশাকরি কাজ এগোচ্ছে সন্তোষজনকভাবে এবং ভবিষ্যতে আরও নতুন শিক্ষার্থীরা যোগ দিতে থাকবে। অনুগ্রহ করে সকল অগ্রগতির বিষয়ে আমাকে অবহিত রাখবেন। সায়োনানের বাহিনীর সকলে এখানে ভাল আছে। তাদের আরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শুধুমাত্র নার্সদের পাঠানো হয়েছে আমাদের একটি হাসপাতালে কাজ করবার জন্য।

অনেক শুভেচ্ছাসহ,

জয় হিন্দ
সুভাষ চন্দ্র বসু

পুনশ্চ: আশাকরি আপনি নিজেও উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। উচ্চতর পদে পদোন্নতি করতে হলে এটা আপনার প্রয়োজন হবে।

সু চ ব

লেফটেন্যান্ট এম সত্যবতী থেভরের প্রতি
ব্যক্তিগত ও গোপনীয়

আইএনএ
সদর দপ্তর, আলা কামান
আজ়াদ হিন্দ ফৌজ
(সদর দপ্তর, সর্বাধিনায়ক, ভারতীয় জাতীয় বাহিনী)
বর্মা
১৯ আগস্ট, ১৯৪৪

ক্যাপ্টেন এম এস থেভর
কমান্ডান্ট,
ঝাঁসির রানি বাহিনী শিবির
সায়োনান

জয় হিন্দ!

ঝাঁসির রানি বাহিনীতে সাম্প্রতিক পদোন্নতির বিষয়ে আদেশগুলি আপনি এই চিঠির সঙ্গে পাবেন। আপনাকে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত করতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। শিবিরের কমান্ডান্ট হিসাবে আপনি যে চমৎকার কাজ করেছেন এটা তারই স্বীকৃতি। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা কথা আমি আপনাকে খোলাখুলি বলব। আমি দেখতে চাই যে ঝাঁসির রানি বাহিনীর অফিসারেরা ঠিক আইএনএ-র অফিসারদের মতোই দক্ষ অফিসার হবেন, যাতে কারওর এমন কথা ভাবার কোনও যুক্তি না থাকে যে, ঝাঁসির রানি বাহিনীতে পদোন্নতি হওয়া সহজ। কঠোর সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আপনি এখনও ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হবার মতো যোগ্যতা অর্জন করেননি কিন্তু আমি আশা করব যে আপনি সেই যোগ্যতা অর্জন করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। যখন সায়োনানে গিয়েছিলাম তখন আপনাকে আমি বলেছিলাম যে একজন ভাল ম্যানেজার হওয়াতেই আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। আপনাকে একজন দক্ষ সামরিক অফিসারও হতে হবে। আপনার নিজের প্রশিক্ষণের জন্য আরও বেশি সময় দিতে হলে আপনার সহকারীদের মাঝে কাজগুলি ভাগ করে দিতে হবে। আমি লক্ষ করেছি যে অতিরিক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিজের হাতে রেখে দেবার একটা প্রবণতা আপনার আছে। একটা কথা মনে রাখবেন যে, একজন দক্ষ পরিচালক শুধু যে নিজেই কঠোর পরিশ্রম করেন তা নয়, তিনি অন্যদের কাছ থেকেও কঠোর পরিশ্রম আদায় করে নেন। শুধু তাঁর নিজের কাজ দিয়ে নয়, সামগ্রিকভাবে তাঁর পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে কতটা কাজ পাওয়া যাচ্ছে তা থেকেই একজন পরিচালকের যোগ্যতার বিচার হয়।

বাহিনীর তামিলভাষী মেয়েদের প্রতি আপনি বেশি পক্ষপাত দেখিয়ে থাকেন, সায়োনানে থাকাকালীন আপনার বিরুদ্ধে আমি এই মর্মে অভিযোগ পেয়েছি। এই অভিযোগ যথার্থ কিনা তা আমার জানা নেই। আমি আশা করব যে আপনি এমন কিছু করবেন না যাতে কেউ আপনার বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ আনতে পারে। আমরা যৎপরোনাস্তি নিরপেক্ষ

ও পক্ষপাতশূন্যভাবে কাজ করলেও আমাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আসতে পারে, আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই এমন ঘটনা ঘটেছে। কাজেই যদি পক্ষপাতিত্বের ঘটনা ঘটে থাকে, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন, এই অভিযোগ আরও অনেক বেশি বাড়তে থাকবে।

আপনার মূল সুপারিশে আপনি রাসাম্মাকে সেপাই থেকে হাবিলদারের পদে উন্নীত করবার কথা বলেছিলেন। এই ধরনের পদোন্নতি মঞ্জুর করা যায় না এবং আমি আশা করব যে ভবিষ্যতে আপনিও এমন সুপারিশ করবেন না। গোড়ার দিকে আমাদের কয়েকজনকে খুব দ্রুত উচ্চতর পদে উন্নতির জন্য সুপারিশ করতে হয়েছিল। কিন্তু এখন বাহিনী বেশ ভালভাবে সংগঠিত হয়েছে, কাজেই এখন পদোন্নতিগুলি সাধারণ নিয়ম অনুসারে যেমন হওয়া উচিত সেই ভাবেই করতে হবে। যখনই আপনি কাউকে সেপাই থেকে সরাসরি হাবিলদারের পদে উন্নীত করবার জন্য সুপারিশ করলেন তখনই আপনি নিজের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের অভিযোগ আনার পথ প্রশস্ত করে দিলেন। এমন ঘটনা ঘটতে বাধ্য, বিশেষত এই ধরনের দ্রুত পদোন্নতির সুপারিশ করবার সময় যদি তার জন্য কোনও যথার্থ কারণ দেখানো না হয়ে থাকে। সুতরাং চিঠির সঙ্গে দেওয়া আদেশের তালিকায় আমি রাসাম্মাকে ল্যান্স নায়েক থেকে নায়েকের পদে উন্নীত করেছি। হাবিলদারের পদে পৌঁছতে হলে তাকে যথোপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

রাসাম্মা ছাড়া অন্য সকলের ক্ষেত্রেই আমি আপনার সুপারিশ অনুসারে কাজ করেছি। এবং আপনার বিচারক্ষমতার উপরে আস্থা রেখে মোটামুটি চোখ বন্ধ করেই আমি সেই কাজ করেছি। যথার্থ কারণ ছাড়া ও পক্ষপাতশূন্যভাবে করতে না পারলে সামরিক বাহিনীতে পদোন্নতি অনেক বিক্ষোভ ও অসন্তোষের কারণ ঘটাতে পারে সে কথা আপনার এতদিনে উপলব্ধি করার কথা। আশা করব ভবিষ্যতে সুপারিশগুলি করবার সময় আপনি যেন তা সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্যভাবে করতে পারেন যাতে আপনার বিচারবুদ্ধির উপরে আমাকে যেন আর কখনও অনাস্থা প্রকাশ করতে না হয়।

শিবিরে আপনি ভালভাবে নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন, সে জন্য আমি আনন্দিত। তবুও আমি মনে করি নিয়মশৃঙ্খলার আরও উন্নতি করা সম্ভব, বিশেষ করে মেয়েদের শিবিরের বাইরে যাবার বিষয়ে।

আশা করি আপনারা সকলে সুস্থ আছেন ও আপনাদের মনোবল অটুট আছে।

জয় হিন্দ

সুভাষ চন্দ্র বসু

ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি
সায়োনান

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

গোপনীয়

রেঙ্গুন
২০. ৮. ৪৪

জয় হিন্দ!

আমি শুনলাম যে আপনি আপনার দল নিয়ে থাইল্যান্ডে গিয়েছিলেন আমাদের শ্রমিকদের অবস্থার পরিদর্শনে। আমি জেনে খুশি হয়েছি। হয়তো এর মধ্যে আপনি সায়োনানে ফিরেও এসেছেন। পরিদর্শনে যে দলটি গিয়েছিল তাদের তথ্যের জন্য আমি সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। যাতায়াতের পরিশ্রম সত্ত্বেও আশা করি আপনি সুস্থ আছেন। স্বামীজিকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবেন।

আমার শরীর ভাল আছে। হয়তো আপনি ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন যে শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের কিছুটা আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা নিতে হয়েছে। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য ইম্ফল অধিকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, যার ফলে আমরা কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি। সেইজন্য আমরা পিছিয়ে এসে এমন একটা জায়গায় অবস্থান নিয়েছি যেখানে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করা সুবিধা হবে। আমরা পরবর্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

আমাদের সৈন্যেরা লড়াই করেছে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে। যতক্ষণ আমরা আমাদের এই আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে পেরেছিলাম আমরা আমাদের শত্রুদের সর্বত্র হারাতে পারতাম। শত্রুদের পরাভূত করবার পর সেই জয় আমাদের সেনাদের মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছে। আমরা দেখেছি যে শত্রুর থেকে আমরা আরও বেশি শক্তিশালী। গত ছ'মাসের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা এখন পরের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এখানে সকলের— সেনাদের এবং অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে মনোবল খুবই জোরদার। মালয়ের অধিবাসীদের মধ্যে মনোবলের ঘাটতি দেখা দিয়েছে শুনে আমার খারাপ লাগছে। কেন কেমন হল?

সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছাসহ,
জয় হিন্দ।
সুভাষচন্দ্র বসু

ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি
সায়োনান

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

বর্মাদেশ
২২. ৮. ৪৪

জয় হিন্দ!

আমি আপনাকে ক'দিন আগে লিখেছিলাম। আজ আমি শুধু এই কথা জানাবার জন্য লিখছি যে থাইল্যান্ড থেকে লেখা আপনার দীর্ঘ চিঠি আমি পেয়েছি।

পরিদর্শনের দলে যোগ দেবার কষ্ট আপনি নিয়েছেন, সেইজন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এই দীর্ঘ সফরের জন্য আশা করি আপনার স্বাস্থ্যহানি হয়নি।

সশ্রদ্ধ নমস্কারসহ
জয় হিন্দ
সুভাষচন্দ্র বসু

প্রতিমা পালের মাতাকে

ARZI HUKUMATE AZAD HIND
(THE PROVISIONAL GOVERNMENT OF FREE INDIA)

বর্মা
২২. ৮. ৪৪

সবিনয় নিবেদন

জয়হিন্দ!

প্রতিমার নিকট হঠাৎ একদিন তার পিতৃ বিয়োগের কথা জানিলাম। আপনার এবং পরিবারবর্গের অন্যান্য সকলের জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত হইয়াছি। আপনারা আমার আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ করুণ। এই বিপদের দিনে ভগবানই আপনাদের সান্ত্বনা ও সহ্য করিবার শক্তি দিন— ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

প্রতিমাকে আমি সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহাকে বলিয়াছি যে তাহার পিতা যখন স্বেচ্ছায় তাকে দেশের সেবার জন্য তুলিয়া দিয়াছেন— তখন তাহাকে প্রকৃত বীরের মতো

সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইবে। প্রতিমা ভাল মেয়ে— সে বুঝিয়াছে। সে নিজেকে সামলাইয়াছে। তাহার একমাত্র চিন্তা আপনার জন্য শঙ্কা। যদি আপনার মঙ্গল সংবাদ পায়, তাহা হইলে নিজের কাজে মন দিতে পারিবে। আপনি যথা শীঘ্র আপনার কুশল সংবাদ পাঠাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

আপনি অবশ্য শুনিয়া সুখী হইবেন যে আপনার মেয়ে তার কাজে উন্নতি করিয়াছে এবং পদোন্নতি পাইয়া সে 'সাব-অফিসার (sub-officer) হইয়াছে।

আমি আশা ও ভরসা করি যে এই বিপদের মধ্যে আপনি বুক টান করিয়া থাকিবেন। আপনি ঠিক থাকিলে, আপনাকে দেখিয়া আপনার ছেলে-মেয়েরাও ঠিক থাকিতে পারিবে। করুণাময় পিতা আপনাকে শান্তি, সান্ত্বনা ও শক্তি দিবেন।

জয়হিন্দ!
বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু[১]

ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

বর্মাদেশ
১৯.১০.৪৪

জয় হিন্দ!

আমি আপনাকে এক লাইন লিখছি শুধু জানাবার জন্য যে আমি ভাল আছি। আমাদের সম্মুখ সারির সেনাদের পরিদর্শনের পর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমি সদ্য ফিরেছি। কষ্টকর পরিস্থিতিতে লড়াই এবং কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও আমাদের সেনাদের মনোবল অটুট আছে। অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যেও ভাল আত্মবিশ্বাস আছে। মালয়ের অধিবাসীরা মনোবল হারিয়ে ফেলছে জেনে আমি দুঃখিত। কিছুদিন পরে আমি হয়তো সায়োনানে যেতে পারব।

আপনি ও স্বামীজি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন।

জয় হিন্দ
সুভাষচন্দ্র বসু

---

১. বাংলায় লিখিত পত্রের বানান ও অন্যান্য প্রতিলিপি মূলানুগ রাখা হল।

আইএনএ-র শিক্ষারত সেনানীর প্রতি
টোকিও

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

ফুকুওকা,
২৯. ১১. ৪৪

স্নেহের সেনাবৃন্দ,

নিষ্পনের মাটি ছেড়ে চলে যাবার প্রাক্কালে আমি তোমাদের কাছে আমার আশীর্বাদ জানাই ও কাজে তোমাদের সাফল্য কামনা করি। আমার নিজের কোনও পুত্রসন্তান নেই— কিন্তু তোমরা আমার নিজের পুত্রের থেকেও বেশি— কারণ যে কাজে তোমরা তোমাদের জীবন উৎসর্গ করেছ— সেই কাজ হল আমার জীবনের এক ও অদ্বিতীয় লক্ষ্য— 'ভারতমাতা'র মুক্তি।

সেই কাজ ও 'ভারতমাতা'র প্রতি তোমাদের আনুগত্য যে সর্বদা অচল থাকবে সে বিশ্বাস আমার আছে।

যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা হল না, সে জন্য আমি দুঃখিত— কিন্তু তোমরা তো জানো যে মনে মনে আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি।

ঈশ্বরের আশীর্বাদ তোমাদের সহায় হোক।

জয় হিন্দ।

সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীরাম মূর্তির প্রতি
টোকিও

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

ফুকুওকা,
২৯.১১.৪৪

জয় হিন্দ,

এই চিঠির সঙ্গে আমি সেনাদের প্রতি লেখা একটা চিঠি দিলাম এবং আমি চাই যে সেটা আপনি তাদের হাতে দেবেন। খারাপ আব্‌হাওয়ার জন্য এখানে আমাদের যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়েছে, তবে আশা করছি যে আগামী কাল আমরা রওনা হতে পারব। এ ছাড়া আপনাদের বিশেষ কিছু লেখার নেই। আশা করি কাজ আগের থেকেও ভালভাবে এগোতে থাকবে।

সাধারণ কর্মীদের তরফ থেকে ছেলেদের প্রতি 'মুদ্রিত প্রার্থনা'-টি পাঠাতে ভুলবেন না। কিছু কপি হয়তো হারিয়ে যেতে পারে। সেইজন্য ওখানে আপনি আরও কিছু কপি ছাপিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন। অথবা, আমাকেও জানাতে পারেন এবং আমি সায়োনানে কিছু কপি ছাপিয়ে সেখান থেকে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। নীচে কয়েকটি কাজের বিষয় আমি উল্লেখ করলাম যে কাজগুলি আপনি করাবার ব্যবস্থা করবেন।

(ক) সেনাদের ব্যবহারের জন্য একটা ছোট পাঠাগার।
(খ) জাতীয় সংগীতের পরিবর্তিত রূপটি লীগের সব শাখাতে যেন পাঠানো হয়।
(গ) জাপানের ভারতীয়রা কী খাবার খান সেই বিষয়টি জানার, এবং সেখানে আরও কিছু রসদ পাঠানোর প্রয়োজন আছে কিনা সেই বিষয়ে খোঁজ নেবেন।
(ঘ) শ্রীমেহরার শিল্পভিত্তিক পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করে দেখবেন এবং সাধারণ কর্মীবৃন্দের কাছে জমা দেবার উপযোগী একটা বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা রূপায়ণ করবেন।
(ঙ) ভারতীয়দের মধ্যে আরও কিছু সন্দেহজনক চরিত্র আছে কিনা সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করবেন যাতে কর্তৃপক্ষের কাছে এই বিষয়টির উল্লেখ করা যায়।

টোকিও থেকে সায়োনানে সব সময়েই বিমান চলাচল করছে। যদি ঠিক জায়গায় যোগাযোগ রাখতে পারেন, তা হলে সায়োনানে আপনি ঘন ঘন চিঠি পাঠাতে পারবেন।

জয় হিন্দ
সুভাষচন্দ্র বসু

পুনশ্চ: অনুগ্রহ করে আমার সব সাম্প্রতিক বক্তৃতাগুলির কপি সাধারণ কর্মীবৃন্দ এবং তথ্যকেন্দ্রকে দেবেন। অনুগ্রহ করে তথ্যকেন্দ্রকে জানাবেন যে তারা যদি এই বক্তৃতাগুলি টোকিও প্রেসে ছাপাতে চায় তা হলে সে ব্যাপারে আমার কোনও আপত্তি নেই।

সু.চ.ব

শ্রীরাম মূর্তির প্রতি
টোকিও

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

তাইওয়ান
(ফরমোসা)
৯.১২.৪৪

জয় হিন্দ!

দুর্ভাগ্যক্রমে, খারাপ আবহাওয়া এবার যেন আমাদের সঙ্গী হয়েছে। যেখানেই যাচ্ছি, শৈত্যপ্রবাহ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে এবং তদুপরি প্রতিটি বিমানবন্দরে আমাদের বিমান দেরিতে ছেড়েছে। সেই কারণে আমাদের যাত্রা এখনও শেষ হয়নি। সাংহাইতে শ্রী এ. এম. সহায়ের সঙ্গে দেখা হল— তিনি কিছুদিন পরে টোকিও যাবেন— চিনদেশে তাঁর কাজ শেষ হলে। অনুগ্রহ করে শ্রীমতী সহায়কে জানিয়ে দেবেন যে শ্রী সহায় নিরাপদে সাংহাই পৌঁছেছেন।

আমি আপনাকে ফুকুওকা থেকে লিখেছিলাম। বৈদেশিক দপ্তরের একজন সদস্য টোকিওতে ফিরছিলেন, তাঁর হাতে আমার চিঠি পাঠিয়েছিলাম। ছেলেদের উদ্দেশে লেখা আমার একটা চিঠিও সেই চিঠির সঙ্গে ছিল এবং আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম তাদের হাতে চিঠিটা পৌঁছে দিতে।

বর্মাদেশের দূতাবাস থেকে একজন সদস্য টোকিও যাচ্ছেন এবং আমিও সেই সুযোগে আপনাকে দ্রুত কয়েক লাইন লিখে পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহ করে শ্রীশিবরামকে আমার গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত রাখবেন।

নিপ্পন টাইমস্ সহ, জাপান ও চিনদেশ থেকে প্রকাশিত ইংরাজি ভাষার যাবতীয় সংবাদপত্র আমি পেতে চাই। অনুগ্রহ করে এই কাগজ ও পত্রিকাগুলি ক্রমানুসারে সংগ্রহ করে রাখবেন এবং সায়োনান বা রেঙ্গুন যাচ্ছেন, এমন কারওর হাতে সেগুলি পাঠাবার সুযোগ যদি আসে, অনুগ্রহ করে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন। আপনি যদি খেয়াল রাখেন তা হলে আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে এমন অনেককেই পাবেন যাঁরা টোকিও থেকে সায়োনান বা রেঙ্গুন যাচ্ছেন। আপনাকে শুধু সঠিক জায়গায় যোগাযোগ রাখতে হবে। এ ছাড়াও, এখানকার সাধারণ কর্মীবৃন্দের তরফ থেকে লোকজন অনেক সময়েই বিমানে ওদিকে যাতায়াত করে থাকেন। থাই ও বর্মা দূতাবাস থেকেও লোকজন যাতায়াত করেন। ব্যাঙ্কক অভিমুখে যাত্রী থাই দূতাবাসের সদস্যেরা ব্যাঙ্ককের ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের অফিসে কাগজপত্রগুলি পৌঁছে দেবেন এবং তারপরে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ সেটা বিমানে ব্যাঙ্কক থেকে রেঙ্গুনে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন, যেটা অতি সহজেই করা যাবে। থাই রাষ্ট্রদূত আমার বিশেষ পরিচিত এবং এই ব্যাপারে থাই দূতাবাস যে আমাদের সানন্দে সাহায্য করবেন সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। আমরাও সকলে ভাল আছি।
শুভেচ্ছাসহ,

জয় হিন্দ
সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীরাম মূর্তি
চেয়ারম্যান, আঞ্চলিক কমিটি, আইআইএল
টোকিও

আইএনএ শিক্ষারত সেনানীর প্রতি
টোকিও

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

সায়গন
১৪. ১২. ৪৪

স্নেহের শিক্ষানবিশ সেনাবৃন্দ,

আজ আমি সায়োনান ছেড়ে যাচ্ছি। আজ এখান থেকে একজন ভদ্রলোক টোকিও যাচ্ছেন। আমি এই সুযোগে তাঁর হাতে তোমাদের কাছে কিছু 'কাগজপত্র' পাঠাচ্ছি। আমি আরও কিছু জিনিস পাঠাতে পারতাম। কিন্তু তিনি এর থেকে বেশি ওজন নিতে পারবেন না।

আশা করি তোমরা সকলে ভাল আছ। আমাদের যাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে; কিন্তু এই যাত্রার প্রতি পর্যায়ে আমাদের বিলম্ব ঘটেছে খারাপ আবহাওয়ার জন্য।

আমার শুভেচ্ছা ও স্নেহাশীর্বাদ রইল।

জয় হিন্দ।
সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীরাম মূর্তির প্রতি
টোকিও

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

সায়গন
১৪. ১২. ৪৪

জয় হিন্দ!

জানি না কবে এই চিঠি আপনার হাতে পৌঁছবে। আজ হিকারি কিকানের মেজর আবে বদলি হয়ে টোকিও যাচ্ছেন এবং তিনি আমাদের ছেলেদের জন্য এক বান্ডিল 'কাগজপত্র' নিয়ে যাচ্ছেন। আমি আরও বেশি দিতে পারলাম না কারণ তিনি এর থেকে বেশি ওজন নিতে পারবেন না।

আমেরিকান পত্রিকা 'নেশন'-এ প্রকাশিত ইম্ফল যুদ্ধের উপরে একটি প্রবন্ধের কিছু অংশ এই চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি। আমি চাই যে, আমার তরফ থেকে এই লেখাটি আপনি মহানুভব জেনারেল তোজোর কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

সময়াভাবে আমি মেজর আবের হাতে এই চিঠিটা দিতে পারলাম না, কিন্তু তিনি 'কাগজপত্র'গুলি ঠিকই নিয়ে যাবেন। লেফটেন্যান্ট কর্নেল হবিবুর রহমান, আমার তরফ থেকে আপনার উদ্দেশ্যে লেখা একটা চিঠি, সেই 'কাগজপত্র'-এর সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

ফুকুওকা থেকে আমি আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম এবং সেইসঙ্গে আমাদের ছেলেদের উদ্দেশ্যে লেখা একটা চিঠিও পাঠিয়েছিলাম। আশা করি সেই চিঠি আপনি যথাসময়ে পেয়েছেন এবং ছেলেদের হাতে তাদের চিঠি পৌঁছে দিয়েছেন।

আমি এখান থেকে মাঝে মাঝে আমাদের ছেলেদের জন্য কিছু মাখন পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। পার্সেল নিয়ে যেতে রাজি হবে এমন কাউকে পাওয়া শক্ত। তেমন একজনকে যদি জোগাড় করতে পারা যায় তা হলে সহজেই মাঝে মাঝে একটা পার্সেল সায়গন থেকে টোকিও পাঠাতে পারা যাবে।

আমি ছেলেদের জন্য একটা চিঠি আপনার এই চিঠির সঙ্গে দিচ্ছি।

টোকিও রেডিয়োর মাধ্যমে আমেরিকার উদ্দেশ্যে আমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলাম তার একটা কপি অনুগ্রহ করে আমাকে পাঠাবেন। মনে হয় শ্রীশিবরামের কাছে, বা রেডিয়ো সম্প্রচারে যাঁরা আছেন তাঁদের কাছে আপনি একটা কপি পাবেন।

টোকিওতে পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই যে বক্তৃতাগুলি আমি দিয়েছিলাম, সেই বক্তৃতাগুলির কপি যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয়, তা হলে আপনাকে পাঠাব। তার জন্য আমাকে কাগজ কলম নিয়ে বসতে হবে ও স্মৃতি থেকে বক্তৃতার বয়ান মনে করতে হবে। আপনি তার পরে পুস্তিকার আকারে সেই বক্তৃতাগুলি প্রকাশ করতে পারবেন, যদি প্রয়োজন হয়।

সায়োনানে পৌঁছবার পরে আশা করছি, ইউএসএ-তে একটা বেতার সম্প্রচারের কেন্দ্র খোলবার বিষয়ে আমি একটা বার্তা পাব।

শ্রীআয়ার সায়োনানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন, সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য। আমি আজই সায়োনানে যাবার জন্য রওনা হচ্ছি।

আশা করি আপনাদের সকলের খবর ভাল।

সর্বাঙ্গীণ শুভেচ্ছাসহ,

জয় হিন্দ

সুভাষচন্দ্র বসু

বেনিতো মুসোলিনি প্রেরিত
(টেলিগ্রাম)

জানুয়ারি ২, ১৯৪৫

মহানুভব সুভাষচন্দ্র বসু
স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকারের সর্বাধিনায়ক

মহানুভব, আমাকে এবং ইতালীয় জনগণকে আপনি নববর্ষের যে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং সেইসঙ্গে আপনাকেও আমি অনুরোধ করব যেন আপনি আমার একান্ত আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন, আপনার ব্যক্তিগত মঙ্গল কামনায় এবং ভারতের আনন্দময় ভবিষ্যতের জন্য, যখন আপনার দেশ আমাদের দুই দেশের শত্রুর হাত থেকে শেষ বারের মতো মুক্তি পাবে।

মুসোলিনি

ডক্টর মজুমদারের প্রতি

রেঙ্গুন
১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫

ডক্টর মজুমদার,
চেয়ারম্যান, ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ,
সেরেমবান।

জয় হিন্দ!

শ্রী এইচ. পি. ভৌমিক মালয়ে ফিরে যাচ্ছেন। যুদ্ধের অগ্রবর্তী এলাকায় লড়াইয়ে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তিনি নিজেও তাঁর আত্মীয়দের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে সেখানেই তিনি ভাল থাকবেন। সুতরাং তাঁর মালয়ে ফিরে যাবার বিষয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই।

তাঁর জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটা ব্যবস্থা করতে আমি আপনাকে অনুরোধ করব:

১. সেরেমবান শাখা থেকে তাঁকে একটা উপযুক্ত পরিমাণে মাসিক অর্থসাহায্য দেওয়া হবে।
২. তাঁকে নিয়মিতভাবে খাবার রসদ (আইএনএ অথবা এ এইচডি-র মান অনুসারে) দেওয়া হবে।
৩. তাঁর চিকিৎসার জন্য যখন এবং যে সাহায্য লাগবে, আপনি তাঁকে সেটা দেবেন।
৪. সম্ভব হলে তাঁর জন্য একটি ভৃত্যের ব্যবস্থা করবেন, যে সর্বক্ষণ তাঁকে দেখাশোনা করবে। সেরেনবামের লীগ তার বেতন ও খাবার রসদ দেবে।

আরামে ও আনন্দে থাকবার জন্য সব রকমের সাহায্য যেন তাঁকে দেওয়া হয়, এটা আমি চাই।

আশা করি আপনার অঞ্চলে সন্তোষজনক ভাবে কাজের অগ্রগতি হচ্ছে।

জয় হিন্দ
সুভাষচন্দ্র বসু

এম সত্যবতী থেভরের প্রতি

আর্জি হুকুমতে আজ়াদ হিন্দ
(স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার)

ব্যাঙ্কক
২১ মে ১৯৪৫

ক্যাপ্টেন এম এস থেভর
কমান্ডান্ট
ঝাঁসির রানি বাহিনী প্রশিক্ষণ শিবির

জয় হিন্দ!

পদোন্নতির বিষয়ে সুপারিশ সহ আপনার চিঠি আমি যথাসময়ে পেয়েছি। কিন্তু আমি এখনও সে তালিকা দেখার সময় পাইনি। লেফটেন্যান্ট কর্নেল হবিবুর রহমান কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে আসছেন এবং আমি তাঁকেই অনুরোধ করব আপনার সুপারিশের তালিকা দেখে তাঁর মতামত জানাতে। অনুগ্রহ করে সব সুপারিশগুলি তাঁর সামনে পেশ করবেন ও আনুষঙ্গিক সব তথ্যগুলিও তাঁকে জানাবেন যাতে তিনি তাঁর অভিমত জানাতে পারেন।

আমাকে অনুগ্রহ করে জানাবেন যে আপনার শিবিরের প্রস্তাবিত সম্প্রসারণের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা এবং যদি তা হয়ে থাকে, তা হলে আরও কতজন বাড়তি মেয়েকে সেখানে স্থান দেওয়া যাবে।

আশা করি কাজ সন্তোষজনকভাবে এগোচ্ছে এবং আপনারা সকলে সুস্থ আছেন।

জয় হিন্দ
সুভাষচন্দ্র বসু

এম. সত্যবতী থেভর প্রেরিত

ঝাঁসি রানি বাহিনী
প্রশিক্ষণ শিবির

২২ মে, ১৯৪৫

মহানুভব
নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু
সর্বাধিনায়ক, এ. এইচ. এফ.

শ্রদ্ধেয় নেতাজি,

২১ মে, '৪৫ তারিখে লেখা আপনার চিঠি আমি পেয়েছি। আপনার নির্দেশ মতো পদোন্নতির জন্য সব সুপারিশগুলি আমি লেফটেন্যান্ট কর্নেল হবিবুর রহমানের কাছে দিয়েছি এবং তার একটা প্রতিলিপি আমি আপনার কাছে পাঠাচ্ছি।

শিবির সম্প্রসারণের কাজের বিষয়ে জানাচ্ছি যে, অফিসারদের কোয়ার্টার্স তৈরির কাজ প্রায় শেষ এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই একটি নতুন শিবির ও নতুন দপ্তরের কাজ শুরু হবে। মালপত্র না পাওয়ার জন্য নির্মাণের কাজে বিলম্ব ঘটেছিল। এখন মালপত্র পাওয়া গেছে এবং শিবির ও দপ্তর তৈরির কাজ শীঘ্রই সম্পূর্ণ হবে।

আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে ১০০ জনের থাকবার মতো ব্যবস্থা হয়ে যাবে। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাখা এক তৃতীয়াংশ জমির বাকি অংশের দখল নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে, কারণ কুচকাওয়াজ হবার মতো যথেষ্ট জায়গা নেই। আমি এর মধ্যে হিকারি কিকানের মাধ্যমে মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

গত চার মাস ধরে শিবিরের মধ্যে স্কেবিজ, ম্যালেরিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের প্রকোপে অনেকেই খুব কষ্ট পেয়েছে। বর্তমানে শিবির রোগমুক্ত হয়েছে এবং সিপাইদের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয়েছে। তারা মানসিকভাবেও প্রফুল্ল আছে।

কর্নেল আলাগাপ্পান সুপারিশ করেছেন যে সব শিক্ষিত সিপাইকে অথবা অন্ততঃপক্ষে ১৫০ জন সিপাইকে নার্সিং শেখানো হোক এবং তার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নিয়মিত টাটকা সবজি, মাছ ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী পাঠিয়ে খাদ্যসম্ভার দপ্তরের সহকারী প্রধান আমাদের খুব সাহায্য করে থাকেন। বর্তমানে শিবিরের সকলে শারীরিক দিক দিয়ে সুস্থ ও মানসিকভাবে প্রফুল্ল।

শিবিরের কাজ চলছে যথানিয়মে। এনসিওদের জন্য চতুর্থ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে এবং আরও কয়েকজন সিপাই নার্সিং পাঠক্রমে যোগ দিয়েছে। মেজর (মিসেস) কে এস নেরুলার স্থানে ক্যাপ্টেন দাশগুপ্তকে মেডিকেল অফিসারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলির বিষয়ে আরও তথ্যের প্রয়োজন থাকলে অনুগ্রহ করে তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল হবিবুর রহমানের কাছ থেকে জেনে নেবেন। এই ছোটখাটো বিষয়গুলি নিয়ে আপনাকে ব্যস্ত করার প্রয়োজন না থাকায় আমি চিঠি থেকে সেগুলি বাদ দিচ্ছি।

সিপাইদের মনোবল... (পাঠসাধ্য নয়)... আমাদের মধ্যে অধিকাংশের মতই হল যে আমরা লড়াই করে মৃত্যুবরণ করতে চাই কিন্তু আপনি আমাদের সর্বাধিনায়ক, আপনি যেমন সিদ্ধান্ত নেবেন আমরা তাই করব। আমাদের আপনি যেভাবে কাজে লাগাতে চান আমরা

সেইভাবেই কাজ করবার জন্য প্রস্তুত এবং আমাদের ঐকান্তিক কামনা হল জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেন আপনার পাশে আমরা থাকতে পারি।

আশা করি আপনার ও আপনার সঙ্গে যারা আছে সকলের শরীর সুস্থ আছে।

'জয় হিন্দ'

এম সত্যবতী থেভর
ক্যাপ্টেন
কমান্ডান্ট ঝাঁসী রানি বাহিনী
প্রশিক্ষণ শিবির

ব্রহ্মচারী কৈলাসমের প্রতি

ব্যাঙ্কক
১০/৬/৪৫

ব্রহ্মচারী কৈলাসম্
সায়োনান

জয় হিন্দ,

আমি আপনাকে এক লাইন লিখছি জানাবার জন্য যে আমি ভাল আছি। বর্মাতে সম্প্রতি যা ঘটেছে তা সত্ত্বেও আমাদের লড়াই চলবে। আমরা জয়ী হব এবং ভারত স্বাধীন হবে।

স্বামীজিকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাবেন। সশ্রদ্ধ শুভেচ্ছাসহ,

জয় হিন্দ
সুভাষচন্দ্র বসু

নির্দেশিকা

১৯৪২ সালের আন্দোলন ২৯০

অচিনলেক, জেনারেল ২১৪
অযোধ্যা ৯১
অরবিন্দ ঘোষ ৭৯
অল ইন্ডিয়া মুমিন পার্টি ৩১২
অশোক, সম্রাট ২৩৬
অসহযোগ আন্দোলন ৬২, ৮০, ৮১, ৯১, ৯৭, ১৪৩
অস্ট্রিয়া ৬২, ১৯৬, ১৯৯, ২৬৮
অস্ট্রেলিয়া ১৫৫, ১৫৮
অহল্যাবাঈ ৯৭
অহিংস আন্দোলন ১৭১, ১৯৯
অ্যামেরি, মিস্টার ৩২২
অ্যালসাশ-লোরেইন ১৮১
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া ৩০৫

আইজেনহাওয়ার, জেনারেল ১৮৪
আইনঅমান্য আন্দোলন ৪, ২৫, ৩৩, ৩৭, ৫৬, ৬৩, ৬৫, ৮০, ৯১, ১৪৮, ১৫৩, ১৯৭, ২৩৮, ৩১১, ৩২৪
আইরিশ বিদ্রোহ ২৬৯
আকিয়াব এলাকা ১৪৭, ২২৪, ২৩৩, ২৫৩
আঙ্কারা ১৮৭
আজাদ মুসলিম লীগ ৩০৩, ৩১২, ৩৩৭
আজাদ হিন্দ আপৎকালীন সরকার *দেখুন* আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার
আজাদ হিন্দ ফৌজের আপৎকালীন সরকার *দেখুন* আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার
আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ ১৫৬
আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার ২৫, ৩৫, ৫৬, ৫৭, ৮৭-৮৯, ৯২-৯৫, ১০০-১০৮, ১১১, ১১৬, ১১৭, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৯, ১৫৫-১৫৮, ১৬৭, ১৭৮, ১৯৭, ২১০, ২২২, ২২৬, ২২৮, ২৩৩, ২৩৪, ২৫১, ২৫২, ২৭০, ২৭১, ২৮৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৮, ৩১৯, ৩৪০-৩৪২, ৩৪৫
আজিজ আহমেদ্, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ৮৯
আট্টু দ্বীপ ৬৮
আনাতোলিয়া ৮৯, ৯৫, ১০৩, ২৬৮
আনে, মিস্টার /শ্রী ২৯৩, ৩০২
আন্তর্জাতিক রেড ক্রস সোসাইটি ১২৭
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ *দেখুন* আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১২১, ১৩৪, ১৩৮, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৯, ১৫০, ১৫৬, ১৬৭, ১৭৮, ২৫১
আপৎকালীন আজাদ হিন্দ সরকার *দেখুন* আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার
আপৎকালীন সরকার *দেখুন* আজাদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার
আপ্পা সাহিব ভোঁসলে ৯১
আফগানিস্তান ১৩৫, ১৩৬, ২৩৬
আফ্রিকা ৫, ৭৩, ৭৪, ১৩৮, ১৫৫, ২০১
আবিসিনিয়া ২১৪
আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা ২৮৪, ২৮৯, ৩০০, ৩০৩, ৩০৫, ৩৩০, ৩৩৫, ৩৩৮
আবে, মেজর ৩৭২
আমানুল্লা, রাজা ১৩৬
আমেরিকা ৫, ৭, ৯, ২৮, ৫৫, ৭৪, ৮২, ১০১, ১০৭, ১৩৮, ১৪৪, ১৫৫, ১৫৮, ১৬৭, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৫, ১৯০-১৯২, ১৯৯, ২০১, ২২৯, ২৪৪, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫৫, ২৫৭, ২৭১, ২৭৪, ২৮৪-২৮৬, ৩১৫, ৩১৭, ৩২৫, ৩৪১

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র *দেখুন* আমেরিকা
আমেরিকান শতাব্দী ১৭২, ১৮৩, ২২৯, ২৭৪
'আমেরিকানদের শতাব্দী' *দেখুন* আমেরিকান শতাব্দী
আয়ার, শ্রী ৩৭৩
আয়ারল্যান্ড ৩৫, ৬২, ৭৯, ৮০, ৮৮, ৯৫, ১০৩, ১২৫, ১৪৯, ১৯৮, ২০০, ২১৪, ২১৯, ২৩৩, ২৩৯, ২৫০, ২৫৪, ২৬৯, ২৮০, ৩০০, ৩১২, ৩৩৪
আর কে শেখরণ ৩৫৭, ৩৫৮
আরউইন উইকার্ট ১৬
আরশাদ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ৩১৫
আরাকান ১৪৬, ১৪৮, ১৫৬, ১৬৩, ১৬৭, ১৬৯, ২০২, ২১৭, ২২৫, ২৫১, ২৫৯, ২৬৫, ৩১৪, ৩৫৭
আরাকান অঞ্চল *দেখুন* আরাকান
আরাকান সীমান্ত ১৪৭
আর্চিবল্ড স্টিল ১৯৩
আর্জি হুকুমত-এ আজ়াদ হিন্দ (স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার) *দেখুন* আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার
আর্নস্ট ওয়োরম্যান, ডক্টর ১২২, ১২৩
আর্মি অফ লিবারেশন ৩১
আলওয়ার ২০৫
আলাগাপ্পান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ৩৫২, ৩৭৬
আলাস্কা ৭
আসফ আলি ২৮৯
আসাম ১৬৪, ১৬৯, ১৯৫, ২০২, ২০৩, ২২৫, ২৩২, ২৫২, ২৫৮, ২৬৫

ইউনিয়নিস্ট পার্টি ৩৩৮
ইংল্যান্ড ৫, ৭, ৯, ২৪, ৫১, ৬১, ৬২, ৭৪, ১১২, ২০১, ২১৩, ২৩১, ২৪০, ২৪৪, ২৪৭, ২৪৮, ২৫৫, ২৫৭, ২৮৬, ২৮৮, ৩০৭, ৩১৩, ৩১৭, ৩২২, ৩৩৫
ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তি ১৯৮
ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী/ শক্তি ৫, ৭, ২৩-২৫, ৩১, ৭২, ৮২, ৮৯, ৯৪, ১০৬, ১২৩, ১৩২, ১৪৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৭৯, ১৮৬, ১৮৮-১৯২, ১৯৪, ১৯৫, ২১৫, ২১৬, ২২০, ২২৫, ২৩০, ২৫১, ২৫৬, ২৫৭, ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৬, ২৯৯, ৩০৭-৩০৯, ৩১৬, ৩১৯, ৩২৯, ৩৩০, ৩৪১
ইঙ্গ-মার্কিন জোট *দেখুন* ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী/ শক্তি
ইঙ্গ-মার্কিন সেনাবাহিনী *দেখুন* ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী/ শক্তি
ইডেন, মিস্টার ২৫৭
ইতালি ১৩, ২৮; ৮০, ১৮২, ১৮৪, ১৮৭, ১৯০, ১৯৯, ২০০, ২১৪, ২১৫, ২৩৯, ২৪০, ২৫৭
ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ *দেখুন* ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ
ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ১৯, ২০, ২৭, ৩১, ৪১-৪৪, ৫৬-৫৮, ৮৩, ৮৮, ৯২, ৯৫, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১১০, ১৩৪, ১৪৪, ১৪৯, ১৫৬, ১৬৭, ৩১৩, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৯, ৩৫৪, ৩৫৯, ৩৭০
ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি ২৭, ৩১
ইন্ডিয়ান লিবারেল ফেডারেশন ২৯৯
ইন্দোচিন ১৬, ৮৫, ৯৪, ১৬৬, ২৫৬, ২৮৪
ইম্ফল ২১৭, ২২৫, ২৩২, ২৫১-২৫৩, ২৫৮, ২৬৫, ২৭০, ৩১৪, ৩৫৭, ৩৬৫
ইয়ামামোতো, কর্নেল ৮৮, ১০৭
ইয়েনান ৩১৭
ইয়োমিউরি হোচি ১৬২
ইয়োশিহিসা কুজু ১২২
ইরাক ১০৭
ইরান ১০৭, ১৩৬, ১৮৬
ইরিত্রিয়া ২১৪
ইশার সিং, সর্দার ৯০, ১৫৯
ইস্ট ইন্ডিজ় ৬, ২৫৬
ইস্টার বিদ্রোহ *দেখুন* ইস্টার বিপ্লব
ইস্টার বিপ্লব ৬২, ১২৫, ২৮০

উ বা লুইন ৫৫
উইডমেয়ার, জেনারেল ২৫৭
উইনস্টন চার্চিল, মিস্টার ৮, ২৩, ১৮৩, ১৯০, ২৫৭
উত্তর আফ্রিকা ৫, ৬, ১৮৪, ১৮৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রদেশ ১৪৮
উমিচাঁদ ২১০

এ ইয়েলাপ্পা ৯০, ১৫৯
এ এন সরকার ৯০
এ এম সহায় ৯০, ৯১, ১১৬, ৩৭০
এ জি লোগানাদান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ৯০, ১৪১, ১৬৭, ২৫১
এ সি চ্যাটার্জি, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ৮৩, ৮৯
এ হাসান ১১৬
এইচ. পি. ভৌমিক, শ্রী ৩৭৪
এইজি আমাউ ১১৬
এন রাঘবন, মিস্টার ১৫৯
এম কে চিদাম্বরম, মিস্টার ৮৮
এম কে চিদাম্বরম, মিসেস ৯৬
এম কে রামচন্দ্রন, মিস্টার ৮৩
এম জেড কিয়ানি, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ৯০, ২৫১
এম মলোটভ ২৭১, ২৭৩, ২৭৪, ২৮৬, ৩১৫
এম. সত্যবতী থেভর, লেফটেন্যান্ট ৩৫৩, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৭৫, ৩৭৬
এমিলিও এগুইন্যালডো, জেনারেল ৮২
এল এস মিশ্র, মেজর ১৬৩
এশান কাদির, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ৯০
এস এ আয়ার ৮৯, ১৩৯
এস এ আলাগাপ্পন ২০
এস এন সরস্বতী, মিস ২০
এস এম বশির, মিস্টার ১৫৯
এস সি আলাগাপ্পান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ১৫৯

ওয়াঙ চিঙ-ওয়ে, প্রেসিডেন্ট ১২২, ১২৩
ওয়াভেল, জেনারেল *দেখুন* ওয়াভেল, লর্ড
ওয়াভেল, লর্ড ৭, ২২, ১১৪, ১৩৮, ২১৪, ২৭৮, ২৭৯, ২৮১, ২৮৩-২৮৫, ২৮৭-৩০২, ৩০৫-৩১০, ৩১২, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৮, ৩২৩, ৩২৬, ৩২৯-৩৩১, ৩৩৪-৩৩৮
ওয়াল স্ট্রিট ১৭৭
ওয়াশিংটন ৭৪, ১০৬, ১৭২

কংগ্রেস-লীগ চুক্তি ২২১
কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২৯৭, ২৯৮, ৩০০, ৩০৪-৩০৭, ৩১০, ৩১১, ৩১৩, ৩১৯, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩০,-৩৩২
ককেশিয়া ১৩৬
কনজারভেটিভ পার্টি ৩০৪, ৩০৭, ৩০৮, ৩২২
কন্সটান্টিনোপল ১৩১, ২৬৮
কমিউনিস্ট আন্দোলন ২৪০
করিম গনি ৯০
কলকাতা ৭৪, ২৭০
কলপি ৯৯
কস্তুরবা গান্ধী ১৫৩, ১৫৪, ১৭১
কাইজো শিবুজায়া ১১৬
কাজুও আওকি ১১৬
কানাডা ১৯৮
কাবুল ১৩৬
কালাদান ১৬৪, ২০২, ২১৭, ২২০, ৩৫৭
কুনওয়ার সিং ৯১
কুয়ালা লামপুর ৭০, ৭৩, ৭৪
কুয়োমিনটাং ২৪৪
কে এস নেরুলা, মেজর (মিসেস) ৩৭৬
কৈলাসম, ব্রহ্মচারী ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৬৫-৩৬৭, ৩৭৭
'কোমাগাটা মারু' ১৪৮, ১৮৯
কোহিমা অঞ্চল ২১৫, ২১৭, ২২০, ২২৪, ২৩২, ২৩৩, ২৫৩, ৩৫৭
ক্রিপস ২৯৩
ক্রিপসের প্রস্তাব ৩০০
ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ১১৮
ক্রোয়েশিয়া ১৯৬
ক্লসউইটজ্ ২৬৮, ২৭১

খারে, ডক্টর ২৯৩, ৩০২
খুদাই-খিদমতগার ৩১২, ৩৩৮

গান্ধী, মিস্টার *দেখুন* মহাত্মা গান্ধী
গান্ধীজি *দেখুন* মহাত্মা গান্ধী
গিরাউ, জেনারেল ১৮৪
গুলজারা সিং, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ৯০
গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, পণ্ডিত ৩৩৮
গোয়ালিয়র ৯৯
গোল টেবিল বৈঠক ২৮১, ৩৩৫
গ্যারিবল্ডি ২৮, ৮০, ২০০, ২৩৯
গ্রিস ২৩৫, ২৫৭, ২৬৮, ৩৩২
গ্রেট ব্রিটেন ১৭

চট্টগ্রাম ২২৫, ২৩২, ২৫২, ২৫৩, ২৫৮
চাঁদ বিবি ৯৬
চাঙসা ১৯৪
চার্চিল, প্রধানমন্ত্রী ৮৫, ১২৮, ১৯১, ২৫৭, ৩১৭, ৩২২
চার্চিল, মিস্টার *দেখুন* চার্চিল, প্রধানমন্ত্রী
চিদাম্বরম, মিস্টার ৯১
চিন ৪, ১৬, ১২৯, ১৩৮, ১৪৯, ১৫৫, ১৫৮, ১৬৬, ১৭৬-১৭৮, ১৯৩, ১৯৪, ২১৬, ২৪০, ২৪৩, ২৮৪, ৩১৬, ৩১৭
চিনা কমিউনিস্ট পার্টি ২৪৪
চিয়াঙ, শ্রীমতী ১২২
চিয়াঙ কাই-শেক ৪, ১২২, ১২৯, ১৯১
চু মিন-ই ১২২
চুঙকিঙ ৪, ১২২, ১২৯, ১৫৮, ১৭৬, ১৭৭, ১৯১, ১৯৩, ১৯৪, ২০২, ২৫৭, ২৮৪, ৩১৭
চেকোস্লোভাকিয়া ৬২, ৮৮, ৯৫, ১০৩
চেম্বারলেইন, মিস্টার ৬৪
চ্যারেরিস, ব্রিগেডিয়ার ২০৯

জওহরলাল নেহরু, পণ্ডিত ২০৯, ২৮৪, ২৯০, ৩০৫
জয়পুর ২০৫
জর্জ ওয়াশিংটন ২৮
জাপান ৪, ৮, ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ২৪, ২৮, ৩৪, ৩৫, ৫১, ৫৩-৫৫, ৫৮, ৭৬, ১১২, ১১৭, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৮, ১৪২, ১৪৪, ১৪৯, ১৫৫, ১৬২, ১৬৬, ১৬৭, ১৭৬-১৭৯, ১৮৯-১৯৪, ২০০-২০২, ২১৪, ২১৬, ২২২, ২২৯, ২৩৮-২৪০, ২৪২, ২৪৮, ২৪৯, ২৫১, ২৫২, ২৫৫-২৫৭, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৪, ২৯৯, ৩০৭, ৩১৪-৩১৬, ৩১৭, ৩২৫, ৩২৯, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৯, ৩৫৮, ৩৬৯, ৩৭০
জাভা ১৬৬
জামায়েত-উল-উলেমা ৩০৩, ৩১২, ৩৩৭
জার্মানি ৮, ১৬, ১৮, ২৮, ৬২-৬৪, ৬৭, ৯২, ১১২, ১২২, ১২৮, ১৩৬, ১৩৮, ১৪৪, ১৬৭, ১৭৮, ১৮১, ১৮২, ১৮৫, ১৮৭, ১৯০, ১৯২, ১৯৬, ১৯৯, ২১১, ২১৩, ২১৪, ২২২, ২২৯, ২৩০, ২৪০, ২৪৫, ২৪৭, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৬৮, ২৭১, ২৭৩-২৭৬, ২৮০, ২৮৬, ৩০৭, ৩১৬
জালিয়ানওয়ালাবাগ ৭৯
জি আর নাগর, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ১৫৯
জিন্না, মিস্টার ৪৯, ৫০, ২১৯, ২২০, ২৪৬, ২৮৮, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩৩৫, ৩৩৮
জে এ থিভি, শ্রী ৯০, ৩৫৪
জে কে ভোঁসলে,লেফটেন্যান্ট কর্নেল ৮৯, ১১৬
জে থিভি *দেখুন* জে এ থিভি
জেনেভা ৩১৬
জোন অফ্ আর্ক ১৬০

ঝাঁসি ৯৭, ৯৯
ঝাঁসি বাহিনী *দেখুন* ঝাঁসির রানি বাহিনী
ঝাঁসির রানি ৩৬, ৯১, ৯৮, ৯৯
ঝাঁসির রানি বাহিনী ৫৬, ৮৪, ৯৬,১০৫, ১৬০, ১৬১, ১৬৬, ৩১৯, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৬১, ৩৬৩
ঝাঁসি রানি রেজিমেন্ট *দেখুন* ঝাঁসির রানি বাহিনী

টিড্ডিম ১৬৪, ২০২, ২১৭, ২২০
টিপু সুলতান ৭৮, ৯১
টিমবাকটু ৭
টোকিও ৫, ১০, ১৩, ১৬, ১৯, ২৪, ৫৫, ১১৬, ১২৪, ১২৯, ১৩৮, ১৩৯, ১৪১, ১৪৪, ১৬৭, ২১০, ২৪৭, ২৫০, ২৫১, ২৫৬, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭২
টোঙ্গু এলাকা ৩১৪
ট্রিপোলিটানিয়া ৬
ট্রুম্যান, প্রেসিডেন্ট ৩১৭

ডানকার্ক ২৩১
ডাবলিন ৬২
ডারলান, অ্যাডমিরাল ১৮৪
ডি আই রাজু, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ১১৬
ডি এম খান ৯০
ডি ভ্যালেরা, প্রেসিডেন্ট ১৯৮, ২৫০
ডেনমার্ক ৩৩২
ডোরমান স্মিথ, স্যার ৫১

তাইওয়ান ২২৬, ২২৯
তাঁতিয়া তোপী ৯১, ৯৯
তিউনিসিয়া ৫-৭
তুরস্ক ৮০, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৯, ২৬৮, ২৮০, ৩০০
তেনো হেইকার ১২১
তোজো, জেনারেল ৮, ২৪, ৩১, ৫১, ৫৩, ৬৮, ১০৭, ১২১, ১৬৭, ১৭৮, ৩৭২
ত্রিপুরী ৬৪

থাইল্যান্ড ১৬, ৫৭, ৮৩-৮৬, ৯৪, ৯৯, ১৬৬, ২৭২, ২৮৪, ৩৬১, ৩৬৫, ৩৬৬
থাউঙ বাজার ১৪৭
থিভি, শ্রী ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬১

দক্ষিণ আফ্রিকা ১৫৩, ১৯৮
দক্ষিণ সুমাত্রা ১৩৩, ১৩৪
দাশগুপ্ত, ক্যাপ্টেন ৩৭৬
দি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ ৮৬
দিয়েপে ৬, ৭২
দিল্লি ২৬, ২৮, ৪০, ৫১, ৫২, ৫৪, ৫৬, ৬০, ৮৭, ৮৯, ৯৯, ১০৮, ১২০, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৯, ১৫৬, ১৮০, ২০৩, ২১৩, ২১৪, ২২৫, ২২৭, ২৩১, ২৩৪, ২৫০-২৫২, ২৭০
দিল্লি, নতুন ১৪১
দুর্গাপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত ১৩৪
দেবনাথ দাস ৯০
দেশাই-লিয়াকত আলি চুক্তি ৩৩৪
দ্বিতীয় গোলটেবিল সম্মেলন ৩৩৪
দ্য গল, জেনারেল ১৮৪

নবাব আলি ১৩৪
নাগপুর ৮১
নাগা পাহাড় ২১৫
নানকিং ১২২, ১২৩, ৩১৭
নানাসাহেব ৯১, ২০৫
নিউ ইয়র্ক ৬
নিকোবর ১৩৪
নিপ্পন ৩, ৩১, ৫১, ৮৭, ৮৮, ৯২, ১০০, ১০৬, ১০৭, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২১-১২৪, ১৩০, ১৩৪, ১৪১-১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫১, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৪, ১৬৯, ১৯৩, ২২৬, ২৫১-২৫৩, ৩৬৮
নিয়ানগাঙ ১৪৭
'নিহিলিস্ট' আন্দোলন ২৩৯
নুরজাহান ৯৭
নেপাল ২০১
নেপোলিয়ন ১১৮, ১৮৪, ১৮৫, ১৯৯, ২১২, ২৫৭
নেপোলিয়ান বোনাপার্ট *দেখুন* নেপোলিয়ন
'নেশন' ৩৭২
নেহরু, পণ্ডিত *দেখুন* জওহরলাল নেহরু, পণ্ডিত
নেহরু, মিস্টার *দেখুন* জওহরলাল নেহরু, পণ্ডিত
ন্যাশনাল সোশ্যালিজ়ম ২৪০, ২৪৬, ২৪৭

পঞ্জাব ৯১, ১৪৮, ৩৩৮
পন্থ, পণ্ডিত ৩৩৫
পাকিস্তান ৫১, ২১৯, ২২১, ২৯০, ২৯৪, ৩০২, ৩০৩
পাদাং ময়দান ১০০
পানিপথ ২২৫, ২৩১, ২৫২
পানিপথের যুদ্ধ ২৩২
পারস্য ২৩৬
পালাম ২২০
পালেমবুঙ ১৩৪
পালেল ২১৭
পিবুল সনগ্রাম ৫৭
পিয়ারা সিং, লেফটেন্যান্ট ১৬৩, ১৬৪
পুনা ১৫৩
পূর্ব আফ্রিকা ১০
পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা ১৫৮
পেড্যাঙ ৩৭, ৩৮
পোর্ট আর্থার ২৯
পোর্ট ব্লেয়ার ১৩৪, ১৪২, ১৭৮
পোল্যান্ড ৬২, ১৮৬
পোসেনবি ২০৯
প্যানটেলিরিয়া ৬, ৭
প্যারিস ৬, ৭৯
প্যারিস কংগ্রেস ১১৮

প্যালেস্টাইন ২১৯
প্রজা পার্টি ৩০৩, ৩১২, ৩৩৮
প্রতিমা পাল ৩৫০, ৩৬৬
প্রোম ৩১৪

ফরমোসা ২২৬, ২২৯, ২৫৭
ফরাসি বিপ্লব ১৭৬
ফশ, মার্শাল ১৮১, ১৮৪, ২৬৭, ৩১৭, ৩১৮
ফিনল্যান্ড ১৮৬
ফিনিশিয়া ২৩৫
ফিরোজ খান নুন, স্যার ২৭২
ফিলিপাইন/ফিলিপিন ৬, ১৬, ২৪, ৫৩, ৮২, ৮৫, ৮৮, ১০১, ১০৬, ১০৭, ১২৩, ১২৮, ১৩০, ১৩৮, ১৪৯, ১৬৬, ১৭৬, ২৫৭, ২৭১
ফুকুওকা ৩৭০, ৩৭২
ফ্যাসিজ়ম ২৪০, ২৪৬
ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ার যুদ্ধ ২৩২
ফ্রান্স ৬, ৭, ২৮, ৪৯, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৭২, ১৪৯, ১৬০, ১৮২, ১৮৪, ১৮৫, ১৯০, ১৯২, ২২৯, ২৪০, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৫২, ২৫৬, ২৭৪, ২৮৬, ৩৩২

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ৭৯
বর্মাদেশ ৬, ৭, ২৪, ৫১-৫৮, ৭৫, ৭৬, ৮২-৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯৯, ১০১, ১০৬, ১০৭, ১২৭-১৩০, ১৩৬, ১৫৯, ১৬৭, ১৬৮, ১৯৩, ১৯৪, ২০২, ২২২, ২৩১, ২৫৬, ২৫৯, ২৬৩-২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭৬, ২৭৮, ২৮৩, ২৮৫, ২৯৬, ২৯৯, ৩০৮, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৭-৩১৯, ৩২১-৩২৩, ৩২৬, ৩৫৪, ৩৭০ বর্মা ৮৫, ৯৪, ১১৩, ১৩৮-১৪২, ১৪৫, ১৪৯-১৫২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৭৬, ১৭৮, ১৯৬, ২২৩, ৩৪১, ৩৫৬, ৩৭৭
বলকান অঞ্চল ১৮৬, ১৯৯, ২৬৮
বল্লভভাই প্যাটেল, সর্দার ২৮৪, ৩০৫
বা ম, ডক্টর ৫২, ৫৫, ৫৭, ৮৩, ৮৬, ১৪১, ৩১৪
বাউলি বাজার ১৪৭
বাংলা ২২৫, ২৩২
বাজি রাও, পেশওয়া ৯১
বাদোলিও ১৮২
বার্লিন ৬৩, ৬৯, ১৮৬, ২৭১
বার্লিন কংগ্রেস ১১৮
বালসেনা ১৬৬
বালুচিস্তান ১৩৫, ২১৩
বাল্টিক সাগর ১৮৬
বাহাদুর শাহ, সম্রাট ৭৫, ৭৬, ৯১, ২০৪, ২০৬, ২০৭
বিকানির ২০৫
বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ২৭২
বিঠলভাই প্যাটেল ২৯৪, ৩১৬
বিবিসি ২১৩
বিসমার্ক ২৭৩
বিশেনপুর ২২০
বীর-এ-হিন্দ ১৬৩
বুলগেরিয়া ১৯৯, ২৬৮
বেতাই, শ্রীমতী ১৫৯
বেনিতো মুসোলিনি ৩৭৩
বেরিলী ২০৬
বেলজিয়াম ১৮৪, ২৫৭, ৩৩২
বোম্বাই ৭৪, ২১৯
বোর্নিও ১৬৬
বোস্টন ৬
ব্যাঙ্কক ১৩৯, ৩৫৫, ৩৫৯, ৩৭০
ব্যাবিলন ২৩৫
ব্রিটেন ১৭, ১৮, ৫৫, ৬২-৬৪, ৮৫, ১০১, ১০৭, ১৩৬, ১৪৩-১৪৫, ১৬৭, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ১৮৪, ১৯০, ১৯২, ২০১, ২০৫, ২০৭, ২১৯, ২২১, ২২৯, ২৫৭, ২৭১, ২৮৫, ২৯৮, ৩০৪, ৩০৮, ৩০৯, ৩১৫, ৩১৬, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩২, ৩৪১
ব্রেনার ২১৫

ভবানী, রানি ৯৭
'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ১৭২, ১৭৯, ২০১, ২১২, ২৮৫, ২৯২, ২৯৬, ২৯৮, ৩০৬
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ৭৯
ভার্সেই শান্তি সম্মেলন ১১৮
ভিয়েনা ১৩১
ভিয়েনা কংগ্রেস ১১৮
ভুলাভাই দেশাই, মিস্টার ৩০৫, ৩১১
ভেলু থামপি ৯১

ভোঁসলে, কর্নেল ৩৫৪, ৩৫৬

মজলিশ-ই-আহরার ৩০৩, ৩১২, ৩৩৮
মজুমদার, ডক্টর ৩৭৪
মণিপুর ১৬৪, ১৬৯, ১৯৫, ২০২, ২০৩, ২১৩-২১৫, ২২৪, ২২৫, ২৬৫
মন্টগোমারি, জেনারেল ২১৪
মস্কো ১৭, ১৩৬, ১৮৪, ২৫৭
মহাত্মা গান্ধী ১৪, ২৫, ৩৭, ৫৬, ৬২-৬৫, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৯১, ১৫৩-১৫৫, ১৬২, ১৭৩, ১৭৮, ১৭৯, ২০১, ২০৯, ২১২, ২১৯, ২৩৮, ২৪০, ২৪১, ২৬৯, ২৮১, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৭, ২৯১, ২৯৭, ২৯৮, ৩০৫, ৩০৭, ৩১০, ৩১১, ৩১৯, ৩৩১, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৮
মহাত্মাজি *দেখুন* মহাত্মা গান্ধী
মহাদেব দেশাই ১৫৩
মহারাষ্ট্র ৯৭
মাজিনি ২৩৯
মাঞ্চুকুও ১২২
মাৎসিনি ৮০
মাদ্রাজ ৭৪
মান্দালয় ৫১, ৩১৮
মামোরু শিগেমিতসু ১১৬, ১১৭, ১৪৬
মায়ু নদী ১৪৭
মার্কস ২৪৭
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র *দেখুন* আমেরিকা
মালটা দ্বীপ ৭
মালয় ৬, ১৬, ৩৩, ৪৬, ৪৭, ৫৬, ৭৪, ৮৩-৮৫, ৯৪, ১১০, ১১২, ১১৫, ১৪৫, ১৪৯, ২২৩, ২৩১, ২৫০, ২৫১, ২৫৬, ২৮৪, ৩১৯, ৩৪১, ৩৫৭, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৭৪
মালাকানান ১২৩
মাসায়ুকি তানি ১২২, ১২৩
মিউনিখ ৬৪
মিতসুরু তোয়ামা ১২২
মিত্রশক্তি ১৮৯, ১৯৩, ১৯৪, ২০২, ২১৫
মিশর ১৮৬, ২৩৫
মীর জাফর ৭৭, ৭৮, ২১০
মুকডেন ২৯
মুমতাজ হুসেন, জনাব সৈয়দ ৩৪০
মুলমেইন ৩৬১
মুসলিম মজলিস ৩০৩
মুসলিম লীগ ৪৯, ২২০, ২২১, ২৪৬, ৩০২, ৩০৩, ৩১০, ৩১১, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮
মুস্তাফা কামাল *দেখুন* মুস্তাফা কামাল পাশা
মুস্তাফা কামাল পাশা ৮০, ৮৯, ৯৫, ১০৩, ২৬৮, ২৬৯
মেরিডিথ কনরেড্ ৩৮
মেহরা, শ্রী ৩৬৯
মৈত্রেয়ী ৯৭
মোহনলাল ৭৮, ৯১
ম্যাজিনো লাইন ২২৪, ২২৫, ২৩২, ২৫২
ম্যানিলা ১২৩, ১২৪

যতীন্দ্রনাথ দাস ৬৬
যুক্ত প্রদেশ ২০৬
যুক্তরাষ্ট্র ১৮৪
যুগোস্লাভিয়া ৩৩২
যোধপুর ২০৫

রফি আহমেদ কিদোয়াই ২৮৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪০, ২৪১
রস দ্বীপ ১৩৪, ১৪১
রাউলাট আইন বা ব্ল্যাক অ্যাক্ট ৭৯
রাওয়ালপিন্ডি ৭৪
রাজাগোপালাচারী, শ্রী/মিস্টার ২৭৯, ৩০৫, ৩১১
রাজিয়া বেগম ৯৭
রানি ঝাঁসি বাহিনী *দেখুন* ঝাঁসির রানি বাহিনী
রানি ঝাঁসির রেজিমেন্ট *দেখুন* ঝাঁসির রানি বাহিনী
রাম মূর্তি, শ্রী ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭২
রামগড় ৩১২
রামাকৃষ্ণ, শ্রীযুক্ত ১৩৪
রাশিয়া ৪, ৭৯, ১৮২, ১৮৬, ১৮৭, ২১৪, ২১৬, ২২৯, ২৩৮-২৪০, ২৫৭, ২৭১
রাসবিহারী বসু/বোস ১৯-২১, ২৭, ৯০, ১২২
রাসাম্মা ৩৬৪
রিসোরজিমেন্টো আন্দোলন ৮০, ২৩৯
রুজভেল্ট, প্রেসিডেন্ট ৮৫, ১২৮, ১৮৩, ১৮৫, ১৯০-১৯২
রুডল্ফ হেস্ ২১৩

রুমানিয়া ২৬৮
রুসো-টার্কিশ যুদ্ধ ১১৮
রেঙ্গুন ৫২, ৫৫, ৮৩, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৫৯, ২৫১, ২৫৫, ৩২৩, ৩২৬, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৬১, ৩৭০
রোম ৬৯, ৮০, ১৩৫, ২৭০
র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ৩০৫

লক্ষ্মী, ক্যাপ্টেন মিসেস ৮৯, ৯৬, ১৪০, ৩৫৩
লক্ষ্মীবাঈ, ঝাঁসির রানি ৯৬, ৯৭, ১৬০
লম্বার্ড স্ট্রিট ১৭৭
লন্ডন ৬, ৬৪, ১০৬, ১৭২, ১৮৩, ২১৩, ২৭৮, ২৮১, ৩২২, ৩৩০, ৩৩১
লয়েড জর্জ, মিস্টার ৩১২
লী, ক্যাপ্টেন ৩৬১
লু ইয়ুং-হুয়ান ১২২
লুই মাউন্টব্যাটেন, লর্ড ৭২, ২১০, ২১৪
লুকসমেয়া, শ্রীমতী ৩৫৭
লেবানন ২৮০, ২৮৬, ৩১৫, ৩২৪
লেবার পার্টি ৩০৮, ৩২২, ৩৩০
লোকার্নো সম্মেলন ১১৮
লোগানাদান, মেজর জেনারেল ১৩৪, ৩১৫
ল্যাম্পেডিউসা ৬, ৭

শান প্রদেশ ৩১৪
শাহ নওয়াজ়, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ৯০
শিকাগো ডেইলি নিউজ় ১৯৩
শিগেরু হোনজো ১২২
শিজেনোরি কুরোদা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ১২৩
শিন ফেইন *দেখুন* শিন ফেইন পার্টি
শিন ফেইন পার্টি ৩৫, ৬২, ৮০, ১৯৯, ২০০, ৩১২, ৩৩৪
শিবরাম, শ্রী ৩৭০, ৩৭২
শিয়া কনফারেন্স ৩০৩, ৩১২
শিশির কুমার বসু ৩৫০
শুনরোকু হাতার ১২২, ১২৩
শেগিনোরি তাশিরো ১২৪
শোজো মুরাতা ১২৩
শোনান ১৪১
শ্যাম সিং, সর্দার ৯১

সত্যবতী থেভর, লেফটেন্যান্ট ৩৫৬, ৩৬০
সত্যাগ্রহ আন্দোলন/সংগ্রাম ১৪, ৮০, ৮১, ১৪৮, ১৯৭-১৯৯
সর্দার-এ-জং ১৬৩
সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ৩১১
সর্বভারতীয় মোমিন পার্টি ৩০৩
সহায়, শ্রীমতী ৩৭০
সাইরেনাইকা ৬
সাংহাই ১২৩, ১২৯
সান ইয়েত-সেন, ডক্টর ১২২, ১২৩, ২৪০, ৩১৭
সান ফ্রান্সিসকো ২৭৪, ২৮৬
সান ফ্রান্সিসকোর সম্মেলন ২৭১, ২৭২, ৩১৫
সায়গন ১২৪, ৩৭২
সায়োনান ১৯, ৩৩, ৪০, ৫২, ৫৬, ৭২, ৭৪, ৮৪, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১০৬, ১১০, ১১১, ১১৩, ১২৪, ১২৮, ১৩৯-১৪১, ১৪৫, ১৫৭, ২২২, ২২৮, ২৫০, ২৫১, ২৫৫, ৩২৩, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৫১-৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৭, ৩৬৯-৩৭১, ৩৭৩
সার্বিয়া ২৬৮
সি রাজাগোপালাচারী *দেখুন* রাজাগোপালাচারী, শ্রী
সিংহল ৩৫৯
সিঙ্গাপুর ৬, ৮, ২৭, ৩১, ৩৮, ৩৯, ৭২, ৮৩, ৯৬, ১৩৫, ১৪৯, ২০০, ২২২, ২২৩, ২৫৭, ৩২৩
সিপাহী বিদ্রোহ ৭৬, ৭৮
সিমলা ৩১৯, ৩৩৭
সিমলা সম্মেলন ২৮৮, ২৯০, ২৯১, ৩০৫-৩০৭, ৩১০, ৩১৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৪-৩৩৬, ৩৩৮
সিরাজ-উদ্-দৌল্লা, নবাব ৭৮, ৯১
সিরিয়া ১৮৬, ২৮০, ২৮৬, ৩১৫, ৩২৪
সিসিলি ৭, ৭৩
সুদেটান জার্মান ৬৪
সুমাত্রা ১৬৬
সেদান ২৯
সেবক-এ-হিন্দ ১৫৯
সেরেমবান ৩৭৪
সেলাঙ্গো ৭০

সেলুলার জেল ১৪২
সেলেবেস ১৬৬
সোভিয়েত *দেখুন* সোভিয়েত রাশিয়া
সোভিয়েত ইউনিয়ন *দেখুন* সোভিয়েত রাশিয়া
সোভিয়েত রাশিয়া ১৬, ১৩৬, ১৮৪, ১৮৫, ২১১, ২১৯, ২৪৫, ২৪৭, ২৭৩, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৫, ৩০০, ৩০৩, ৩১৬
সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ১৩৬
সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধ ১৩৬
স্টালিন, মার্শাল ১৮৬, ২৭৫, ৩১৭
স্টালিনগ্রাড ৬৮, ১৮৬, ২৭১
স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্, স্যার ৯, ২৩, ২৫, ৫১, ২৭৯, ২৮০, ৩২৯
স্বরাজ ১৩৪
স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন আজ়াদ হিন্দ সরকার *দেখুন* আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার
স্বাধীন ভারতের আপৎকালীন সরকার *দেখুন* আজ়াদ হিন্দের আপৎকালীন সরকার
স্বামী, মেজর ৩৬০
স্লিম, জেনারেল ৩১৬
স্লোভাকিয়া ১৯৬
হঙকঙ ৬, ১৩১, ১৪৯
হবিব, জনাব ২৫৫
হবিবুর রহমান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ১৫৯, ৩৭২, ৩৭৫, ৩৭৬
হল্যান্ড ৩৩২
হাকা ১৬৪, ২০২, ২১৭, ২২০
হাঙ্গেরি ৬২, ২৬৮
হাবিব সাহেব ১৫৯
হায়দার আলি ৯১
হিকারি কিকান ৪৩, ৮৮, ১০৭, ৩৪৯, ৩৭২, ৩৭৬
হিটলার, হের ৬৪, ৬৭, ২৪৫, ২৭৩
হিদেকি তোজো, জেনারেল ১১৬, ১১৭, ১৪১
হিন্দু মহাসভা ২৪৬
হোরগে ভ্যারগাস, মিস্টার ৮২
হোজ়ে পি. লরেল, প্রেসিডেন্ট ৮২, ১২৩, ১২৪
হ্যারল্ড ল্যাস্কি ৩৩০
হ্যালিফ্যাক্স, লর্ড ২২

‘Secrets of Crewe House’ ২০৯
‘The Indian Struggle’ ২৪৬
‘Wartime Falsehood’ ২০৯

9 789350 406137

আক্রমণ চালায়— যে আক্রমণকে তারা বর্মাদেশ পুনর্বার অধিকারের প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছিল। সে আক্রমণ কিন্তু শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখা যায়নি এবং চুঙকিঙের উপরে তার প্রভাব কী হয়েছে সেটা বর্ণনা করার থেকে কল্পনা করে নেওয়াই ভাল। আরও একটা চতুর কৌশল ইঙ্গ-মার্কিন করবার চেষ্টা করেছিল। তারা চুঙকিঙের সামনে এই সম্ভাবনা জাগিয়ে রেখেছিল যে যদি জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয় তা হলে চিন এশিয়াতে সর্বপ্রধান ও প্রবলতম শক্তিতে পরিণত হবে, যদিও বাস্তবিক জাপান যদি পরাজিত হয় তা হলে চিন সরাসরি চলে যাবে আমেরিকানদের কর্তৃত্বের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে। তবুও আমেরিকানদের এই কৌশল হয়তো ফলপ্রসূ হত চুঙকিঙে যুদ্ধের পরিস্থিতি যদি এখনকার থেকে ভাল হত। কিন্তু চাঙসা ও অন্য যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে চুঙকিঙ আমেরিকার সাম্প্রতিক পরাজয়ের ফলস্বরূপ সেখানকার পরিস্থিতি এবং তাদের মনোবল এখন যে অবস্থায়, তাতে আমেরিকানদের এই প্রচার কৌশলে আর কোনও কাজ হবে না।

কাজেই সংক্ষেপে বলতে গেলে, চুঙকিঙের পরিস্থিতি এতই সঙ্গীন যে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিকে সাহায্য করার পরিবর্তে তাদের কাছ থেকেই চুঙকিঙের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন, এবং এটা বলাই বাহুল্য যে ভবিষ্যতে পূর্ব এশিয়াতে জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির যুদ্ধে চুঙকিঙের অবদান খুবই সামান্য হবে। পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির যে পর্যালোচনা উপরে করা হল তা থেকে সহজেই যে সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছতে পারি তা হল ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পক্ষে জাপানকে পরাস্ত করা অসম্ভব। অন্তিম যুদ্ধে জাপানের জয় অবশ্যম্ভাবী, ইউরোপীয় যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে জয়পরাজয়ের চূড়ান্ত পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। এবারে আমি ভারতের কথা বলতে চাই এবং দ্বিতীয় প্রশ্নটিরও উত্তর দিতে চাই যে বর্তমানের এই জটিল ঘটনাবহুল পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষে কী করা সম্ভব।

পূর্বের ইতিহাস থেকে আমরা দেখেছি যে ভারতবর্ষে ব্রিটেনের সামরিক কৌশলগত প্রস্তুতি সর্বদাই এই ধারণার উপরে ভিত্তি করে ছিল যে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম দিক থেকেই শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এখন হঠাৎ করেই ভারতের পূর্বসীমান্ত উন্মুক্ত হয়ে গেছে, এ যেন বিধাতার ইঙ্গিত— বিশেষ করে যখন ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ত্রিশ লক্ষ দেশপ্রেমিক প্রবাসী ভারতীয়দের বসবাস।

এই ত্রিশ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়েরা রাজনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বিশ্বের নয়টি বন্ধুভাবাপন্ন দেশ সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি ভারতীয় আজ একই মহান উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যে ধর্ম বা অন্য কোনও ভেদাভেদ নেই, বিভেদের যে প্রাচীর ব্রিটিশ সর্বদাই ভারতীয়দের মধ্যে গড়বার চেষ্টা করেছিল। এই প্রবাসী ভারতীয়েরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার উদ্দেশ্যে 'সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি'র শপথ নিয়েছিল— সৈন্যবল, অর্থবল ও রসদ সংগ্রহের সেই শপথ আজ তাদের একটি আধুনিক সেনাবাহিনী গঠন করতে সাফল্য দিয়েছে এবং সেই সেনাবাহিনী গত মার্চ মাস থেকে ভারতের মাটিতে লড়াই করছে।

আজ শুধু একটাই প্রশ্ন— সেই প্রশ্ন হল এই সেনাবাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজ কি জাপানের সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে ও ভারতের অভ্যন্তরের দেশপ্রেমিক ভারতীয় জনগণের সমর্থনে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শক্তির কবল থেকে মুক্তি দিতে পারবে? আমার উত্তর হল— 'হ্যাঁ'।

আমি এ কথা বলছি আমার অভিজ্ঞতা থেকে একজন বাস্তববাদী হিসাবে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের শক্তি সম্বন্ধে আমি অবহিত। আবার ভারতের অভ্যন্তরে ভারতীয়দের ক্ষমতা